আওয়ামী দুঃশাসনের

শ্বেতপত্র

বুদ্ধিজীবীদের ডায়েরি থেকে

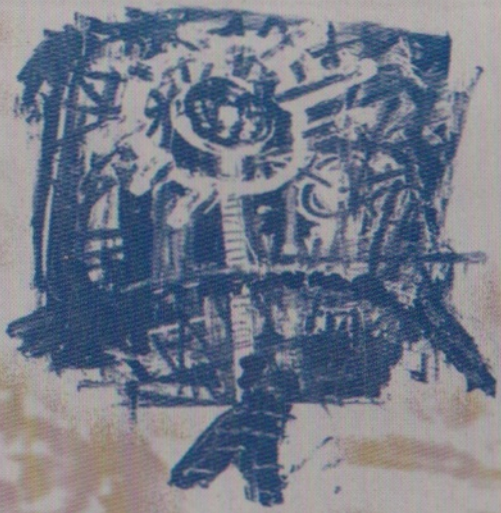

সোহেল মাহমুদ

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

বুদ্ধিজীবীদের ডায়েরি থেকে

সম্পাদনায়

সোহেল মাহমুদ

ইউনিভার্সাল বুক এজেন্সি

www.pathagar.com

আওয়ামী দু:শাসনের শ্বেতপত্র
বুদ্ধিজীবীদের ডায়েরি থেকে

সম্পাদনা
সোহেল মাহমুদ

প্রকাশক
ইউনিভার্সাল বুক এজেন্সি
১৩১ ডিআইটি এক্সটেশন রোড
ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০০১
ভাদ্র ১৪০৮

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
রফিকুল্লাহ গাযালী

বর্ণবিন্যাস
ছিদ্দিকুর রহমান, মনির ও ফারুক

মূল্য
টাকা ২৫০·০০

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স লি:
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৩৩৬৬৭৯, ৪১৯৬৫৪

www.pathagar.com

ন্যায় বিচারের রূপ একটি, জুলুম-অত্যাচারের শত রূপ। এই কারনেই ন্যায় বিচার করা অপেক্ষা অত্যাচার করা সহজ।

– প্লেটো

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল–দেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে তোলা। ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা সূচিত হলেও তা মজবুত ভিত্তির ওপর নির্মিত হওয়ার আগেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের কাছে পদানত হয়। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ সালে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনরায় যাত্রা শুরু হয়। বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে একটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বিগত পাঁচ বছরের (১৯৯৬–২০০১) শাসনকালে তারা সরকার পরিচালনায় কতটা সফল হয়েছে তা মূল্যায়নের দাবি রাখে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাবি করেন যে, তার সরকার জাতিকে সুশাসন উপহার দিয়েছে এবং দক্ষতার সাথে প্রশাসন চালিয়েছে। কিন্তু দেশের রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধজনেরা এ বিষয়ে কী বলেনঃ প্রফেসর এমাজ উদ্দীনের মতে, বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সুশাসন ও স্বশাসনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান আদালতের ওপর আওয়ামী লীগ সরকারের অনভিপ্রেত ক্ষোভ প্রকাশের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে "সুপ্রীম কোর্টের ওপর কি ডামেকোলসের তরবারি?" শীর্ষক নিবন্ধ লিখেছেন। বিবিসি-র প্রখ্যাত সাংবাদিক সিরাজুর রহমান আওয়ামী লীগ নেত্রীর রাজনীতির স্বরূপ পর্যালোচনা করে বলেছেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যতে শেখ হাসিনার কোন স্বার্থ নেই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতিতে বাংলাদেশকে শীর্ষে স্থান দিয়েছে। দেশের বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের শাসনকালকে 'দুঃশাসন' আখ্যা দিয়ে নানাবিধ মন্তব্য করেছেন।

বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনায় যে সফলতা বা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তার একটি ক্ষুদ্র চিত্র তুলে ধরার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে দেশের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীদের প্রাসঙ্গিক লেখাগুলো সঙ্কলিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লেখাগুলো ইতিপূর্বে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বুদ্ধিজীবীদের মতামত ও চিন্তাগুলোকে যুথবদ্ধ রূপ দেয়া হয়েছে। গ্রন্থিত নিবন্ধগুলো প্রধানত দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক যায় যায় দিন ও সাপ্তাহিক বিক্রম থেকে নেয়া হয়েছে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের তৈরি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদনটি প্রাসঙ্গিক তথ্যসমৃদ্ধ বিধায় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে মোট ৪৮ জন লেখকের ৬৪ টি নিবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে এবং তা বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে ১৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিষয়ের ভিন্নতা, বহুমাত্রিকতা ও ব্যাপকতা বিচারে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় পৃথক পৃথক বিষয়ে কয়েকজন লেখকের একাধিক লেখাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যে সকল বিদ্বজ্জনের লেখা বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে তাদের অনুমতি নেয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য সেই সৌজন্যের দাবি পূরণ করতে পারিনি বলে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকার ও পত্রিকা কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীদের লেখাগুলোতে যে মূল্যবান মতামত প্রতিফলিত হয়েছে তা পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে–এ প্রত্যাশা নিয়ে সম্পাদনার কাজটি হাতে নেই। আমার বিশ্বাস- এ গ্রন্থটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। আমার প্রত্যাশা ও বিশ্বাস কিছুটা পূরণ হলেও নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো। একটা উপযুক্ত সময়ে বইটি প্রকাশের জন্য আমি প্রকাশক তথা ইউনিভার্সাল বুক এজেন্সিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদক

•

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
শেখ হাসিনার রাজনীতির স্বরূপ

সিরাজুর রহমান: বাংলাদেশের ভবিষ্যতে শেখ হাসিনার কোন স্বার্থ নেই ১৩
আমানুল্লাহ কবীর: ক্ষমতার লোভ ও শেখ হাসিনার রাজনীতি ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়
জাতীয় সংসদ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি

প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী: সংসদে কেন যাই না ৩৮
বিচারপতি হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়া: জাতীয় সংসদ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ৫২
ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া: জাতীয় সংসদের এখাতিয়ার ও স্পীকারের দায়িত্ব ৫৮
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী: গণতান্ত্রিক সংসদে অগণতান্ত্রিক আচরণ ৬৫

তৃতীয় অধ্যায়
বিচার বিভাগের মর্যাদা ও স্বাধীনতা

বিচারপতি নঈমউদ্দিন আহমেদ: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ৬৯
প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ: বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা ৭৫
প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান : সুপ্রীম কোর্টের উপর ডামেকোলসের তরবারি ৭৯
ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন: গণতন্ত্র ও বিচার বিভাগের মর্যাদা ৮১
ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া: বিচার বিভাগের সাংবিধানিক মর্যাদা ৮৬
এম এ হাকিম: স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ৯৯

চতুর্থ অধ্যায়
গণতন্ত্র ও আইনের শাসন

ড: আফতাব আহমাদ ও ড: মাহাবুব উল্লাহ: আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতি ১০৪
ড: এ কে এম শাহাদত হোসেন মন্ডল: দেশ আজ কোন পথে? ১২২
লে: ক: (অব:) এম এ লতিফ খান: সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের কালো অধ্যায় ১৩০
মোবায়দুর রহমান: অবৈধ অস্ত্রের ভাণ্ডার এই বাংলাদেশ ১৩৬
শহিদুল ইসলাম: আওয়ামী শাসনে দেশ দুর্বৃত্তের স্বর্গরাজ্য ১৪০

পঞ্চম অধ্যায়
গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র

সিরাজুর রহমান: ব্যক্তি বিদ্বেষ, সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্র ১৪৫
আমানুল্লাহ কবীর: বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ১৫১
রাশেদ খান মেনন: আক্রান্ত সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা ১৫৭
আলী রীয়াজ: সাংবাদিকের ওপর হামলা ও লেখকের স্বাধীনতা ১৬৩

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
পররাষ্ট্র নীতি ও সীমান্ত সঙ্কট

প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ: ভারত তোষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৬৭
ড: এস এম লুৎফর রহমান: ওরা এত সাহস পায় কোত্থেকে? ১৭১
ড: মোঃ তৌহিদুল আনোয়ার: আমাদের টিকে থাকার শানে নজুল ১৭৬

সপ্তম অধ্যায়
গঙ্গা পানি চুক্তি

ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হাই: বাংলাদেশে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীসমূহ ও এদের প্রতিক্রিয়া ১৮১
শাহাদাত হোসেন খান: কার স্বার্থে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ১৮৯
লে: ক: (অব:) এম এ লতিফ খান: বাংলাদেশের বন্যা ও ফারাক্কা বাঁধ তৈরীর অসারতা ১৯৪

অষ্টম অধ্যায়
পার্বত্য চগ্রাম চুক্তি

সৈয়দ আলী আহসান: পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ২০২
প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া: পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে ২০৬
প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান: জনগণের সার্বভৌমত্ব ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ২১০
প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ : শান্তিচুক্তি না আত্মসমর্পন ২১২

নবম অধ্যায়
জননিরাপত্তা আইন ও বিশেষ নিরাপত্তা আইন

আবদুল গফুর: ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না লাগলে এখন লাগছে কেন? ২১৭
হারুনর রশীদ: মৃত্যু, পরাজয় ও নিয়তির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার লড়াই ২২২
ব্যারিস্টার সলিমুল হক খান মিল্কী : নির্বাচন ও জননিরাপত্তা আইনের বিরামহীন ব্যবহার ২২৮
মুরশাদ সুবহানী : জননিরাপত্তা আইন মৌলিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী ২৩১

দশম অধ্যায়
সুশাসন-প্রশাসন ও দলীয়করণ

প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ: সুশাসন ও স্বশাসনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা ২৩৭
ড: খলিলুর রহমান: আওয়ামী আমলে দখলের রকমফের ২৪৩
হারুনুর রশীদ: ২১ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার ২৪৯
সোহেল মাহমুদ : শেখ হাসিনার এই ভয়াবহ 'সুখ' থেকে জাতি মুক্তি চায় ২৫৭
নোমান ইরফান: প্রশাসনের শীর্ষপদে ভগ্নিপতির পর ভাগ্নিজামাই ২৬২
কবির মুরাদ: পাবলিক সার্ভিস কমিশন দলীয়করণ ২৬৮

একাদশ অধ্যায়
শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন

আবু জাফর: ইসলামী শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি: ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির প্রহেলিকা ২৭২
প্রফেসর আফতাব আহমাদ: শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও দলীয়করণ ২৭৯
এস এম আরেফীন: সোনার ছেলেদের দখলে শিক্ষাঙ্গন ২৮২

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্ম ও সংস্কৃতি

ওবেইদ জায়গীরদার: ইসলামপন্থীদের উপর সরকারের নির্যাতন এবং আমাদের গণতন্ত্র ২৯১
আরিফুল হক: ওরা বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করতে চায় ২৯৬
ড: হাসানুজ্জামান চৌধুরী: যন্ত্রণায় জাহেলিয়াতের জীবন ৩০১
ইউসুফ শরীফ : সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভয়াল মহামারী ৩০৬
সোহেল মাহমুদ: ধর্মপ্রীতি ও ধর্মভীতির আওয়ামী স্টাইল ৩১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেতার-টেলিভিশন

গাজীউল হাসান খান: বিটিভি ও বেতারের স্বায়ত্তশাসন ও আসফউদ্দৌলা কমিশনের রিপোর্ট ৩১৮

চতুর্দশ অধ্যায়

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি

রাশেদ খান মেনন: টিআই রিপোর্ট ও থলের বিড়াল ৩২৪
ইউসুফ শরীফ: শীর্ষ পর্যায়ে দুর্নীতিপরায়ণতা: এই কলঙ্ক কার ৩২৮
হারুনর রশীদ: ভয়াবহ দুর্নীতি: ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা ৩৩৩

পঞ্চদশ অধ্যায়

তেল ও গ্যাস সম্পদ

ড: খন্দকার মোশাররফ হোসেন: বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ ব্যবহার-বিতর্ক ৩৪০
ড: আনোয়ার হাসান : আমাদের গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রসঙ্গে ৩৪৬
সিরাজুর রহমান: বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস সম্পদ: দূরদৃষ্টির অভাবে জাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন ৩৫৪

ষোড়শ অধ্যায়

ট্রানজিট বিতর্ক

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া: ট্রানজিট বিতর্ক: পক্ষে-বিপক্ষে ৩৫৯
ড: এস এম লুৎফর রহমান: ট্রানজিট করিডোর একটি ষড়যন্ত্র ৩৬৩
ড: মাহবুব উল্লাহ : ট্রানজিটের ফাঁসে বাংলাদেশ ৩৬৭

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্থনীতি

ড: মাহবুব উল্লাহ: বাজেটের রাজনৈতিক অর্থনীতি ৩৮০
ড: মোহাম্মদ আবদুর রব : আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশ : ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ৩৮৭
মুনশী আবদুল মান্নান: সরকারের এক নম্বর সাফল্য দাবী এবং বাস্তবতা ৩৯১
শাহ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম: অর্থ ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে চরম দুর্যোগ ৩৯৮
শাহ আহমেদ রেজা: জাতীয় অর্থনীতি মহাদুর্যোগের সম্মুখীন ৪০২

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

মানবাধিকার রিপোর্ট ২০০০ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ৪১২

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

- **সৈয়দ আলী আহসান :** প্রথিতযশা কবি ও শিক্ষাবিদ, জাতীয় অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য।
- **প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী :** বিশিষ্ট চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ ও সপ্তম জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা।
- **বিচারপতি হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়া :** বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সাবেক আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি।
- **বিচারপতি নঈমউদ্দিন আহমেদ :** বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। বর্তমানে আইন কমিশনের সদস্য।
- **এম. এ. হাকিম :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব।
- **প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সাবেক রাষ্ট্রদূত।
- **প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।
- **প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও লেখক।
- **ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন :** দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি, সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও খ্যাতিমান আইনজীবী।
- **ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন :** রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক শিক্ষক।
- **ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া :** সাবেক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট আইনজীবী।
- **অধ্যাপক আবদুল গফুর :** ভাষা সৈনিক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **সিরাজুর রহমান :** প্রখ্যাত সাংবাদিক। বিবিসি বাংলা বিভাগে ৩০ বছরের অধিক কর্মরত ছিলেন।
- **মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী :** বিশিষ্ট আলেম, রাজনীতিবিদ ও সপ্তম জাতীয় সংসদে পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতা।
- **আমানুল্লাহ কবীর :** বিশিষ্ট সাংবাদিক। ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি।
- **রাশেদ খান মেনন :** বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কলামিষ্ট।
- **প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ :** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও কলামিস্ট।
- **ডঃ এস এম লুৎফর রহমান :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও কলামিস্ট।

www.pathagar.com

- **ডঃ আফতাব আহমাদ** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও কলামিস্ট
- **ডঃ মাহবুব উল্লাহ** : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো ভিসি।
- **ডঃ এ কে এম শাহাদাত হোসেন মন্ডল** : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর অধ্যাপক।
- **ডঃ মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক চেয়ারম্যান।
- **ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হাই** : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী।
- **ড: আনোয়ার হাসান** : প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- **ডঃ খলিলুর রহমান** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও কলামিস্ট।
- **ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও কলামিস্ট।
- **ডঃ মোহাম্মাদ আবদুর রব** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ও কলামিস্ট।
- **আলী রীয়াজ** : লেখক ও গবেষক। যুক্তরাজ্যের লিঙ্কনশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার।
- **আবু জাফর** : সাহিত্যিক, সঙ্গীত রচয়িতা, শিক্ষাবিদ ও গবেষক।
- **ওবেঈদ জায়গীরদার** : কলামিস্ট ও শিল্পপতি।
- **আরিফুল হক** : অভিনেতা, সাংস্কৃতিক সংগঠক, গবেষক ও কলামিস্ট।
- **গাজীউল হাসান খান** : সাংবাদিক, কলামিস্ট, সাবেক মিনিস্টার, প্রেস ও তথ্য, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন।
- **হারুনুর রশীদ** : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট।
- **মোবায়দুর রহমান** : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **লে: ক: (অব:) এম এ লতিফ খান** : বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপির সাবেক মহাপরিচালক।
- **শাহ আহমেদ রেজা** : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **মুনশী আবদুল মান্নান** : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **ইউসুফ শরীফ** : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **শাহাদাত হোসেন খান** : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **শাহ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম** : সাংবাদিক, গবেষক ও কলামিস্ট।
- **সোহেল মাহমুদ** : গবেষক, গ্রন্থকার ও কলামিস্ট।
- **নোমান ইরফান** : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **কবির মুরাদ** : যুব সংগঠক ও লেখক।
- **শহিদুল ইসলাম** : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **এসএম আরেফীন** : সাংবাদিক ও লেখক।
- **মোরশাদ সোবহানী** : সাংবাদিক।

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

প্রথম অধ্যায়

শেখ হাসিনার রাজনীতির স্বরূপ

সিরাজুর রহমান: বাংলাদেশের ভবিষ্যতে শেখ হাসিনার কোন স্বার্থ নেই

আমানুল্লাহ কবীর: ক্ষমতার লোভ ও শেখ হাসিনার রাজনীতি

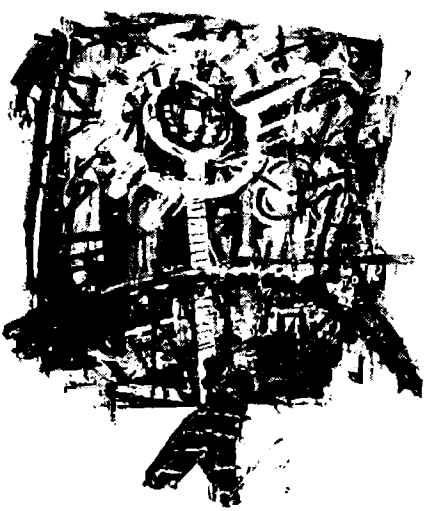

www.pathagar.com

সিরাজুর রহমান

বাংলাদেশের ভবিষ্যতে হাসিনার কোন স্বার্থ নেই

ডেটলাইন ঃ ১০ জুন ২০০৬

কিছুদিন আগে ঢাকার বনানীতে একজন ব্যবসায়ীকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। উপস্থিত লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে ঘাতককে সনাক্তও করেছে। কিন্তু এ নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্তও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী, নিহত ব্যবসায়ীর বাবা ও ভাই বলেছেন, তারা অসাধারণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং সে কারণে তারা দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এই হতভাগ্য পরিবারটির নিরাপত্তাহীনতার কারণ ঘটাচ্ছে খুনী ও তার পৃষ্ঠপোষকরা। এসব তৎপরতা তারা চালিয়ে যাচ্ছে সকলের চোখের সামনে, অথচ পুলিশ খুনী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের গ্রেফতার করতে পারছে না- এ ব্যাপারটা সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করান যাবে না। সকলেই সন্দেহ করছেন এবং কেউ কেউ মুখ খুলে বলছেন যে, খুনী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এক দুর্ধর্ষ সংসদ সদস্যের পুত্র, সে কারণেই তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না এবং সম্ভবত তাকে গ্রেফতার করার সাহস পুলিশ পাচ্ছে না। এর বিপরীতে পূর্ববর্তী সরকারের আমলের একটা ঘটনার উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। সে সময়ে কোন সংসদ সদস্যের পুত্র নয়- বরং তৎকালীন বিরোধী আওয়ামী লীগের একজন ডাকসাইটে সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধেই খুনের অভিযোগ উঠেছিল। আদালত থেকে জামিন নিয়ে তিনি ফেরার হয়ে যান। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের রাজধানীতে দাপট দেখিয়ে বেড়ানোর সাহস পাননি, পালিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে একাধিক দেশে আত্মগোপন করেছিলেন। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার বিভিন্ন বিদেশ সফরে সেই পলাতক খুনের আসামীর সঙ্গে বিস্তর দহরম মহরম করেন। ১৯৯৬ সালে গদিতে বসেই শেখ হাসিনা সে ফেরারী আসামীকে দেশে তলব করেন। তাকে আওয়ামী লীগের একটা বিশিষ্ট পদ দেয়া হয়। নিজ 'প্রতিভার জোরে' সে ব্যক্তি আবার একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদটিও জবর দখল করে নিয়েছিলেন। সে ব্যক্তি প্রকৃতই খুনী কিনা বলা যাবে না। কেননা যদ্দুর জানা যায় তার মামলা এখনও আদালতে ওঠেইনি; আদালতে তোলার কোন উদ্যোগ বর্তমান সরকার নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়নি এবং অবশ্যই তাড়াতাড়ি সে অভিযোগের বিচার করার দাবিতে ডাক, তার, টেলিযোগাযোগ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা অন্য কোন মন্ত্রী বিচারকদের লাঠিপেটা করার হুমকি দেননি।

www.pathagar.com

বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই পদ গ্রহণের সময় অনেক গলাবাজি করে নৈরাজ্য, অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নৈরাজ্য, অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নৈরাজ্য, অপরাধ ও সন্ত্রাস দমন করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তথাকথিত জননিরাপত্তা আইন নামে অত্যন্ত ভীতিকর একটা কালাকানুনও পাস করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে খুঁজে খুঁজে বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় করা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা রুজু করা হচ্ছে কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নাকের ডগার ওপরে শাসক দলের সংসদ সদস্যরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন, দেশবাসী ও বিচারকদের মনে আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে পাঁচ মন্ত্রী মিলে লাঠিমিছিল বের করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় অন্যের বাড়ী জবর দখল করছেন এবং সংসদ সদস্যের পুত্ররা প্রকাশ্যে খুন করে বেড়াচ্ছে। এসব ব্যাপারের প্রতিকার হচ্ছে না।

বর্তমান সরকারের মন্ত্রীদের তাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অথবা তাদের কাছে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার দাবি জানিয়ে লাভ নেই, কেননা প্রতিশ্রুতির মূল্য শুধু সম্মানিত ব্যক্তিরাই দিয়ে থাকেন। কিন্তু আরও উদ্বেগের কারণ হচ্ছে পুলিশের ভূমিকা। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের বেশ কিছু পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ আমার হয়েছে। তাদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে আমি সম্মানিত ব্যক্তি মনে করি। কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলাদেশ পুলিশ সম্বন্ধে এই বিশেষণটি আর প্রয়োগ করা যাচ্ছে না বলে আমি দুঃখিত। পুলিশের কোন কোন কর্মকর্তা কিংবা বিভাগ কেস নিতে অস্বীকার করেন। যেখানে তারা কেস গ্রহণ করেন সেখানে সমাধান তারা করেন না অথবা তাদের করতে দেয়া হয় না। বাংলাদেশের যে কোন মানুষকে পুলিশ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যাবে যে পুলিশ বাহিনীর দলীয়করণের প্রক্রিয়া এখন সম্পন্ন হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর কর্তব্য এবং প্রয়োজন জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। বাংলাদেশে এখন এ বাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিরোধীদের নির্যাতন ও নিপীড়ন করার জন্য, রাজনৈতিক গুণ্ডাগার্দির কাজে।

হানি করার মত মান কোথায় ?

দায়িত্ব পালনে পুলিশের ব্যর্থতার এটা অবশ্যই প্রধান কারণ। স্বভাবতঃই প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়, সংসদ সদস্য কিংবা সংসদ সদস্যের পুত্রদের গায়ে হাত দিয়ে তারা আখের খোয়াতে চাইবেন না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যদি হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদির সাফাই গাইতে থাকেন তখন পুলিশের জন্য সুস্থ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয় না। প্রধানমন্ত্রী যেখানে বলেছেন, ফ্লোরিডায় মানুষ খুন হয়, সুতরাং বাংলাদেশে খুন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তাহলে খুনীকে ধরার অনুপ্রেরণা পুলিশ পাবে কোথায়? রাজনৈতিক প্রভুদের চাপে যথাযথ কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুলিশের আত্মমর্যাদা ধ্বংস করে দিয়েছে। বাহিনীর কোন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অন্য যেসব দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে

www.pathagar.com

তারও কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এই আত্মমর্যাদার অভাব এবং তার ফলে সৃষ্ট একঘেঁয়েমী ও অসন্তোষের মধ্যে। 'আজকের কাগজ'-এর একজন সাংবাদিককে সম্প্রতি গ্রেফতার করে বেশ কয়েক ঘণ্টা আটক রাখা হয়েছিল। গোড়ায় গ্রেফতারের অন্য কারণ দেখান হলেও পরে ঢাকার পুলিশ কমিশনার বলেছেন যে, উক্ত সাংবাদিক পুলিশের মানহানি করেছেন, পুলিশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছেন, সেজন্য তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়েছে। কিন্তু যে বাহিনীর দফতরের পানির ট্যাংকে গলিত লাশ পাওয়া যায়, যে বাহিনীর হেফাজতে তরুণ রুবেলকে হত্যা করা হয়, যে বাহিনীর হেফাজতে নারীরা ধর্ষিত হয়, সে বাহিনী রাজপথে নারীর বস্ত্রহরণ করে, সে বাহিনীর ভাবমূর্তি বহু আগেই সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে, হানি করার মত কোন মান সাংবাদিকদের জন্য অবশিষ্ট থাকেনি।

খুনের দায়ে অভিযুক্ত ফেরারী আসামীর বিচার না করা এবং তাকে নেতৃত্বের উচ্চপদ দিয়ে শেখ হাসিনার প্রশাসন যে সংকেত দিয়েছিল, যে ঢালু এবং পিচ্ছিল পথ তৈরী করেছিল, অনিবার্যভাবেই সে পথে পুলিশবাহিনী বর্তমানের স্তরে নেমে এসেছে। তাই এখন বনানীর ব্যবসায়ী শিপুর হত্যাকারী ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সকলের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালেও তাদের গ্রেফতার করা পুলিশের জন্য সম্ভব হয় না। বরং তারা শিপুর পিতা, ভাই এবং তার পরিবারের জন্য আতংক সৃষ্টি করে এবং সেজন্য এই পরিবারটিকে প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য বিদেশে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে হয়।

শোনা যায়, সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি লন্ডনে, নিউইয়র্কে, ফ্লোরিডায় এবং অন্যত্র কোটি কোটি ডলারের সম্পত্তি কিনছেন। সৎ এবং সাধু উপার্জনের মাধ্যমে যে সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলাই বাহুল্য। যেভাবেই হোক তারা আখের গোছাচ্ছেন এবং নিজেদের ও সন্তানদের জন্য ভবিষ্যতের একটা হিল্লে করে রাখছেন। দুর্ভাগ্যবশত তাদের মত সুদিনের মুখ দেখার জন্য নয়, বরং প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই শিপুর পরিবারকে দেশান্তরী হবার কথা ভাবতে হচ্ছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ৪৬ বছর বয়সে পিতা হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে জনমতের পরিসংখ্যানগুলোতে তার জনপ্রিয়তা কয়েক সূচক বেড়ে গেছে। এর কারণও আছে। সাধারণত ভোটদাতারা চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর তিনটি সন্তান আগে থাকতেই ছিল। তার ওপর আরও একটা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি এবং তার স্ত্রী। এই চার সন্তানই বড় হবে এদেশেই। প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই চাইবেন যে, দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি পরিবেশ ইত্যাদি এমন হোক - যাতে তার সন্তানরা সুখী ও সুন্দর পরিবেশে বড় হবে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নত হবে এবং সুখী হবে। টনি ব্লেয়ার নিশ্চয়ই সে লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন। তাই তার ওপর ভোটদাতাদের বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে,

www.pathagar.com

কেননা সাধারণ মানুষ জানে যে, মিঃ ব্লেয়ারের সেসব চেষ্টা থেকে তারা নিজেরাও লাভবান হবে।

শ্মশান শিলায় খোদিত নাম

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সর্বশেষ কবে দেশের উন্নতি, প্রগতির কথা, দেশবাসীকে উন্নত ও সুখী ভবিষ্যৎ উপহার দেবার উদ্যোগ আয়োজনের কথা বলতে শুনছেন? দেশের সবকিছুরই তার পিতার নামে নামকরণ হলে তার পিতার হত্যাকারীদের সকলকে ধরে ধরে উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার ওয়াইল্ড ওয়েস্টে আরণ্যক দিনের লিঞ্চিংয়ের মত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলে এবং হয়ত সে সঙ্গে তারও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে অমর করে রাখা গেলেই তিনি সন্তুষ্ট। তার ছেলেমেয়ে এবং নাতী-নাতনীরা, এমনকি তার একমাত্র বোনও এখন বিদেশে বসতি স্থাপন করেছেন। তারা আর কখনও দেশে ফিরবে না। প্রধানমন্ত্রীর স্বামী অবশ্যই বাংলাদেশে আছেন, কিন্তু শোনা যায় যে, তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক এখন আর অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সঙ্গে শেখ হাসিনার নাড়ীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; এ দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে তার কোন স্বার্থ জড়িত নেই। সে জন্যই তিনি অতীতের কথা বলেন, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের জন্য তার কোন মাথাব্যথা নেই। গোরস্থানে পাথরের গায়ে পিতৃপুরুষের নাম খোদাই করে যেমন জীবিতরা সরে পড়ে, শেখ হাসিনার কার্যকলাপ থেকে সে দৃষ্টান্তই মনে আসা অস্বাভাবিক হবে না।

আমেরিকার ওয়াইল্ড ওয়েস্টেরই একটা কাহিনীর চলচ্চিত্র দেখেছিলাম বহু দিন আগে। ধু-ধু মাঠ আর ঢেউ খেলান পাহাড় পেরিয়ে একটা লোক এল ঘোড়ায় চড়ে। এসে দেখল ভয়ানক অভিশপ্ত এক শহর। গুটিকয়েক লোক সবকিছু দখল করে বসে আছে। শহরের শেরিফ (পুলিশ প্রধান), জজ, মেয়র - সবই তাদের হাতের মুঠোর লোক। তারা লোকের ভালো ভালো ঘর-বাড়ী, দোকান ও সম্পত্তিগুলি দখল করেছে, আবাদী জমির ভিতর দিয়ে তাদের গরুর পাল চলাচল করছে, শহরের নারীরা অবলীলায় ধর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু বিচার চাইতে গেলে মানুষকে উল্টো সাজানো অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেয়া হচ্ছে, নয়ত রাস্তায় গুলী করে খুন করা হচ্ছে কুকুরের মত। নবাগত লোকটি এসব কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সে এলাকার সকল অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত করল। তারপর একদিন সকলে মিলে অত্যাচারী চক্রটিকে মার দিয়ে নেড়ী কুকুরের মতই সে চাক্‌লা থেকে বের করে দিয়েছিল।

বাংলাদেশেও অনুরূপ একটি শুদ্ধি অভিযান অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

* * *

www.pathagar.com

হেজাব-নেকাব এবং রাজনৈতিক দন্ত-নখর

ডেটলাইন ঃ ৪ এপ্রিল ২০০১

ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা সকলকে। আর অভিনন্দন যে ২০ লাখ বিশ্বাসী এবার হজ্জ উদযাপন করেছেন তাদের সকলকে। পত্রিকায় পড়ছিলাম, হাজীদের কেউ কেউ শত শত কিলোমিটার দূর থেকে পায়ে হেঁটেও হজ্জ করতে এসেছিলেন। এই শেষোক্তদের উদ্যম বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ইসলাম ধর্মের বিধান, বিশ্বাসীরা নিজেদের সৎ উপার্জন থেকে হজ্জ করবেন। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রয়াস প্রচেষ্টার ওপর হজ্জের সওয়াব ও বরবকত নির্ভর করে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে কার হজ্জ গৃহীত হবে কি হবে না সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আল্লাহর ওপর এবং আল্লাহ দয়ালু ও সর্বশিক্তমান।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও হজ্জ করে এসেছেন। সে ঘোষণা তিনি আগেই দিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, হজ্জ করে এসে তিনি নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করবেন এবং তাতে তিনি জয়ী হবেন। হাসিনা হজ্জ করতে গেছেন নিজের উপার্জিত অর্থে নয়, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের রক্ত পানি করা অর্থে, তাও একা নয় ডজনখানেক মন্ত্রী ও রাজনৈতিক চেলাচামুণ্ডাদের বিরাট দল নিয়ে এবং লক্ষ্য করার বিষয়ে যে, প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া সাঙ্গপাঙ্গের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাছাড়া সউদী আরবেও তিনি ছিলেন সে দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি। বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে আগেও একাধিকবার হাসিনা হজ্জ ও ওমরাহ করতে গেছেন। ফিরে এসেছেন হেজাব-নেকাব পরে। কিন্তু সাময়িক ফাঁড়া কেটে যেতে না যেতেই সেসব মুখোশ তিনি ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। হাসিনার রাজনৈতিক মুখোশও তার হেজাব-নেকাবের মতই ক্ষণস্থায়ী। একানব্বইয়ের ফেব্রুয়ারিতে হাসিনা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে নির্বাচনে নেমেছিলেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে আদর্শ স্থানীয় সে নির্বাচনে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ছিয়ানব্বইয়ের ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতাসীন বিএনপি মারাত্মক কতগুলো ভুল করে। আওয়ামী লীগ সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিল। হাসিনা হঠাৎ রাজনৈতিক হেজাব-নেকাব পরলেন। অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য তিনি দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলেন। পরে জানা যায় যে, নির্বাচনী বিজয়ের জন্য তিনি রাতের আঁধারে ইন্দিরা রোডে গিয়ে জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম আযমের দোয়াও সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ দয়াবান ও ক্ষমাশীল। সে বছরেরই জুন মাসের নির্বাচনে তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় এবং নিরঙ্কুশ না হলেও হাসিনা বিজয়ী হন। কিন্তু গদি লাভের পর হাসিনার রাজনৈতিক মুখোশ খসে পড়তে দেরি হয়নি। মানসিক অসুস্থতা, চারিত্রিক অবিমৃষ্যকারিতা এবং অসংযত জিহ্বার কারণে তিনি বিগত সাড়ে চার বছরে বাংলাদেশকে যেন একটা রণক্ষেত্রে পরিণত করেছেন; এ জাতি আগে কখনও এমন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েনি। ফলে ঐক্যবদ্ধভাবে জনসাধারণের ভাগ্যের উন্নতির চেষ্টা এবং

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের মানুষ এখন জানে যে, হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে গদিচ্যুত করা না গেলে সর্বনাশের পথের এই পাগলা ঘোড়ার গতি কিছুতেই রোধ করা যাবে না। অন্যদিকে ক্ষমতা হাতছাড়া হতে দেয়ার কথা হাসিনা কিছুতেই ভাবতে পারেন না। তার কাছে গণতন্ত্রের মাত্র একটাই সংজ্ঞা; ক্ষমতা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে তার এবং তার পরিবারের হাতে।

অনাবৃত দন্ত ও নখর

শেখ হাসিনা বলেছেন, হজ্জ করে এসে তিনি নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করবেন। বছরাধিককাল থেকে মাঝে মাঝে তিনি নির্বাচনের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু সঠিক সময় কিংবা তারিখের কথা তিনি উচ্চারণ করেননি। এবারে কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আদৌ নির্বাচন দিতে চান (নির্বাচন এড়িয়ে যাবার জন্য তার পিতা সংবিধান উল্টে দিয়ে একদলীয় পদ্ধতি চালু করেছিলেন) তাহলে মাস চারেকের মধ্যেই তাকে সংসদ ভেঙে দিতে হবে। হাসিনা জানেন যে, রাজনীতির হিসাব কিছুতেই তার জন্য অনুকূল হতে পারে না। '৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল এবং জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনেই সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। যে দলগুলো সে নির্বাচনে ৬০ শতাংশের বেশী ভোট পেয়েছিল, তারা এখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ। ওদিকে প্রাপ্ত সকল তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এখন সর্বকালের মধ্যেই সর্বনিম্নে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা অনুপস্থিত। কারও জানমালের নিরাপত্তা নেই। অর্থনীতি বিধ্বস্ত এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে বর্তমান পরিবেশে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারও সম্ভব নয়। এই অসম্ভব পরিস্থিতিতেই হাসিনা ও তার পৃষ্ঠপোষকদের গদি আঁকড়ে থাকার মতলব আঁটতে হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক হজ্জের পর পরই হেজাব-নেকাবের মত তার রাজনৈতিক মুখোশও খসে পড়তে বাধ্য এবং সে সঙ্গেই অনাবৃত হয়ে পড়বে দন্ত ও নখর। কিন্তু কিছু লক্ষণ ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। গদি লাভের পর থেকেই হাসিনা সরকার প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর দলীয়করণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। সরকার আশা করে যে, তাদের আজ্ঞাবহ নির্বাচনী কর্মকর্তারা ভূয়া ভোট দিয়ে ব্যালটবাক্স ভর্তির ব্যাপারে তাদের সাহায্য করবে। সে হিসাব অনুযায়ী এখন শুধু প্রয়োজন ভোট লুণ্ঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আবডাল সৃষ্টি করা। শেখ হাসিনার মতিগতি দৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিনি এমন সময়ে সংসদ ভেঙে দিতে চান যাতে নির্বাচন হয় ভরা বর্ষায়, যখন গ্রামবাংলায় ভোটকেন্দ্রে যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আরও একটা আয়োজন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই করে আসছে, যার প্রকৃত তাৎপর্য ১৩ ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলীতে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পাঁচ বছর বিরোধী দলে থাকাকালীন আওয়ামী লীগ মোট ১৭৩ দিন হরতাল করেছে। সেসব হরতালের অসারতার ওপর আলোকপাত করার কারণে এই ভাষ্যকারকেও হতমান করার সব চেষ্টাই করেছেন

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের কিছু সাংবাদিক ও তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী। কিন্তু ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়ার, তাদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার হরণের যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে বিরোধীরা হরতালের পথ ধরলে তাদের বিরুদ্ধে 'শান্তিবাহিনী' নামধারী ঘাতকদের লেলিয়ে দেয়া হয়। বিএনপি সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের ১৭৩ দিনের হরতালে একটিও প্রাণহানি হয়নি। আওয়ামী সরকারের সাড়ে চার বছরে প্রধান বিরোধী দল হরতাল করেছে ৮০ দিনেরও কম। কিন্তু তাদের হরতালের ওপর বন্দুক ও বোমাবাজির ফলে এ যাবৎ অন্ততপক্ষে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। গোড়ায় আওয়ামী সরকার এবং তাদের গোয়েবলসরা সেসব হত্যার দায়িত্ব বিরোধী দলের ওপরই চাপিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্ট করছিল। কিন্তু ১৩ ফেব্রুয়ারিতে কয়েকজন নির্ভীক সাংবাদিক এবং কয়েকটি সাহসী পত্রিকা হাটের একেবারে মধ্যখানে আওয়ামী লীগের সব রহস্যের হাঁড়ি ভেঙে দেন। সেসব ঘটনার সর্বসাধারণের এই বিশ্বাসেরই সত্যতা সুপ্রমাণ হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলোর সত্যিকারের গডফাদার হচ্ছেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা; তাদের পোষ্য খুনী ও সন্ত্রাসীরাই দেশজুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আওয়ামী লীগের পদলেহী কতিপয় সাংবাদিক ও ভাষ্যকার এবারেও জনসাধারণের চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা করেছেন। লন্ডনে প্রবাসী নামকরা এক সাংবাদিক আওয়ামী লীগের ঢাক পিটিয়ে অতীতে নানাভাবে লাভবান হয়েছেন। 'অন্ন উপার্জনের' তাগিদে অতীতেও অসত্য এবং পরস্পরবিরোধী দাবি করে তিনি বহুবার লোক হাসিয়েছেন। মাত্র বিগত দুই বছরের মধ্যেই তিনি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছেন যে, ভাষা আন্দোলন শুরু করেছিলনে শেখ মুজিবুর রহমান এবং উপকারক ও পৃষ্ঠপোষকদের মনোরঞ্জনের আশায় তার স্বরে সে কথা ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি আমাদের জাতীয় গৌরব শহীদ দিবসকেও দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছেন। হয়তো বৃহত্তর প্রাপ্তির আশাতেই এই তত্ত্ব উৎপাদক সাংবাদিক সম্ভবত চলতি বছরের সবচাইতে উদ্ভট তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন। তার থিয়োরি অনুযায়ী ঘাতক পরিবৃত সংসদ সদস্য ডাঃ ইকবালের আলোকচিত্র নাকি 'ডক্টরিং'- এর (কৃত্রিমভাবে সাজানো) ফসল। এতগুলো পত্রিকায় অবিকল একইভাবে কি করে ভুয়া ছবির ডক্টরিং সম্ভব তার কোন ব্যাখ্যা দিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। দু-একজনকে যথার্থই মন্তব্য করতে শুনেছি যে, উক্ত সাংবাদিকের মস্তিষ্কের ডক্টরিং (চিকিৎসা) এখন বড় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, আওয়ামী লীগ এতকাল গোয়েবলসীয় কায়দায় মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করলেও ১৩ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় সুপরিকল্পিতভাবেই দড়ি টানাটানিতে ঢিল দিয়েছে? হয়তো তারা ভোটদাতাদের হুমকি দিতে চায় যে, বোমা-বন্দুকের জোরেই গদি আঁকড়ে থাকার পরিকল্পনা রাখে। আওয়ামী লীগ হয়তো আশা করছে ভরা বর্ষায় নির্বাচন হলে এমনিতেই বহু লোক ভোটকেন্দ্রে যেতে অনীহা দেখাবে; তার ওপর বোমা বন্দুকের ভয় থাকলে মানুষ ভোট দিতে যাবে না; তেমন অবস্থায় ভুয়া ভোট দিয়ে ব্যালটবাক্স বোঝাই

www.pathagar.com

করতে বসম্বদ পোলিং অফিসার ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কোন অসুবিধা হবে না।

বিকৃত ইস্যু, রুগ্ন মানসিকতা

কোন কোন ইস্যুতে আওয়ামী লীগ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চায় তার কিছু হদিসও ইদানীং পাওয়া গেছে। খুলনা বেতার থেকে কিছুদিন আগে ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে একই এবং অভিন্ন সংবাদভাষ্য পর পর কদিন ধরে প্রচারিত হল। বুঝতে অসুবিধা হবার কারণ নেই যে, এ ভাষ্যটিকে রাজনৈতিক বাইবেলরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল শুধু এজন্য যে, সে ভাষ্যের লেখক হাস্যকরভাবে বর্তমান ফতোয়াবাজির জন্য ১৯৮১ সালের ৩০ শে মে তারিখে নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দায়ী করেছেন। জিয়াউর রহমান সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ'কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন বলেই নাকি ফতোয়াবাজির জন্ম হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্যা দিগ্‌গজ তথাকথিত ইতিহাস আবিষ্কর্তারা ভুলে যাচ্ছেন যে, কবি নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমেদসহ বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী দেশ বিভাগের আগে থাকতেই ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে আপসবিহীন সংগ্রাম করেছেন। ফতোয়াবাজি দীর্ঘদিন ধরে ছিল এবং দেশের সকল মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা পর্যন্ত থাকতে বাধ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ হাসিনা একদিকে বেকায়দায় পড়লেই হজ-ওমরাহ করতে ছুটছেন, হিজাব-নেকাব পরছেন আর তারপরেই জনসাধারণকে ধর্মনিরপেক্ষতার সবক দিচ্ছেন এবং ফতোয়াবাজির সুপ্রাচীন কাসুন্দিকে নতুন করে চটকে রাজনৈতিক ফায়দা লুণ্ঠনের চেষ্টা করছেন। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাই বর্তমান ক্ষমতাসীনদের আসল মতলব। ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মান্ধতা নিয়ে বর্তমান কৃত্রিম রাজনৈতিক বিতর্কের এই হচ্ছে রহস্য। পুরাতন বিষয়টিকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি শেখ হাসিনার সরকারই করছে এবং সেটা করা হচ্ছে অশুভ উদ্দেশ্যে।

হাসিনা আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ শুরুর চিন্তাভাবনাও করছেন কি? আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ইদানীং স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তির কথা ঘন ঘন বলা হচ্ছে। কিন্তু পক্ষের ও বিপক্ষের এই শক্তিগুলো কারা? একাত্তরের মুষ্টিমেয় কিছু ঘাতক-দালাল ছাড়া বাংলাদেশের সকল মানুষ দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ক্ষমতালোভী আওয়ামী লীগ অন্য সকলকে বঞ্চিত করে একদলীয় সরকার গঠন করে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির ঐক্যে সর্বপ্রথম ফাটল সৃষ্টি করে। সবচাইতে বড় কথা, যে উন্নত জীবন এবং সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, দুই দফায় আওয়ামী লীগ সরকারের কুশাসনে সে স্বপ্ন এবং আশা ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মানুষ জানে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন (পলাশীর যুদ্ধের ২৩৯ তম বার্ষিকী, যে যুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয়া হয়েছিল) তারিখে হাসিনার ক্ষমতা লাভের মধ্যবর্তী সময়ে

www.pathagar.com

বাংলাদেশে যারা কোন দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন হাসিনা তাদের সকলকেই মুজিবের ঘাতকদের দলভুক্ত এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। সমালোচকদের রাষ্ট্রদ্রোহী কিংবা মুজিবের ঘাতক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর অতিমাত্রিক আগ্রহের সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে। তারা আরও জানে যে, শেখ হাসিনার এই রুগ্ন, অসুস্থ মানসিকতা সাম্প্রতিক অতীতের মত বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যতেরও সর্বনাশ করছে। সুতরাং শুধু শেখ হাসিনা এবং তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় বসানোর জন্য আবারও তথাকথিত স্বাধীনতার যুদ্ধে লিপ্ত হবার বিন্দুমাত্র বাসনা বাংলাদেশের মানুষের থাকতে পারে না। আওয়ামী লীগের ভাঙা তরীতে চেপে আবারও স্বাধীনতা যুদ্ধে যাবার আগে বাংলাদেশের মানুষ হিসাব চাইবে, ত্রিশ বছর আগের স্বাধীনতা থেকে তারা কি পেয়েছে।

* * *

আবুধাবির সে মহিলা এবং বাংলাদেশের রাজনীতি

ডেটলাইন ঃ ২৫ ডিসেম্বর ২০০০

আবুধাবি থেকে ওমানের মস্কত যাচ্ছিলাম সে যাত্রায়। বিমানবন্দরে ডিপার্চার লাউঞ্জে বসে আছি। একটি যুগল এসে ঢুকল তখন। দামী স্যুট পরা মাঝ বয়সী ভদ্রলোক। ভদ্রমহিলা আপাদমস্তক বোরখায় মোড়া এবং চোখে ইয়াশমাক। তবে সবই দামী, ফ্যাশন দুরস্ত। বসে বসেই বোধ হয় ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। চোখ খুলতেই দেখি সেই ভদ্রলোক খোশগল্পে ব্যস্ত অতি সুন্দরী এবং লাস্যময়ী এক যুবতীর সাথে । যুবতীর সুচারু মেকআপ, ঠোঁটে পুরু টকটকে লাল লিপস্টিক এবং হাতের দু আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট। মাইক্রো-মিনি স্কার্টে কষ্টে-শিষ্টে নিতম্বটি ঢাকা পড়েছে। গোড়ায় হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সাব্যস্ত করতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল সে আসলে এ মহিলা। সে মহিলাই বটে, তবে আমার সংক্ষিপ্ত তন্দ্রার অবকাশে তিনি লেডিস রুমে গিয়ে ভোল বদল করে এসেছেন। লন্ডন ফ্লাইটের তলব আসতেই তারা চলে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবছিলাম সে বহুরূপী মহিলার কথা। বিগত বছর চারেক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রসঙ্গে সে মহিলার কথা আমার বহুবার মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা মাঝে মাঝেই হজ্জ কিংবা ওমরা করতে সউদী আরবে যান। পত্রিকার ছবিতে দেখি, তিনি বিমান থেকে নামছেন হেজাব-নিকাব পরে। কিন্তু দু- এক দিনের মধ্যেই ভোল পাল্টে যায়। তার বিদেশ সফরের ছবিও দেখি প্রায়ই। কোন পত্রিকায় যেন দেখছিলাম তিনি ৪০ বার বিদেশ সফরে গেছেন; প্রধানমন্ত্রিত্ব পাবার পরের ১৬৪০ দিনের মধ্যে প্রায় ৩০০ দিনই তিনি বিদেশে ছিলেন। এসব সফরে বাংলাদেশের সত্যিকারের কোন লাভ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ এমনই বিষাক্ত হয়ে গেছে

www.pathagar.com

যে, এ দেশে শেখ হাসিনারও দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়, প্রায়ই তিনি নানা অজুহাতে মন ভরে দম নিতে ভেসে ওঠে এবং ফুট্টু কাটে। এই হাওয়া বদলগুলো যে শেখ হাসিনার জন্য খুবই উপাদেয় হচ্ছে সেটাও পরিষ্কার। সাজগোজে তো বটেই তার চেহারাও আজকাল রীতিমত লাস্যময়ী দেখায় এসব সফরে। বিল ক্লিনটনের সাথে তার যুগল ছবি দেখেননি আপনারা?

ধর্মে পণ্ডিত কিংবা প্রচলিত সংজ্ঞায় ধার্মিকও আমি নই। তবে এমন পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে যেখানে তারা অক্ষরে অক্ষরে ধর্ম পালন করতেন; অন্ধভাবে নয়-জেনেশুনে এবং চুলচেরা বিচার করে। যখন তখন হজ্জ কিংবা ওমরা করতে যাবার রাজনৈতিক কারণগুলো কখনই আমার বোধগম্য হয়নি। শুনেছি, হজ্জের কতগুলো শর্ত আছে। হজ্জ করার নির্দেশ আছে নিজের সৎ ও সাধুভাবে উপার্জিত অর্থে। তাও আত্মীয়-পরিজনের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে। শুনেছিলাম যে, প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে হজ করলেও সে হজের শর্ত পুরোপুরি পূরণ হয় না। আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস,পরের অর্থে বিশেষ করে দরিদ্র জনতার কষ্টার্জিত অর্থ অপচয় করে হজ করতে গেলে সে হজ্জ বিধাতার গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য হজ্জ নিয়ে বহু দুর্বিনীত পরিহাসও আছে। আমার পরিচিত এবং সম্মানিত এক ব্যক্তি বিদ্রুপ করে বলতেন, মাঝে মাঝে পাপের বোঝাগুলো সউদী আরবে ফেলে আসা ভালো, নইলে পরবর্তীকালে যে পাপগুলো করার মতলব আছে সেগুলোর বোঝা বইবে কি করে?

শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ, তিনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেছেন। বিদেশী সংবাদদাতা সমিতির বৈঠকে তিনি বলেছেন যে, আগামী মার্চ মাসে তিনি হজ্জ করে এসে নির্বাচনী অভিযান শুরু করবেন এবং আল্লাহ অনুকূল হলে (ইনশাআল্লাহ) তিনি সরকার গঠন করতে সমর্থ হবেন। তবে পরের দমেই আরেকটা কথাও বলেছেন তিনি। রাশিচক্র অনুযায়ী মে কিংবা জুন মাস নাকি তার নির্বাচনী বিজয়ের জন্য অনুকূল নয়।

সারাটি কর্মজীবন ধরে বাংলাদেশের মানুষকে চেনার, তাদের মনের কথাটি বোঝার চেষ্টা করে এসেছি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন থেকে শুরু করে সবগুলো নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করারও চেষ্টা করেছি। আমার দৃঢ় প্রতীতি হয়েছে যে, বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে ভুল করে না। কেউ টাকার হরি লুট ছড়াতে চাইলে টাকাও হয়ত তারা নেবে কিন্তু ভোট দেবে সঠিক ব্যক্তিকে। অবশ্য যদি তাদের অবাধে ভোট দিতে দেয়া হয়। এই মানুষগুলোর বর্তমান অবস্থা এমন যে, তারা মুক্তমনে ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও গদিতে বসাইতে চাইবে বলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। অর্থাৎ পরিস্থিতি হাসিনার জন্য খুবই সংকটপূর্ণ এবং এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার আশাতেই তিনি হজ্জ করতে যাচ্ছেন। কেননা তার বিশ্বাস যে, তাতে তার ফাঁড়া কেটে যাবে। তাহলে এই

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাও করা যায় যে, সংকট দেখা দিলেই তিনি হজ্জ কিংবা ওমরা করতে যান এবং হেজাব-নিকাব পরে ফিরে আসেন।

কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, প্রধানমন্ত্রী কি নিজের সৎ ও সাধুভাবে উপার্জিত অর্থেই হজ্জ করতে যাবেন? দেশের এবং দেশের কোন সম্পদ কি তিনি তার হজ্জযাত্রা বাবদ ব্যবহার করবেন না? কেননা তাহলে তো হজ্জের শর্তগুলো পূরণ হওয়ার কথা নয়। আরও একটি প্রশ্ন আমার মনে জাগে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, ইনশাআল্লাহ, তিনি জয়ী হবেন। কিন্তু পরের দমেই তিনি বলছেন যে তার রাশিচক্র অনুযায়ী মে-জুন মাস তার জন্য অনুকূল নয়। তাহলে কুষ্ঠি-ঠিকুজির ওপর তার আস্থা কি আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের সমান সমান? তবে এটাও পরিষ্কার যে, শেখ হাসিনা আল্লাহর অনুগ্রহ, হজ্জ এমনকি রাশিচক্রের ওপরও পুরোপরি ভরসা করে থাকতে রাজি নন। আরো একবার গদিতে বসার জন্য তিনি এবং তার দল যে কোন কিছুই করতে বাকি রাখছেন না, বাংলাদেশের মানুষের কাছে সেটা পরিষ্কার। গদিতে বসার সময় থেকেই তিনি সুপরিকল্পিতভাবে একদিকে প্রশসনযন্ত্রের দলীয়করণ এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক বিরোধীদের হয়রানির কাজ শুরু করেছিলেন। বিগত সাড়ে চার বছরে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে যত রাজনৈতিক মামলা রুজু করা হয়েছে, তার শুমার করাও বোধকরি সম্ভব নয়। শেখ হাসিনা তাতেও খুশি হতে পারছেন না, মনে ভরসা পাচ্ছেন না তিনি। বিচারকরা তার মর্জি অনুযায়ী তার রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজনৈতিক ময়দান থেকে সরিয়ে জেলে পুরে রাখতে রাজি হচ্ছেন না। সে জন্যই তো গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটা কালাকানুন পাস করা হল। এখন আর বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের আটক করতে এবং আটক রাখতে কোন বাধা নেই।

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হাতে এখন বেশুমার আগ্নেয়াস্ত্র। লক্ষ্মীপুরে আবু তাহের, ফেনীতে জয়নাল হাজারী, নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমান জাতীয় আওয়ামী বীরাপ্পনরা নিজ নিজ এলাকায় স্বাভাবিক জীবন অসম্ভব করে রেখেছে। তবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এসব অস্ত্র এখন সেমসাইড অর্থাৎ দলের বিভিন্ন অংশের প্রাধান্য বিস্তারের লড়াইতেও ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো থেকে জানতে পাই যে, একমাত্র ২০০০ সালের প্রথম ১১ মাসেই দেশে ২০৭টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে, আহত হয়েছে ১১৮২ জন। এখন আর রাজনৈতিক গুণ্ডাদের সংখ্যা যথেষ্ট বিবেচনা করা হচ্ছে না। বিরোধীদের ঠ্যাঙাতে গোড়া থেকেই পুলিশকে নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে। সে জন্যই বাংলাদেশী পুলিশের নৃশংসতায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে আতংক প্রকাশ করতে হয়। শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েও গলাবাজি করে এসেছেন যে, তিনি যেমন উদারহস্তে সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিয়েছেন তেমনটা আগে কখনো করা হয়নি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টুর 'আমার ফাঁসি চাই' বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালায়। হাসিনার আমলে বাংলাদেশে

www.pathagar.com

কয়েকজন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, সরকারের বিরুদ্ধে সামান্যতম সমালোচনা করলেও সাংবাদিকদের হয়রানি করা হয়, নানা রকমের হুমকি দেয়া হয় এবং সেসব হুমকিতে সরকারের মন্ত্রীরাও যোগ দেন। পত্রিকাতেই পড়ি যে, সরকারের সন্ত্রাসীরা এখানে-সেখানে কোন কোন পত্রিকার কপি পোড়াচ্ছে, পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে, তারা যেন বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা একই এই সন্ত্রাসীদের হাতেই ন্যস্ত হয়েছে। পত্রিকা, পুস্তক এবং লাইব্রেরী পোড়ানোর ঘটনাগুলো ঘটেছিল ত্রিশের দশকে জার্মানীতে এবং ইতালীতে। কিন্তু এ কথাও সকলের মনে আছে যে, তার পরিণতিতে সারা বিশ্বের পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। সে জন্যই মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টও এখন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে।

আতঙ্কের কথা যে, আর কতগুলো ফ্যাসিস্ট তৎপরতা শুরু হয়েছে সাম্প্রতিক বাংলাদেশে। শেখ মুজিব যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানে গিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে সদ্ভাব করে এলেন, পাকিস্তান তখনও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। ক্ষমা পাকিস্তান এখনও চায়নি। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক আছে। কিন্তু পাকিস্তানের সামান্য একজন কূটনীতিক যদি ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন তাহলে হঠাৎ করে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? রাষ্ট্রীয় বিচারে একজন ডেপুটি হাইকমিশনার সামান্য চুনোপুঁটি-ক্ষমা চাইবার অধিকার তার নেই, সুতরাং তিনি ক্ষমা না চাইলে এত ক্রোধ কেন? একজন সামান্য ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে যারা একাত্তরের মানবতা বিরোধী নৃশংসতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা দাবি করেছিল, তদের বুদ্ধিমত্তাকেই বরং ধিক্কার দেয়া উচিত। শেখ হাসিনার সরকার যদি নিজেদের এতই শক্তিধর মনে করেন, তাহলে গদিতে থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের কাছে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করতে পারতেন, এখনও জেনারেল পারভেজ মোশাররফের কাছে দাবি জানাতে পারেন। সে দাবিকে সকল বাংলাদেশী সমর্থন জানাবে।

জাতীয় সঙ্গীতের ছন্দ অনুসরণ করে কোন পত্রিকার পাঠক যদি প্যারোডি লেখে এবং পত্রিকার সম্পাদক যদি অসাবধানে সেটাকে ছেপে দেন, তাহলে দেশদ্রোহিতার কোরাস শুরু হয়ে যায় কেন? জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখানো নাগরিকের কর্তব্য; কিন্তু সে সঙ্গীত কিংবা পতাকা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা যাবে না, এমন কথা কোন দেশের সংবিধানেই থাকে না। গার্ডিয়ান বৃটেনে একটি উচ্চশ্রেণীর সম্মানিত পত্রিকা। সে পত্রিকা মাত্র কদিন আগে সপ্তাহজুড়ে রাজতন্ত্র বনাম প্রজাতন্ত্র বিষয়ে অনেকগুলো লেখা ছেপেছে; একটা লেখায় বৃটেনের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে। গার্ডিয়ান বলেছে যে, জনসাধারণের মুক্তচিন্তাকে উদ্দীপিত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করেন। কিন্তু বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেটাকে

www.pathagar.com

উপযুক্ত বিবেচনা করেননি। তার প্রস্তাব অনুযায়ী রুশ পার্লামেন্ট মাত্র ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আবার সোভিয়েত আমলের সঙ্গীতটির সুর ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও বলা হয়েছে যে, সে সুরে নতুন কথা আরোপ করা হবে। কিন্তু বাংলাদেশে একজন অধ্যাপক জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের প্রস্তাব দিতেই সরকার এবং তার চেলারা যে সিনথেটিক এবং কৃত্রিম রোষানল জাগিয়ে তুলেছে তার কারণ কি? একজন ডেপুটি হাইকমিশনার, একটি প্যারোডি এবং একজন অধ্যাপকের একটি প্রস্তাব - এই তিনটি বিষয়ের একটি মাথা, একটি লেজ এবং একটি পা জোড়া দিয়ে দেশদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র নামক নারকীয় জীবটি সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি? কার এবং উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষমতাসীনরা কৃত্রিম একটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মনোবিকার সৃষ্টি করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চায় যে, তারাই স্বাধীনতার একমাত্র ধারক এবং বাহক, ভোট দিয়ে তাদের গদি পাকাপোক্ত করা না হলে স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। কিন্তু এ মহলটি ভুলে যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে এখনও এমন কিছু মানুষ বেঁচে আছেন, যারা মুসলিম লীগের গদি আঁকড়ে থাকার খেলাটা ভালো করেই দেখেছেন। মুসলিম লীগের সমালোচনা করাকেও সেকালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমপর্যায়ের বলে প্রচারণা চালানো হতো।

বর্তমানের এই বিষাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক হচ্ছে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের আচরণ। প্লেটো এবং সক্রেটিসের কাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু মহান শিক্ষকের আবির্ভাব হয়েছে যারা বলে গেছেন যে, শিক্ষকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনে মুক্তচিন্তার প্রবণতাকে বেগবান করা। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক নামধারী ব্যক্তি বরং মুক্তচিন্তাকে লাঠিপেটা করার ব্রত নিয়েই ময়দানে নেমেছেন। জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করা উচিত কিংবা সম্ভব কিনা- প্রস্তাব করার দরুন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে জনৈক অধ্যাপকের দপ্তরে আগুন লাগানো হল, কিন্তু এই শিক্ষকরা প্রতিবাদ করলেন না। তারা বরং উক্ত অধ্যাপককে শিক্ষক সমিতি থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থাই নিলেন। এই শিক্ষকরা কি মনের মুকুরে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন সম্প্রতি? আশা করা সঙ্গত হবে যে, আলোচ্য শিক্ষকরা আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের আরও দু' একটি কবিতাও পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশকে এমন একটি স্বর্গে জাগরিত করার জন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যেখানে চিত্ত ভয়শূন্য, শির উচ্চ এবং জ্ঞান মুক্ত হবে। স্পষ্টতই বর্তমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে স্বর্গরাজ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের আত্মা আলোচ্য শিক্ষকদের ধিক্কার দেবে, যেমন দেবে প্লেটো এবং সক্রেটিসের দিন থেকে শুরু করে সকল মহান শিক্ষকের আত্মাও।

* * *

www.pathagar.com

বজ্র আঁটুনি, কালা কানুন ও ক্ষমাহীন ইতিহাস

ডেটলাইন ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০

উনিশ'শ বিরাশি সালের খুব সম্ভবত ১৬ জানুয়ারি আমি এবং বিবিসিতে আমার সহকর্মী রিচার্ড ওপেনহাইমার বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে তৎকালে বন্ধুস্থানীয় এক ব্যক্তি, তৎকালীন সেনাপ্রধানের আত্মীয় টেলিফোন করে জানালেন যে, সেনাপ্রধানও আমাকে একটি সাক্ষাৎকার দিতে চান। কয়েক ঘণ্টা পর ভদ্রলোক নিজেই এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললেন যে, সেনাপ্রধান তখনও স্বয়ং সাক্ষাৎকার দেয়া সমুচিত বিবেচনা করছেন না, তবে এ ভদ্রলোককে তাঁর হয়ে বক্তব্য রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন। সে বক্তব্যের সারকথা এই ছিল যে, তৎকালে প্রস্তাবিত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভার ওপর ভেটো ক্ষমতা দেয়া না হলে সেনাপ্রধান ক্ষমতা গ্রহণ করবেন- সে ব্যাপারে কোন আপস নেই।

ইতিহাসের সম্ভবত দীর্ঘতম নোটিশের পরে হলেও সে ব্যাপারটা ঘটেছিল। মে মাসে সেনাপ্রধান বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে বলনে যে, তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর না করলে সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান ঘটাবে এবং সেজন্য দায়ী হবেন প্রেসিডেন্ট। প্রাণের ভয় সকলেরই থাকে। বলাই বাহুল্য যে, অসুস্থ এবং বৃদ্ধ বিচারপতি আবদুস সাত্তার পদত্যাগপত্রে সই করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিনা রক্তপাতে হলেও বাংলাদেশে একটি সামরিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বাংলার বাণী' নামক একখানি দৈনিক পত্রিকা সে সামরিক অভ্যুত্থানের সাফল্য কামনা করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিল এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও বর্তমান শাসক দল আওয়ামী লীগের কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ যোগসাজশে প্রায় নয় বছর ধরে সে স্বৈরতন্ত্রী সরকার বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অনুশাসনগুলোকে একে একে হত্যা করার সুযোগ পেয়েছিল।

এস, ওয়াজেদ আলীর ভাষায় 'সে ট্রাডিশন সমান চলিতেছে' বাংলাদেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টও একজন বিচারপতি। আঠার বছর পরে আবার একটি ব্যক্তি সদম্ভে বঙ্গভবনে হামলা করে তার স্বাক্ষর দাবি করেছেন এবং বলেছেন যে, স্বাক্ষর না দিলে সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান ঘটাবে এবং প্রাণের ভয়ে কিনা জানি না, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আদিষ্ট স্বাক্ষরটি দান করেছেন। এখুনি স্বৈরতন্ত্র হয়েছে বলা যাবে না; কিন্তু বাংলাদেশে এমন একটা কালাকানুন জারি হল ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসনের আমলেও সে রকম জঘন্য নিপীড়নমূলক আইন দেখা যায়নি। প্রেসিডেন্ট স্পষ্টতই এই বিলটি অনুমোদন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, হুমকির মুখেই স্বাক্ষরটি তিনি দিয়েছেন এবং একেবারে শেষ মুহূর্তেও তিনি বলেছেন যে, বিলের জঘন্যতম বিধানগুলো বর্জন করা হবে- এ মর্মে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পাবার পরই শুধু তিনি আন্তরিক অপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিলটিতে সই করেছেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মানুষ বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে সম্মান করে; তিনি সত্য বৈ মিথ্যা বলবেন না, সে বিশ্বাস তাদের আছে। কিন্তু শেখ হাসিনা ওয়াজেদের প্রতিশ্রুতিকে তারা বিশ্বাস করতে পারবে কি? তাদের অবশ্যই মনে আছে, একানব্বইয়ে হিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে শেখ হাসিনা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। ছিয়ানব্বইয়ে অতীতের ভুল ভ্রান্তির জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন যে, তার পিতার আমলের কালাকানুন 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' তিনি বাতিল করবেন। কিন্তু শেখ হাসিনা ওয়াজেদের স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল; মাত্র সোয়া তিন বছর আগের প্রতিশ্রুতির কথা তিনি বেমালুম অস্বীকার করছেন।

শেখ হাসিনার পিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পীড়াবোধ করছি। তাঁর নিশ্চয়ই বহু সদগুণ ছিল, অন্যথায় এত বড় নেতা তিনি হতে পারতেন না। সেসব সদগুণের কিছু কিছু পরিচয় আমিও পেয়েছিলাম, সেজন্যই এখনও আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। কিন্তু একথাও সত্যি যে, ক্ষমতার আসনে বসার পর স্তবস্তুতি ও চাটুকারিতার মোহ এবং ক্ষমতার নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। সেসব দুষ্ট চাটুকার দিয়ে তিনি নিজেকে ঘিরে রেখেছিলেন বলে দেশের দুর্দশা এবং দেয়ালের লিখন তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু সর্বময় সংকট যখন দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল চুয়াত্তরের বন্যায় যখন সর্বাধিক যাট সত্তর হাজার মানুষ মারা গেল, তখনও ভুলভ্রান্তি শোধরানোর বদলে তিনি দুষ্ট চাটুকারদের নির্দেশিত সর্বনাশার পথই ধরলেন। যে গর্তে পড়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সে গর্তকে আরও গভীর করে খোঁড়ার পথ ধরলেন তিনি; দেশব্যাপী সমালোচনাকে স্তব্ধ করার জন্য তিনি পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে সত্য সংবাদের কণ্ঠরোধ করলেন। প্রতিবাদকে গুঁড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কালাকানুন বিশেষ ক্ষমতা আইন পাস করলেন। তাতেও প্রতিবাদ থামেনি, থামবে বলে মনে হচ্ছিল না। অথচ এ কথাও তাকে বোঝানো হয়েছিল যে, যে কোন মূল্যে তাকে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতেই হবে। সে জন্যই তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব বিলোপ করলেন, একদলীয় স্বৈরতন্ত্র কায়েম করলেন বাংলাদেশে। এই অপকর্মগুলো করেছিলেন বলেই যে কথা ভাবতে এখনও আমার বেদনাবোধ হচ্ছে- শেখ মুজিব ও তার পরিবারের মর্মান্তিক হত্যায় বাংলদেশে অশ্রুবর্ষণ করার লোক ছিল না, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশের নানা স্থানে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছিল। পিতার সদ্‌গুণগুলোর কিছু শেখ হাসিনা পেয়েছেন বলে লক্ষ্য করিনি, কিন্তু শেখ মুজিব গদিতে বসার পর থেকে যে অপগুণগুলোর পরিচয় দিয়েছিলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হুবহু সেগুলোর অন্ধ অনুকরণ করে চলেছেন। সুপরামর্শ তিনি নেবেন না, চাটুকার ও স্তাবকদের স্তবস্তুতিতে ভুলবেন তিনি এবং সেসব স্বার্থ-সর্বস্ব পরগাছাদের পরামর্শে চলবেন। ইংরেজদের আমল থেকে বারবার প্রমাণ হয়েছে যে, রাজনৈতিক নির্যাতন ও কালাকানুন কুশাসনকে কায়েম রাখতে পারে না। ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা শেখ মুজিব নিজে নেননি, সুতরাং তার গুণধর কন্যা নেবেন কি করে? সাতচল্লিশে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র চেয়েছে এবং মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছে। পাকিস্তানের

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের সরকার ভোটদানের অধিকার থেকে দীর্ঘকাল তাদের বঞ্চিত রেখে, বলে চুয়ান্নতে তারা ঢালাও ভোট দিয়েছে যুক্তফ্রন্টকে। গোটা পাকিস্তান ভিত্তিতে আরও দীর্ঘকাল তারা জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে অস্বীকার করেছিল বলেই '৭০ সালের ডিসেম্বরে তারা একচেটিয়া ভোট দিয়ে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করেছিল। কিন্তু সেই শেখ মুজিবই আবার যখন কালাকানুনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, যখন তিনি বাকস্বাধীনতা রহিত করে স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার পথ ধরেছিলেন, তখন আর তার জন্য দেশের মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি অবশিষ্ট ছিল না; তার মর্মান্তিক হত্যায়ও বাংলাদেশের মানুষ অশ্রুপাত করেনি। এই হচ্ছে ইতিহাসের সত্যিকারের শিক্ষা।

কিন্তু শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ইতিহাস থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে ক্রমাগত অস্বীকার করে যাচ্ছেন। পরিবর্তে অত্যন্ত একগুয়ে ও নির্লজ্জভাবে পিতার অপগুণগুলোর অন্ধ অনুকরণ করে দেশকে তিনি অপরিহার্যভাবেই দুর্দৈবের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। সে কারণেই তার ভুলত্রুটিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে গেলেই তার পিতার প্রসঙ্গ টানতে হয়। তাতে শেখ মুজিবের ভুল-ত্রুটিগুলোর ওপর বারংবার আলোকপাত হচ্ছে, তার ভাবমূর্তি অকারণে আরও কলংকিত হচ্ছে। আর সে জন্য দায়ী হচ্ছেন শেখ হাসিনা স্বয়ং।

বিনয়ী কিংবা বাকসংযমী বলে শেখ হাসিনার সুনাম নেই। তার বহু দাবির মধ্যে একটা হচ্ছে যে, তিনি প্রচুর বই পড়েন। অথচ মাত্র গত জুলাই মাসে তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া লন্ডনে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার সংবাদদাতা সুজান গোল্ডেনবার্গকে বলেছেন, সাজগোজে সময় কম নষ্ট করে দেশের সেবায় আরেকটু বেশী সময় দেয়ার এবং জিটিভি কম দেখে কিঞ্চিত লেখাপড়া করার পরামর্শ দিয়েই নাকি তিনি স্ত্রীর বেশী বিরাগভাজন হয়েছেন। কিন্তু সে বিতর্ক তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপার। বই না পড়েও ইতিহাস সম্বন্ধে আরও কিছু শিক্ষা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাতের কাছেই পেতে পারেন। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীও তার অপ্রিয়তার দিনগুলোতে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও কালাকানুনের সাহায্যে গদি আঁকড়ে থাকার প্রয়াস পেয়েছিলেন; জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করেছিলেন তিনি। সে সময় জনৈক কারারুদ্ধ সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসুর একখানি অত্যন্ত করুণ চিঠির কথা আজও আমার মনে পড়ে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে সেজন্য চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল; '৭৭ সালের নির্বাচনে ভারতের ভোটদাতারা সেহেতু কন্যা ইন্দিরাকে চরম অপমান করতে ছাড়েনি। নেহেরু পরিবার আজ যে ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে নেই, ইন্দিরা গান্ধীর তৎকালীন রাজনৈতিক একগুয়েমী ও স্বার্থান্ধতা কি তার সূচনা নয়? শেখ হাসিনার একগুয়েমী ও একরোখাপনা আরও বেশী নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। তিনি নাকি এখন থেকেই 'বংশানুক্রমিক গণতন্ত্রের' কথা বলছেন; তার পরে নাকি প্রধানমন্ত্রিত্ব দিয়ে যাবেন ছোট বোন শেখ রেহানাকে অর্থাৎ এই একবিংশ শতাব্দীতেও তোগলকী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন শেখ হাসিনা ওয়াজেদ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনসাধারণ এ কথাও ভুলে যায়নি যে, ছিয়ান্নব্বই সালে শেখ হাসিনা ও তার আওয়ামী লীগ প্রচুর অনুনয়-বিনয় করে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এখন বলতে বাধ্য হন যে, তিনি 'বিচলিত' এবং 'ক্ষুব্ধ'। হয়তো 'অপমানিত' কথাটা তিনি সুচিন্তিতভাবেই বাদ দিয়েছেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট যে অপমানিত হয়েছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সে অপমান বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিও অপমান - যাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং একটি কালাকানুন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ১৯৯৬ সালের ২৩ শে জুন, মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার দিনে, বাংলার স্বাধীনতা বিকিয়ে নেয়ার দিনে গদিতে বসেছিলেন। তখন থেকেই রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্যাতন-নিপীড়ন, তাদের বাকস্বাধীনতা হরণ ও প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ-কিছুই তিনি বাদ রাখেননি। তাতেও ক্ষমতা কায়েম রাখা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পেরে পিতার মতই তিনি কালাকানুনের পথ ধরেছেন। সে কানুনে সর্বজন সম্মানিত প্রেসিডেন্টের সম্মতি আদায়ের জন্য তিনি সামরিক অভ্যুত্থানেরও হুমকি দিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবারও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার কথা প্রধানমন্ত্রী নিজেই তুলেছেন-যেমন, জেনারেল এইচ এম এরশাদ তুলেছিলেন ১৯৮২ সালে। এখনও যদি শেখ হাসিনার সম্বিৎ ফিরে না আসে তাহলে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য অপেক্ষা না করে দেশের সাধারণ মানুষই সিদ্ধান্ত নিজেদের হাতে তুলে নেবে। বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হলে, প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ হলে সহিংসতাকে অনিবার্য করে তোলা হয়। অনুরূপ পরিস্থিতিতে বহু দেশেই গৃহযুদ্ধ হয়েছে। গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি অবস্থা চলছে প্রতিবেশী রাজনৈতিক অসন্তোষকে যদি গণতান্ত্রিক বহিঃপ্রকাশের উন্মুক্ত পথ দেয়া না হয়, তাহলে সে অসন্তোষ উত্তর-পূর্ব ভারতের অসন্তোষের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আশা অত্যন্ত বাস্তব। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার বহু বছর ধরে অস্ত্রের জোরে সে বিদ্রোহের অবসান করতে পারেননি বলেই এখন আসামের বোড়োদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে মীমাংসার কথা বলেছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আলোচনার কথা বলেন বটে, কিন্তু সেটা বিরোধীদের বিদ্রূপ করা এবং তার স্তাবক কপিকুলের আনন্দ-বর্ধনের উদ্দেশ্যে; সেসব কথা মোটেই আন্তরিক নয়।

www.pathagar.com

আমানুল্লাহ কবীর

ক্ষমতার লোভ ও শেখ হাসিনার রাজনীতি

ডেটলাইন ঃ ২৫ জুলাই ১৯৯৯

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গত ১১ জুলাই বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে বলেছেন, "দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে ঋণখেলাপীরা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যে যত বড় ঋণখেলাপী, সে তত বেশী প্রভাবশালী। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। ছাত্র, মস্তান ও সন্ত্রাস ছাড়া যেমন রাজনৈতিক দল চলে না, তেমনি বড় বড় ঋণখেলাপী ছাড়াও রাজনৈতিক দল চলে না।--জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে যে লংকাকাণ্ড ঘটে গেল এবং বিনা কারণে অতীতকে টেনে এনে যেভাবে পরস্পরকে গালিগালাজ করা হল, তাতে দুনিয়ার কাছে আমরা জাতি হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছি।" প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাংবিধানিকভাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু 'ফাদার ফিগার' হিসেবে তার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলতে বাধা নেই, অনেকদিন পর হলেও আবেগবশতই হোক, আর যে কারণেই হোক, তিনি সাহস করে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলার চেষ্টা করেছেন- ঢালাওভাবে সব রাজনৈতিক দলের কথা বললেও প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করেছেন ক্ষমতাসীন দলের দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতি। তার এ বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত সফরে অবস্থান করছিলেন যুক্তরাজ্যে। তার সফরকে কেন্দ্র করে আলোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে নানা কারণেই। দশদিনের এ সফরে তার অর্ধশতাধিক সফরসঙ্গীর মধ্যে ছিলেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক বিতর্কিত ব্যক্তিও। প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে অস্পষ্টভাবে হলেও ইঙ্গিত রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঐ বিতর্কিত সফরের প্রতি। ব্রিটিশ হাই কমিশনের প্রেস রিলিজ অনুসারে সরকারি সফর ছিল মাত্র চারদিন। আর ছয় দিন তিনি যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন বেসরকারি কর্মসূচির কারণে, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যক্তিগত প্রয়োজনও। ঘটা করে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে যুক্তরাজ্য সফরে যাওয়া এবং পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার (যিনি ঘনিষ্ঠজনদের তালিকার বহির্ভূত বলে ঢাকায়ই অবস্থান করছিলেন) হেঁয়ালিপূর্ণ সাক্ষাৎকার তার সফরকে কেবল বিতর্কিত করেনি, রহস্যময়ও করে তুলে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত কর্মসূচির মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল তার একমাত্র পুত্র জয়ের বিয়ে। কিন্তু জয়ের পিতা ডঃ ওয়াজেদ সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না, আয়োজন দেখে ঐরকম একটা ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলেন মাত্র। কনে কে, তা নিয়েও পত্র-পত্রিকায় নানা জল্পনা-কল্পনা। ইতিপূর্বে কন্যা পুতুলের যখন প্রথম সন্তান হয়, তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় একমাস কন্যার কাছে কাটান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তখনও

www.pathagar.com

স্বামী ডঃ ওয়াজেদকে তিনি সঙ্গে নেননি। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ফেলে মাসব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকে কেন্দ্র করে সে সময়ও দেশে বেশ আলোচনা-সমালোচনা, জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, নানা ধরনের রসাল গল্প মানুষের মুখে মুখে শোনা গেছে। এবার শেখ হাসিনার সফরের খবরা-খবর পরিবেশনের পাল্লায় বাজিমাৎ করে সরকার সমর্থক একটি দৈনিক। প্রতিবেদনে বলা হল, নির্ধারিত সকল কর্মসূচি বাতিল করে প্রধানমন্ত্রী নীরবে (গোপনে) চলে গেছেন ডালাস (আমেরিকা)। পরের দিন অবশ্য ঐ পত্রিকাকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে এ ধরনের সংবাদ ছাপার জন্য। সত্য-মিথ্যা যাই হোক, প্রধানমন্ত্রীর দশদিনের যুক্তরাজ্য সফরকে ঘিরে এমনি ধরনের সন্দেহ, কৌতূহল ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন মহলে। কারণ কি? কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে লন্ডনে 'বাংলাদেশ ফেস্টিভাল' আয়োজনের প্রয়োজন দেখা দিল কেন হঠাৎ ? এ টাকার যোগান দিল কারা? দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যখন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, তখন এ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিরাট লটবহর নিয়ে যুক্তরাজ্য সফরের উদ্দেশ্য কি? বিনিময়ে বাংলাদেশ কি পাবে? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সফরের আয়োজকরা সতর্কতার সাথে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির ব্যাপারে আগাগোড়াই একটা রাখঢাক পলিসি অনুসরণ করেছে। একজন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হলেও তার ব্যক্তিগত জীবন আছে, দেশে-বিদেশে ব্যক্তিগত কর্মসূচিও থাকতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে রাখঢাক কেন? যদি তার পারিবারিক কর্মসূচিতে জয়ের বিয়ের ব্যাপারটিও থেকে থাকে, তাতেও স্বাভাবিকভাবে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তা জনসমক্ষে চেপে যাওয়ার কারণ কি? পরে অবশ্য জানা গেল, বর-কনে কেউ লন্ডন আসেনি, গত এপ্রিল মাসেই তারা বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ডালাসে বসবাস করছে। লন্ডনে ধুমধাম করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনেকে বরণ করে নেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, কনে নাকি যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসরত এবং তিনি এক শিখের কন্যা। এ দুর্বলতার কারণেই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীর সফরের এ পর্বটি সম্পর্কে এত সতর্কতা, এত রাখঢাক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। গত ১৫ জুলাই দেশে ফিরে শেখ হাসিনা অবশ্য এ সব খবরকে কল্পকাহিনী বলে উড়িয়ে দিয়ে পত্র-পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্য সফর খুব একটা সুখকর ছিল, তা নয়। তার সরকারের ব্যর্থতা, দুর্নীতি, দলীয়করণ ও কারচুপির জন্য সেখানেও তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিক্ষোভের। বাংলাদেশ ফেস্টিভালের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের কথা থাকলেও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তাকে সে কর্মসূচি বাতিল করতে হয়েছে। এটা সহজেই অনুমেয় যে, যে ঢাকঢোল পিটিয়ে তিনি যুক্তরাজ্য সফরে গিয়েছিলেন, সাফল্যের সে জৌলুস নিয়ে দেশে ফিরতে পারেননি। যাহোক, প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে এত গুজব, কানা-ঘুষার মূল কারণ হচ্ছে, তার সফরসূচির ব্যাপারে স্বচ্ছতা রক্ষা করা হয়নি।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা ও তার সরকারের বৈশিষ্ট্যও এটাই - মুখে স্বচ্ছতার কথা বললেও আয়নায় কখনো নিজেদের মুখ দেখেন না। যারা আয়নায় নিজেদের মুখ দেখেন, তারা নিজেদের চেহারা সম্পর্কে সচেতন থাকেন বলে অন্যের সম্পর্কে যা খুশী তাই বলতে পারেন না- লজ্জা-শরমের একটা বালাই থাকে। সম্প্রতি রাজউকের প্লট বরাদ্দ নিয়ে দেশে যে নিন্দা ও ক্ষোভের ঝড় বইছিল, তা শেখ হাসিনার অজানা নয়। প্লট বরাদ্দের তালিকা সম্পর্কেও যে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন তেমনটিও অনুমান করা কঠিন। তার চোখকে এড়িয়ে কোন মন্ত্রীর পক্ষে কোন কিছু করা, বিশেষত বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। নেহায়েতই ক্রেডিট নেয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখালেন তার নির্বাহী ক্ষমতার চূড়ান্ত ব্যবহার করে - প্লট বরাদ্দ বাতিলের ঘোষণা দিয়ে। তদন্ত করা কিংবা তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানেরও প্রয়োজন বোধ করলেন না, উল্টো নিজের সরকারের দোষ ঢাকার জন্য আবারও অতীতকে টেনে নিয়ে আসলেন। অধ্যাপক বি. চৌধুরীও নন, টেনে আনলেন তার মরহুম পিতা কফিল উদ্দিন চৌধুরীকে - যিনি পাকিস্তান আমলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। বাঘ ও ছাগল ছানার সেই পুরনো কেচ্ছার মত -'পানি তুই ঘোলা না করলেও ঘোলা করেছে তোর বাবা'। তার সরকার কোন দোষ করেনি বলে শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলনে যে সাফাই গাইলেন, তার চমৎকার জবাব দিয়েছেন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতা রাশেদ খান মেনন। চুরির মাল ফেরত দিলেও (বা উদ্ধার হলেও) লুটপাটকারী বা চোর যেমন লুটপাট বা চুরির দায় থেকে রেহাই পায় না, তেমনি প্লট বরাদ্দ বাতিল করেও সরকার দুর্নীতি বা অনিয়মের দায় থেকে রেহাই পেতে পারে না। শেখ হাসিনা এর কি জবাব দেবেন? অধ্যাপক বি. চৌধুরী তার মরহুম পিতার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে বলেছেন, তার পিতা কফিল উদ্দিন চৌধুরী মন্ত্রী থাকাকালে নিজের বা নিজের আত্মীয়-স্বজনের নামে কোন প্লট বরাদ্দ দেননি, যাদের প্লট দিয়েছিলেন- তাদের একজন হচ্ছেন তৎকালীন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্পষ্টতই তা হচ্ছে তার ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়ী। মুজিব সরকারের আমলে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ প্লট পেয়েছিলেন ধানমন্ডিতে, যেখানে লেক ভরাট করে বাড়ী নির্মিত হয় বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলে। গ্রামে একটা প্রবাদ আছে চোরের মায়ের (শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রী, কর্মী-সমর্থকরা অবশ্য 'আপা' বলে সম্বোধন করে। সে অর্থে 'বোন' বলাই সমীচীন) বড় গলা'। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের এই খাই-খাই অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বুড়ীগঙ্গা নদী থেকে শুরু করে ধানমন্ডি ও গুলশান-বারিধারার লেক পর্যন্ত ভাগাভাগি ও দখল চলছে। রাজউক বহুবার উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ধমক বা মার খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তার অফিসারদের। কয়েক দিন আগে সম্ভ্রান্ত এলাকা বারিধারা সংলগ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে তাদের জমাজমি লুটপাট বা দখলেরও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এলাকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যখন পুলিশের বিরুদ্ধে দা-বটি-লাঠি নিয়ে নেমে পড়ে, তখন তাদের পিছু হটা

www.pathagar.com

ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বলি, এত সব কলা-কৌশলের দরকার কি? শেখ হাসিনা ও দলের নেতাকর্মীরা যা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেন, তা সোজাসুজি বললেই পারেন- দেশ স্বাধীন করেছেন শেখ মুজিব, জাতির জনক তিনি, দেশটা তার। এত দিন দেশটা বেদখল ছিল। শেখ মুজিবের উত্তরসুরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার আত্মীয়-স্বজন, দলের নেতা-কর্মীরা খাবে না, খাবে কে?

দীর্ঘ একুশ বছর পর শেখ হাসিনার দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক যে, একুশ বছরের বঞ্চনা মাত্র পাঁচ বছরে ওয়াসিল হয় না। যদিও শেখ হাসিনা গত পার্লামেন্ট নির্বাচনের পূর্বে জনগণের কাছে অতীতের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে মাত্র একবারের জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ দানের আবেদন জানিয়েছিলেন। জনগণ ভোট দিলে একবার কেন, একাধিকবার ক্ষমতায় যান, তাতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এতসব বাহানা কেন? প্রথম শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি ৫৭ বছর বয়সে অর্থাৎ ২০০৪ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন অর্থাৎ আরেকটি মেয়াদের জন্য তিনি ক্ষমতায় থাকতে চান। এবার লন্ডনে এবং লন্ডন থেকে ফিরে এসে তিনি সাংবাদিকদের কাছে খোলামেলাভাবেই তার মনের বাসনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, তার সরকার গত তিন বছরে অনেক কাজ হাতে নিয়েছে এবং এসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরেকটি মেয়াদ দরকার। এ ইঙ্গিত তিনি লন্ডনে তার 'বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল লেকচারেও' দিয়েছেন। দেড় ঘণ্টা দীর্ঘ লেকচারে এক ঘণ্টার বেশী সময় ধরে বয়ান করেছেন 'আমি ও আমার সরকার' তিন বছরে কী সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জন করেছে, তার সুবিশাল ফিরিস্তি। শেখ হাসিনা ঠিকই বলেছেন, তার সরকার অনেক কাজ করছে, আরও অনেক কাজ করার বাকি রয়েছে। কাজেই আরেকটি মেয়াদ তাকে ক্ষমতায় আসতে হবে। শেখ হাসিনা তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার' চেষ্টা করেছেন। প্রথমত জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন, দ্বিতীয়ত পরবর্তী পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিরোধী দলগুলোকে আগাম জানান দিয়েছেন। বিনা প্রস্তুতিতে তিনি এসব কথা বলছেন না। কয়েক দিন আগে একটি প্রভাবশালী ইংরেজী সাপ্তাহিকে খবর বেরিয়েছে যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন ও পার্লামেন্ট নির্বাচন ক্যাম্পেইনে হেলিকপ্টার ব্যবহার করবে। একটি প্রাইভেট কোম্পানী থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এই হেলিকপ্টার ভাড়া করা হবে। পরে বিবিসি'র খবরে বলা হয়, ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সাথে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। হেলিকপ্টার ভাড়া বাবদ প্রতি ঘণ্টার জন্য ব্যয় হবে এক লাখ টাকা এবং অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে বিশ লাখ টাকা। দরিদ্র বাংলাদেশের নির্বাচনের এমন ব্যয়বহুল প্রচারণার ব্যবস্থা করে ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মাস দেড়েক আগে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিএনপি কোটি কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছে। যারা আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের নেতা-নেত্রীদের বিশেষত শেখ হাসিনাকে স্টাডি করেছেন, তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে,

www.pathagar.com

বিএনপি'র ওপর আগাম দোষ চাপিয়ে আসলে কাজটি করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগই। আওয়ামী লীগ বিএনপি'র মত বেয়াকুব নয়। পিতা শেখ মুজিবের 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' ঘোষণার মতই যখন শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন যে, বাকি কাজ সম্পন্ন করতে তার দলকে অন্তত আরেকটি মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় আসতে হবে, তখন প্রয়োজনীয় 'মানি এন্ড মাসল' (অর্থ ও পেশিশক্তি) নিয়ে তারা মাঠে নামবেন। অপরদিকে, নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রশাসনের নির্বাহী ও পুলিশ বিভাগকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত ঢেলে সাজাচ্ছে। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি'কে তার মিত্র দলগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল হিসেবে হাসিনা সরকার এককভাবে বিএনপি'র সক্রিয় নেতা-কর্মীদের সন্ত্রাসীদের তালিকাভুক্ত করে সাঁড়াশি আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুলিশ কর্মকর্তাদের বৈঠকে ঢাকা মহানগরীর টপ সন্ত্রাসীদের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তার শীর্ষে রয়েছে সাদেক হোসেন খোকা এমপি (বিএনপি'র ঘোষিত মেয়র ক্যান্ডিডেট), মীর্জা আব্বাস, আমানউল্লাহ আমান এমপিসহ যুবদল ও ছাত্রদলের প্রায় সকল নেতা। এ ধরনের তালিকা চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীসহ সকল শহর ও থানা পর্যায়েও তৈরী করা হবে বা হচ্ছে। এটা হচ্ছে নির্বাচনের পূর্বেই নির্বাচনী ফলাফল নিশ্চিত করার আওয়ামী কৌশল। খুলনা-যশোর অঞ্চলে সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের আত্মসমর্পণের নামে যে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, তা'ও আওয়ামী নির্বাচনী কৌশলের অংশ। এ অঞ্চলে আওয়ামী লীগের যে দলগত অবস্থান, তা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই এসব সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের দলে ভেড়ানোর জন্য এ নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে, সেসব খবরেও বলা হয়েছে প্রকৃত সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের কেউ আত্মসমর্পণ করেনি বা অস্ত্র জমা দেয়নি। যেসব অস্ত্র জমা দেয়া হয়েছে, সে সব অস্ত্রের প্রায় সবগুলোই অকেজো। সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীরা অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করছে বলে যে প্রায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তাহলে সেসব অস্ত্র গেল কোথায়? সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে, আত্মসমপর্ণকারী সন্ত্রাসীদের আনসার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর অর্থ হচ্ছে তাদের হাতে সন্ত্রাসের বৈধ লাইসেন্স তুলে দিচ্ছে, যা স্পষ্টতঃ ব্যবহৃত হবে সরকারের প্রতিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে। আবারো সেই কথায় ফিরে আসি।

শেখ হাসিনা কেন আরও একটি মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় থাকতে আটঘাট বেঁধে নেমেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বর্তমান সরকারের মূল এজেন্ডা হচ্ছে রাজনৈতিক এজণ্ডা, অর্থনৈতিক এজেন্ডা নয়। অর্থনৈতিক এজন্ডাকে গৌণ করে রেখে রাজনৈতিক এজেন্ডাকে মুখ্য করে দেখার ফলে গত তিন বছরে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার উল্লেখযোগ্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেনি কিংবা কোন অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করতে পারেনি। গ্যাস সেক্টর বাদ দিলে সকল সেক্টরে বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অর্থনৈতিক খাতের ওপর যে চাপ পড়েছে, তার ফলে প্রবৃদ্ধির হার ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার আরো

www.pathagar.com

আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থ বছরে প্রাক্কলিত ৫.২% প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে বিশ্বব্যাংকসহ বিদেশী মিশনগুলো পর্যন্ত হাসি-তামাশা করেছে। একদিকে রফতানী হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে ভারতীয় পণ্যে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। পরোক্ষ করে ভারাক্রান্ত বাজেটের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে বাজারে শুরু হয়েছে। গ্যাস-বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষমতায় আওয়ামী লীগের তিন বছরপূর্তি উপলক্ষে এবং আগে ও পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একাধিকবার বক্তৃতায় সাক্ষাৎকারে তার সরকারের সাফল্যের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে প্রধানত রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের কথা বলেছেন। উল্লেখযোগ্য কোন অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা বলতে পারেননি। সাফল্যের ফিরিস্তি বলতে 'বঙ্গবন্ধু'র হত্যাকারীদের বিচার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন, গঙ্গা পানি চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম 'শান্তিচুক্তি' (যে চুক্তি দুটোই দেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ), ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা (পরবর্তী পদক্ষেপ), দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রাম ইত্যাদি। শেখ হাসিনা সরকারের অভিধানে 'ব্যর্থতা' ও 'দুর্নীতি' বলে কোন শব্দ নেই। বোফর্স কেলেংকারির জন্য ভারতে কংগ্রেসকে এখনো মূল্য দিতে হচ্ছে। কিন্তু রাশিয়া থেকে মিগ-২৯ ক্রয় কেলেংকারি, ভারত থেকে সেনাবাহিনীর জন্য অশোক লেল্যান্ডের ট্রাক ক্রয় কেলেংকারি আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য কোন কেলেংকারি নয়।

ডঃ কামাল হোসেন সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিগ-২৯ ক্রয়, তেল ক্ষেত্র ইজারা, রাজউকের প্লট বরাদ্দ, রুবেল হত্যা মামলার তদন্ত রিপোর্টসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু পার্লামেন্টের স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার জন্য পেশের দাবি করেছেন। ডঃ কামাল হোসেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ও ভদ্রলোক। কিন্তু আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে অবশেষে আওয়ামী লীগ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল নিজেকেই। শেখ হাসিনাকে ১৯৮১ সালে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তারপরও আওয়ামী লীগে তাঁর ঠাঁই হয়নি। আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীদের ফ্যাসিস্ট চরিত্র তার কাছে অজানা নয়। স্পীকারকে পার্লামেন্ট চালাতে হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (যিনি লিডার অব দি হাউসও) চোখের দিকে তাকিয়ে। বিরোধী দলের সদস্যদের মাইক 'অন' ও 'অফ' হয় শেখ হাসিনার ইশারায়। গত তিন বছরে পার্লামেন্টে গঙ্গা পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম 'শান্তিচুক্তি' তেল-গ্যাস নীতির মত কোন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়নি। হঠাৎ কেউ রেডিওতে পার্লামেন্টের আলোচনা শুনলে বুঝতে পারবেন না কোন সংসদ সদস্য (বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের সদস্য) বক্তব্য রাখছেন, না কোন নামজাদা মস্তান হুমকি-ধামকি দিচ্ছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা হয়ে আরেকজন ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে যে ভাষায় কথা বলেন, তাতে টানবাজারের সদস্যাদের সেই নোংরা, অভদ্র ও রুচিবিবর্জিত আচরণের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাহলে এই পার্লামেন্ট থাকার অর্থ কি? দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। শেখ হাসিনা যখন রাজনীতি করেন, তখন ক্ষমতার লোভ থাকবেই। এটা দোষের কিছু নয়। আমাদের সংবিধানেও এমন কোন

www.pathagar.com

বিধিনিষেধ নেই যে, এজন্য দু'বারের বেশী প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট (প্রধান নির্বাহী হিসেবে) হতে পারবেন না। জনগণ ভোট দিলে সারা জীবনই একজন প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন। কিন্তু এখনো অনেক কাজ অসম্পন্ন রয়েছে, তাই আরেকবারের জন্য ক্ষমতায় যেতে হবে-এ বাহানা কেন? তাহলে কোন্ কাজগুলো অসম্পন্ন রয়েছে, যে কারণে শেখ হাসিনা আগে-ভাগেই ঘোষণা দিচ্ছেন তাকে আরেক মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় যেতে হবে? অসম্পন্ন কাজগুলো সম্পর্কে সরাসরি তিনি কিছু না বললেও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের বুঝতে কষ্ট হয় না এবং এ সবই তার অঘোষিত রাজনৈতিক এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত। এর একটি অংশ পরিবারকেন্দ্রিক, অপর অংশ দিল্লীকেন্দ্রিক। পরিবারকেন্দ্রিক অংশে রয়েছে শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও কার্যকর এবং রাজনৈতিকভাবে তাদের পুনর্বাসন, যে জন্য গৃহীত হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতকে সামরিক করিডোর প্রদান, ভারতে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দান, ভারতে গ্যাস রফতানী, রাশিয়া ও ভারত থেকে মিগ-২৯ ও পরিবহনসহ সমরাস্ত্র ক্রয় করে সামরিক বাহিনীকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করা এবং অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করা। শেখ হাসিনার অঘোষিত রাজনৈতিক এজেন্ডার তৃতীয় দিকটি হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপিকে নানা কৌশলে ধ্বংস করে দেয়া। তাহলে বাংলাদেশের আকাশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের সূর্য আর কখনো অস্ত যাবে না। যে কারণে শেখ হাসিনাকে আরেকটি মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় যাওয়া দরকার। দিল্লীর সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা সে কৌশল নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলো আগামী নভেম্বর মাসে আন্দোলন তুঙ্গে নিয়ে ডাকা ঘেরাওয়ের ডাক দেবে-এই মর্মে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন ওয়াকিবহাল মহলে আলোচনা হচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ ডিসেম্বরেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন দিতে পারে। কারণ আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মনে করেন, সরকার বিরোধী আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হলে তাদের আবার একুশ বছরের ফ্যাকড়ায় পড়তে হবে, অর্থাৎ সহসা ক্ষমতায় আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। শেখ হাসিনার আবেদন ও তার দলের সার্বিক প্রস্তুতি দেখেও তাই মনে হয়। কিন্তু বিএনপি ও তার মিত্র দলগুলো কি আওয়ামী লীগের এ কৌশল বুঝতে পারছে?

www.pathagar.com

আওয়ামী দু:শাসনের শ্বেতপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় সংসদ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি

প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী: সংসদে কেন যাই না

বিচারপতি হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়া: জাতীয় সংসদ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি

ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া: জাতীয় সংসদের এখাতিয়ার ও স্পীকারের দায়িত্ব

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী: গণতান্ত্রিক সংসদে অগণতান্ত্রিক আচরণ

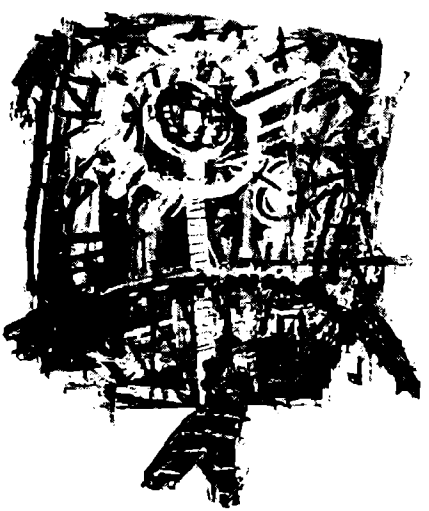

www.pathagar.com

প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

জাতীয় সংসদে কেন যাই না

ডেটলাইন ঃ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

প্রখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, সাবেক মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা প্রফেসর ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগকে জনগণ 'বিশ্বমিথ্যুক' উপাধি দিয়েছে। তাদের কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। দিল্লীতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশে যারা ছাতা তোলে, তারা এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সপক্ষ শক্তি নয়। তিনি বলেছেন, "বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের এমন অকার্যকর সংসদ জীবনে দেখিনি।" বদরুদ্দোজা চৌধুরী দৈনিক ইনকিলাবকে ১২-৯-৯৯ তারিখে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তার সাক্ষাৎকার নিম্নরূপ ঃ

সাংবাদিক : দেশের বিরাজমান বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় সংসদের বৃহত্তম বিরোধী দলের উপনেতা হিসেবে বর্তমান সংসদকে আপনি কি চোখে দেখছেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আসলে এটা দেখার সাথে সাথে একটু অনুভূতিরও প্রয়োজন রয়েছে। আমি কি দেখি এবং কি অনুভব করি— এই দু'টো মিলে করলেই বোধহয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহৎ বিরোধী দল বিএনপি এবং আমরা সংসদে আছি অনেক দিন থেকে। সে হিসেবে জাতীয় সংসদের এই দৈন্যদশা, এই দুর্দশা, এই অকার্যকারিতা, এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অন্তত জাতীয় সংসদের সাথে আমার যে দীর্ঘ ১১ বছরের সম্পর্ক, তাতে এমন অবস্থা, এমন নিম্নমান আমি কখনো দেখিনি। একটা একটা করে সংসদের কাজগুলো ধরা যাক ঃ

এক, জাতীয় সংসদে জাতীয় সমস্যা আলোচনা করা হবে। দুই, জাতীয় সংসদে বাজেট পাস করা হবে। দুই নম্বর। জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন করা হবে। তিন নম্বর। এগুলোই হলো জাতীয় সংসদের মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়া জাতীয় সংসদে মাঝে মধ্যে আন্তর্জাতিক সমস্যাও আলোচিত হবে। কিন্তু জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু আছে, সেগুলো প্রধানত এখানে আলোচিত হবে এবং এ ব্যাপারে মৌখিকভাবে আওয়ামী লীগও এই ধরনের ঘোষণা দিয়েছে। সংসদ হবে জাতীয় সকল সমস্যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আর মৌখিকভাবে নয়, আমরা এটা আন্তরিকভাবে প্রমাণের চেষ্টা করেছি। বিএনপি যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল, আমরা এখানে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত, আইন প্রণয়ন দেশের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য যতো আইন আছে, তা পাস করানো, সেই ধরনের আইন এখানে আলোচিত হবে। সমালোচিত হবে এবং সুস্থভাবে বিবেচনার পর আইন হিসেবে প্রণীত হবে। এখানে সরকারও কিছু কিছু আইন আনবে, যেগুলো সরকারি দল, বিরোধী দল উভয় পক্ষই আলোচনা করবে। ঠিক

www.pathagar.com

সেভাবেই বিরোধী দল থেকেও আইন আসবে এবং উভয়পক্ষের সাধারণ সদস্যরাও নতুন আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব আনবে। এটাই হলো নিয়ম।

তৃতীয় হলো বাজেট প্রণয়ন। সরকারি দলের প্রস্তাবিত বাজেটকে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন, যেটার জন্য সুচিন্তিত অভিমতের প্রয়োজন এবং সেই বাজেটে জনগণের চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, সেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কতখানি অগ্রগতি হলো, অথবা পশ্চাৎগতি হলো, অথবা থেমে গেছে কিনা— সেটা বাজেট অধিবেশনে পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হবে। এখানে জেদ করলে চলবে না, মিথ্যা ভাষণ দেয়াও উচিত হবে না। সুন্দরভাবে কঠোরতম সমালোচনা করতে হবে; বাজেটের ভুল-ত্রুটি থাকলে এবং যদি কোনো সদস্য কোনো ভুল-ত্রুটি করে থাকেন তাঁর বক্তব্যে সেটাকে সংশোধন করার পরিপূর্ণ দায়িত্ব, অধিকার এবং ক্ষমতা স্বয়ং স্পীকারের। বাজেটে সরকার বলবে তাদের উপস্থাপিত বাজেটের পক্ষে এবং বিরোধী দল যেখানে যেখানে বাজেট গণমুখী হয়নি, গণতন্ত্রমুখী হয়নি, সমাজমুখী হয়নি, রাজনীতির সপক্ষে হয়নি— সেগুলো পয়েন্টআউট করবে। This is the duty of the opposition. অপজিশন যেখানে ভুল-ত্রুটি, সংশয়, সন্দেহ সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে। জনগণ এজন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে। এবং সরকারকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। সুতরাং অপজিশন সমালোচনা করলেই সরকার তার তীব্র ভাষায় জবাব দেবে— এটা তো হতে পারে না।

বর্তমান সংসদের পরিবেশের কথায় আসেন। যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি সংসদে যাবেন, কথা বলবেন, সেখানে সরকারি দল থাকবে, বিরোধী দল থাকবে, হয়ত কিছু মধ্যপন্থীও থাকতে পারে, আবার উভয়পন্থীও থাকতে পারে আজকাল যেটা দেখছি সরকারি এই সংসদ সদস্যদের দক্ষতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়নি। তারা অসত্য ভাষণ এত বেশি বলে যে, তার কোনো তুলনা হয় না। আমি একটা সহজ উদাহরণ দেবো। সংসদে একটা কাগজ উঁচু করে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বললেন যে, "এই কাগজগুলো হলো ডিআইটির ডকুমেন্টের কপি এবং তাতে লেখা আছে, খালেদা রহমান বলে জিয়াউর রহমানের পত্নী। 'তার নামে গুলশানে ১০ কাঠার একটি প্লট আছে। এতদিন পর্যন্ত বিরোধীদলীয় উপনেতা যে বলেছেন, জিয়াউর রহমান কোনো বিষয় সম্পত্তি রাখেননি— সেটা সর্বৈব মিথ্যা।" এই কথা প্রতিমন্ত্রী বললেন। আমরা বহু চেষ্টা করেছি, এটা অনুসন্ধান করতে, কোথাও কিছু পাইনি। আমি নেত্রীকে বললাম, আপনি একটু অনুসন্ধান করুন। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি জীবনেও এরকম কোনো খবর পাননি- শোনেননি, জানেননি যে গুলশানের মতো জায়গায় তার দশ কাঠার ডিআইটির দেওয়া প্লট আছে। জিয়াউর রহমানের নামে তা এলট করা হয়েছে, তিনি এখন পর্যন্ত জানেন না। আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, অনুসন্ধান করেছেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, অনুসন্ধান করেছি। আমার কোনো প্লট সেখানে নাই।"

www.pathagar.com

এই রকম একটা জাজ্বল্যমান মিথ্যা যদি তারা বলে.... মিথ্যা মিথ্যা, এবং সংসদে মিথ্যা কথা তো বলাই যাবে না। 'মিথ্যা' শব্দটি পর্যন্ত সংসদে উচ্চারণ করা যাবে না। এটা 'আনপার্লামেন্টারিয়ান'। সেই জন্য, যদি কেউ এখানে অসত্য কথা বলে তাহলেই সংসদের অপমান হয়। It's an insult to the parliament সেখানে অবলীলাক্রমে এরকম মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে তারা। আমার বিরুদ্ধে তো অনেক মিথ্যা কথা বলছে তারা। একটা উদাহরণ দিই। ১৪ বিঘা জায়গা ছিল আমার বাবার। ঢাকার খিলগাঁওয়ে এবং ক্রয়সূত্রে মালিক, সরকারি কোনো জায়গা নয়। সরকার সেটা দখল করে নেয় আইয়ুবী আমলে। ৩৬ বছর পরে, দুই বছর আগে এই আওয়ামী লীগের আমলে আমি একটা কাগজ পেলাম, "আপনাকে আড়াই কাঠা জমি বরাদ্দ দেয়া হইয়াছে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে।" আমাকে আর আমার আর দুই ভাইয়ের নামে আড়াই কাঠা করে সাড়ে সাত কাঠা জমি সদাশয় সরকার আমাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়েছেন এবং এজন্যও কিছু টাকা জমা দিতে হবে। আমার বাকি এক ভাই এবং পাঁচ বোন এই ছয়জনের কাউকেই দেয়া হয়নি। নিয়ম হলো, যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাকে দিতে হবে, তিনি যদি মারা যান, তার ওয়ারিশানদেরকে দিতে হবে। কিন্তু ওয়ারিশানদের মধ্যে তিনভাগের একভাগ আমরা পেয়েছি। 'পেয়েছি' বলব না। 'বরাদ্দপত্র' পেলাম একটা এবং টাকাটা জমা দিলাম মাত্র। তারপর জনাব পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, বিএনপি আমলে আমি সাতটি প্লট নিয়েছি। এই ধরনের জাজ্বল্যমান মিথ্যা কথা সংসদে দাঁড়িয়ে বলা হলো। আমি এর প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু এইগুলো তো সংসদে আনাই উচিত না। These are not subjects of the parliament এতো চূড়ান্ত, সর্বৈব মিথ্যা কথা তো সংসদে আসা উচিতই নয়। আর প্রথম সারিতে যারা বসেন, তাদের মুখ থেকে যখন আসে তখন তো খুবই দুঃখ পাই। কিন্তু সংসদের ভিতরে এটা হচ্ছে। বাইরেরটা তো বাদই দিলাম। বাইরে তো যা তা, যাচ্ছেতাই বলে। শুনলেন তো সেদিন এক মন্ত্রী বললেন যে, আমার মগবাজারের বাড়ি আমি কিভাবে পেয়েছি, সেটাও আমাকে জানাতে হবে। আরে এটা আমার বাবা কত সনে কিনেছেন, কিভাবে কিনেছেন, সব দলিলপত্রের তো কপি আছে, অফিসে গিয়ে দেখে নিলেই তো হলো কোনো অসুবিধা তো নাই।

দেখুন, আমি যে কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করিনি, আমি রাসূলুল্লাহর নাম উচ্চারণ করার আগে 'সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আহমদ মুজতবা, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইওয়া সাল্লাম শব্দ উচ্চারণ করি।' আর সেখানে বলা হলো যে, আমি রাসূলুল্লাহকে অপমান করেছি। বেগম খালেদা জিয়ার নামই পর্যন্ত আমি উচ্চারণ করিনি পিছনে এবং আগে। সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের কোথাও খালেদা জিয়ার নাম নেই। অথচ বলা হলো, আমি ওনার নাম উচ্চারণ করে ওনার সাথে রাসূলুল্লাহর তুলনা করেছি। নাউজুবিল্লাহ। তা'ও এই আক্রমণ, মিথ্যা আক্রমণ, শঠতামূলক আক্রমণ, অন্যায় আক্রমণ, দূরভিসন্ধিমূলক আক্রমণ করলেন কে? আমার আপত্তি এখানেই। এটা করলেন স্বয়ং সংসদ নেত্রী নিজে! তিনি একজন মুসলমান, তিনি জানেন যে, এই শব্দটা বলা কতখানি গুরুতর অপরাধ এবং তিনি যে কথাটি বললেন, তার মানেটা পরের দিন বোঝা গেল, যখন তাঁর সকল

www.pathagar.com

অঙ্গ সংগঠন, ওলামা লীগ এবং বিশেষ করে ছাত্রলীগ আমাকে 'মুরতাদ' ঘোষণা দিয়ে রাস্তায় মিছিল বের করল। চিন্তা করেন। ছাত্রলীগের কর্তৃত্ব যাদের হাতে, তাদের অনেকেই 'মুরতাদ' শব্দটার মানে জানে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাদের জানার কথাও নয়। তারা যদি এই কথা বলে সেটা দুঃখের ব্যাপার নয়? কিন্তু দুঃখই শুধু নয়— পরে দেখলাম আমি অবজারভারে পড়েছি, আওয়ামী ওলামা লীগ নামে একটা সংগঠনের নেতা 'মাওলানা' আছে নামের আগে— তিনি ঘোষণা দিলেন যে, বদরুদ্দোজা চৌধুরী খুব বড় গুনাহ করেছেন। এত গুনাহ করেছেন যে, তিনি আর মুসলমানের মধ্যে নেই। তিনি মুরতাদ এবং এই মুরতাদের শাস্তি প্রাণদণ্ড এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তওবা না করলে, ক্ষমা না চাইলে এই প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে। এটাতো খুব সাংঘাতিক কথা এবং আপনি কি মনে করেন, দেশবাসী কি মনে করেন না যে, প্রধানমন্ত্রী উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই কথা বলেননি? এবং তিনিই এই কাজটি করাননি?" এবং তারপর আমার যে জীবনসংশয় হয়েছিল, উনি যে আমার জীবনসংশয় করার চেষ্টা করেছিলেন, এই কথাটি যদি কেউ ভাবে, তাহলে সে কিন্তু ভুল ভাববে না। তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই কাজটি করেছেন, তা মনে করার মতো কোনো যুক্তি আমি পাইনি। তার প্রমাণ হলো—তারপরে যখন আমি এটা নিয়ে বাজেট পাসের পরে দাঁড়াবার সুযোগ পেলাম, তখন আমি দু'টা কথা শেষ করতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী দাঁড়ালেন, দাঁড়ালেন-বসলেন— এরকম করে আমার লাইট নিভে গেল এবং তিনি বলতে থাকলেন যে, কিছুতে আমাকে বলতে দেয়া যাবে না, এর নাকি কোনো রেওয়াজ নেই। 'রেওয়াজ।' লক্ষ্য করবেন। 'বিধি' না কিন্তু। বিধি হলো এক জিনিস, রেওয়াজ হলো অন্য জিনিস। একটা লোকের জীবন-মৃত্যু সংশয় করে দিয়েছেন আপনি। আপনি তাকে ডিফেন্ড করতে দিচ্ছেন না। এর চেয়ে বড় কোনো অপরাধ হতে পারে? এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি আমাকে তারা মেরে ফেলতো, কিছু তো বলার ছিল না। কেননা, 'মুরতাদের' শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড এবং তিনি সেই আগুনে আরেকটু ঘি ঢাললেন। তিনি বললেন, 'বি চৌধুরী যে অপরাধ করেছে, জাতির কাছে তার ক্ষমা চাইতেই হবে।' এই ধরনের বক্তব্য তিনি দিলেন। আমাকে নিজেকে ডিফেন্ড করা থেকে পর্যন্ত তিনি বিরত করলেন। সংসদে যদি এরকমভাবে মানুষের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত বন্ধ করে দেন স্বয়ং সংসদ নেতা (উনি আবার নিজেকে 'নেত্রী' বলেন না। আমি সেই ভাষায়ই বললাম) তাহলে আপনি সেই সংসদে কেমন করে স্বাধীনভাবে বক্তব্য দেবেন? দেয়া যায় কী? আমার মাইকটা অফ হয়ে গেল এক মিনিটের মাথায়। এটা একবার নয়। এর আগেও অনেকবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেয়ার সময় আমার মাইক অফ হয়ে গেছে। আমাদের নেত্রী সংসদে কম যান, তিনি দাঁড়ানোর পরেও তার মাইকও অফ করে দেয়া হয়েছে। এরপরেও যদি বলেন, 'আপনার কথা বলার পূর্ণ অধিকার সংসদে আছে। আসেন না কেন, বলেন না কেন' এটা কি! এটা এক ধরনের নির্মম রসিকতা। গেলে আপনি কথা বলতে দেবেন না, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেবেন না, যেটা আপনার পছন্দ না, সে ধরনের কথা বললে মাইক বন্ধ করে দেবেন, আবার বলবেন, 'আসেন সংসদে সব কথা হবে।' এটা কেমন

www.pathagar.com

কথা? আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলাম মাত্র। এরকমের অসংখ্য উদাহরণ আছে। এভাবে কেমন করে সংসদ চলবে এত অসত্য ভাষণের মধ্যে?

অসত্য ভাষণ, অশ্লীল কথা, সময় না দেয়া, বিরূপ আচরণ, ক্রুদ্ধ মনোভাব, এইগুলো দিয়ে সংসদ চলতে পারে না। ঠিক এভাবে পানি চুক্তিও তারা আলোচনা করতে দেয়নি। পাত্তাই দিল না। বললো, দরকার কী? এসব চুক্তি আলোচনা হয় না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেন এমন কথা। সংসদের মধ্যে, কার্যউপদেষ্টা কমিটিতে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কমিটিগুলোতেও। এগুলোকে যেহেতু বলা হয় Extension or Parts of the Parliament-সেখানেও কথা সংযতভাবে বলা উচিত। উনি বললেন, 'যা দিয়েছি, দিয়েছি, ব্যস, যান আর হবে না'। এটা কি হলো? এই ধরনের কথা বললে সংসদ কেমন করে চলবে? এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, বাংলাদেশের সংসদে এত বড় বিরোধী দল কখনও ছিল না। আর এই বিরোধী দল এর আগে কয়েকবার সরকারে ছিল। সেই অবস্থায় তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয়প্রতিপন্ন করা হবে জনসমক্ষে? বিশেষ করে জিয়াউর রহমান তাদের প্রধান টার্গেট। জিয়াউর রহমান, যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি— নিজে যুদ্ধ করেছেন; স্ত্রী, সন্তানদের জীবন বাজি রেখে। সেই মানুষকে কতরকমভাবে ছোট করা যায়, হেয় করা যায়, সেই প্রচেষ্টায় এরা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। মনে হয়, এটাই তাদের কাজ, এটাই তাদের প্রধান চিন্তা। টার্গেট নাম্বার টু খালেদা জিয়া। তাঁর সম্পর্কে যে কত অশ্লীল কথা তারা বলতে পারে, সেটা কল্পনা করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তার বাজেট বক্তৃতায় বেগম খালেদা জিয়ার সম্পর্কে অশ্লীল বক্তব্য দিয়েছেন। অত্যন্ত নোংরা ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং উঁচু পর্যায় থেকে এই ধরনের বক্তব্য ও নোংরা ইঙ্গিত আসতে থাকে, তাহলে যদি কেউ বলেন, 'আমি ওখানে বসতে চাই না, তাদের সঙ্গে এক আসনে' তাহলে সত্যিই কি তাকে দোষ দেয়া যায়? আমি তো দোষের কিছু দেখি না।

আপনি রাস্তাঘাটে ঠিক আছে সেখানে জবাব দেয়ার মতো আমাদের বহু লোক আছে। আমাদের জবাব দিতে হবে। আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে অনেকেই আছে, যারা এগুলোর যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে, কিন্তু জাতীয় সংসদে এ ধরনের বক্তব্য আসা উচিত নয়। সেই জন্য জাতীয় সংসদ দিনে দিনে ইনইফেকটিভ হয়ে যাচ্ছে। জিরো হয়ে যাচ্ছে টু বী ফ্রাঙ্ক এবং আমার মনে হয় এরপরে শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন ভদ্র যারা আছেন, তারা আস্তে আস্তে সরে যাবেন বোধহয়, আর যারা আসতে চান ভবিষ্যতে, তারা সংশয়ে থাকবেন— আসবেন কি আসবেন না। আর আমার মতো যারা আছে, তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বলবে, বাবা তোমরা রাজনীতিতে যেয়ো না। ... কাজেই এটা শুধু ইনইফেকটিভ পার্লামেন্টই হয়ে যাচ্ছে না, এটা ভবিষ্যতে কী প্যাটার্নে গিয়ে পৌঁছুবে, তার একটা ইঙ্গিতও বহন করছে। এটা আমাদের বুঝতে হবে। সমগ্র জাতিকে বুঝতে হবে যে, এইভাবে পার্লামেন্ট চালানোর উদ্দেশ্য কী। আমরা খুব হতাশ হই মাঝে মধ্যে। দেখি পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়, 'সংসদে এইরূপ কাদা ছোড়াছুড়ি ভালো লাগে না।'

www.pathagar.com

এইরূপ কাদা "ছোড়াছুড়ি" নয়। আপনি কাদা ছুড়ছেন, আমি কাদা ঠেকাচ্ছি। আমি একটা উত্তরও দেবো না? একজন বললো, 'অনেক খারাপ খারাপ আক্রমণ হয়েছে আমার ওপরে।' শুনে একজন বললো, 'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে, কামড় দিয়েছে পায়', কবিতা আছে না একটা? 'তাই বলে কি কুকুরের পায়ে কামড়ানো মানুষের শোভা পায়'? এই রকম একটা বলে দিলেই পারেন। সাথে সাথে আরেকজন আরও ভালো উত্তর দিলেন : 'দ্যাখেন, ঐসব রবীন্দ্র সঙ্গীত টাইপের মন্তব্য করবেন না। ঐসব জমানা পার হয়ে গেছে। পাগলা কুত্তার সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলে কোনো কাজ হবে না। জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর এইসব কথায় চলবে না। ঐখানটায় বাঁশ দরকার এবং বাঁশ দিয়েই তাকে শায়েস্তা করতে হবে'। তো এখন আমার মতো ভদ্রলোকের পক্ষে বাঁশ নিয়ে কুকুরের পিছনে দৌড়ানো সম্ভবপর নয়। এটা মুশকিল না? এটা রুচির প্রশ্ন। সুতরাং এটা আমরা পারি না। কাজেই সংসদের ইনইফেকটিভনেসের এটাও একটা বড় প্রমাণ।

তারপর হলো, সংসদের পরিচালনার স্টাইল। এটারও মান থাকছে না। Speaker is the most important person in the House, He controls the House. সমস্ত দেশটা চলছে তিনটা শক্তির ওপর। একটা হলো সরকার যা এক্সিকিউটিভ বডি, একটা সুপ্রিম কোর্ট এবং আরেকটা হলো পার্লামেন্ট। যেখানে আইন প্রণয়ন হবে, বাজেট হবে ইত্যাদি। এই তিনটা সম্পূর্ণ ইনডিপেনডেন্ট অব ইচ আদার। প্রধানমন্ত্রী তার অফিস চালাবেন, দেশ চালাবেন, সেগুলো সব ঠিক আছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্পীকারকে চালাতে পারবেন না, তিনি হাইকোর্টকে চালাতে পারবেন না। এটা হলো নিয়ম। এই তিনের ওপর নির্ভর করে দেশের গণতন্ত্র। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কী দেখলাম? যখন স্পীকার আমাকে চান্স দিচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী অ্যাজ লীডার অব দি হাউস তা বন্ধ করে দিলেন এবং Speaker could not conduct the house according to his will. তিনি নিজে আমাকে যে সুযোগ দিয়েছিলেন, সেটা তাকে প্রত্যাহার করতে হলো। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এটা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। ভবিষ্যতে Parliament will be subdued and will be under the Prime Minister. প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলেই তো সংসদকে তার নিজের হাতের মুঠোয় আনতে পারেন না। এটা হয় না তো। এটা হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। যেমন প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলেই সুপ্রিম কোর্টের ওপর কিছু করতে পারেন না। ইচ্ছে করলেই পার্লামেন্টের ওপরও তিনি কিছু করতে পারেন না।

সাংবাদিক : সংসদকে কার্যকর করার প্রায় সবগুলো দরজাই তাহলে বন্ধ হয়ে গেছে, এমনটি বলা যায়?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : হ্যাঁ, আমি কথাটা বলব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। ক্রমাগত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি এখনও একটু একটু আশা করি, হয়ত এই রুগীটিকে এখনও স্যালাইন বা অক্সিজেন দিয়ে বাঁচান যেতে পারে। আমি চিকিৎসক তো—।

www.pathagar.com

সংসদটা পুরোপুরি মৃত পর্যায়ে চলে গেছে— না বলে বলবো, চলে যাচ্ছে খুব দ্রুত এবং একে বাঁচানোর জন্য প্রাণরসায়নগত পরিবর্তন দরকার, স্যালাইন এবং অক্সিজেন দেয়ার শেষ সময় বোধহয় চলে এসেছে। সেখানে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রধান দায়িত্ব হবে স্পীকার সাহেবের। তাঁকে তাঁর পজিশনে থেকে সংসদকে দৃঢ়ভাবে চালাতে হবে। তিনি সংসদ নেতা/নেত্রী দ্বারা পরিচালিত হবেন, এটা ঠিক নয়। তিনি তাঁদের সাহায্য নেবেন— সরকারি দল-বিরোধী দল নির্বিশেষে। এই কথাটি স্পীকার শুধু মনে না রেখে যদি কাজে পরিণত করতে পারেন, তাহলে সংসদ এখনো বাঁচতে পারে। এক। দুই নম্বর হলো, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা যিনি, তাকে তাঁর আচরণে, কথায়, ব্যবহারে, ভঙ্গিতে তাঁর পদের কথা ভেবে সংযত ও মানানসই হতে হবে। তিনি শুধুমাত্র একটি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী– এইরকম আচরণ করলে কোনোদিন এই সংসদের সুন্দর ভবিষ্যৎ আমি কল্পনা করতে পারি না। তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো আচরণ করতে হবে। তিনি আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের অফিসে বা আওয়ামী লীগের জনসভায়। কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি সেক্রেটারিয়েট এবং সংসদে প্রবেশ করবেন, তখন তাকে দেশের স্বার্থ চিন্তা করতে হবে। দেশে বিরোধী দল একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বিরোধী দল ছাড়া কখনও কোনো সরকার চলতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকার চলতে পারে না। অগণতান্ত্রিক সরকারও চলতে পারে না এবং যদি তিনি বিরোধী দলকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন, খুব ভালো। কিন্তু যদি তিনি বিরোধী দলকে উৎখাত করার কথা ভাবেন, তাহলে সেটা গণতন্ত্র নয়। আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, ঠিক আছে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে উৎখাত করার কথা মনের মধ্যে যদি ভেবেও থাকেন, স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নেও ভেবে থাকেন, সেটা একবারেই গণতন্ত্রবিরোধী এবং বাংলাদেশের মাটিতে এই ঘটনা আর কখনো ঘটবে না। বাংলাদেশের মানুষ দেশ স্বাধীন করেছে। বহু চড়াই-উৎরাই অতীতে পার হয়ে এসেছে। সুতরাং, আমি মনে করি যে, সংসদে সংসদ নেত্রীকে সংসদ নেত্রীর মতো আচরণ করতে হবে।

সেখানে খারাপ ব্যবহার, অসভ্য ব্যবহার বা ইঙ্গিত, ভাষাজ্ঞান নেই, সেই ধরনের লোকজনকে ব্যবহার করে বিরোধী দলকে খাটো করার চেষ্টা, জিয়াউর রহমানকে ও খালেদা জিয়াকে ছোট করার চেষ্টা, তাদের পরিবারকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা অথবা আমাদের নেতা-নেত্রীদের ছোট করার চেষ্টা করলে এই লক্ষ্য কখনও অর্জিত হবে না। পার্লামেন্টারি-আনপার্লামেন্টারি বলে কতগুলো ওয়ার্ড আছে। এ সম্পর্কে আমার মনে হয়, সরকারি দলকে অনেক দিন সবক নিতে হবে। কেননা, আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড কী, তাঁরা এখনো বুঝতে পারেনি।"

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং দায়িত্বশীল মন্ত্রীবর্গ বেগম জিয়া সম্পর্কে বিএনপির অন্যান্য নেতা-কর্মী সম্পর্কে, আমার সম্পর্কে, আমার মরহুম পিতা সম্পর্কে যে ধরনের অশ্লীল, অশ্রাব্য কথাবার্তা বলেন, যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেন, তাতে মনে হয়,

www.pathagar.com

পার্লামেন্টারি-আনপার্লামেন্টারি শব্দগুলো সম্পর্কে তাদের আরেকটু বিশদ জ্ঞান থাকা উচিত। প্রথম কথা হলো, আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড কী, জানতে হবে। দ্বিতীয় হলো, এগুলো ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। যদি এসেই যায়, স্পীকারকে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো এক্সপাঞ্জ করতে হবে। তিনি যদি আমাদেরটা সঙ্গে সঙ্গে এক্সপাঞ্জ করলেন আর ওনাদেরটা বললেন, "হ্যাঁ আমি পরে দেখবো, যেখানে যেখানে অসংসদীয় কথা আছে, পরে বাতিল করা হবে।" এটা তো কোনো সঙ্গত কথা হলো না। সুতরাং সংসদ সদস্যদেরও এটা করা উচিত নয় এবং চতুর্থত হলো, যদি সংসদকে ইফেকটিভ করতে হয়, চলমান যতো সমস্যা আছে, বিশেষ করে জাতীয় সমস্যাগুলো আলোচনা করতে দিতেই হবে এবং সময় দিতে হবে। সেখানে চালাকী করে একটা ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আসলেন, এটা হবে না। আমাদের সাথে গত অধিবেশনে আলোচনা করার কথা ছিলো অথচ আলোচনার জায়গায় কী দেখা গেলো? আলোচনা মানে কী? দুই পক্ষই আলোচনা করবে এবং বিরোধী দলকে বেশি সময় দেয়া উচিত। কারণ, তারাই আলোচনাটা চায়। তা না করে যদি সমান সমান দেয়া হয়, উভয়পক্ষ বলার পরে বিষয়টা টকড-আউট হয়ে যাবে, এটাই নিয়ম। সেই জায়গায় আপনি কী দেখলেন? যেটা আমাদের কার্যউপদেষ্টা কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়নি, সেই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত সরকার নিয়ে ফেললেন এবং কার্যপত্রে দেখা গেল, আলোচনার জায়গায় লেখা–"একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনা করিবেন।" ধন্যবাদ প্রস্তাব তো কথা ছিল না। আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই না। সে জন্যই এই আলোচনা চেয়েছি। দেশের যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি, সেটা তো মোটেই ধন্যবাদের উপযুক্ত নয়। আপনি কেন ধন্যবাদ প্রস্তাব আনবেন? কথা ছিল, লেখা ছিল "এই বিষয়টি আলোচনা হইবে।" দ্রব্যমূল্য, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সন্ত্রাস— সব বিষয়ের ওপর আপনি ধন্যবাদ প্রস্তাব আনিয়ে দিলেন। এই যে হিপোক্রেসি, অর্থাৎ মুখে একরকম, আর পেটের ভিতর আরেকরকম— এরকম অবস্থা চলতে থাকলে সংসদের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। এই অভ্যাসটা সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে, স্পষ্ট হতে হবে, ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে এবং এটা না হওয়া পর্যন্ত সংসদ সঠিকভাবে চলতে পারে না। আমার মনে হয়, সরকারি দলের এই সংশোধনগুলো সবচেয়ে জরুরি।

সাংবাদিক : এ অবস্থায় একজন সংসদ সদস্যের এই সংসদে যাওয়ার আর প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আমি যদি বলি, না, আর সংসদে যাওয়া উচিত নয়, তাহলে আপনি দেখুন– এও তো হতে পারে যে, আওয়ামী লীগ এই জিনিসটাই চায়। সুতরাং এই ব্যাপারে স্ট্রেইট উত্তর না দিয়ে আমি বলবো, ওয়েট এ্যান্ড সী।

সাংবাদিক : এবার সংসদ থেকে একটু রাজপথে আসি। রাজপথের আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বিএনপির মধ্যে একধরনের একটা দ্বিধা কাজ করছে। কোথায় যেন একটা সিদ্ধান্তহীনতা, একটা দোদুল্যমানতা, একটা স্ববিরোধিতা কাজ করছে এবং

www.pathagar.com

যে কারণে আন্দোলনের কোনো ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছে না বলে অনেকেই মনে করছেন এটার কারণ কি?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : এই প্রশ্নটা যদি আমি পুরোপুরি এ্যাকসেপ্ট করে নেই, তাহলে বোধহয় সঠিক হবে না। আছে, নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে মাঝে ভুলত্রুটি হয়। সেটা সত্য কথা। কিন্তু ধরেন, আমাদের রোডমার্চের যে কর্মসূচিটি চলছে, সেটা দারুণ সফল হয়েছে। তারপরেই সাথে সাথে বাজেট সেশন এসে গেল। তারপর ঝড়-বৃষ্টি এসে গেল। এগুলো নিশ্চয়ই একটা লম্বা প্রোগ্রামের বাধাস্বরূপ। তারপরেও এর মধ্যে আমরা হরতাল দিয়েছি, বাজেটের ফলোআপে হরতাল দিয়েছি এবং এর মধ্যেও আমরা আরও কিছু রোডমার্চ করছি। একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, বিএনপি আর আওয়ামী লীগ এক নয়। আওয়ামী লীগ যখন নিজের স্বার্থ খোঁজে, দেশের মানুষের স্বার্থ কোনো কিছু তারা বিবেচনা করে না। এই হিসেবে আওয়ামী লীগের যে কার্যক্রম, সেটা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। নিজেদের স্বার্থভিত্তিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য। জনগণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, তাদের জীবনযাত্রা সবকিছু উপেক্ষা করে তারা এখন অগ্রসর হতে পারে। তারা ঐ ধরনের একটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে দেশ এবং দেশের জনগণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারে। ইয়েস, এটা সত্য কথা। এ ধরনের ঘটনা প্রয়োজন কখন? মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে। গণতন্ত্র যখন চিরকাল নির্বাসিত হয়ে যাবে, সেই সংগ্রামে অবশ্যই দরকার হয় এবং আমরা মনে করি আজকে দেশটা সেইদিকে যাচ্ছে বলে আমরা দেশটাকে রক্ষা করার জন্য ভবিষ্যতে আরও অনেক তীব্র কর্মসূচি দেব, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু কতগুলো জিনিস আছে কর্মসূচি দিলেই সাথে সাথে সরকারের পতন হবে, এমন কথা তো ভাবা উচিত নয়। আমাদের কর্মসূচির মাধ্যমে কনট্যাক্ট বাড়বে, জনসংযোগ বাড়বে। কোনো আন্দোলনে, কোনো কর্মসূচির একটি অংশও বৃথা যায় না। এখন কোশ্চেনও তো একটাই যে, আমরা এই কর্মসূচিকে কিভাবে কখন স্পীডআপ করে একটা ক্লাইমেক্সে নিয়ে যাব। আমার মনে হয়, সেটাই এখন আমাদের যারা নেতৃত্বে আছেন, তাদের চিন্তায় আছে এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে সেই পর্যায়ে দেশকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে সেই পর্যায়ের তীব্র আন্দোলন আপনারা দেখতে পাবেন।

সাংবাদিক : আপনার নিজের বক্তব্যেই এসেছে, আওয়ামী লীগ যে ধরনের রাজনৈতিক দল বা সরকার বা যে পদ্ধতি তারা দেশে চালু করেছে এবং যে পরিবেশ তৈরি করেছে, এ অবস্থায় রবীন্দ্র সঙ্গীত মার্কা আন্দোলন দিয়ে এই সরকারকে হটান যাবে না— আপনি স্বীকার করছেন এবং আরেকটি কথা সরকারি দল থেকে বলা হয়েছে যে, আন্দোলন কিভাবে করতে হয়, সেটা নাকি তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে এবং তাদের কাছে মুচলেকা দিয়েই নাকি বিএনপিকে আন্দোলন করতে হবে। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : শোনেন, আমি আগেই বলেছি, জনগণ যাদেরকে বিশ্বমিথ্যুক বলে, তাদের ভাষায় যদি আপনারা বলেন, তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে

www.pathagar.com

হয়। মুচলেকা কে দিয়েছিল? এটা কোনো কথা হলো? আমরা তো বলেছি, যমুনা ব্রিজ দিয়ে আমরা যাবই যাব। তারপর বিএনপির ইচ্ছা, জনগণের ইচ্ছা এবং চাপ তারা সহ্য করতে পারল না। তখন তারা বললো, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনারা যান। তবে দয়া করে একসাথে না গিয়ে একটা একটা করে গাড়ি পার করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আমরা বলেছি, যমুনা ব্রিজ আমাদের করা, এর আশি ভাগ কাজ আমরা করেছি, সব টাকা-পয়সা আমরা দিয়ে এসেছি। সুতরাং যমুনা ব্রিজের জন্য কোনো দয়া বা কোনো মহব্বত আমাদের চাইতে তোমাদের বেশি এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তোমরা নিশ্চিত থাক, যমুনা ব্রিজের ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করলে, সেটা তোমাদের হাতে হতে পারে, আমাদের হাতে হতে পারে না। এর মধ্যে কোন জায়গাটাতে মুচলেকা আছে? মুশকিল এই জন্য তো জনগণ তাদেরকে 'বিশ্বমিথ্যুক' টাইটেল দিয়েছে। মুচলেকার 'ম'ও ছিল না সেখানে।

সাংবাদিক : বিরোধী দলের বর্তমান যে ঐক্য, এটাকে কি আপনি নির্বাচনী ঐক্যে নিয়ে যাবেন, নাকি একটা ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : দেখুন, এটা একটা বেশ সুদূরপ্রসারী ব্যাপার। কিন্তু নিশ্চয়ই ঐক্য ছাড়া এই সরকারকে হটানো যাবে না এবং এই মুহূর্তের দাবি, ঐক্য। যেমন—একটা হিংস্র যদি একটা গ্রামের মধ্যে এসে পড়ে তখন গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার বিভিন্ন বিবাদ থাকতে পারে কিন্তু সেই মুহূর্তে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়। না হলে তো হিংস্র প্রাণীটির হাতে তারা নিহত হবে। এটা একটা সিমিলিমাত্র। এই সিমিলি সব সময়েই প্রযোজ্য যখন দেশ কোনো বহির্দেশ আক্রমণ করে, মুক্তিযুদ্ধ হয় তখন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। এটাও সেরকম। যখন গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে যায়, যখন মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে যায়, যখন দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে না, মা-বোনদের জীবনে নিরাপত্তা থাকে না, যখন অর্থনীতি ভেঙে বাংলাদেশ যখন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যায়, শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়, দেশে একটা দোকানদারের জাতি ছাড়া কিছুই থাকে না, এই পর্যায়ে যখন দেশ চলে যায়, সেখানে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাই কাম্য। অবশ্যই আমরা এজন্য সবরকম ত্যাগ স্বীকার করব এবং এজন্য প্রয়োজনীয় যতো পদক্ষেপ নেয়া যায়, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা সেগুলো নেব।

সাংবাদিক : কিন্তু ঐক্যবদ্ধ প্রধান বিরোধী দলগুলোর এক প্লাটফর্মে আসার সময় কি হয়নি এখনো?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : প্লাটফর্মতো হয়েই গেছে। হ্যাঁ, চূড়ান্তভাবে নেতৃবৃন্দ কবে, কখন বসবেন এক সাথে, সেটা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে নির্ধারিত হবে। প্লাটফর্মতো এক হয়েই গেছে। আমার মনে হয় প্লাটফর্মের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সম্মিলিত সংগ্রাম যেটাকে বলছেন নির্বাচন পর্যন্ত, সেটাতো ডেভলপড করার প্রশ্ন, সেগুলোতে একটা পর্যায়ে আসবে। কিন্তু অবশ্যই এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, চূড়ান্ত ঐক্যের

www.pathagar.com

মাধ্যমে, প্রয়োজন হলে সবচাইতে ঘনিষ্ঠতম ঐক্যের মাধ্যমে হলেও এই সরকারকে আমাদের হটাতে হবেই।

সাংবাদিক : আর একটা কথা প্রচলিত আছে সেটা হলো, আওয়ামী লীগে সবাই একপন্থী; কিন্তু বিএনপিতে নাকি উদারপন্থী, কট্টরপন্থী, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি এরকম নামের বহু বিভক্ত পক্ষ কাজ করছে। আসলে বিএনপিতে এরকম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিপক্ষের, উদারপন্থী-কট্টরপন্থীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে কি?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : শহীদ জিয়াউর রহমান যখন দলটি গঠন করেন, তিনি বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্রবিরোধী, তাদের বাদ দিয়ে সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, মুষ্টিমেয় যারা গণতন্ত্রবিরোধী তারা বাদ যাবে, এ ছাড়া যতো মানুষ আছে, যারাই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে, তাদের সবাইকে নিয়ে একটা দল গঠন করতে এবং সেই জন্য তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে, যারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে, তাদের সবাইকে নিয়ে বিএনপি গঠন করেছিলেন। তার মানে হলো এই, পাহাড়ের লোক, সমতলের লোক এবং মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাইকে একটা প্লাটফর্মে দাঁড় করাতে পারে একমাত্র একটি জাতীয়তাবাদ, সেটা হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ বাংলাদেশী বললে পাহাড়ের লোকের আপত্তি থাকবে না, সমতলের লোকদেরও আপত্তি থাকবে না। মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কারোরই আপত্তি থাকবে না। কিন্তু বাঙালি বললে পাহাড়ের লোকদের যেমন আপত্তি থাকে, তেমনি সমতলের লোকদেরও আপত্তি থাকে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বললে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের কারোর কারোর আপত্তি থাকবে। সেই জন্য এটা একটা সুন্দর বৈজ্ঞানিক দর্শন, যার মাধ্যমে বিএনপি ও জনগণকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন— এখানে যারাই দেশকে ভালোবাসে, গণতন্ত্রকে ভালোবাসে, দেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাখবে এবং অন্য দেশের অধীনে বাংলাদেশ কখনও থাকবে না, এই মতবাদে যারা বিশ্বাসী— তাদের সবাইকে তিনি একটা প্লাটফর্ম দিয়েছিলেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্লাটফর্ম। এখন সমস্ত দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে লাগানোটাই হলো আমাদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় হলো, জিয়াউর রহমানের সময়ে এবং তার পরবর্তী পর্যায়েও আপনি যে বললেন, ঐ উদারপন্থী আর কট্টরপন্থী (মানে অনুদারপন্থী)— এই ধরনের কোনো গ্রুপের কথা আমি জানি না, আমরা জানতাম না। এগুলো হলো একশ্রেণীর সংবাদপত্রের সৃষ্টি, আমার সন্দেহ যেসব সংবাদপত্র আমাদের ঐক্য চায় না, তাদের সৃষ্টি। এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট। ব্যক্তিগতভাবে কে কাকে পছন্দ করে না, সেটা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। সেটা খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট কিছু না। কিন্তু নীতিগতভাবে বিএনপির মধ্যে এ ধরনের কোনো পার্থক্য আছে, এটা সত্যি কথা নয়।

www.pathagar.com

সাংবাদিক : ট্রানজিট-করিডোর নিয়ে বর্তমানে বেশ তোড়জোড় চলছে। ভারতকে এই করিডোর দেয়াটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত বা আদৌ দেয়া যায় কিনা?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : এটা তো আমরা স্পষ্ট ভাষায় অনেকবার বলেছি। ট্রানজিট হয় একদেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য। ভারত থেকে বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতে পৌঁছানো— এটা তো ট্রানজিট হবে না। ভারত থেকে বার্মায় যাওয়ার জন্য ট্রানজিট চান— ইয়েস। এটা বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু ভারত থেকে ভারতে যাওয়ার জন্য ট্রানজিট হবে কেন? এটা করিডোর, এটা তো হতেই পারে না। এটা অবৈধ জিনিস। সেজন্য এটার সপক্ষে কোনো যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না।

সাংবাদিক : আরেকটা প্রসঙ্গ। এই যে তালেবান খোঁজার নামে বাংলাদেশে একটা তাণ্ডব হয়ে গেল, বিভিন্ন মাদ্রাসায় হানা দিয়ে একটা হুলস্থুল কারবার। শামসুর রাহমানের বাসায় সংঘটিত একটা তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরে তারা এখন ধুয়া তুলছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষাটাকেই বন্ধ করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : এটা খুবই একটা জঘন্য অন্যায় বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশে তালেবান আছে বা ছিল— এটা কখনও কিন্তু আমার মনে হয়নি। চিন্তা-ভাবনায়ও কখনও উদিত হয়নি। যে তালেবান আফগানিস্তানে আছে, যে তালেবানের ভয়ে বিল ক্লিনটন আমেরিকাতে কাঁপে— চিন্তা করেন, সেই তালেবান বাংলাদেশে ঢুকে গেছে ছুরি হাতে, একজন কবিকে হত্যার জন্য— এটা নিছক কল্পনাপ্রসূত মনে হয় আমার কাছে। তবে শুধুমাত্র কল্পনাই এটার মধ্যে আছে, নাকি কোনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্র আছে— সেটাও আমাদের সিরিয়াসলি চিন্তা করতে হবে। সিরিয়াসলি চিন্তা করতে হবে এই জন্য যে, মাদ্রাসার বিরুদ্ধে এরা যেভাবে লেগেছে তাতে দু'টি জিনিস আছে। একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার জন্য লেগেছে বিভিন্ন অজুহাতে। অন্যদিকে তারা বলছে যে, ইসলাম এবং মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে তারা কত বড় উদার! আপনারা সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য শোনে অবাক হয়ে যাবেন। আসলে বাংলাদেশের মুসলমানরা অত্যন্ত ধর্মভীরু ও ধর্মপ্রাণ। এই জিনিসটাই ওদের মনে বারেবারে পীড়া দেয়। আমাদের দেশে ধর্মীয় শিক্ষা, বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা সঙ্কোচন করার যে চেষ্টা, আমি মনে করি সেটা একটা সজাগ প্রচেষ্টা এই সরকারের এবং এটা একসিডেন্টাল নয়। এটার ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র অবশ্যই আছে এবং তাদের ভিতরে যে মোনাফেকি, সেটা এর মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে। ধর্মকে এই সরকার যেভাবে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে, এর নজির অন্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টি দেখায়নি। তাদের প্রধান নেত্রীর সেই নির্বাচনী তসবিহ, মাথায় হেজাব– এগুলো তো সঠিক ছিল না। এগুলো আপনারা চিন্তা করে দ্যাখেন, টেলিভিশনে দেখেছেন— তসবিহ টিপতে টিপতে সঠিক শপথ গ্রহণ করছেন— এইগুলো রাজনৈতিক স্টান্ট। আমি না, এ ব্যাপারে যারা বেশি শিক্ষিত— আমাদের মাওলানা সাহেবরা কী বলেন, তাদের কাছে প্রশ্ন করবেন যে এটা কিসের মধ্যে পড়ে। এটা "মোনাফেকি" কী না।

www.pathagar.com

যা হোক, এসবের পরেও একদিকে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তারা অত্যন্ত ইসলাম পছন্দ দল, ইলেকশনের আগে তাদের নেত্রীর হেজাব-তসবীহসহ মোনাজাতের চেহারা ইত্যাদির মাধ্যমেও যেটা তারা প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছে।

অন্যদিকে তারা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার জন্য যে মাথায় হেজাব পরা হয়েছিল, সে মাথাতেই আবার দেখা যায় অন্য ধর্মীয় হাতে তিলক গ্রহণ করতেও কোনো কুণ্ঠা নেই। দিস ইজ হিপোক্রেসি। আমাদের রীতি, আচরণ এবং সংস্কৃতি আমাদের কোনো মহিলাকে এমনকি কোনো পুরুষকেও কখনো তিলক গ্রহণ করতে পারমিশন দিতে পারে না। সত্য কথা এটা এবং সেজন্যই কেউ যদি তিলকও ধারণ করে, আবার পট্টিও লাগায় তারপর ধর্মের জন্যও কাঁদে, আবার ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীনতার কথাও বলে, দিস ইজ এ বিগ সেলফ কনট্রাডিকশন এবং আমার মনে হয়, সেজন্যই এই মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারটা আরও অনেক সিরিয়াসলি দেখতে হবে যে, এর পেছনে আসল ষড়যন্ত্রটা কী? আমার মনে হয়, এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। এদেশ থেকে, এদেশের মানুষের কাছ থেকে ইসলামিক সংস্কৃতির প্রতি যে আকর্ষণ, সেটাকে মুছে ফেলার চক্রান্ত শুরু করা হয়েছে। এই মাদ্রাসা শিক্ষা এখন অনেক আধুনিক। এখান থেকে পাস করে এখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবই হওয়া যায়। এ ব্যাপারে কোনো কুসংস্কার থাকা উচিত নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে অনেকে বিসিএস এ্যাটেন করছে, রিসার্চ করছে, ডক্টরেট করছে। এখান থেকে অনেকে হাফেজ হচ্ছেন। এই হাফেজরা না থাকলে আমরা কোথায় যেতাম? আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই শিক্ষায় শিক্ষিতজনের প্রয়োজন। সুতরাং এই শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত ও মজবুত করতে হবে। আরও সময় উপযোগী সংহত ও জনপ্রিয় করতে হবে। ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আমাদের সরকার আসলে আমরা এ ব্যাপারে আরও পদক্ষেপ নেব।

সাংবাদিক : বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য এই মুহূর্তে প্রধান সমস্যা বা প্রধান শত্রু কী বা কারা বলে আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : দেখুন, আমি মনে করি, সার্বভৌমত্বটার মানেটা হলো আমার দেশ আমি চালাব, অন্য কোনো দেশের হুকুমে চালাব না। এই কথাতেই এর উত্তরটা আছে। যে সরকার বা যে দল অন্য দেশের হুকুমের, অন্য দেশের সন্তুষ্টির অপেক্ষায় বসে থাকে, সেই সরকার বা দল সার্বভৌমত্বের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সার্বভৌমত্ব যখন চলে যাবে, স্বাধীনতা যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। সিকিম-মনিপুরের উদাহারণ আছে এক্ষেত্রে। সুতরাং যদি অন্য দেশের অর্থাৎ দিল্লীতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশে ছাতা তোলা এটা খারাপ কথা। আগে যেমন ওয়াশিংটনে বা মস্কোতে বৃষ্টি হলে কেউ কেউ ছাতা তুলতো। এরা আসলে কেউ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সপক্ষ শক্তি নয়।

সাংবাদিক : সম্প্রতি আওয়মী লীগের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা কর্তৃক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক দখলের ঘটনা কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

www.pathagar.com

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আওয়ামী লীগ নেতার ব্যাংক দখলের প্রক্রিয়া ভবিষ্যতের জন্য অশনি সঙ্কেত বহন করে। এ ধরনের রীতিবহির্ভূত ও সন্ত্রাসী পদ্ধতিতে ব্যাংক হাইজ্যাকের ঘটনা এর আগে কখনও কোথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। আওয়ামী সরকারের আমলে আজকে দেশে সন্ত্রাস কোন পর্যায়ে নেমে এসেছে এটা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা আইন হাতে তুলে নিয়ে, আইনের কোনোরকম তোয়াক্কা না করে যে উদাহরণ সৃষ্টি করলেন তাতে জনগণের মনে প্রবল সন্দেহ জেগেছে দেশে কোনো সরকার আদৌ আছে কি-না। 'পুলিশ স্যালিউট দিলো খুনি আসামিকে' শিরোনাম এসেছে একটি পত্রিকায়। এই সরকারের আমলে এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও চূড়ান্ত ব্যর্থতার একটি 'হিন্দি ফিল্মের' এপিসোড হিসেবে চিহ্নিত হবে। স্বভাবতই মানুষ শঙ্কিত–এরপর আরও কী হবে? আমরাও শঙ্কিত এবং এ ব্যাপারে জনগণকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি। এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনো লাভ হয়নি, হবে না।

সাংবাদিক : বিরোধী দলের আন্দোলনে সরকারের দমননীতির অংশ হিসেবে অতি সম্প্রতি একটি পত্রিকা অফিসে হামলা ও এই ঘটনায় জড়িয়ে আনোয়ার জাহিদের মতো প্রবীণ নেতাকে গ্রেফতার এবং এসব দমননীতি ও নির্যাতন মোকাবিলা ও ট্রানজিট-করিডোরের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে আপনারা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন? আজ সচিবালয় ঘেরাওয়ের পর কী ধরনের কর্মসূচি আসতে পারে?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : যে কোনো সংবাদপত্রের ওপর যে কোনো হামলা, সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়াও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ আমি নীতিগতভাবে বিরোধিতা করি। উল্লিখিত সংবাদপত্র অফিস আক্রমণের ঘটনাটি সাজানো নাটক বলে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন। জনাব আনোয়ার জাহিদ মিছিলের প্রথম ভাগে অনেক আগেই পার হওয়ার পর সরকারি সন্ত্রাসীরা গণমিছিলে আক্রমণ করে। অথচ প্রবীণ জননেতা আনোয়ার জাহিদকে গ্রেফতার করা হলো সন্ত্রাসের অভিযোগে। এ ব্যাপারে এবং ট্রানজিট নামে করিডোর চুক্তির প্রতিবাদে আজ তীব্র গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে। দেশনেত্রীর 'রোডমার্চ' কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশ আজ একাত্ম হয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনে শরিক হচ্ছে। বিভিন্ন মিছিল, প্রতিবাদ সভা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ (শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবীগণসহ) আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর '৯৯ দেশনেত্রীর আহ্বানে সচিবালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের বড় কর্মসূচিতে জনগণ এগিয়ে আসবে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায়-চতুর্দিকে এই সম্ভাবনার লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট। এর মাধ্যমে গণবিক্ষোভ আরও তীব্রভাবে প্রকাশ পাবে। আমরা আশা করি, বিএনপি ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আরও তীব্র ও প্রত্যক্ষ কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন।

www.pathagar.com

বিচারপতি হাবিবুল ইসলাম ভূইয়া

জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

ডেটলাইন ঃ ১২ জুলাই ১৯৯৯

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আচার-আচরণ, কথা-বার্তায় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ একেবারেই অনুপস্থিত। তারা যে কোনো ক্ষেত্রে কি সংসদে, কি মাঠে-ময়দানে, কি সেমিনারে যেখানেই বক্তব্য রাখছেন আক্রমণাত্মক মনোভাব একে অপরের প্রতি। কারো মধ্যে সহনশীলতা নেই। আমি নিজে একজন রাজনীতিবিদ। আমি দেশের কল্যাণের জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য একটা রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আবার আমারই মতো আমার আরেকজন রাজনৈতিক সহকর্মী তিনি একটা ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী। তিনিও দেশের মঙ্গলের জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য, দেশের উন্নয়নের জন্য তার রাজনৈতিক আদর্শ মতো কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের মতের এবং পথের বিভিন্নতা থাকতে পারে, তাই বলে আমাদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না, আমি তাকে শ্রদ্ধা করব না, তিনি আমাকে শ্রদ্ধা করবেন না, তার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল না থাকতে পারে, তার মতো সম্পর্কে এবং তার সম্পর্কে কথা বলতে গেলে তাকে গালাগালি করতে হবে, তাকে হেয়প্রতিপন্ন করতে হবে, তাকে ছোট বানাতে হবে, তার দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করতে হবে, তার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন নিয়ে বিশ্রী মন্তব্য করতে হবে, এই যে একটা অপসংস্কৃতি রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেছে, তা আমাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি বিপন্ন মনে করছি আমাদের রাজনীতিকে।

দেশে একটা সুস্থ রাজনীতি গড়ে তুলতে হলে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা থাকতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়েরই নিয়ম-নীতি আছে। খেলাধুলার কথা ধরলে যেমন বক্সিং খেলা। বক্সিং খেলায় ঘুষি মেরে নাক ভেঙে দেয়া যাবে, মাথা ফাটিয়ে দেয়া যাবে কিন্তু কোমরে যে বেল্ট বাঁধা থাকে তার নিচে আঘাত করা যাবে না। এটাকে বলা হয়, One can't hit below the belt। তেমনি রাজনীতির অঙ্গনে আপনার মতের সঙ্গে আমার মিল নেই, আপনার মতটা সঠিক নয়, আপনি একটা ভ্রান্ত পথে চলছেন, আপনার ম্যানিফেস্টো ঠিক নয়, আপনি দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না বা আপনার সে যোগ্যতা নেই অথবা আপনি ব্যর্থ হয়েছেন—এ কথাগুলো বলার জন্য বাংলাভাষায় অনেক সুন্দর, সহনশীল, সুশীল ও তীক্ষ্ণ বাক্য আছে। ভদ্রভাবে কথা বলা যায়, ভদ্রভাবে সমালোচনা করা যায়, ভদ্রভাবে একজনের ব্যর্থতা তুলে ধরা যায়, ভদ্রভাবে, সুন্দর ভাষায় একজনের নীতি যে ভুল, তার

www.pathagar.com

কাজ যে জনগণের কোনো কল্যাণে আসছে না এগুলো বলা যায়। কিন্তু আমরা রাজনীতিবিদরা কি ব্যবহার করছি; কি ভাষা ব্যবহার করছি?

সংসদ কার্যপ্রণালীতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শুধু জুনিয়র এমপি সাহেবরা নন, আমাদের বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিনিয়র এমপি এবং মন্ত্রী আছেন, যাদের ভাষা আক্রমণাত্মক, তারা রুচিহীন-অশোভন ভাষা অবলীলায় ব্যবহার করে যাচ্ছেন। একটা যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রত্যেকের মাঝে বিরাজ করছে। এই সংস্কৃতিটা যদি চলতে থাকে তাহলে কোনো দিন আমরা কোনো বিষয়ে একত্রিত হতে পারব না; একমত হওয়া দূরে থাক। তাই যারা রাজনীতি করেন তারা সমাজেরই অংশ, সমাজ বিচ্ছিন্ন কোনো জীব নন। আমাদের বন্ধু-বান্ধব আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, সামাজিকতা আছে, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি আছে, আমরা সেখানে রাজনীতিবিদরা একত্রিত হতে পারি, আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে, আলাপ-আলোচনা হতে পারে। কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা হওয়ার ক্ষেত্র লাগবে। আপনি যদি সারাক্ষণ আমাকে গালাগালি করে কথা বলেন বা আমি যদি আপনাকে সব সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং আক্রমণাত্মক ভাষায় আপনার সম্পর্কে বক্তব্য রাখি তাহলে স্বভাবতই যখন কোনো একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে, আমাদের মধ্যে ঐ মিল-মহব্বত বা ঐ আন্তরিকতা থাকবে না। থাকার কথা নয়। রাজনীতিতে আমাদের একটা সহনশীল মনোভাব গড়ে ওঠা দরকার। ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত মনীষী বলেছেন, 'আমি তোমার মতের সঙ্গে একমত নই, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের যে অধিকার তা সংরক্ষণের জন্য আমি জীবন দিতে প্রস্তুত'– এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি যা ভাবছেন সেটা আপনার বলতে পারাটা একটা অধিকার। এসবকে বলতে হবে মৌলিক অধিকার। আমাদের দেশের সংবিধানে এ কথাগুলো লিপিবদ্ধ আছে। আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে যে, আমি যে মতে বিশ্বাসী সে মতটা প্রকাশ করার অধিকার আমার থাকবে এদেশে। এটাই স্বাধীনতা, এটাই সভ্যতা, এটাই গণতন্ত্র। একজনের মত ভুল হতে পারে, আপনি তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারবেন না। আপনি তাকে বলতে পারবেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মত বল আমি শুনব। তোমার মত যে ঠিক নয়, আমিও সেটা বলব। আমি তোমার মত প্রকাশে বাধা প্রদান করব না। এটাকে আমরা সভ্যতা, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার বিভিন্ন নামে বলে থাকি।

আমি যে বিষয়টি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন সেটি হচ্ছে– আমাদের রাজনীতিতে আচার-আচরণ সুশীল নয়। আমি সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ নই। ঘটনাচক্রে রাজনীতিতে আমার আগমন। প্রায় ৯ বছর হয়ে গেল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাদের দেশে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে যাতে অসংখ্য নেতাকর্মী আছেন, আমি সর্বতোভাবে মনে করি এবং বিশ্বাস করতে চাই যে, আমরা সবাই দেশের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা এবং পারস্পরিক

www.pathagar.com

শ্রদ্ধাবোধ কেন থাকবে না? আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে কত লোক আছেন, পেশাজীবী আছেন, আইনজীবী আছেন, বুদ্ধিজীবী আছেন, প্রত্যেকেই নিজ-নিজ অবস্থান থেকে আমরা দেশের কল্যাণে, দেশের উন্নয়নে কিছু কিছু অবদান রাখছি। বিশেষ করে রাজনীতিবিদরা। রাজনীতিবিদদের মতো এত বেশি ব্যাপকভাবে দেশের এবং জনগণের কল্যাণে সময় কেউ দিচ্ছেন না। রাজনীতিবিদগণ সার্বক্ষণিকভাবে দেশের কল্যাণ, জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। কিভাবে দেশের কল্যাণ হতে পারে, জনগণের ভাগ্যের উন্নয়ন হতে পারে, এটা নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করেন। সেহেতু তারাই বেশি অবদান রাখেন। এখন একটি দল বা দলভুক্ত রাজনীতিবিদগণ যদি মনে করেন যে, আমি এবং আমার দল ছাড়া আর বাকি অন্যান্য দল ও দলের নেতাকর্মীরা দেশপ্রেমিক নন, তাহলে এটা ভুল। আমাদের একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি মনে হয় পাকিস্তান আমল থেকেই চলে আসছে, বিশেষ করে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ প্রবণতা বেশি যে আমি ছাড়া এবং আমার দল ছাড়া অন্য যে সব দল আছে তারা দেশদ্রোহী, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম নেই, তাদের সমস্ত কাজ জনগণের বিরুদ্ধে, তাদের কথায় জনগণের কোনো মঙ্গল হবে না– এরকম একটা মনোভাব। এটাকেই আমি মনে করি এটা অসুস্থ চিন্তা, অসুস্থ পথ। এই পথ পরিহার না করলে আমাদের দেশে সুস্থ রাজনীতি গড়ে উঠবে না। এ বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ রয়েছে। কারণ, এ সবের ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি এবং দেশের ভবিষ্যৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। যেমন আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন। এর মধ্যে একটা বড় সমস্যা, কি নাগরিক জীবনে কি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামে-গঞ্জে সেটা হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস এমন একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ কঠিন। সন্ত্রাস জাতিকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। সন্ত্রাস কে করছে? আমি বলি ঐ দল করছে, ঐ দলের লোকরা বলছে আমার দল করছে। আমি যদি ক্ষমতায় থাকি তাহলে বলি যে বিরোধীদলীয় লোকেরা সব সন্ত্রাস করছে। আমি যদি বিরোধী দলে থাকি তখন বলি সরকার সন্ত্রাসীদের লালন করছে। এখন উভয় রাজনৈতিক দল যারা সরকারে আছে এবং বিরোধী দলে আছে তারা খোলা মন নিয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দেশের কল্যাণের জন্য এই সন্ত্রাস দমনে বা সন্ত্রাসী কে, কারা, সেকি আমার দলের লোক না অপর দলের লোক আলোচনা করে চিহ্নিত করা দরকার। আন্তরিক মন নিয়ে যৌথ উদ্যোগ না নিলে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা যাবে না, সন্ত্রাসও দমন করা সম্ভব হবে না। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ ধরনের কল্যাণধর্মী মনোভাব গড়ে না উঠলে আমার মনে হয় আমাদের দেশের সন্ত্রাস নামক ইন্ডাস্ট্রিটা শনৈ শনৈ উন্নতি লাভ করবে। কারণ সন্ত্রাস যারা করছে তারা কোনো এক পক্ষ নয়, উভয়পক্ষেরই মদদ পাচ্ছে। উভয়পক্ষ যদি আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়, শুধু এক পক্ষ দেয় তাহলে সন্ত্রাস কিছুটা থাকতে পারে। আমি যদি সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় না দেই

www.pathagar.com

আপনি দিলে সন্ত্রাস পুরোপুরি থাকতে পারবে না, কিছুটা থাকবে, যতটুকু আপনি প্রশ্রয় দিলেন অতটুকু থাকবে। সমপরিমাণ বিরোধিতা তো আমার কাছ থেকে আসবে। সুতরাং সন্ত্রাস কখনো পরিপূর্ণ রূপ লাভ করবে না। আর আমরা যদি উভয় দল, উভয় দল বলতে আমি বিরোধী ও সরকারি দলের অবস্থান এবং সর্বদল বুঝাচ্ছি। সরকার ও প্রধান বিরোধী দল ছাড়াও দেশে ছোট ছোট অসংখ্য দল আছে। তারাও হয়ত সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেন। আমরা যারা রাজনীতি করি আমরা সবাই মিলে সন্ত্রাস মোকাবিলা করতে পারি। রাজনীতিবিদরা একটা কমিউনিটি। আইনজীবী, পেশাজীবী তাদের যেমন একটা গোষ্ঠী, রাজনীতিবিদরাও একটা গোষ্ঠী। তারাও সমস্যা সমাধানের বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। এই মনোভাবের অভাব লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে।

আমাদের ছোট দেশ, অগণিত জনসংখ্যা। দিনকে দিন এ জনসংখ্যা বাড়ছে। আমাদের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ ছোট একটি ভূখণ্ডের মাঝে বিরাট একটা জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর কিভাবে উন্নতি হবে, এ নিয়ে রাজনীতিবিদরা ভাবছেন অবশ্যই, কেউ বসে নেই। কিন্তু ব্যতিক্রমগুলো হচ্ছে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নেই।

আমরা সরকারি এবং বিরোধী দল

পারস্পরিক ভুল, ত্রুটি, সার্থকতা, ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে যখন আলাপ-আলোচনা করি এবং আমরা যে একটা সভ্য জাতি, আমরা ভদ্রলোক, আমরা অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আমাদের মাতৃভাষা একটা সমৃদ্ধ ভাষা, এর ভিতরে যে অন্যের সমালোচনা এবং বিরোধিতা করার সুশীল শব্দ আছে তা আমাদের রাজনীতিবিদদের কথাবার্তায় একেবারেই প্রমাণিত হয় না। উল্টো প্রমাণিত হয় যে, বাংলা ভাষা এরকম একটা ভাষা, যাতে নিম্নস্তরের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ দিয়ে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সমালোচনা করা সম্ভব নয়। কোনো বিদেশী যদি বাংলা ভাষা শেখে, তবে আমাদের বক্তব্য বিবৃতি শুনে তার মনে হবে বাংলা ভাষাটা বুঝি এরকমই, এভাবেই বাংলা ভাষায় আলোচনা-সমালোচনা করতে হয়।

আমাদের দেশে রাজনীতিকদের মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো ধরনের মেলামেশাই নেই। কোনো একটা সমস্যা হলে আমরা একমত হতে পারি না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় যে কোনো বিষয় নিয়েই আমরা একত্রে বসে আলাপ-আলোচনা করতে পারছি না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এবং হতাশাব্যঞ্জক কথা। আমরা কোনো কিছুতেই একমত হতে পারি না— সেটা যতো বড় ইস্যুই হোক না কেন। আমাদের কোনো কিছুই সেটেল্ড নয়।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়েও আমরা সকলে একমত নই। আমাদের এই উদারতাটুকু পর্যন্ত নেই যে, একজন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, একজন স্বাধীনতা যুদ্ধ

www.pathagar.com

করলেন— এই যে স্বীকৃতি, রাজনৈতিক কারণে আমরা এ স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত। আমরা দিতে পারি না, দিতে চাই না, দিলে না জানি কি হয়ে যায়– এরকম একটা মনোভাব। মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরেও এখন কত রকম গ্রুপ হয়ে গেছে, নানা রকমের গ্রুপ, তারা একমত নয়। এভাবে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা রাজনীতিবিদরা একটা উদার-মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারছি না। আমরা ক্রমশঃই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে অত্যন্ত দ্রুত সঙ্কীর্ণতার ভিতর জড়িয়ে যাচ্ছি।

পার্লামেন্টের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, শব্দের ব্যবহার, শব্দ চয়ন ও বাক্য বিনিময় কি রকম! একে অপরের প্রতি অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করছেন। যে সকল দেশে সংসদীয় রাজনীতি চলে সেখানে সংসদীয় ভাষা বলে একটা কথা আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে Perliamentary Language । এর অর্থ হচ্ছে, সংসদে সব সময় সুশীল ও বিনয়ী ভাষা ব্যবহার এবং ভদ্র আচরণ করা। যেমন, একটা কটু কথা যদি কেউ বলেন এটাকে বলা যায়, Ueperliamentarian language ব্যবহার করা। শুধু ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয় আচরণের ক্ষেত্রেও Parlamantarian behaviour বলে একটা কথা আছে। পার্লামেন্টে গেলে সেখানে ভদ্র, রুচিসম্মত ভাষার ব্যবহার এবং আচরণ করতে হবে। আমাদের পার্লামেন্টে দেখা যায়, সিনিয়র লিডাররা পর্যন্ত তাদের প্রতিপক্ষের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। আক্রমণাত্মক এবং অশোভন উক্তি, এমনকি অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত এ সংসদে চলছে। ফলে সংসদ কার্যত একটা গালাগালি ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের অভয়রাণ্যে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রতি সংসদে আক্রমণাত্মক, অশালীন, রুচিহীন, অমার্জিত, শিষ্ঠাচারবর্জিত ভাষা প্রয়োগ ও আচার-আচরণ মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। সংসদ সদস্য কামরুন্নাহার পুতুল, রাশেদ মোশাররফ সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেত্রী সম্পর্কে সম্প্রতি সংসদে যে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ উক্তি করেছেন, তা এদেশের সংসদীয় ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সংসদীয় আচার-আচরণ ও সংসদীয় ভাষা পরিহার করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে জনগণ রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপে শুধু যে হতাশ হচ্ছেন তা নয়, তারা বীতশ্রদ্ধও হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কোনো ভদ্রলোক সংসদ সদস্য হতে চাইবেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিরোধীদলীয় নেত্রী তো একজন ব্যক্তি নন শুধু, একটা ইনস্টিটিউশন। প্রধানমন্ত্রীত্ব যেমন একটা ইনস্টিটিউশন, আমাদের দেশে সাংবিধানিকভাবে বিরোধীদলীয় নেত্রী তেমন গুরুত্বের দাবি রাখেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে কোনো বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা, বিতর্ক, বিরোধিতা আছে। একজন কথা বলেছেন দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে যদি প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়ান, সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে প্রাধান্য এত বড় যে, তাকেই কথা বলতে দেয়া হবে। এটা সংসদীয় রীতি। এ রীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সংসদীয় গণতন্ত্র।

www.pathagar.com

তেমনি বিরোধীদলীয় নেত্রী যদি উঠে দাঁড়ান সংসদে তাকে বক্তব্য দিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর পরেই বিরোধীদলীয় নেত্রীর অবস্থান। একজন মন্ত্রী, তিনি যদি বিরোধীদলীয় নেত্রী সম্পর্কে শোভন বাক্য ব্যবহার না করেন অশোভন উক্তি করেন—তা হলে যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা ভবিষ্যতে পার্লামেন্টের মেম্বার হয়ে আসবেন তিনি কি শিখে সংসদে ঢুকবেন? তিনি কি দেখবেন? তিনি দেখবেন যে, আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতারা বিরোধীদলীয় নেত্রীকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করছেন। আমরা এই যে একটা অবস্থা সৃষ্টি করছি, তা যুগ যুগ ধরে রয়ে যাবে, সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসবে না, সুস্থ রাজনীতি হবে না—যদি এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা না করি এবং নিজেদেরকে না শুধরাই তা হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। অতএব, আমাদেরকে শুধরাতে হবে, শুধু আমাদের নিজেদের জন্য নয়—আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদি বিশৃঙ্খলা, অপসংস্কৃতি থাকে তাহলে সমাজের অপর কোনো অঙ্গনেই কোনো শুভ প্রতিক্রিয়া থাকবে না, কোনো ভালো অবস্থান কখনো থাকবে না। কেননা, রাজনীতিটাই গোটা সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতি গোটা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন, রাজনৈতিক অঙ্গন, যদি সুন্দর না হয়, সুশীল না হয়, সভ্য না হয়, ভালো কিছু রেখে যেতে না পারে, ভালো কোনো অনুকরণীয় নিদর্শন স্থাপন না করতে পারে, ভালো কোনো আদর্শ রেখে না যেতে পারে, তাহলে সে জাতির কল্যাণ সম্ভব নয়। সে জন্যই রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে, রাজনীতিবিদদের আচার-আচরণ সম্পর্কে কথা বলার, আলোচনা করার সময় এসেছে শুধু তাই নয়, আমি বলব, সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া

জাতীয় সংসদের এখতিয়ার ও স্পীকারের দায়িত্ব

ডেটলাইন ঃ ৮ নভেম্বর ১৯৯৯

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকার পরিচালনায় সরকারের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা গ্রহণ ও সব কর্মের স্বচ্ছতা গণমানুষের কাছে তুলে ধরার মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে সংসদীয় গণতন্ত্রে জাতীয় সংসদ। আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সরকারি কর্মকাণ্ড ও বিরোধী দলের কর্মসূচি নিয়ে সংসদে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করলে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হত্যা, বোমাবাজি, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ সকল অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে এদেশের অধিকার বঞ্চিত অগণিত মানুষকে রক্ষা করে তাদের ন্যূনতম বাঁচার অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তাসহ আইনের শাসন কায়েম করা সম্ভব হতো। আমাদের জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী পাঠ করে এবং টেলিভিশন ও রেডিওতে ধারাবিবরণী শুনে সংসদীয় গণতন্ত্র, জবাবদিহিতামূলক সরকার, সুশাসন ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী জনগণ অনেকটা হতাশায় ভুগছে। প্রতি দু'মাস অন্তর অন্তর সংসদ অধিবেশন আহ্বান আমাদের সংবিধানে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ঘন ঘন সংসদ অধিবেশন আহ্বান সংবিধানে এ জন্যই রাখা হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই সংসদে যাচাই-বাছাই করা যায়। দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, জাতীয় সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা পাবে বলে জাতি যে প্রত্যাশা করেছিল, সে দিকনির্দেশনা থেকে জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। রুচিহীন বক্তব্য, কুৎসা রটনা, অশ্লীল ভাষার ব্যবহার, পরস্পরকে আক্রমণ, জাতীয় স্বার্থবিরোধী অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিতর্ক, চ্যালেঞ্জ, যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রকাশ ও অশালীন ভাষায় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করে জাতীয় সংসদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় বিনষ্ট করা হয়েছে। ফলে জাতি বঞ্চিত হয়েছে কিভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়, বিদ্যুৎ ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা যায়, কি পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, কিভাবে বর্তমান এ কম্পিউটারের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব, কিভাবে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা যায়, কিভাবে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যায়, কিভাবে শিশু নির্যাতনের হাত থেকে সমাজ রক্ষা করা যায়, কিভাবে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা দেয়া যায়, কিভাবে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি, কিভাবে জাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে— এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার ও বিরোধী দলের যুক্তি-তর্ক ও মতামত থেকে। জাতীয় সমস্যা সমাধানে সরকার ও বিরোধী দলের কি দিকনির্দেশনা রয়েছে সেসব বিষয়ে জাতীয় সংসদে সুষ্ঠু পরিবেশে যুক্তি-তর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই জনগণ বুঝতে

www.pathagar.com

পারত কোন্ রাজনৈতিক দল দেশের বিরাজমান সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম এবং সেভাবেই তারা জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারত।

জাতীয় সংসদ সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার কেন্দ্রস্থল। আইন প্রণয়ন, আইনের শাসন কায়েম, গণতন্ত্র বিকাশে ও জাতীয় সমস্যা সমাধানে জাতীয় সংসদের ভূমিকা সর্বাধিক। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ জাতির চালিকাশক্তি, জাতির বিবেক, এমনকি রাষ্ট্রপতির শাসনেও সংসদ রাষ্ট্র পরিচালনায় এক গুরুদায়িত্ব পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম থাকলেও রাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিনিধি পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদের আস্থা হারালে সরকারের পতন হয়। সংসদের ভোটে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাচ্যুতির বিধানও রয়েছে। সিনেটের এবং House of Representative ভোটেই রাষ্ট্রপতির ইম্পিচমেন্ট হয়।

দেশের সংবিধান এবং জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদ পরিচালনার দিকনির্দেশনা রয়েছে। এসব দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে স্পীকার সংসদের কার্যাবলী পরিচালনা করেন। সংসদ কার্যাবলী পরিচালনায় স্পীকার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। সংবিধানে তাই বলা হয়েছে, সরকার ও বিরোধী দলের ভোট সমান না হলে স্পীকার সংসদে কোনো বিষয়ে ভোট প্রদান করতে পারেন না। স্পীকার যদিও কোনো দল কর্তৃক মনোনীত হয়ে স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত হন, তথাপি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দল থেকে পদত্যাগ করলেও তার পদ ও মর্যাদা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগৃহ ইংল্যান্ডে স্পীকার পদটিকে নিরপেক্ষ ও দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখার বৃহত্তর স্বার্থে সাধারণত পার্লামেন্টের নির্বাচনেও স্পীকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। অতীতে পাকিস্তান আমলে জাতীয় সংসদে স্পীকার তমিজউদ্দীন খান স্পীকারের মর্যাদা ও নিরপেক্ষতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার স্বার্থে সর্বোচ্চ আদালতে পর্যন্ত লড়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক স্পীকার সাহেদ আলী স্পীকারের নিরপেক্ষতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে অকাতরে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্পীকারের রুলিং সংসদে Substantive motion ব্যতীত চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নেই। স্পীকার সংসদে কোনো সিদ্ধান্ত বা রুলিং প্রদানে কোনো কারণ দর্শাতে বাধ্য নন। সংসদ বিতর্কে সর্বাবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা স্পীকারের মূল দায়িত্ব। স্পীকার এ নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে সবসময় বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং দলীয় রাজনীতিতে নিজেকে জড়িত করেন না।

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রী, সংসদের অভিভাবক স্পীকার এবং বিচার বিভাগের প্রধান প্রধান বিচারপতি। আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে তিনটি বিভাগের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করা আছে। সংবিধানে এক বিভাগের কাজে অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। প্রত্যেক বিভাগই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন। তাই কোনো

www.pathagar.com

বিভাগের কার্যক্রম অন্য বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করার সুযোগ নেই, যদি নির্বাহী বিভাগকে সংসদকে জবাব দিতে হয়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত হতাশার সাথে লক্ষ্য করছি, আমাদের দেশের মাননীয় স্পীকার তার কিছু সিদ্ধান্তে তার নিরপেক্ষতা নিয়েও সংসদে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। স্পীকার তার কোনো সিদ্ধান্তে বিতর্কিত হয়ে উঠলে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং স্পীকারের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে সুস্থ সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। Impartiality of the speaker is an indispensable condition of the successful working of parliament.

সিলেটের এক রেলওয়ে স্টেশন উদ্বোধন নিয়ে স্পীকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাঝে দলীয় রাজনীতির আধিপত্যের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় তার বিশদ বিবরণও ছাপা হয়েছিল। সে সময় স্পীকার বলেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কারও নির্দেশ মানতে প্রস্তুত নন। মাননীয় স্পীকার তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে সংসদকে নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিছুদিন আগে জাতীয় সংসদে স্পীকার বিরোধী দলের উপনেতা ডাঃ প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আপত্তির মুখে সে অনুমতি প্রত্যাহার করে মাইক বন্ধ করে দেন। যদিও Substantive motion ব্যতীত স্পীকারের বিরোধী দলের উপনেতা বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি প্রদানকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেত্রীর ছিল না। অথচ প্রধানমন্ত্রী-সংসদ নেত্রীর অবৈধ প্রতিবাদের মুখে স্পীকার বঞ্চিত করলেন বিরোধী দলের উপনেতাকে তার বক্তব্য দেয়ার অধিকার থেকে এবং স্পীকারের শব্দটিকে নির্বাহী প্রধান প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ একটি বিভাগ বলে প্রমাণ করলেন। স্পীকারের এ আচরণ সংসদের মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। বৃটেনের পার্লামেন্টে আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের আলোকে বৃটেনের পার্লামেন্টে ১৯৬৩ সালের ২৩ জুলাই রিজুইলেশন পাস করে, যাতে কোনো বিতর্কের প্রশ্নোত্তর পূর্বে মোশনে বিচারাধীন বিষয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা না করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যাবলী বিধি ২৭০(১) বিধিতে বলা হয়েছে, কোনো সদস্য বক্তৃতকালে (১) বাংলাদেশের যে কোনো অংশের কোনো আইন আদালতের বিচারাধীন কোনো বিষয় উল্লেখ করবেন না। ২৭০(৩) বিধিতে কোনো আলোচনা যথাযথ ভাষায় লিখিত বাস্তবভিত্তিক না হলে রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারকের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষের সমতুল্য কোনো মন্তব্য করবেন না।

শুধু বিচারাধীন বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত করা হয়নি, জাতীয় সংসদের বিতর্কে এমনকি সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারকের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষের সমতুল্য মন্তব্যও করা যাবে না বলে বলা হয়েছে। এ বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও মাননীয় স্পীকার

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে বিচারাধীন মামলায় জামিন সংক্রান্ত ব্যাপারে অশালীন, রুচিহীন, যুক্তিহীন বক্তব্য প্রদানে সুযোগ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সম্বন্ধে শুধু অশালীন বক্তব্য দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দম্ভ করে ঘোষণা করেছেন, জাতীয় সংসদে সদস্যদের privileges-এর সুযোগে তিনি কি কি বিষয়ে বক্তব্য দিতে পারেন তা তিনি ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারপতির বিরুদ্ধে অমার্জিত, অশালীন, রুচিহীন, কদর্যপূর্ণ বক্তব্য দিতে বেছে নিয়েছেন সংসদের পবিত্র কক্ষকে এবং স্পীকার জাতীয় সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির ২৭০ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে বিধিবহির্ভূত বক্তব্য প্রদানে অনুমতি প্রদান করেছেন।

ইদানীং বিএনপির টিকিটে জাতীয় সংসদ নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সরকারের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ আলাউদ্দিন ও উপমন্ত্রী জনাব স্বপনের সংসদ সদস্যপদ নির্বাচন কমিশন বাতিল ঘোষণার পর জনমনে স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে মারাত্মক সন্দেহ ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সংসদ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়েছেন। তিনি জাতীয় পার্টি থেকে জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং জাসদের একমাত্র সংসদ সদস্য জনাব আবদুর রবকে মন্ত্রিপরিষদে স্থান দিয়ে তার আবিষ্কৃত ঐকমত্যের সরকারের রূপরেখা উপহার দিলেন এ দেশবাসীকে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সরকারি দল ও বিরোধী দলের অবস্থানে আঘাত হানলেন ঐকমত্যের সরকারের Concept প্রদান করে। যদিও তার ঐকমত্যের সরকারে সংসদে ১১৬টি আসন বিজয়ী বিএনপি এবং তিন আসনে বিজয়ী জামায়াতে ইসলামী এবং পরবর্তীতে এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির অধিকাংশ সংসদ সদস্য যোগদান থেকে বিরত রয়েছে। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস উচ্ছেদ, দুর্নীতি দমনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো জাতীয় ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টা না চালালেও জাতিকে ঐকমত্যের সরকার উপহার দিয়েছেন তিনি। ঐকমত্যের সরকারে বিএনপি যোগদান না করায় বিএনপিকে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি বিএনপির পেছন সারির দুই এমপিকে বাগিয়ে নিয়ে মন্ত্রীর পদ প্রদান করে তার ঐকমত্যের সরকারের পরিপূর্ণ রূপ প্রদান করে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন। মাননীয় স্পীকার প্রধানমন্ত্রীর এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলার জন্য বিএনপি থেকে নির্বাচিত ডাঃ আলাউদ্দিন ও জনাব স্বপন বিএনপি প্রদত্ত সরকারবিরোধী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করে আওয়ামী সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হয়েছে কিনা তা বিবেচনার জন্য নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। স্পীকার জাতীয় সংসদে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে রুলিং দিলেন, বিএনপি থেকে নির্বাচিত ডাঃ আলাউদ্দীন ও জনাব স্বপন বিএনপির কর্মসূচির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

মন্ত্রিসভায় যোগদান করা সত্ত্বেও সংবিধানের ৬৬(৪) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে না। ৬৬(৪) বলা হয়েছে "কোনো সংসদ সদস্য তাহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হয়েছেন কিনা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্য-সদস্যার আসন শূন্য হইবে কিনা, সে সম্পর্কে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।"

বিএনপি সংসদে বারবার আবেদন করেছেন স্পীকারের নিকট ডাঃ আলাউদ্দিন ও জনাব স্বপনের বিষয়টি সংবিধানের ৬৬(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্বাচন কমিশনে পাঠাবার জন্য। স্পীকার তার ক্ষমতাবলে রুলিং দিয়েছেন বিএনপির শেখ হাসিনার ঐকমত্যের সরকারে যোগদান করার কোনো সিদ্ধান্ত না থাকলেও ডাঃ আলাউদ্দীন ও জনাব স্বপন সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর তাদের সংসদ সদস্য পদ নিয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দেয়নি। তাই ৬৬(৪)-এর অধীনে তা নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশনে পাঠাবার প্রশ্ন ওঠে না। স্পীকারের রুলিং-এ বিএনপি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। স্পীকারের এ রুলিং চ্যালেঞ্জ করা হলো সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ স্পীকারের রুলিং সংবিধানের ৬৬(৪) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন বলে রায় দিলেন এবং বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ৬৬(৪)-এর অধীনে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে স্পীকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলেন। আপিল বিভাগের ৫ জন বিচারপতি সর্বসম্মতিক্রমে হাইকোর্ট-এর রায়কে বহাল রেখে স্পীকারের আপিল খারিজ করলেন এবং বিষয়টি সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। অনেক তালবাহানার পর মাননীয় স্পীকার সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নিয়ে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করলেন। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে নানা প্রশ্ন বিরোধী দল উত্থাপন করলেও নির্বাচন কমিশন ডাঃ আলাউদ্দিন ও জনাব স্বপনের সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করেছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগের জন্য বিরোধী দল আন্দোলনে থাকলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের আলোকে ডাঃ আলাউদ্দীন ও জনাব স্বপনের সদস্যপদ বাতিল করে নির্বাচন কমিশন প্রমাণ করলেন স্পীকারের রুলিং ছিল সংবিধানের ৬৬(৪) অনুচ্ছেদ ৭০ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

স্পীকার পদটি নিরপেক্ষ। স্পীকারের নিরপেক্ষতা প্রশ্নাতীত। তাই স্পীকারকে কোনো সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ নেই Substantive motion ব্যতীত। একমাত্র সংবিধান প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম আর সবই সংবিধানের অধীন। সংবিধান ব্যাখ্যার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে কিনা তা নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দেবেন এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কিন্তু বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের এখতিয়ার স্পীকারের।

www.pathagar.com

স্পীকার তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন তা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ডাঃ আলাউদ্দিন ও জনাব স্বপনের সংসদ সদস্যপদ বাতিলের মধ্যদিয়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। স্পীকার তার এ সিদ্ধান্তের ব্যাপার নির্বাহী প্রধান ঐকমত্যের সরকারের ধারক ও বাহক প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছেন কিনা সে বিতর্কে না জড়িয়েও বলা যায়, নির্বাচন কমিশন অন্তত একটি ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে সংবিধানের ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সাহায্য করেছেন। স্পীকার এ ব্যাপারে রুলিংটি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিবেকবান নাগরিকগণের বিবেক নাড়া দিয়েছে; তারা হতাশায় ভুগছেন, নিরুৎসাহিত হয়েছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যথার্থ বলেছেন, স্পীকারের নিরপেক্ষ আচরণ ব্যতীত সংসদ অধিবেশনে যোগদান করে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব নয়। স্পীকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় স্পীকার পদটি বিতর্কিত হয়ে উঠেছে এবং মহান জাতীয় সংসদকে হেয়প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। জাতীয় সংসদ জাতির বিবেক সংসদীয় সরকারের সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যাচাই-বাছাইয়ের কেন্দ্রস্থল। মাননীয় স্পীকারের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ শুধু স্পীকার ও জাতীয় সংসদের মর্যাদাকেই আঘাত করেনি, সুশাসন (Good Governmance) প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় সৃষ্টি করছেন। সর্বোচ্চ আদালতে ইদানীং কয়েকটি মামলায় স্পীকারের দায়িত্ব পালন নিয়ে এটর্নি জেনারেলও যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন। স্পীকার কার্যত তার আচরণের মাধ্যমে বিরোধী দলের মনে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে, জাতীয় সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার তেমন কোনো সুযোগ নেই। সংসদ নেত্রী ও সরকারি দলই তাদের আচরণে প্রমাণ করছেন সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার সুযোগ সীমিত। সরকার প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পর জনমতের চাপে জাতীয় সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপন করে। এভাবে স্পীকার ও সরকার জাতীয় সংসদকে কার্যত অকার্যকর করে ফেলেছেন।

ডাঃ আলাউদ্দীন ও স্বপনের মতো Back Bencher-দের ডিগবাজি খাবার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বছরের সেরা চমক দেখাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন হয়ত বিএনপির প্রথম সারির এমপিদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী তার চমক সৃষ্টি ও ওয়াদা পূরণ করবেন এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম জিয়াকে দুর্বল করে ফেলবেন। কিন্তু শেখ হাসিনা সে চমক আর দেখাতে পারলেন না।

সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিপরিষদের প্রত্যেক সদস্য সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য Collective Responsibility-এর আওতাধীন। কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনার ঐকমত্যের সরকারের মন্ত্রী জনাব আবদুর রব ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু চট্টগ্রাম পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে সরকারের সাথে একমত পোষণ না করেও ঐকমত্যের সরকারের মন্ত্রিসভায় বহাল তবিয়তে রয়েছেন। Collective

www.pathagar.com

Responsibility-এর দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারের রীতিনীতি ভঙ্গ করে ঐকমত্যের সরকারের ন্যায় সংসদীয় গণতন্ত্রে নবধারা সৃষ্টি করেছেন। এ জাতীয় ধারা সৃষ্টি জবাবদিহিতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিতকে মারাত্মকভাবে নাড়া দিয়েছে। এর পরিণাম ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হতে পারে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, বহু ত্যাগ-তীতিক্ষার পর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতায় ও খামখেয়ালী আচার-আচরণ ও কার্যকলাপে যেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে না পড়ে এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস না পায়। সরকারি দলের সাথে সাথে বিরোধী দলের ভূমিকাও দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক হতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল ছায়া সরকার। ছায়া সরকারকে তাদের বিকল্প কর্মসূচি জনগণকে জানাতে হবে।

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সুযোগ্য সদস্যদের বক্তৃতা জাতীয় টেলিভিশন ও রেডিও বাংলাদেশে আমরা অহরহ শুনতে পাচ্ছি। তদন্তাধীন বিষয়ে তদন্তকার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিরোধী দলকে দায়ী করে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ জাতীয় দায়িত্বহীন বক্তব্যের পর তাদের অধীনস্থ পুলিশ বিভাগ কর্তৃক কোনো জঘন্যতম অপরাধের তদন্ত নিরপেক্ষ হবে কিনা এ ব্যাপারে সচেতন বিবেকবান নাগরিকদের মনে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ দেখা দেয়া কি অস্বাভাবিক, নাকি তদন্তকারী সংস্থা তাদের কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট করার মানসে তদন্ত কার্য পরিচালনা করবেন তা ভেবে দেখতে হবে।

জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় পদবীর দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ও বিবেকবান না হলে নির্বাচিত সরকারের কোনো কার্যকারিতাই থাকে না। ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন কায়েম ও সুস্থ সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে ও সুশাসন কায়েমের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল বাধা-বিপত্তি অবসান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় গণতন্ত্র বিকাশের সাধারণ গতি ব্যাহত হবে, সভ্যতা, মানবতা ও মানবাধিকার চরম হুমকির সম্মুখীন হবে এবং ইনসাফের হাত থেকে মজলুমেরা বঞ্চিত হবে।

www.pathagar.com

২০০০ সালের মধ্যেই শেখ মুজিব হত্যা মামলার রায় কার্যকর করতে হবে- এ সময় বেঁধে দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি আইন ও বিচার বিভাগের প্রতি হুমকি প্রদর্শন ও চাপ সৃষ্টি করছেন না? তিনি কি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায়কে কার্যকর করার দাবি জানিয়ে তাড়াতাড়ি শুনানির কথা বলছেন না। এ দাবি কিসের আলামত। ১৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী বন ও পরিবেশমন্ত্রী বেগম সাজেদা চৌধুরী বিচারকদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'যদি আদালত অবমাননাও হয় তবু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ভয় পান না। আদালত অবমাননার দায়ে বহু লোক জেলে ঢুকবে। আওয়ামী লীগের লাখ লাখ নেতাকর্মী এ জন্য প্রস্তুত। তিনি বিব্রতবোধকারী বিচারকদের সরিয়ে দিয়ে যারা ন্যায়বিচার করতে পারেন এমন বিচারপতি উচ্চতর আদালতে বসানোর জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির প্রতি আহ্বান জানান।' একজন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসেবে তিনি জেনেশুনে আদালত অবমাননা করে লাখ লাখ আওয়ামী লীগের কর্মী জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত– এ ঘোষণা দিয়ে আদালতের বিচারকার্য পরিচালনায় বিচারকগণ যে স্বাধীন যে সাংবিধানিক ক্ষমতাকে কি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলেন না? তার এ বক্তব্য কি বিচার বিভাগের প্রতি চরম হুমকি ও চাপ প্রয়োগের আওতায় পড়ে না? ক্ষমতাসীন দলের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রীর এ বক্তব্য আদালতের অস্তিত্বকে কি বিপন্ন করে দেবে না? তার ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের কর্মীবাহিনী আদালতকে অবজ্ঞা করলে দেশে কি অরাজকতা সৃষ্টি হবে না? সর্বত্র সবাইকে কি পছন্দসই বিচার ও বিচারকের দাবি জানাবে না? এরপর কোনো বিচারক কি তাদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের রায় প্রদান করার সাহস পাবেন?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাঠি মিছিলের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, লাঠি কোথায় কখন ব্যবহার করতে হয় তা আওয়ামী লীগের সদস্যরা জানে এবং সময় হলে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে দ্বিধা করা হবে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ মাননীয় মন্ত্রীর এ বক্তব্য আওয়ামী লীগের কর্মীদের আইন হাতে নিয়ে বিচারকদের মাথায় লাঠি মারতে অনুপ্রেরণা যোগাবে না কি? আইনের প্রতি সম্মানের একি নমুনা দেখাচ্ছেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা। সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা করবেন।' মাননীয় মন্ত্রীদের উপরোক্ত বক্তৃতা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের বিচার বিভাগকে সহায়তা করতে কতটুকু অনুপ্রাণিত করবে? বিচার বিভাগের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বিচারক ও বিচার বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিচার বিভাগের মান-মর্যাদা এভাবে ক্ষুণ্ন করা হলে বিচারের রায় অমান্য করার প্রবণতা দেখা দিবে কিনা। এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। এ সব কর্মকাণ্ড আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে কিনা বিচার

www.pathagar.com

রেফারেন্সটি ক্রমিক তালিকা পরিবর্তন করে আগে শুনানির আবেদন করলে মাননীয় বিচারপতিগণ দুবছর আগের রায়ের ডেথ রেফারেন্স শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে-এ কারণে এ মামলাটি যথারীতি শুনানির কথা বলে বাদীপক্ষ তাড়াতাড়ি শুনানি করতে চাইলে অন্য বেঞ্চে যাবার পরামর্শ দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী অন্য বেঞ্চে শুনানির জন্য আবেদন করলে ঐসব বেঞ্চ ডেথ রেফারেন্সের নির্ধারিত বেঞ্চে বা Senior বেঞ্চে যাবার পরামর্শ দেন। হাইকোর্টের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্সের শুনানি অনুষ্ঠিত করা যায়নি। পরবর্তীতে বাদীর আইনজীবীদের আবেদনক্রমে প্রধান বিচারপতি ডেথ রেফারেন্স শুনানির জন্য বিচারপতি আমিরুল কবীর চৌধুরী এবং বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল আজিজের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে প্রেরণ করেন। বিচারপতি আমিরুল কবীর চৌধুরী শুনানি শুরু করার পর মামলাটি শুনানির ব্যাপারে বিব্রতবোধ করেন জানিয়ে মামলাটি অন্য কোনো বেঞ্চে শুনানির জন্য বলেন। এ বিব্রতবোধ করার ঘটনা নিয়ে বিচার বিভাগের ওপর যে কলঙ্কজনক আক্রমণ চালানো হয় এবং বিচার বিভাগ সম্পর্কে যে অনভিপ্রেত মন্তব্য করা হয় তা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এক বা একাধিক বিচারপতি কোনো মামলায় বিব্রতবোধ করলে সে মামলার শুনানি থেমে যায় না। এমতাবস্থায় প্রধান বিচারপতির নির্দেশে অন্য বিচারপতিগণ মামলা শুনানি করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ডেথ রেফারেন্স মামলার প্রথম একজন বিচারপতি এবং লাঠি মিছিলের পর দু'জন বিচারপতি বিব্রতবোধ করেছেন। বিবেকের বাধ্যবাধকতায় বিচারক সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার করতে পারবেন না বলে মনে করলে বিব্রতবোধ করতে পারেন। পৃথিবীর সব দেশে বিচারকের বিব্রতবোধ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের দেশেও অতীতে অনেক মামলায় বিচারকদের বিব্রতবোধ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। দু'একজন বিচারক ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিব্রতবোধ করলে সমগ্র বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের নেতৃত্বে লাঠি মিছিলের কথা আইনের শাসনে বিশ্বাসী কেউ কল্পনাও করতে পারেন না।

শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও প্রভাবমুক্ত বিচারের ব্যাপারে কোনো মহল থেকে কোনো উচ্চবাচ্য উচ্চারিত না হলেও সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিরাপত্তা দেয়ার ঘোষণা দিয়ে মুজিব হত্যার বিচারক জেলা ও দায়রা জজ গোলাম রসুলকে বিচার চলাকালীন নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল বলে ঘোষণা দেয়ায় জনমনে এ রায়ের ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয়া অস্বাভাবিক নয়। জেলা জজ গোলাম রসুল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিলেন কিনা, না স্বইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে অতি উৎসাহী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এ নিরাপত্তা বিচারককে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছিল কিনা এ প্রশ্ন জনমনে দেখা দেয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

www.pathagar.com

'৭২ সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন বলে বলা হয়েছিল। চতুর্থ সংশোধনীর সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশ বিলুপ্ত করে নিয়োগের ক্ষমতা 'রাষ্ট্রপতিকে' দেয়া হয়। '৭২ সংবিধানে বিচার বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের বদলি, পদোন্নতি, ছুটি সবই সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের এ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির নিকট ন্যস্ত করা হয়। অর্থাৎ অধস্তন আদালত ও সুপ্রিম কোর্টে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয় এবং এভাবেই বিচার বিভাগের করুণ পরিণতি ঘটেছিল বেসামরিক নির্বাচিত সরকারের হাতে। বহুদলীয় গণতন্ত্র ধ্বংস, জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকার কিভাবে স্বৈরাচারী সরকারে রূপান্তরিত হতে পারে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত গণতান্ত্রিক বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ আওয়ামী লীগ থেকে একদলীয় বাকশালে পরিণত করে গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালো অধ্যায় রচনা করল শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ সরকার। তাই ইতিহাসের বাস্তবতার নিরিখে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে মূল্যায়ন করতে হবে।

যে দলটি ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করেছিল সে দলটি ২০০০ সালে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে লাঠি মিছিল করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের রাজাকার আখ্যায়িত করে অপসারণের দাবি জানাচ্ছে।

শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার ও বিচারের রায় সম্পর্কে কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্ব কোনো বক্তব্য বা মন্তব্য প্রদান করেননি। কোনো মহল থেকেই এ বিচার বা রায় নিয়ে কোনো বিতর্কের অবতারণা হয়নি। শেখ মুজিবুর হত্যার বিচারক জেলা ও দায়রা জজ জনাব গোলাম রসুল বিচারকার্য চলাকালীন জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বা কোনো মহল থেকে তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন-এ কথা কেউ কখনও বলেননি। আসামি পক্ষ থেকে এ জাতীয় কোনো প্রশ্নও উত্থাপিত হয়নি। বিচার চলাকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী এবং নেতৃবৃন্দ আসামিদের ফাঁসি দাবি করে মিছিল করেছেন। বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন। যেসব আইনজীবী বিচার শুরু হবার পূর্বে আসামিদের ফাঁসির দাবি করে আইনজীবী নিযুক্ত করেন এবং রাষ্ট্রই এ জন্য খরচ বহন করে থাকেন।

প্রচলিত নিয়মানুসারে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার রায়টিও ডেথ রেফারেন্স হিসেবে যথারীতি বিচারের জন্য হাইকোর্টের দৈনন্দিন কার্যতালিকায় ৩০ (ত্রিশ) নং ক্রমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। বাদী পক্ষের আইনজীবী এই ডেথ

www.pathagar.com

দান করা হইল।" চতুর্থ সংশোধনীতে সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪৪ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়।

"মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ-এ ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংসদ আইনের দ্বারা একটা সাংবিধানিক আদালত, ট্রাইব্যুনাল অথবা কমিশন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন।" অর্থাৎ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের জনগণের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়।

৭২-এর সংবিধানের ৯৫ (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ করিবেন। চতুর্থ সংশোধনীতে ৯৫(১) অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হয়।

"৯৫(১) প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করার যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল তা বিলুপ্ত করে বিচারক নিয়োগে প্রেসিডেন্টকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। একই পদ্ধতিতে সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদেরও পরিবর্তন করে সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া" শব্দগুলো বিলুপ্ত করে সর্বময় ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ওপর অর্পণ করা হয়।

'৭২-এর সংবিধান ৯৬(২) অনুচ্ছেদ 'প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসমর্থের কারণে সদস্যের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।

চতুর্থ সংশোধনীতে ৯৬(২) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (২) দফা প্রতিস্থাপিত হয় ঃ "অসদাচরণ বা অসমর্থের কারণে রাষ্ট্রপতির আদেশ ছাড়া কোন বিচারককে তাহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিচারককে তাহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাহাকে অপসারিত করা যাইবে না" এবং ৯৬(৩) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়। বিচারকদের অপসারণে সর্বময় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয় চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। ১৯৭৮ সালে অসদাচরণ বা অপসারণের কারণে বিচারকগণের অপসারণের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাদের নিয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হয়। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা বিচারককে তার পদ থেকে অপসারিত করার বিধান করা হয়।

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া

বিচার বিভাগের সাংবিধানিক মর্যাদা

ডেটলাইন ঃ ১৩ মে ২০০০

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা মানব সভ্যতার মাপকাঠি। যে রাষ্ট্র বা সমাজ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সক্ষম সে সমাজ বা রাষ্ট্রই মানব সভ্যতার ইতিহাসে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আইনের শাসন কায়েম ব্যতীত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক ও নৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার। মানব সভ্যতা, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনই ন্যায়বিচার তথা মানবাধিকার নিশ্চিত করার মূল চাবিকাঠি।

বিচার ব্যবস্থাকে আঘাত না করে আইনের শাসনকে ধ্বংস করা যায় না। তাই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শাসনে বিশ্বাসীরা বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কারণ সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা তথা আইনের শাসনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শাসনের কোন সুযোগ নেই। বিচার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে গেলে জনগণ ইনসাফ বা সুবিচার থেকে বঞ্চিত হলে সমাজে অরাজকতা ও মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের শত্রুরা এ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করতে কখনও কার্পণ্য করেন না।

গণতন্ত্রের উত্থান-পতনে এ দেশে বিচার বিভাগ ও সংবিধানের ওপর মারাত্মক আঘাত এসেছে বারংবার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধানের ওপর প্রথম আঘাত হানা হয় ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় গণতন্ত্রের স্থলে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে ভিন্ন দল ও মত প্রকাশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে। সংবিধানের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করা হয় ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে ছিল (১১) "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র। যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" "চতুর্থ সংশোধনীতে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"-শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধির স্থলে তদানীন্তন আওয়ামী বাকশালী সরকার প্রতিটি বৃহৎ জেলায় জেলা গভর্নর নিয়োগ করেন। এভাবেই গণতন্ত্রের ভিত ভেঙে চুরমার করা হয় চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে।

৭২-এর সংবিধানের ৪ অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার বলবৎ করলে বলা হয় ৪৪ (১) "এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করিবার অধিকার নিশ্চয়তা

www.pathagar.com

পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালী বিধিতেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষ করার সমতুল্য বক্তব্য রাখার বিরুদ্ধে পরিষ্কার বাধা-নিষেধ আছে। সর্বোপরি জনজীবন সংক্রান্ত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত যে কোন ব্যক্তিকে বক্তব্য রাখার সময় স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে, এমনকি নিজের পদমর্যাদার কথাও বিবেচনায় রাখিয়া ভাষা প্রয়োগ করিতে হয়।

তাই হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের ওপর ঘন ঘন বিরূপ আক্রমণ চালাইবার বিষয়টি রীতিমত দুশ্চিন্তার বিষয়। গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট নিয়া খেলা আগুন নিয়া খেলার শামিল। কোর্ট আদালতের ক্ষমতার রক্ষক যে শুধু জজ-বিচারক তাহা নহে। নিজেদের প্রয়োজনেই আইনজীবীসহ সার্বিকভাবে জনসাধারণও কোর্ট-আদালতের ক্ষমতার রক্ষক। সরকারী কর্মচারীরাও দুর্বল হইয়া পড়িবে। তাই পুলিশী ক্ষমতার জোরে যাহারা হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টকে দুর্বল বা অসহায় মনে করিতেছেন তাহারা মারাত্মক ভুল করিতেছেন।

সবারই জানা, কোর্ট-আদালতের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা খর্ব না করিয়া কোথাও কেহ স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। তাই কোর্ট-আদালতের বিশেষ করিয়া হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষাকে কেহ গণতন্ত্রের ভাষা হিসেবে দেখিবে না।

অতীতকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের দেশে হিংসা-বিদ্বেষ আর অসহনশীল রাজনীতি প্রশ্রয় পাইতেছে। পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করিতে গিয়া ১৯৭৪ সালে দিল্লী স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বঙ্গবন্ধু কি বলিয়াছিলেন, উহার উদ্ধৃতি দিয়াই লেখাটি শেষ করিতেছি। "..... the Prime Minister of Bangladesh had declared with regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971 that he wanted the people to forget the past and to make a fresh start, stating that the people of Bangladesh knew how to forgive."

www.pathagar.com

মৌলিক অধিকার থাকারই বা সার্থকতা কি? সব ব্যাপারে অসহনশীল হওয়া গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য কাম্য নয়।

আমি এই ব্যাপারে একমত যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এককভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নয়, অন্যান্য মন্ত্রণালয়েরও ভূমিকা রহিয়াছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বহুলাংশে নির্ভর করে। রাজনৈতিক অসহনশীলতার মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা মোটেই সহজ নয়। কোর্ট-আদালতের সহযোগিতাও প্রয়োজন।

অপরাধ সংঘটিত হইবার পরই বিচারের প্রশ্ন আসে। কিন্তু খুন-খারাবির মতো মারাত্মক অপরাধ যাহাতে কেহ করিতে সাহস না পায় তাহার জন্য অপরাধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার গুরুত্ব তো অনেক বেশি। ইহা ছাড়া, পুলিশ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত করিতে না পারে তাহা হইলে কোর্ট কাহার বিচার করিবে? সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে বা রাজনৈতিক কারণে পুলিশ যখন প্রকৃত অপরাধীদের ধরিতে ব্যর্থ হয় তখন কি ইহা বলা যায় না যে, এইসব অপরাধী সন্ত্রাসীরা বিনা বিচারেই 'মুক্তি' পাইয়া গিয়াছে? দলীয় রাজনীতির নামে বড় বড় সন্ত্রাসীরা যে আইন-কানুনের ঊর্ধ্বে থাকিতে পারিতেছে তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সরকার হাইকোর্টকে দুর্বল করিতে চাহিলেই হাইকোর্ট দুর্বল হইবে না। হাইকোর্টের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র প্রদত্ত। শাসনতন্ত্র অকার্যকর করিতে না পারিলে হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অক্ষুণ্নই থাকিবে। আর শাসনতন্ত্র অকার্যকর করার অর্থ যে সরকারের শাসনতান্ত্রিক বৈধতা অকার্যকর করা তাহা তো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই।

একটি কথা স্মরণ রাখিলে সবাই ভালো করিবেন- কোন কাজটি বা বক্তব্যটি আইন ও শাসনতন্ত্রসম্মত সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু মন্ত্রী-মিনিস্টারদের নাই, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে। পার্লামেন্টে প্রদত্ত বক্তব্য, বিশেষ করিয়া যখন সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দেওয়া হয়, তখন সেই বক্তব্যের শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত দিক দেখার ক্ষমতা বিচারপতিদের একেবারেই নাই তাহা বলা ঠিক হইবে না। সবকিছু নিয়া হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইবার জন্য আমি এই কথা বলিতেছি না। এমন অনেক সমস্যা আছে যাহাদের সমাধান জনমত ও রাজনীতির পথে খোঁজাই শ্রেয়।

ইহা কাহারও পক্ষে মনে করা ঠিক হইবে না যে, পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া তিনি যে কোন ধরনের বক্তব্য রাখিয়া আইন ও শাসনতন্ত্রের ঊর্ধ্বে থাকিতে পারিবেন। পার্লামেন্টারি অধিকার যথেচ্ছ অপব্যবহার করার জন্য নয়। তাই হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের শামিল কোন বক্তব্য যে এক ধরনের অপরাধ (Obstruction to Justice) তা অস্বীকার করা যাইবে না।

www.pathagar.com

কেহ মন্ত্রী-মিনিস্টার হইতে পারেন। কিন্তু আইন ও বিচার বিষয়ে দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন কেহ জজ-বিচারক হইতে পারেন না। তাই খেয়াল-খুশিমত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বিচার বিভাগেই সবচাইতে কম।

জজ-বিচারকদের কাজের সমালোচনা করার পূর্বে মন্ত্রী-মিনিস্টারদের ভাবিয়া দেখা উচিত, তাহারা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিয়া থাকেন। তাহাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উভয়পক্ষের বক্তব্য রাখার সুযোগ কতটা রাখা হইয়াছে? তাহাদের সিদ্ধান্তসমূহ কতটা প্রকাশ্যেই বা নেয়া হয়? জজ-বিচারকদের পদ্ধতিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিলে দেশে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাই অনেক কমিয়া যাইত। অন্যায়-অবিচার আর দুর্নীতি করার সুযোগও হ্রাস পাইত। দোষ যাহারই হউক, ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পার্লমেন্টে পর্যন্ত উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পরিবেশ রাজনীতিবিদরা রাখেন নাই।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিমের হতাশ হইবার যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহা বুঝি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য হইল, হাইকোর্ট সন্ত্রাসীদের পালিতেছে। অথচ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টসহ আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাও তো বলিয়া থাকেন, রাজনীতি মাস্তাননির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। রাজনীতিবিদরা বড় বড় সন্ত্রাসীদের অভিভাবক ও আশ্রয়দাতা। রাজধানী ঢাকায় যেভাবে ইউসিবিএল ব্যাংক হাইজ্যাক হইয়াছিল তাহাতেও এই অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। এইসব হাইজ্যাকারদের তো পুলিশ গ্রেফতার করিতে পারিতেছে না।

এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ানদের কনফারেন্স উপলক্ষে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল ঢাকায় আসিয়াছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-এ মতবিনিময়ের জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের দলীয় রাজনীতিতে সমস্যা-সঙ্কট আছে। কিন্তু যেহেতু সেখানে প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করার মত শক্তি অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাই দলীয় রাজনীতির সমস্যাসমূহের মধ্যেও ভারতে উন্নতি-অগ্রগতি ঠিকই হইতেছে। বড় ধরনের সঙ্কটও ভারতকে মোকাবিলা করিতে হইতেছে না।

আমাদের দুর্ভাগ্য, এ দেশের রাজনীতিবিদরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্বল, এমনকি পারিলে ধ্বংস করিয়া গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য শক্তি অর্জনের কথা ভাবেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়া সরকার চালাইবার চেষ্টা যে বাংলাদেশে হয় নাই এমন তো নহে। সকল সংবাদপত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াও তো সরকার চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় সরকার বা দেশবাসী কতটা লাভবান হইয়াছে তাহা তো আমাদের কাহারও ভুলিয়া যাইবার কথা নয়।

সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া পুলিশ বলিলেই যদি একজনকে সন্ত্রাসী বা খুনি হিসেবে দেখিতে হয়, তাহা হইলে কোর্ট-আদালতের আর প্রয়োজন কি? মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা কিংবা

www.pathagar.com

হতাশা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া খুনি-সন্ত্রাসীদের দোষ প্রমাণের কাজটি সহজ হইবে না। নির্দোষ-নিরীহ লোকদের ধরা যত সহজ আসল সন্ত্রাসী ও খুনিদের ধরা তত সহজ নয়।

আমি কোন মন্ত্রী বিশেষকে দোষারোপ করিতেছি না। দলীয় রাজনীতিতে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকায় গণতান্ত্রিক সরকার চালাইবার ধ্যান-ধারণা অনেকেরই নাই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে কেবল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একার নিয়ন্ত্রণের তাহাও নয়। একজন সরকারী দলের এমপি হইতে শুরু করিয়া ক্ষমতাসীন দলের সবাই কম-বেশি পুলিশের উপর কর্তৃত্ব খাটাইতে চেষ্টা করেন।

পার্লামেন্টের মতো পবিত্র আইন প্রণয়নকারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে দাঁড়াইয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ হইল, হাইকোর্ট জামিন দিয়া সন্ত্রাসীদের স্বার্থে সংসদ সদস্যরা বিশেষ প্রিভিলেজ বা অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু জজ-বিচারকদের সম্পর্কে কটাক্ষ করিয়া যাহা খুশি তাহা বলার স্বাধীনতা তাহাদেরকে দেওয়া হয় নাই।

এই সম্পর্কে প্রবীণ আইনজীবী সাবেক এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ গত ৬ সেপ্টেম্বর সংসদে বিচারক ও বিচারকার্য সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছে উহাকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলিয়াছেন, "সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ২৭০-এ বিচারকদের ব্যক্তিগত চরিত্র আলোচনার ব্যাপারে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও মূল সংবিধানে বিচারকার্যে বিচারকদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হইয়াছে। সংসদের ভিতরে সংসদ সদস্যরা প্রিভিলেজড এবং ইহা কোর্টের এখতিয়ারের বাহিরে। এইসব ক্ষেত্রে সংসদের বিধি ও সংবিধানের বিধান যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে এবং সংবিধান যাহাতে লংঘিত না হয় তাহা স্পীকার নিশ্চিত করিয়া থাকেন।"

হাইকোর্টের ভুল হইতে পারে না এমন দাবী কেহ করিবে না। এমনকি জজ-বিচারকরাও তাহা বিশ্বাস করেন না। জামিনের অর্থ কাহাকেও বিচার হইতে অব্যাহতি দেওয়া নয়। তাই এই ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তির সুযোগই বা কতটা আছে বুঝি না। তবু জজ-বিচারকদের জামিন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একাধিক আপিল ও রিভিশন করার সুযোগ রহিয়াছে। বড় যে কোন অপরাধ সংক্রান্ত জামিনের সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট পর্যায়ে কোন বিচারপতি এককভাবে দিতে পারেন না। দুইজন বিচারপতিকে একমত হইতে হয়। এই সিদ্ধান্ত তাহারা সরকার পক্ষেরই আইনজীবীর উপস্থিতিতে এবং তাহার বক্তব্য ও যুক্তি শোনার পর নিয়া থাকেন। হাইকোর্টের জামিন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিতে চাহিলে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতির নিকট সরকার আপিল করিতে পারেন। সব বিচারকার্যই প্রকাশ্যে হয়। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক শিক্ষা ও জ্ঞান ভিন্ন যে

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন

বিচার বিভাগের মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক সরকার

ডেটলাইন ঃ ১৫ জুন ১৯৯৯

রাজনীতিতে অসহনশীলতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেহ কাহারও কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্যদের সহযোগিতা পাইতে হইলে সহনশীলতা অবশ্যই দেখাইতে হইবে। সবাইকে খেপাইয়া সরকার পরিচালনার কাজটিকে অধিকতর জটিল করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যে হাইকোর্টের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা শাসনতন্ত্র নিশ্চিত করিয়াছে সেই হাইকোর্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার পূর্বে দেখিতে হইবে জনগণ উহাকে কিভাবে দেখিবে। এমনকি বাংলাদেশে কার্যরত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কিভাবে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করিবে তাহাও বিবেচনায় রাখিতে হইবে। কারণ গণতন্ত্র বা আইনের শাসন কোন দেশের একক চিন্তা-ভাবনার বিষয় নয়। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রই যে শুধু গণতান্ত্রিক তাহা নহে, বিশ্বে আরও অনেক গণতান্ত্রিক দেশ ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রহিয়াছে এবং বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বিশ্বেরই অংশ। বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার কাজ বর্তমান বিশ্বে তাই অধিকতর কঠিন হইয়াছে।

সরকার সন্ত্রাস দমন করার জন্য 'জননিরাপত্তা আইন' পাস করিবেন, ভালো কথা। সন্ত্রাস দমন হউক, ইহা তো সকলের দাবী। সন্ত্রাস দমন আইনের পক্ষে বক্তব্য রাখিবার জন্য হাইকোর্টের জামিন দিবার ক্ষমতার তীব্র সমালোচনার প্রয়োজন ছিল না। অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই বিশেষ পরিস্থিতির কারণেই সন্ত্রাস দমনের বিশেষ আইন রহিয়াছে। বিএনপি সরকারও সন্ত্রাস দমন আইন পাস করিয়াছিল। কিছুদিন যাইতে না যাইতে আবার সেই আইন পরিত্যাগ করাই বিএনপি সরকার শ্রেয় মনে করে। গণতন্ত্র ধ্বংস বা মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের মতো কিছু না থাকিলে শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়েই এই ধরনের আইন পাস করিতে অসুবিধা নাই। কিন্তু 'জননিরাপত্তা' আইনের নামে যদি বিরোধী রাজনৈতিক দল দমন করার কালো আইন পাসের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে উহা মানা যাইবে না। আইনটি নিয়া এই কারণে নানা ধরনের আপত্তি ও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইতেছে। আর যদি শাসনতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোন বিধান এই আইনে থাকে তাহা হইলে আইনের সেই বিধান হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট ঠিকই অবৈধ ঘোষণা করিবে। কাহারও মর্জি-মেজাজের কথা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন না।

তবে সন্ত্রাস দমন আইনে আর যাহাই হউক দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে। বিনা বিচারে আটক রাখার আইনের দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে চলিবে না। আমার তো ভয় হইতেছে, সন্ত্রাস দমনের নতুন আইন পাস হইবার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

www.pathagar.com

লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং সরকার নিজেও অবৈধ শক্তির কাছে নাজুক হয়ে পড়ে। চতুর্থ সংশোধনী দেশের জন্য এমন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, ঐ পরিস্থিতিতেই ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বরের মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ঘটতে পেরেছিল।

আমি আমার প্রিয় বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে এবং রাজনীতির একজন ছাত্র হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক কিছু বিবৃতিতে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তিনি বিচার বিভাগের নিন্দায় তার বক্তব্যকে সমর্থন করার কসরত করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতারকৃত কিছু ব্যক্তিকে জামিন দেয়ার ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়েছেন।

জানা যায়, সত্তরের দশকের প্রথম দিকে একই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঐ বিচারক গ্রেফতারকৃত 'সন্ত্রাসীদের' জামিন দিচ্ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদ ও ডঃ কামাল হোসেনের পরামর্শে শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। তারা তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এ ধরনের সিদ্ধান্তে খারাপ নজির সৃষ্টি হবে।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি নাগাদ যখন চতুর্থ সংশোধনী আইন পাস হয় তখন তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিপরিষদে ছিলেন না এবং 'পলায়নকারী' পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন অক্সফোর্ডে গবেষণা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিছু গরম মাথা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কিছু ক্ষমতাপাগল তরুণ সহকর্মীর প্রভাবে এবং মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতাদের প্ররোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন বিচার বিভাগকে নির্বাহী ক্ষমতার অধীনস্থ করার মত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এভাবেই সেদিন আইনের শাসন ভেঙে পড়েছিল। এ থেকেই কিছু লোক আইন হাতে তুলে নেয়ার দুঃসাহস পেয়ে ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বরের নিষ্ঠুর ঘটনাবলী ঘটাতে পেরেছিল।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে দেশের আইনের শাসনের ব্যবস্থা ধ্বংস করার বিপজ্জনক পথে না চলার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। অন্যথায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। দেশের সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকদের উচিত আওয়ামী লীগকে এ মর্মে বিরত রাখা– যাতে আওয়ামী লীগ তার নিজের ধ্বংস এবং বাংলাদেশের জনগণের সীমাহীন দুর্ভোগ ডেকে না আনে।

www.pathagar.com

প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান

সুপ্রীম কোর্টের উপর কি ডামেকোলসের তরবারি

ডেটলাইন ঃ ২৯ আগস্ট ১৯৯৯

বর্তমানে আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর বস্তুনিষ্ঠ কোন লেখা খুব কমই চোখে পড়ে। এ রকমই ব্যতিক্রমধর্মী একটি লেখা আমার নজরে পড়ল সেদিন। আর লেখক হচ্ছেন আমাদের খ্যাতনামা একজন শিক্ষাবিদ (যাকে আমি বুদ্ধিজীবী হিসেবে উল্লেখ করা থেকে পরামর্শমত বিরত থাকলাম) প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। কয়েকদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকে ঐ লেখাটি প্রকাশিত হয় এবং লেখাটির শিরোনাম ছিল 'বঙ্গবন্ধু যেখানে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে'। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি ঐ নিবন্ধে প্রফেসর সিদ্দিকী যা বলতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে একটি জাতি হিসেবে উদ্দীপ্ত করে তোলার সকল কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুর। তিনি বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনের ক্ষেত্রে শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী সময়ের কোন কোন সিদ্ধান্ত বিতর্কিত হলেও, সেগুলোর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি থাকতে পারে। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপকের মতামতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি, সবচাইতে বিপর্যয়কারী যে ভুলটি শেখ মুজিবুর রহমান করেছিলেন, সেটি হচ্ছে– ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন সাধন। ঐ চতুর্থ সংশোধনী আইন পাসের কাহিনী সবারই ভালভাবে জানা আছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বলে অনাবশ্যক দ্রুততার সাথে সংশোধনী আইনটি পাস করা হয়েছিল। আমার মতে, চতুর্থ সংশোধনীর সবচাইতে বিপর্যয়কারী দিক ছিল–বাঙলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণের বিষয়টি।

ঐ সংশোধনীতে বিধান রাখা হয়েছিল যে,

'প্রেসিডেন্ট সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের নিয়োগ দান করবেন এবং বিচারকগণ প্রেসিডেন্টের সন্তুষ্টি মোতাবেকই তাদের পদে বহাল থাকতে পারবেন।' এ ভাবে বিচার বিভাগকে পুরোপুরি নির্বাহী ক্ষমতার অধীনস্থ করে ফেলা হয়।

আইনের শাসনের ভিত্তিই হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। আইনের শাসন ব্যবস্থায় নাগরিক এবং সরকার উভয়েই নিরাপদ থাকতে পারে। সরকার যদি আইনের শাসন লঙ্ঘন করে বসে, তাহলে একটি নির্বাচিত সরকারের বৈধতা ধ্বংস হয়ে যায়। দেশ তখন একটি জংলী আইনের কবলে পড়ে যায়, যেখানে সবাই সবার সাথে সংঘর্ষে

www.pathagar.com

বদৌলতে অনেকে সীমাহীন অসম্মান ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আর জামিন তো মুক্তিদান নয়। আগাম জামিনপ্রাপ্তদের ক'জন বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন? জামিন দেবার সময়ও তো সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত এটর্নিরা আদালতে উপস্থিত থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর দুঃখ এইখানটায় যে, ইচ্ছামত তিনি তার প্রতিপক্ষ অথবা বিরোধী মতাবলম্বীদের শায়েস্তা করতে পারছেন না। সমগ্র জাতি এরই মধ্যে টের পেয়ে গেছে এক বুকভরা প্রতিহিংসার আগুন বুকে চেপে তিনি ক্ষমতাসীন হয়েছেন। ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞদের উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কারণে অকারণে গ্রেফতার করে, গ্রেফতারের পরে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন জেলের ঘানি টানিয়ে, ইচ্ছামাফিক শাস্তির বিধান করে তিনি চেয়েছিলেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। কিন্তু এ-তো রাজনীতি নয়। এ শুধু প্রতিহিংসাপরায়ণতা। সত্য সমাজে, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা যে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই সময় সুযোগমত তিনি যে ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে তুলে চলেছেন একরাশি অভিযোগ।

সংবাদপত্রের কথা বলছেন? সাংবাদিকরা তো জবাবদিহি করছেন প্রতিদিন। সুরুচির নিকট, দুর্নীতির নিকট, সত্য ও সুন্দরের নিকট সাংবাদিকদের প্রতিদিন মুখোমুখি হতে হয়। সে তুলনায় প্রেস কাউন্সিল বা আদালতের নিকট জবাবদিহিতা তুচ্ছ। এরপর বাকি থাকে কি? আমাদের কথা তার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তারপরেও বলব, তিনি সম্প্রতি যা বলে চলেছেন তা এই সমুন্নত অবস্থানের সাথে মানানসই নয়। অন্যের সমালোচনার পূর্বে তিনি কি দু'দণ্ড আত্মসমালোচনায় মনোযোগী হবেন? যা বলেছেন তা যে সত্যই অসুন্দর।

www.pathagar.com

রক্ষার জন্য বিচারকদের স্বাধীনতাই হল প্রকৃষ্ট রক্ষাকবচ (This independence of the judges in requisite to guard the constitution and the rights of indiveduals from the effects of those ill humors which the arts of designing men, or the influence of particular conjunctures, sometimes disseminate among the people themselves) যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা সংবিধান বিশেষজ্ঞ জন রচে (Jong P. Roche) তাঁর Judicial Self Restraint শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, জনগণের নিকট থেকে রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার অভিভাবকত্ব ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অধিক উপযোগী নয় কেননা, এইটি দেশে আইনের শাসনের অঙ্গীকারে নিবেদিতপ্রাণ।" (The people must be protected from themselves and no institution is better fitted for the role of Chaperone than the federal judiciary, dedicated as it is to the supremcy of law)। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রদেহে সত্যের রস সঞ্চারের প্রশ্নাতীতভাবে সবচেয়ে বড় ভরসা হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, বিশেষ করে সুপ্রীম কোর্টের উপর সনাতন আস্থা।"

[Unquestionably the greatest hopes for infection pure truth serum into the body politic have been traditionally reserved for the federal judiciary, and particularly for the supreme court]

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এসব জানার কথা নয় এবং তার জানার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তার উপদেষ্টাদের উচিত এসব তথ্য তার সামনে সবিস্তারে তুলে ধরা। বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এখানে সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট রয়েছে। জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে ও সংবিধান রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওপর। কার নিকট জবাবদিহি করবেন বিচারকরা? প্রধানমন্ত্রীর নিকট? না প্রেসিডেন্টের নিকট? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জানা উচিত, মৌল জবাবদিহিতার সূত্র নিহিত রয়েছে আইনের নিকট, বিধিবিধানের নিকট বিশেষ করে সাংবিধানিক আইনের নিকট। কোনো ব্যক্তির নিকট নয়। আইনের শাসনের মৌল তাৎপর্যই তাই। আর স্বচ্ছতার কথা? উভয়পক্ষের যুক্তিতর্কের দীর্ঘ শুনানির পরেই তো বিচারালয়ে রায় দেয়া হয় আইনানুগ প্রক্রিয়ায়।

সত্যি বটে, হাইকোর্ট থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যেভাবে আগাম জামিন দেয়া হচ্ছে, তা প্রধানমন্ত্রীর মনঃপুত নয়। কিন্তু নির্বাহী বিভাগের চণ্ডনীতি এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্মকাণ্ডের প্রচার যে দ্রুত গতিতে ঘটে চলেছে হাইকোর্টের আগাম জামিনই হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠতার শেষ ভরসাস্থল। গত সাড়ে তিন বছরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার কাল্পনিক ষড়যন্ত্র যতগুলো উত্থাপিত হয়েছে শুধুমাত্র আগাম জামিনের

www.pathagar.com

অর্থনীতির এই কালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল দু'টি স্তম্ভ-বিচার ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা করতে হবে। ভাবখানা এই যে 'যত উঁচু ডালে বসে থাক না কেন, এদিক সেদিক করলে কিছুতেই ছাড়বো না।' সমাজের দুটি মহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি কি নিছক ধমক? না, কোনো অশনি সংকেত? ঘরপোড়া গরু তো! তাই ভয়টা নিছক অর্থহীন নয়।

সংবিধান ও জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যে অপরিহার্য তা যুগে যুগে স্বীকৃত হয়েছে। স্বীকৃত সত্য এও যে গণতান্ত্রিকতার সুষ্ঠু আবহাওয়ার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের পুরোহিতরা সর্বপ্রথম সমাজের এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠরোধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই শতকের তৃতীয় দশকে জার্মানীর রাজনৈতিক ইতিহাসে দৃষ্টি দিন, ইতালী, স্পেন ও পর্তুগালের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কার্যক্রম পর্যলোচনা করুন, দেখবেন সর্বত্র একই দৃশ্যপট, একই কাহিনী। হিটলার, মুসোলিনীর কথা বাদ দিলেও ছোট ছোট নব্য হিটলারদের দিকে তাকান, প্রায় সবই অগ্রসর হয়েছেন ছকে আঁকা পথ ধরে। ব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পরিবারতন্ত্র এবং দলীয় কর্তৃত্ব সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে স্থায়ী করতে হলে, বিশেষ ক্ষমতা কেন্দ্রে ব্যক্তিগত প্রভাবকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে (in the sphere of personalized power) সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিচার বিভাগ এবং মুক্ত প্রেস। তাই স্বৈরশাসন, তা সামরিক হোক আর বেসামরিক হোক, নির্বাচিত সরকার প্রধান হোন আর অভ্যুত্থানকারী হোন, প্রতিষ্ঠার প্রথম লগ্নেই বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজন পড়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের। এই সত্যও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জানা।

অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনাই হয় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। তার বিস্তৃতি ঘটে মুক্ত ও অবাধ প্রেসের মাধ্যমে। কোনো দেশের সংবিধান ও জনগণের মৌলিক অধিকারের ওপর সর্বপ্রথম আক্রমণ আসে নির্বাহী কর্তৃত্বের পক্ষ থেকেই অন্য কোথা থেকে নয়। নির্বাহী কর্তৃত্বের অনুগত হয়েই আইন পরিষদ গণবিরোধী আইন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়। প্রবৃত্ত হয় জাতীয় স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণে। তাই জনস্বার্থ তথা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নির্বাহী কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সীমারেখা সুনির্দিষ্ট থাকতে হয়। সুনির্দিষ্ট আবর্তের মধ্যেই আইন পরিষদকে কর্মচঞ্চল হতে হয়। ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টার তাৎপর্য এইখানে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নকালে জাতীয় নেতৃবৃন্দের যে সকল সৃজনমূলক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয় সেদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার কেউ নেই, বটে তারপরেও বলব-Federalist-এর দিকে দৃষ্টি দিতে -Federalist-৭৮-এ হ্যামিলটন (Alexander Hamilton) লিখেছেন, "ষড়যন্ত্রকারীদের দুষ্কর্ম অথবা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী প্রভাবশালীদের বক্তব্য-বিবৃতি প্রচারের মুখে সংবিধান ও জনগণের অধিকার

www.pathagar.com

এমাজউদ্দিন আহমেদ

বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রে জবাবদিহিতা

ডেটলাইন ঃ ১ নভেম্বর ১৯৯৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন জানি না, বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের ওপর ভীষণ খাপ্পা। সুযোগ পেলেই কিছু না কিছু কটু-কাটব্য করে থাকেন। কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাজ্য সফর শেষে দেশে ফিরে বিচারক এবং সাংবাদিকদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেও তিনি প্রায় একইভাবে বলতে চাইলেন, নির্বাহী বিভাগ এবং আইন পরিষদকে যদি জবাবদিহি করতে হয় এবং স্বচ্ছভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রের তিনটি শাখার অন্যতম বিচার বিভাগকে তা করতে হবে। সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কেও তার একই বক্তব্য। তিনি বলেন, 'সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।' শুধু প্রধানমন্ত্রী কেন, তার একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন স্বরাষ্টমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম জাতীয় সংসদেই তার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'আমরা নই, ওরাই (সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি) দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন করছেন।' তার এই অসৌজন্যমূলক বক্তব্য অনেককে স্তম্ভিত করে। কিন্তু কেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের ওপর এত ক্ষিপ্ত? কেন তার এত অভিযোগ? সমগ্র জাতি জানে তিনিও জানেন দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই সরকার সমর্থক। সাংবাদিকদের অধিকাংশই তাদের লেখাজোখা ও প্রতিবেদনে সরকারকে তেমন ঘাটায় না। সরকারের ব্যর্থতাসমূহ যথাযথভাবে তুলে ধরা হয় না। তারপরেও কেন তিনি সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সম্পর্কে এত ত্রস্ত? রেডিও-টেলিভিশনের মতো সংবাদ মাধ্যমগুলোর যা সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সে সম্পর্কে কি বলেছিলেন তাও সম্ভব প্রধানমন্ত্রীর জানা। নির্বাচনকালে তিনি এ সম্পর্কে কি বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে রেডিও এবং টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে কার্যকর করার লক্ষ্যে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার রিপোর্ট এখন তিনি হয়ত ভুলে গেছেন। বিভিন্ন হাল্কা রসিকতায় এ সম্পর্কে কি কি বলা হচ্ছে তা তার কর্ণগোচর মাঝে-মাঝে হয় হয়ত। তাতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ না করে তিনি সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকে নতুনভাবে 'স্বচ্ছতার এবং জবাবদিহিতার' সবক দিতে চাচ্ছেন কেন? বিচার বিভাগ সম্পর্কে অবশ্য তার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে খানিকটা ক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে, বিশেষ করে বিচার বিভাগের শীর্ষ পর্যায়। কেননা, দেশের প্রধান নির্বাহীকে সঠিক তথ্য জেনে কথা বলবেন। এমন কথা বলার স্পর্ধা বিচারপতিরা পেলেন কোথা থেকে? কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ প্রতিবেশের পরিপ্রক্ষিতে বিশেষ করে মুক্তচিন্তা এবং ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের এ যুগে গণতান্ত্রিকতা ও অবাধ

www.pathagar.com

এবং আপিল আদালত (যদি থাকে) ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। তিনি তাহার বিচারিক সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গসমূহ এবং কার্যনির্বাহীগণ যেইরূপে দায়বদ্ধ থাকেন সেইরূপ অর্থে জনগণ, সংবাদ মাধ্যম বা অন্য কাহারও নিকট দায়বদ্ধ নন। বিচারিক স্বচ্ছতাই হইল বিচার বিভাগীয় জবাবদিহিতা এবং অন্য আর কিছু নহে। বিচারকগণকে যদি আইনের পরিবর্তে, জনমতের গতি অনুসারে মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আইনের শাসনের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ধারণা সকল তাৎপর্য হারাইবে। কিন্তু ইহার অর্থ কি এই যে, বিচারিক ক্ষমতার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না? ইহার অর্থ কি এই যে, বিচারিক পুনর্বিবেচনার ছদ্মাবরণে বিচার বিভাগ আইন প্রণয়ন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী অন্যায়ভাবে অধিগ্রহণ করিয়া বিচার দ্বারা একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করিবে? দ্বিধাহীন উত্তর হইল-না। একটি গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোয় বিচার বিভাগ সর্বশক্তিমান নয় এবং ইহার ক্ষমতা ও এখতিয়ার স্বয়ং সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। বিচার বিভাগ কোনক্রমেই এইরূপ চিন্তা করিতে পারে না যে, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের উপর উহার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিয়াছে। সংবিধান এবং কেবলমাত্র সংবিধানেরই এককভাবে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এবং সংবিধান রাষ্ট্রের এই তিনটি অংশের জন্য পার্থক্যসূচক কার্যাবলী সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করিয়া দিয়াছে। সেই কারণে এই তিনটি অঙ্গ হইল একটি একক সাঙ্গীতিক স্বরলিপির তিনটি বাদ্যযন্ত্র এবং সেই হেতু তাহাদের অবশ্যই একে অন্যের সহিত সমন্বয়পূর্ণভাবে কার্য করিতে হইবে। কিন্তু যদি এই তিনটি অঙ্গ সংবিধানে নির্ধারিত তাহাদের স্বীয় ভূমিকা উপলব্ধিতে ব্যর্থ হইয়া সংঘাতপূর্ণ সুরধ্বনি সৃষ্টি করে, যেটি প্রায়শই নবীন রাষ্ট্রসমূহে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে কোন সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনার সৃষ্টি হইবে না; কেবলমাত্র বিশৃঙ্খলা ও শব্দ দূষণের কারণ ঘটিবে। বিচার বিভাগ সংবিধান ও আইনের অভিভাবকরূপে একদিকে যেমন নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষাকারী, অন্যদিকে তেমনি আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের অধিকার ও এখতিয়ারেরও সংরক্ষণকারী। সর্বোপরি, একজন বিচারকের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ হইল স্বয়ং বিচারকের আত্মনিবৃত্তি। একজন বিচারক যদি ইহা বিস্মৃত হন এবং বিচার বিভাগের জন্য সংবিধান, আইন ও বিচারিক সংযমের মাধ্যমে নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করেন তবে তাহার বিচারক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কোন অধিকার থাকে না এবং এইরূপ বিচারক ও তাহার কর্তৃক প্রযুক্ত স্বেচ্ছাচারী বিচারিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিকারের সংস্থান প্রত্যেক সংবিধানেই রহিয়াছে। সৌভাগ্যবশত অনুরূপ প্রতিকারের আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় ঘটনা উপমহাদেশের আমাদের অংশে অত্যন্ত কদাচিৎ ঘটিয়াছে।

www.pathagar.com

নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ, নির্বাহীর পদমর্যাদা যতই উচ্চ হউক না কেন, আইনানুগ কর্তৃত্বাধীনে হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার এখতিয়ার প্রদান করা হইয়াছে" এবং চূড়ান্তভাবে, "বিচারিক এখতিয়ার অকার্যকর হইবে যদি আইনসমূহ এমনভাবে শব্দসজ্জিত ও ব্যাখ্যাকৃত হয় যে, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ উহার অধীনে তাহাদের পছন্দমত সংবিধিবদ্ধ প্রবিধানমালা প্রণয়নে সমর্থ হইবে এবং এই স্বাধীনতা ব্যবহার করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার উপভোগে বাধা আরোপের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে তাহাদের 'নিজস্ব সন্তুষ্টির' চূড়ান্ত বিচারক তৈরী করিতে পারিবে।

অতঃপর পূর্বতন ঢাকা হাইকোর্ট সহিদুল হক বনাম পূর্ব পাকিস্তান সরকার মোকদ্দমায়, যে মোকদ্দমায় আটকাবদ্ধ ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনে একটি কারখানায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ও শ্রমিকদের উত্তেজিত করিবার দায়ে আটক করা হয়, যদিও পূর্বোক্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধে তৎপূর্বে সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি মোকদ্দমা দায়ের হয়, আদালত ঘোষণা করে যে, 'যেখানে সুনির্দিষ্ট তারিখে আটকাবদ্ধ ব্যক্তির কথিত কার্যকলাপের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে, ন্যায়ত সেই একই কার্যকলাপ একটি আটকাদেশের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।' এই মূলনীতি এখনও অনুসৃত হইতেছে। বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখ হইতে বলবৎ হয় এবং তখন হইতে হেবিয়াস কর্পাস সংক্রান্ত অসংখ্য মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছে। দীর্ঘসূত্রতা পরিহারের স্বার্থে আমি উক্ত মোকদ্দমাসমূহের একটি তালিকা প্রদান হইতে বিরত রহিলাম। আমি কেবল ঐ সকল মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক স্থিরিকৃত হেবিয়াস কর্পাস আইনের মূলনীতিসমূহের উল্লেখ করিব। আদালত সেই সকল ক্ষেত্রে আটকাদেশ বাতিল করিয়াছে, যেই ক্ষেত্রে (১) মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে আটকাদেশ প্রদান ক্ষমতার যান্ত্রিক অনুশীলন হইয়াছে, (২) অনুরূপ ক্ষমতার প্রতারণামূলক প্রয়োগ হইয়াছে, (৩) ভিন্নরূপ উদ্দেশ্যে উক্ত ক্ষমতার প্রয়োগ হইয়াছে, (৪) ক্ষমতার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ প্রয়োগ হইয়াছে, (৫) প্রতিরোধমূলক আটক আইনে উল্লিখিত পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালনে ব্যত্যয় হইয়াছে, এবং (৬) নূতন আটকাদেশ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তির আদর্শ ব্যর্থ করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে।

বিচারকদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

আমাদের দেশে একজন বিচারক সম্পূর্ণরূপে জনসমক্ষে কার্য করে এবং প্রকাশ্য আদালতে সকল বিষয়ের শুনানি ও নিষ্পত্তি হয়। একজন বিচারকের কাজের কোন কিছুই গুপ্ত বা গোপনীয় নয়। একজন বিচারকের কার্য সকল দিক হইতেই স্বচ্ছ ও জনদৃষ্টিতে উন্মোচিত এবং এই স্বচ্ছতাই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কিন্তু এর বেশি আর কিছু নয়। একজন বিচারক তাহার সিদ্ধান্তের জন্য তাহার নিজের বিবেক, শপথ

www.pathagar.com

আদালতসমূহ অতি সতর্কতার সঙ্গে এই তত্ত্ব অনুসরণ করিয়াছে এবং আমার জানা মতে অদ্যাবধি উক্ত অবস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদপসরণ করে নাই। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উচ্চ আদালতসমূহের সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্তভাবে লিভারসিজ-এর নয় বরং এ্যান্ডারসনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছে এবং লর্ড অ্যাটকিনের অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে সমুন্নত রাখিয়া লিভারসিজকে বন্দিত্ব হইতে মুক্তিদানের মাধ্যমে আমাদের আদালতসমূহ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট এবং পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট কতিপয় মোকদ্দমায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আটক-ক্ষমতা অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব প্রদান করিবার পর পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট মিসেস রওশন বিজয়া শওকত আলী খান বনাম পূর্ব পাকিস্তান সরকার মোকদ্দমার অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করে। একজন পেশাজীবী ব্যারিস্টার এবং সক্রিয় রাজনীতিক শওকত আলী খানকে ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান গণনিরাপত্তা আইন, ১৯৫৮-এর ধারা ৪১ প্রয়োগে আটক করা হয়। তাঁহার স্ত্রী কর্তৃক উক্ত আটকাদেশ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়। পরবর্তীকালে অন্য একটি আটকাদেশ জারি করা হয়। আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, সংশ্লিষ্ট আইন নীরব থাকিলেও সংবিধান আটককৃত ব্যক্তিকে আটকের কারণসমূহ জানাইবার আদেশ ধারণ করে; দ্বিতীয়ত অবৈধ ঘোষিত একটি আটকাদেশ পরবর্তীকালীন একটি নূতন আদেশ দ্বারা বৈধ করা যায় না এবং শেষত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট কারণসমূহ জারিকরণের মাধ্যমে আটকাদেশকে জীবনদান করা যায় না। আদালতসমূহ অবশ্য লিভারসিজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মত হইতে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদপসরণ করে নাই এবং এখনও এই অভিমত পোষণ করে যে, আটককারী কর্তৃপক্ষের "বিষয়গত সন্তুষ্টি" এমনকি স্বেচ্ছাচারী হইলেও যুদ্ধের ন্যায় জরুরি অবস্থাকালে যৌক্তিক, কিন্তু শান্তিকালে যখন নাগরিকের স্বাধীনতা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখন যৌক্তিক মর্মে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং লিভারসিজের ভূত এখনও বর্তমান।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা হইল মালিক গোলাম জিলানী বনাম পশ্চিম পাকিস্তান সরকার, যাহা প্রকৃতপক্ষে লিভারসিজের শৃংখল ভাঙ্গিয়াছিল। এই মোকদ্দমায় পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট 'আটকের কারণসমূহ বিষয়ে আটককারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি "বিষয়গত সন্তুষ্টি" হওয়ায় আদালতের পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত নয়' মর্মে একই প্রকৃতির মোকদ্দমায় হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তসমূহ রদ করিয়া কর্তৃত্বপূর্ণভাবে ঘোষণা করে যে, 'আটককারী কর্তৃপক্ষকে স্বীয় সন্তুষ্টির বিচারক হওয়ার সর্বময় কর্তৃত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে ইংলিশ লিভারসিজ মোকদ্দমার মূলনীতির উপর নির্ভর করা, হাইকোর্ট যেমন করিয়াছে, অত্যন্ত পশ্চাৎমুখিনতা হইবে এবং "পাকিস্তানে এখন সরকারী এখতিয়ার প্রযুক্ত হয় ১৯৬২ সনের সংবিধানের অধীনে যাহার অনুচ্ছেদ ২ অনুসারে প্রত্যেক নাগরিক আইনানুগ আচরণ লাভের অধিকারী" এবং আবার "অনুচ্ছেদ ৯৮ দ্বারা সুপ্রিম কোর্টকে

www.pathagar.com

বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য মোকদ্দমাটি উদ্ধৃত করিব। অপর দু'টি মোকদ্দমার সহিত একত্রে শুনানিকৃত এই মোকদ্দমাটি জনারণ্যে অষ্টম সংশোধনী মোকদ্দমা নামে পরিচিতি লাভ করে। একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগকে দেশের সাতটি স্থানে সাতটি স্থায়ী বেঞ্চে বিভক্ত করা হয়। এই সাতটি বেঞ্চকে স্বীয় এলাকায় একচেটিয়া ভৌগোলিক এখতিয়ার অর্পণ করা হয়। হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের নামের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সাতটি ক্ষুদ্রাকার হইকোর্ট বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। অন্যান্য কারণের সহিত এই হেতুবাদে উক্ত সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয় যে, "ইহা রাষ্ট্রের অন্যতম একটি অঙ্গ বিচার বিভাগের বস্তুগত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে এবং সেই কারণে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতীয় সংসদ উহার সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা প্রয়োগ মাধ্যমে এইরূপে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করিতে ক্ষমতাবান নয়।" বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত প্রায় ১০০টি মোকদ্দমা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত সম্ভবত অনুরূপ প্রকৃতির প্রথম মোকদ্দমা কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মোকদ্দমায় এই মর্মে প্রদত্ত রায়ের সহিত সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য প্রকাশ করেন যে, সংবিধান সংশোধনের পার্লামেন্টের এখতিয়ার সংবিধানের মৌলিকত্ব ও মূল কাঠামো পরিবর্তনের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত নয় এবং ৩-১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, বিসংবাদিত সংশোধনী সংবিধানের মূল কাঠামো পরিবর্তন করিয়াছে এবং সেই কারণ অসাংবিধানিক হয়।

জনগণের স্বাধনীতা সমুন্নত রাখিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট কিরূপে উহার বিচারিক পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছে উহা প্রদর্শনের জন্য আমি এখন অসংখ্য হেবিয়াস কর্পাস মোকদ্দমাসমূহের মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিব। বিখ্যাত নাইট-এর হেবিয়াস কর্পাস মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি স্যার নিকোলাস হাইড-এর "রাজার বিশেষ নির্দেশ বা প্রিভি কাউন্সিলের কর্তৃত্বের যথার্থতার সন্দিগ্ধতা অসম্ভব বিধায় আরও কারণ প্রদর্শন অনাবশ্যক" বিষয়ক ঘোষণা হইতে লিভারসিজ বনাম এ্যান্ডারসন মোকদ্দমায় লর্ড এ্যাটকিনের একক ভিন্নমত পোষণকারী রায় প্রদান পর্যন্ত কোন নাগরিককে আটকাবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আটককারী কর্তৃপক্ষের 'বিষয়গত সন্তুষ্ট পর্যাপ্ত' এবং অনুরূপ সন্তুষ্টি আদালতের বিচারিক পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ক তত্ত্ব সমগ্র ইংল্যান্ডব্যাপী এবং অবশ্যই ভারতীয় উপমহাদেশে রাজত্ব করিয়াছে। ৪০-এর দশকে লিভারসিজের মোকদ্দমায় লর্ড এ্যাটকিন তাহার একক কণ্ঠে সর্বপ্রথম দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, আটককারী কর্তৃপক্ষের "বিষয়গত সন্তুষ্টি" যথেষ্ট নয় এবং জনগণের স্বাধীনতার সীমা লংঘনের নির্বাহী বিভাগের অযৌক্তিক প্রচেষ্টার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সার্বিক এখতিয়ার আদালতের আছে। লিভারসিজ মোকদ্দমার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত দ্বারা সূত্রায়িত আটককারী কর্তৃপক্ষের "বিষয়গত সন্তুষ্টির" তত্ত্ব বহু যুগব্যাপী আমাদের উপমহাদেশে প্রবল প্রতাপের সঙ্গে কার্যকর ছিল। ভারতীয়

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাদানের এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে সর্বসাকুল্যে মাত্র ১৮ বছর। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার অনেক দিক রহিয়াছে। যেহেতু এই সংক্ষিপ্ত পরিসীমায় সকল দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর নহে, সেহেতু আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিব পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত সময়কালে বিচারিক পুনর্বিবেচনা এখতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীন সত্তা প্রকাশের ক্ষেত্রে, ভারত ও পাকিস্তানের উল্লেখে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ভূমিকার বিষয়ে।

ডাঃ নূরুল ইসলাম বনাম বাংলাদেশ মোকদ্দমায় ১৯৭৪ সনের পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) আইনের ৯(২) ধারার বৈধতা, যাহা সরকারকে যে কোন সরকারী কর্মকর্তাকে ২৫ বছর চাকুরীপূর্তির পর কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে অবসর প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল, আদালতের বিবেচনার জন্য আনীত হয়। দরখাস্তকারীকে, যিনি একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, সরকার পূর্বোক্ত আইনের ধারা ৯ উপধারা (২) প্রয়োগের মাধ্যমে অবসর গ্রহণের স্বাভাবিক বয়সের পূর্বেই অবসর প্রদান করে। সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, পূর্বোক্ত বিধানে ২৫ বছর চাকুরী সম্পন্নকারী সরকারী কর্মকর্তাদের অবসর প্রদানের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের কোন নীতিমালা বা দিক নির্দেশনার সংস্থান না থাকায় উহা সরকারকে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে এবং সেই কারণে উহা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদের, যাহা "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সম-অধিকার লাভের অধিকারী" মর্মে ঘোষণা করে এবং সকল নাগরিক প্রজাতন্ত্রের চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে সমসুযোগ লাভের অধিকারী মর্মে নিশ্চয়তাদানকারী সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সেই কারণে বিধানটি অসাংবিধানিক সাব্যস্তে রদ করা হয়। সারপিং মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীকে সরকার কর্তৃক পূর্বে ইজারাদানকৃত একটি জলাশয়ের ইজারা বাতিলের সরবরাহ আদেশের বৈধতা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট দরখাস্তের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়। হাইকোর্ট বিভাগ এই হেতুবাদে দরখাস্তটি প্রত্যাখ্যান করে যে, ইজারা একটি চুক্তি হওয়ায় ইজারার কোন শর্তের লঙ্ঘন, চুক্তিমূলক বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন এবং সেই কারণে উক্ত বিষয়ে রীট এখতিয়ার প্রযোজ্য হইবে না, যেহেতু অন্য ফোরামে চুক্তি বলবৎকরণের মাধ্যমে বিকল্প প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ আছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এবং পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া নির্ভরযোগ্যভাবে আইনটি প্রণয়ন করেন। এই মোকদ্দমায় রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে ও সাধারণভাবে ব্যবসায়ী হিসেবে সম্পাদিত চুক্তি এবং সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা সম্পাদিত চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। অতঃপর এই সিদ্ধান্ত হয় যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে যে কোন স্বেচ্ছাচারী কার্য রীট এখতিয়ার প্রয়োগ মাধ্যমে রদযোগ্য হইবে। এই সিদ্ধান্ত আদালতের অনন্য সাধারণ রীট এখতিয়ারের পরিসীমা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমি সর্বশেষ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

www.pathagar.com

বিচারপতি নইমউদ্দিন আহমেদ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা

ডেটলাইন ঃ ১১ নভেম্বর ১৯৯৯

বিচারিক পুনর্বিচারের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা যদিও সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের এবং সংবিধানের আলোকে নির্বাহী ও আইন প্রণয়নকারী বিভাগের কার্যাবলী পুনর্বিবেচনার আদালতের ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের স্বীকৃত নয়, তথাপি ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন বিভাগের কার্যাবলীর বিচারিক পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নির্বাহী ও আইন প্রণয়নকারী অঙ্গের ওপর বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বের উদ্ভব প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যখন প্রধান বিচারপতি ১৮০৩ সনে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন যে, "আইন কি ইহা নির্ধারণ করিবার এখতিয়ার ও দায়িত্ব অবশ্যই বিচার বিভাগের।" তদাবধি, এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক বিধানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বাধাহীনভাবে বিচারিক পুনর্বিবেচনার বিপুল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছে। অপরদিকে, যুক্তরাজ্যের আদালতসমূহ নির্বাহী বিভাগের আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিতে এবং অবৈধ মর্মে ঘোষণা করিতে পারে। "কিন্তু, পার্লামেন্টের বিদ্যমান কোন আইনের বৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা আদালতসমূহের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এইরূপে যুক্তরাজ্যের অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আদালতের ক্ষমতাও ব্রিটিশ সংবিধানের একটি অত্যন্ত মৌলিক ধারণা 'পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব' এর অধীনস্থ।" ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন বিভাগ উভয়ের কার্যাবলী পুনর্বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে আদালতের এখতিয়ার, কতিপয় ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত (ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ ও ২২৬, পাকিস্তান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮৪(৩) ১৯৯ এবং বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২)। দৃশত সে কারণে যুক্তরাজ্যের ওয়েস্টমিনিস্টার আদর্শের সরকার ব্যবস্থাসম্পন্ন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনা সম্পর্কিত আইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য কেবল এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগের বিচারিক পুনর্বিবেচনার এখতিয়ারের উৎস একটি বিচারিক সিদ্ধান্ত এবং উহার পরিধি পূর্বোক্ত দেশসমূহ হইতে ব্যাপক; অন্যদিকে এই সকল দেশসমূহে বিচারিক পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার উহাদের স্ব-স্ব সংবিধানের অন্তর্গত এবং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগযোগ্য।

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ২৮ বছর পূর্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিলেও পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বিচারিক পুনর্বিবেচনা ও সংবিধান

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

বিচার বিভাগের মর্যাদা ও স্বাধীনতা

বিচারপতি নঈমউদ্দিন আহমেদ: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ: বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা

প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান: সুপ্রীম কোর্টের উপর ডামেকোলসের তরবারি

ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন: গণতন্ত্র ও বিচার বিভাগের মর্যাদা

ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া: বিচার বিভাগের সাংবিধানিক মর্যাদা

এম এ হাকিম: স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা

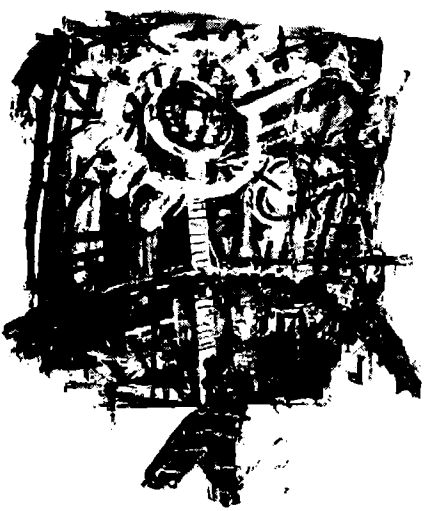

www.pathagar.com

জননিরাপত্তা আইনের পর অপরাধ-প্রবণতা বেড়ে গেছে। যেদিন এই আইনটি পাস করা হলো, সেদিনই খুন হলেন (প্রধানমন্ত্রীর বেয়াইন) তার বেলায় তো এই আইনটির প্রয়োগ হলো না।

হাইকোর্ট হচ্ছে এদেশের মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল। তার ওপরও হাত তুলেছে আওয়ামী লীগ। মাননীয় বিচারপতিদের কটাক্ষ করার কারণে প্রধানমন্ত্রী তিরস্কৃত হন। তাতেও তার বোধোদয় হয়নি। পৃথিবীর কোনো দেশে বিচারপতিদের ওপর মন্ত্রীরা লাঠি তোলে— এমন ইতিহাস নেই। বাংলাদেশে সেটাই হয়েছে। মন্ত্রীরা যেদিন লাঠি মিছিল করল, তখন প্রধানমন্ত্রী বিদেশে ছিলেন। মানুষের ধারণা ছিল, দেশে ফিরে এসে তিনি এ ঘটনার জন্য মন্ত্রীদের তিরস্কার করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশে এসে এই অনৈতিক কাজের জন্য মন্ত্রীদের বাহবা দিলেন। কাকে জামিন দেবেন, আর কাকে কারাগারে পাঠাবেন— তা বিচারপতিদের ব্যাপার। অথচ মাননীয় বিচারপতিদের সে স্বাধীনতা বা অধিকারের ওপর সরকার হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করছে। আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের তাঁবেদার। দেশের অর্থনীতি এখন নিষ্প্রাণ। তারা দেশের অর্থনীতি, মিলকারখানায় সমৃদ্ধি আনার বদলে ক্রমান্বয়ে এসব ধ্বংস করেছে। অনেকগুলো শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। কিছু কিছু কারখানা পানির দামে বিক্রি করে দিয়েছে। মজুরি কমিশন অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরি দেয়া হচ্ছে না। দেশের বড় সম্পদ পাট। অথচ বড় পাটকলগুলো বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। লবণ শিল্প, মৎস্য শিল্প, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ সম্পদ সবকিছুই ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশে সৎ, চরিত্রবান নেতৃত্বের অভাবেই দেশ এখন অর্থনৈতিক ধ্বংসের প্রান্তসীমানায় এসে গেছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৩০ বছর আগে। এখনও আওয়ামী লীগ দেশে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির ধুয়া তোলে। আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, বাংলাদেশে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি বলে কোনো রাজনৈতিক দল নেই। কোনো শক্তি নেই। এখন দেশ গড়ার সময়। অথচ আওয়ামী লীগ এসব বলে দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করার চেষ্টা করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার জন্যই ভারতের তাঁবেদাররা এসব পক্ষ-বিপক্ষের শক্তির সন্ধান করছে। আর স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে কাউকে এদেশের মানুষ কোনো কিছু ইজারা দেয়নি। আওয়ামী লীগ আজ মুক্তিযুদ্ধের 'ব্যাপারী' সেজেছে। আওয়ামী লীগ করলে দেশপ্রেমিক আর না করলেই স্বাধীনতার বিরোধী— এ ধরনের কথাবার্তা মূর্খদের মুখ থেকে বের হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুদিন আগে বলেছেন, ভোট চোর, রাজাকার আর স্বৈরাচার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই ভোট চোর, স্বৈরাচার আর ইন্ডিয়ান রাজাকার কে দেশবাসী তা জানে। চারদলীয় জোট গঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই আবোল-তাবোল বলা শুরু করে দিয়েছেন। দেশবাসীকে জানাতে চাই, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আর অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে চার দল আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে সর্বদলীয় সরকার গঠন করা হবে। জোট ভাঙার যতই ষড়যন্ত্র সরকার করুক-তা কিছুতেই সফল হবে না।

www.pathagar.com

দলের এমপিদের কথাবার্তা কাটছাঁট করে প্রচার করে আমাদের বক্তব্য ব্লাকমেইল করেছে।

গত চার বছরে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছে। সংসদে কথা বলতে না পেরে বিরোধী দল রাজপথে আন্দোলনে এলো। আমরা জনগণের দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে শুরু করলাম। হরতাল-অবরোধ, সভা-সমাবেশ গণতান্ত্রিক দেশে মতপ্রকাশের অন্যতম প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করেই আওয়ামী লীগ আজ ক্ষমতার মসনদে বসেছে। অথচ ক্ষমতায় এসে তারা রাজপথে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করল। জনগণের দাবি নিয়ে বিরোধী দল হরতাল করে আর সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা অস্ত্র হাতে রাজপথ দখল করে রাখে। দেশপ্রেমিক পুলিশকে লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের পেটায়। রাজপথে জনগণের প্রতিনিধি সংসদ সদস্যদের অপমান করে। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের ঘটনা আমি দেখিনি।

দীর্ঘ বর্জনের পর একদিন সংসদে যোগদানের কারণ সম্পর্কে বলতে হয় যে, আমরা এই অগণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলে সংসদে যেতে চাই না। কারণ এরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মানে না। তারপরও একদিনের জন্য আমাদের সংসদে যেতে হয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ গত চার বছরে যা করছে তাতে মনে হচ্ছে ওরা আবার এদেশে বাকশালী শাসন কায়েম করতে চায়। তাদের আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে বিরোধী এমপিদের সংসদে অনুপস্থিতি ৯০ দিন পার হলে তারা ওইসব আসন শূন্য ঘোষণা করে উপনির্বাচন দেবে। তারপর প্রহসনের নির্বাচন করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে '৭২-এর সংবিধানকে পুনরুজ্জীবিত করবে। সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, বিসমিল্লাহ, আল্লাহর ওপর অবিচল বিশ্বাস ও কেয়ারটেকার সরকারের পদ্ধতি শব্দগুলো বাদ দেবে। বিরোধী দল সরকারের এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে সংসদে হাজির হয়েছিল সংবিধানকে রক্ষা করতে। একই সাথে আওয়ামী লীগের চক্রান্ত রুখে দিতে। এতে আমরা সফল হয়েছি।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ, রাহাজানি, অপহরণ গাণিতিক হারে বেড়ে গেছে। প্রত্যেকদিন খুন হচ্ছে মানুষ। আগে একটি খুনের কথা শুনলেই মানুষ ভয় পেত। অথচ এখন খুন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে গেছে। ঢাকা যেন খুনের নগরীতে পরিণত হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক, তিনি তাকে গ্রেফতার করবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি মাটির নিচ থেকে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করবেন। অথচ মন্ত্রী-এমপিদের পুত্ররা বাড়ি দখল করছে, মার্কেট দখল করছে, জমি দখল করছে। তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। সরকারের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি করছে এমনকি মানুষ খুন করে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না। এমপিদের বাসায় বোমা ফেটে লোক মরছে, মন্ত্রীর বাসায় সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নিচ্ছে, তার বিচার হয় না। তাদের গ্রেফতার করা হয় না। সন্ত্রাস বন্ধের জন্য তারা নাকি জননিরাপত্তা আইন করেছে। এখন দেখছি জননিরাপত্তা আইন জনগণের নিরাপত্তার জন্য নয়, গদি নিরাপত্তার জন্যই করা হয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছে,

www.pathagar.com

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গণতান্ত্রিক সংসদে অগণতান্ত্রিক আচরণ

ডেটলাইন ঃ আগস্ট ২০০০

নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে ২১ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ক্ষমতায় এসে সে সব বাদ দিয়ে ভারতের কাছে দেয়া ওয়াদা পূরণে তারা ব্যস্ত ছিল। পার্বত্য চুক্তি বলেন আর পানি চুক্তিই বলেন, সবকিছুই সংসদকে পাশ কাটিয়ে ভারতের স্বার্থে করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ দাবি করছে গত চার বছরে তারা গণতন্ত্র চর্চা এবং আইনের শাসন কায়েম করেছে। সরকারি প্রচার মাধ্যম ও তাদের নিজস্ব কিছু পত্রিকায় এসব কথা ফলাও করে প্রচার করছে। বাস্তব চিত্র কিন্তু সেটা নয়। পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা আর অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করাই হচ্ছে গণতন্ত্র চর্চার প্রধান শর্ত। অথচ বর্তমান সরকার এসবের একটিও করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, সকল বিষয় নিয়ে সংসদে তিনি আলোচনা করবেন। অথচ প্রত্যেকটি জাতীয় ইস্যু সংসদে নামেমাত্র আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন। পার্বত্য কালো চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ দেননি। পানি চুক্তি সংসদে দূরের কথা, মন্ত্রিসভায়ও আলোচনা করা হয়নি। ট্রানজিট করিডোর সবগুলোই তিনি এককভাবে করতে চেষ্টা করেছেন জনগণকে না জানিয়ে। সংসদকে পাশ কাটিয়ে সরকারের করা একতরফাভাবে দেশের স্বার্থবিরোধী এসব কর্মকাণ্ড নিয়ে আমরা সংসদে খোলামেলা আলোচনা করতে চেয়েছি। সরকার আমাদের সে সুযোগ না দেয়ায় সংসদ বর্জন করেছি।

স্পীকার একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি সকল সংসদ সদস্যকে সমান চোখে দেখবেন— এটাই বাস্তবতা। অথচ আমরা দেখেছি সরকারি দলের এমপিদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় কথা বলতে দেয়া হলেও বিরোধী দলের এমপিদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় না। সংসদের কার্যবিবরণী ঘাঁটলে এ সত্যটি ধরা পড়বে। আমার মনে হয় সরকার স্পীকারকে দিয়ে এই অনৈতিক কাজে বাধ্য করেছে। আমার বেলায় দু'তিনবার এমনটা হয়েছে। হয়েছে বিএনপির এমপিদের বেলায়। ফলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, গত চার বছরে জাতীয় সংসদে গণতন্ত্রের চর্চা হয়নি। গণতন্ত্র চর্চার বদলে জাতীয় সংসদে এমন সব অগণতান্ত্রিক কথাবার্তা বিরোধীদলীয় নেত্রী সম্পর্কে উচ্চারণ করা হয়েছে, তা শুধু অশ্লীলই নয়, অমর্যাদাকরও। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটির সম্মান অনেক। এই চেয়ারে বসে মানুষ যে এ ধরনের অশ্লীল আচরণ ও কথাবার্তা বলতে পারে তা বিশ্বাস করাই যায় না। অথচ এদেশের মানুষ সেটাই দেখেছে। আওয়ামী লীগ গত চার বছরে গণতন্ত্র লালন তো করেইনি বরং গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে। গণতন্ত্রের আরেকটি দিক হলো সকল সংসদ সদস্যের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। অথচ টেলিভিশনে সরকারি দলের এমপিদের বক্তব্য পুরোপুরি প্রচার করলেও বিরোধী দলের এমপিদের বক্তব্য প্রচার করেছে চতুরতার সাথে। বলা যায়, বিরোধী

www.pathagar.com

বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তা ভেবে দেখতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপরও নির্ভর করে। এ ব্যাপারে বিচারকদেরও সদা সচেতন থাকতে হবে। উচ্চ আদালতের ক্ষমতা রাজপথে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে বিচার বিভাগের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, আইনের শাসনের অবসান ঘটবে, ন্যায়বিচার বিদায় নেবে। আদালতের কর্তৃত্ব ও মর্যাদাকে যারা চ্যালেঞ্জ করেছেন, যারা স্বইচ্ছায় আদালতকে অবমাননার পথ বেছে নিয়েছেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিপন্ন করতে তাদের গভীর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। বিচার বিভাগকে ধ্বংস না করে, আইনের শাসন খর্ব না করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শাসন কায়েম সম্ভব নয়। সমগ্র জাতিকে, সকল সচেতন নাগরিক এবং বিশেষ করে বিচার বিভাগকে বিচার বিভাগের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যথায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার বিদায় নেবে। সভ্যতা ও গণতন্ত্র মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে।

সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের রক্ষক। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার তাদের শপথে বলেন, 'আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব'। বিচারপতি বা বিচারকগণ তাদের শপথবাক্যে বলেন, 'আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব'। আইনের রক্ষণ ও নিরাপত্তার শপথগ্রহণ করেন শুধু বিচারপতিগণ। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ আইন হাতে নিয়ে সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে হুমকি প্রদর্শন করে বা চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে বিচার বিভাগকে হেয়প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে আইনের রক্ষণের ও নিরাপত্তার জন্য যারা শপথগ্রহণ করেছেন সে আইন রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হবে সর্বাধিক।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ ডেথ রেফারেন্স হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন বিষয়ে শুনানি স্বাভাবিক নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ নেই। আমাদের দেশের উচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো মহল কখনও কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। সকল নাগরিকের কাছে এই ইনস্টিটিউটের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবে বেঞ্চ গঠনসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মামলার ডেথ রেফারেন্স শুনানি ষড়যন্ত্র করে বন্ধ করার কারও কি ক্ষমতা রয়েছে? কারা ষড়যন্ত্র করছে; কিভাবে ষড়যন্ত্র করছে এ তথ্য তুলে না ধরে অযথা এ জাতীয় অভিযোগ উত্থাপন করে সুপ্রিম কোর্টের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার অধিকার কারও নেই।

✳ ✳ ✳ ✳

www.pathagar.com

বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা

ডেট লাইন ঃ ২৮.১১.৯৯

গত কিছুদিন যাবৎ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসহ সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবীগণ বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন। সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে এ জাতীয় বক্তব্য আসার পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করছে বলে অতীতের আওয়ামী সরকারের ইতিহাস থেকে উপলব্ধি করা যায়। '৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শেখ মুজিবুর রহমানকে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনার সুযোগ না দিয়ে এতদঞ্চলে গণহত্যা, ধ্বংস ও ধর্ষণ চালিয়েছিল তা নাৎসী জার্মানীদের অত্যাচারকেও হার মানিয়েছিল। মানুষের জীবনের বিনিময়ে ও অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন পাকিস্তান স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী যেভাবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করেছেন সে জাতীয় অমানবিক অবস্থা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে কখনও দেখা দেবে না। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বাস ও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে পদদলিত করে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জাতীয় সংসদে আইন পাস করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের স্থলে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে দ্বি-মত পোষণকারী জাতীয় সংসদ সদস্যদের সদস্য পদ বাতিল করে দেয়। স্বৈরশাসন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শাসন কায়েমের মূল অন্তরায় স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে অভিহিত জাতির বিবেক সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত হানা হয়। স্বৈরশাসনকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে সকল স্বৈরশাসকই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শাসনে অন্তরায় বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। '৭৫-এর জানুয়ারিতে তদনীন্তন একদলীয় আওয়ামী বাকশালীচক্র অত্যন্ত চাতুর্যের সহিত বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অন্যতম গ্যারান্টি হাইকোর্টের রীট জুরিডিকশন রহিত করে ৪টি সরকারি সংবাদপত্র ব্যতীত সকল সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়ে তদানীন্তন আওয়ামী বাকশালী সরকার প্রমাণ করেছিলেন সকল নির্বাচিত সরকারই গণতান্ত্রিক সরকার নয়। যে সংসদ সুশাসন ও সরকারের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে সে সংসদকেই ব্যবহার করা হয় ব্যক্তি ও পারিবারিক শাসন কায়েমের জন্য, মৌলিক গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক অধিকার রহিত করার জন্য।

www.pathagar.com

২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সন্ত্রাস, হত্যা, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও বেকার সমস্যা সমাধান ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে সরকারের ব্যর্থতা ও দেউলিয়াত্ব ঢাকার জন্য এবং জনগণের দৃষ্টি মূল সমস্যা হতে ভিন্নখাতে প্রবাহের বিশেষ উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগ, সংবাদপত্র জবাবদিহিতা বিতর্কে লিপ্ত করেছেন। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় সংসদের পবিত্র অঙ্গনে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন বলে মারাত্মক অভিযোগ তুলেছিলেন সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই তার বিরুদ্ধে আনীত রীট পিটিশন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বাতিল করে দেয় একই বিচারপতিদের ভূয়সী প্রশংসা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে প্রমাণ করলেন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সরকারের বিপক্ষে রায় হলে যেমন ভর্ৎসনা শুনতে হয় তেমনি পক্ষে রায় হলে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বিচারপতিদের ভূয়সী প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেন না। ইতিপূর্বে ইনডেমনিটি চ্যালেঞ্জের মামলা সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করায়ও সরকারের প্রশংসা পেয়েছিল বিচারপতিরা। এ জাতীয় আচরণের মাধ্যমে সরকারের মন্ত্রী, মিনিস্টার প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগকে প্রভাবান্বিত করতে চান কিনা জনমনে এ ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের একজন সম্মানিত বিচারক কয়েক মাস পূর্বে জাতীয় সংসদের নির্বাচন মামলায় ঢাকা জেলার আড়াইহাজার থানার এমপির নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে বিএনপি প্রার্থী আনোয়ার হোসেনকে বৈধভাবে নির্বাচিত বলে রায় দেয়ায় এবং রাজধানীর রমনা-তেজগাঁও নির্বাচনী এলাকায় ৫৫টি কেন্দ্রে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে রায় দেয়ায় ট্রাইব্যুনালের উক্ত বিচারক বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, এমনকি আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তি দ্বারা রায় পাল্টাবার তদবিরে ব্যর্থ হওয়ার পর উক্ত বিচারককে ঢাকা থেকে বদলি করা হয়েছে বরিশালে এবং বরিশালে তাকে সরকারি বাসার ব্যবস্থা না করে সার্কিট হাউজের একরুমে থাকতে বাধ্য করে মানসিকভাবে তাঁকে নিগৃহীত করা হয়েছে। যদিও নির্বাচনী মামলার শুনানির জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ হওয়ার কথা। কিন্তু বিচারক নিয়োগ ও বদলিসহ সব ব্যাপারেই নির্বাহী বিভাগ হস্তক্ষেপ করছে। এ জাতীয় হস্তক্ষেপেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিচারকদের কর্মকাণ্ডে এ জাতীয় নগ্ন হস্তক্ষেপ শুধু সুষ্ঠু ন্যায়বিচার পাবার পথে সীমাহীন অন্তরায় ও দুর্দশা সৃষ্টি করেনি, বিচার বিভাগ এক চরম হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় বিচার বিভাগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাসের সত্য এই যে, ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে তৎকালীন আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তি ও পারিবারিক শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যই গণতন্ত্রকে হত্যা করে একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করেছিল, রাজনীতি করার মৌলিক অধিকার হরণ করেছিল,

www.pathagar.com

সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো রহিত করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করে বিচার বিভাগকে কার্যত পঙ্গু করেছিল। স্বাধীন সংবাদপত্র প্রকাশের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে গণতন্ত্রের হাত-পা ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর গণতন্ত্র কবরস্থ হয়েছিল বলে বারবার ঘোষণা দিয়ে আত্মতৃপ্তি পেতে ভালোবাসেন। তাদের বক্তব্য ও আচার-অনুষ্ঠানে একদলীয় বাকশালী শাসনকে গণতান্ত্রিক আওয়ামী রূপ বলতে তারা কার্পণ্য না করে তারা ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট হতে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেশে গণতন্ত্র ছিল না বলে দাম্ভিকতার সহিত বক্তব্য দেয়। একদলীয় বাকশালী শাসনের সাথে পরিচিত এদেশের গণমানুষ বর্তমান আওয়ামী লীগের আচার-আচরণে পুনরায় বাকশালী গণতন্ত্রের আস্বাদ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। আওয়ামীগোষ্ঠী নিজেদেরকে যতই গণতান্ত্রিক বলে অহরহ প্রচার করছেন না কেন, তাদের কার্যক্রম ও গণতন্ত্রকে ক্রমান্বয়ে পক্ষাঘাত করে দিয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কেন্দ্রবিন্দু জাতীয় সংসদকে কার্যত অকার্যকর করা হয়েছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ পাকাপোক্ত করার মানসে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও বেকারত্বের দুর্বিসহ আঘাতে সমাজদেহ ক্ষতবিক্ষত। সাধারণ মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই অথচ এ অসহনীয় অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী নিজেদের জবাবদিহিতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে জবাবদিহিতা চাচ্ছে সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের। বিচার বিভাগ নিয়ে দায়িত্বহীন বক্তব্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছিল। উক্ত মামলার রায়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সার্বিক তথ্যনির্ভরশীল নয় বলে প্রধানমন্ত্রীকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে অধিকতর দায়িত্বশীল বক্তব্য জাতি আশা করে বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি।

ইদানীং নিম্নআদালত সম্পর্কে বিচারপতি লতিফুর রহমান ও বিচারপতি নাঈম উদ্দীন আহম্মদ কিছু শক্ত কথা বলেছেন। আজকের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদও প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন নিম্নআদালতে কিছু ত্রুটি রয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ যাবৎ শেখ হাসিনা ব্যতীত আর কোনো নির্বাহী প্রধানই বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা নিয়ে সরাসরি বক্তব্য প্রদান করেননি। হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রী জনগণের দৃষ্টি সরকারের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা থেকে ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্যই নতুন বিতর্কের দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন কি-না তা খতিয়ে দেখতে হবে।

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলে থাকাকালে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দীন ইউসুফ তৎকালীন জাতীয় সংসদে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ করার জন্য একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। এই বিলটি বেসরকারি

www.pathagar.com

বিল হিসেবে সংসদে বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। বিশেষ কমিটি কয়েকটি বৈঠকের পর উক্ত বেসরকারি বিলটি বিবেচনার জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিরোধী দল ৫ম জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ফলে বেসরকারি বিল হিসেবে তা জাতীয় সংসদে এ বিল পাস করা সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের নির্বাচন ইশতেহারে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনের ৪০ মাস অতিবাহিত হলেও এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ এখনও কোনো বিল সংসদে উত্থাপন করছেন না। বিরোধী দলে থাকাকালীন বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের বিল সংসদে আনা ব্যতীত বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনতা নিয়ে অনেক বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করলেও ক্ষমতায় যেয়ে এ বিষয়টি বেমালুম ভুলে গিয়েছে, না কি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছেন, তাই লক্ষণীয়। সরকারের আচরণে এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে কখনও আন্তরিক ছিলেন না এবং বর্তমানেও আন্তরিক নয়। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন।" কিন্তু সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ কার্যকরী করার ব্যাপারে এত গড়িমসি কেন?

মাননীয় রাষ্ট্রপতি সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগহীনতা লক্ষ্য করে কয়েকটি বক্তৃতায় এ বিষয়ে সরকারসহ দেশের সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের ব্যাপারে সবাইকে আন্তরিক উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের এ পরামর্শটুকু অন্তত আইনের কায়েমের স্বার্থে বাস্তবায়ন করা হবে বলে জনগণ আশা করে।

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী বলে দাবিদার বর্তমান সরকার সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এ যাবৎ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথকীকরণে দায়িত্ব পালন না করে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার বিতর্কে জড়াবার পেছনে কোনো সৎ উদ্দেশ্য কাজ করছে, নাকি বিশেষ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যাপারটি উত্থাপিত হচ্ছে তা গভীরভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিচারপতি নাঈম উদ্দীন আহমদ ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আইন সমিতির সেমিনারে বলেছেন, শতকরা ৩০% ভাগ বিচারকার্য হয় প্রভাবিত হয়ে। বিচারকগণ কার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, কিভাবে প্রভাবান্বিত, কেনইবা প্রভাবান্বিত হন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিম্ন আদালতের সম্পর্কটা কি তা দেখার প্রয়োজন সর্বাধিক। প্রধানমন্ত্রী যদিও বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার কথা একাধিকবার উল্লেখ করে প্রয়োজনে মামলা-মোকাদ্দমার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত

www.pathagar.com

বলে উল্লেখ করলেও বিচার বিভাগ কার কাছে জবাবদিহি করবেন সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ রয়েছেন। তার এ নির্লিপ্ততাতে এ কথা কি বলা যায় যে, মন্ত্রী, এমপিদের সংবিধান মোতাবেক জাতীয় জবাবদিহিতার বিধানের কথাই তিনি ভাবছেন। এ জাতীয় জবাবদিহিতা করে বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবে কি? বিচার বিভাগের কাজের ধরনে কি এ জাতীয় জবাবদিহিতা সম্ভব?

আমাদের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, ৯৬ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের পদের মেয়াদ, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন পদ্ধতি ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের দায়িত্ব, ১০৮ অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্ট একটি কোর্ট অব রেকর্ড হইবে এবং আদালত অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ দান বা দণ্ডাদেশ দানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।" ১০৯ অনুচ্ছেদে "হাইকোর্ট বিভাগে অধস্তন সকল (আদালত ও টাইব্যুনালের) উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিবে।" ১১০ অনুচ্ছেদে "অধস্তন আদালত হতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে।" ১১২ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা করিবেন; ১১৩ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীদের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিয়োগদানের কথা বলা হয়েছে; ১১৪ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা, ১১৫ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতের নিয়োগ; ১১৬ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা, ১১৬ (ক) বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালন ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে বলা হয়েছে। জাতীয় সংসদে আইন পাসের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সংবিধানের পরিপন্থী কোনো আইন পাসের এখতিয়ার জাতীয় সংসদের নেই। বহুল আলোচিত ৮ম সংশোধনী মামলার ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা দিয়েছে সংবিধানে Basic Structure-এর পরিবর্তন বা বিবর্তনের অধিকার সংসদের নেই। আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দেশের সংবিধানেরই সার্বভৌমত্ব রয়েছে, আর সবাইকে সংবিধানে সার্বভৌমত্বের আওতায় কাজ করতে হয়। সংবিধান প্রদত্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই।

বিচার বিভাগের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিবেচনা করে সংবিধানের অধীনে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন কায়েম, জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়ের হাত থেকে মানব সমাজকে রক্ষার জন্যই গণতান্ত্রিক সমাজে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বিচার বিভাগের কয়েকটি স্তর রয়েছে। নিম্ন আদালতে রয়েছে সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, সাব জজ, এডিশনাল জজ ও জেলা জজ। সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ।

www.pathagar.com

ব্রিটিশ আমলে দেশ পরাধীন ছিল বিধায় সরকারের জবাবদিহিতা না থাকলেও ইংরেজরা বিচার বিভাগের একটা জবাবদিহিতা চালু করেছিলেন। ব্রিটিশ আমলের পর পাকিস্তান আমল, এরপর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আদালতের কার্য একই পদ্ধতিতে রয়ে গেছে। সহকারী জজ থেকে জেলা জজ তাদের দৈনন্দিন কাজের ডাইরি লিখে রাখেন। মাসের শেষ জজ সাহেবদের একটি বড় ফরমে পুরো মাসের কাজের ফিরিস্তি লিখে জমা দিতে হয়। কখন কোর্টে উঠলেন, দিনের কজ লিস্টে কয়টি মামলা রয়েছে, কয়টি মামলা মুলতবি হয়েছে, কি কারণে মুলতবি করতে হয়েছে, কয়টি মামলার শুনানি হয়েছে, কতজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে, জেরা হয়েছে কতজন সাক্ষীর, রায় লেখা হয়েছে কতটি– সবই বিস্তারিত লিখতে হয় দৈনিক ডায়েরিতে। ঐ ডায়েরি দেখে জজের মাসিক কার্যবিবরণী ফরম পূরণ করেন স্টাফ এবং জজ সাহেবদের ফরমে নিজেরা স্বাক্ষর দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রেরণ করেন। এসব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে যাথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিতর্কে জড়ানোর সুযোগ অনেকটা হ্রাস পাবে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছেন, উন্নতমানের Management-এর মাধ্যমে নিম্নআদালতের অনেক ত্রুটি দূর করা সম্ভব। Effective Supervision এবং Better Management-এর মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠা সম্ভব, অহেতুক সমালোচনা করে তা অর্জন করা যাবে না। সহকারী জজ আদালতে মামলার রায় অসন্তুষ্ট ব্যক্তির সাব জজ, জেলাজজ অতঃপর হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার বিধান রয়েছে। এ ব্যবস্থায় নিম্ন আদালতের সুপ্রিম কোর্টের নিকট জবাবদিহিতার শামিল।

আইন বিভাগকে সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথকীকরণ করা হলে Effective Management এবং Better Supervision অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন না করে বিচার বিভাগকে প্রভাবান্বিত করার অনাকাংক্ষিত উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে কি-না তা পরীক্ষা করে সচেতন নাগরিকদের দেখতে হবে।

বিচার বিভাগ ও পার্লামেন্টের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছে ইংল্যান্ডে কয়েক শতাব্দী যাবৎ। পার্লামেন্টের Supremacy রয়েছে নাকি বিচার বিভাগের Supremacy এ বিতর্কের অবসান ঘটেছে। পার্লামেন্ট এবং বিচার বিভাগকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে Supremacy-এর স্বীকৃতির মাধ্যমে পার্লামেন্টের যেমন Legislative Supremacy রয়েছে, তেমনি আদালতের রয়েছে Judicial Supremacy। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ন্যায়ভিত্তিক সুশাসন কায়েম, জনস্বার্থ ও গণমানুষের অধিকার রক্ষার জন্যই ইংল্যান্ডের বিচার বিভাগ ও পার্লামেন্ট তাদের সুদীর্ঘ দিনের Conflict-এর অবসান ঘটিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগৃহ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতার আলোকেই বাংলাদেশে সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের

www.pathagar.com

পৃথকীকরণের বিধান রাখা হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমান বিশ্বে ইংল্যান্ডে তুলনামূলকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার কম হচ্ছে।

ন্যায়বিচারের মূল উৎস সুষ্ঠু তদন্ত, সঠিক সাক্ষী-প্রমাণ/তদন্ত সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে, সাক্ষী-প্রমাণ যথাযথভাবে উত্থাপন করা না হলে বিচারকের পক্ষে সঠিক রায় প্রদান কি করে সম্ভব তা সবার ভেবে দেখতে হবে। আধুনিক যুগে সাক্ষ্য আইন বিচারকদের রায়ের মূল উৎস।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখ্য মহানগরের হাকিমের নিকট আসামিদের জামিনের কারণ জানতে চাইলে তদানীন্তন মুখ্য মহানগর হাকিম (১) ত্রুটিপূর্ণ এজাহার, (২) ত্রুটিপূর্ণ জব্দতালিকা (৩) মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতে বিলম্ব (৪) গ্রেফতার থাকা অবস্থায় নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানো (৫) রিমান্ড (৬) তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তন, (৭) চার্জশিটে ত্রুটি, (৮) চার্জশিট প্রদানে বিলম্ব, (৯) সাক্ষীর অভাব, (১০) সাক্ষ্য-প্রমাণের অপর্যাপ্ততা ও বিলম্ব এবং (১১) রাষ্ট্রের পক্ষে মামলা সঠিকভাবে উত্থাপন না করাকে চিহ্নিত করেছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে শুধু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

ইদানীং মারাত্মক মামলার তদন্ত চলাকালে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিরোধী দলকে এসব মারাত্মক অপরাধের জন্য দায়ী করে বক্তৃতা দেয়ায় জনমনে প্রশ্ন জেগেছে, তাদের অধীনস্ত তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক নিরপেক্ষ সুষ্ঠু তদন্ত সম্ভব নয়। তাই বিচার বিভাগের অধীনে নিরপেক্ষ তদন্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা ন্যায়বিচারের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করতে হবে। সর্বোপরি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মার্যাদা রক্ষায় বিচার বিভাগেরও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

এম, এ, হাকিম

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা

ডেটলাইন ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের .... অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।' অনুরূপভাবে ৩২ অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে– 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।' উপরে বর্ণিত নাগরিকদের আইনগত মৌলিক অধিকারসমূহ কেবলমাত্র বিচার বিভাগের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। বিচার বিভাগকে সুষ্ঠু, সাবলীল ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে হলে বিচারক ও বিচারকার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সরকারের নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে। দেশের আইনে এমন কোনো ব্যবস্থা রাখা চলবে না যাতে করে সরকারপ্রধান বা নির্বাহী বিভাগের কোনো কর্মকর্তা বা সংস্থা বিচারকার্যের কোন পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–'রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন'। সংবিধানের এ ধারামতে যথাযথ আইন প্রণয়ন করে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা যায়। এর জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। হাইকোর্ট থেকে বেশ কিছুদিন পূর্বে এক রায়ে বলা হয়েছে যে, বিচার বিভাগ পৃথক করার জন্য সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই।

আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলেছিল যে, বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলনীতি অনুসারে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকাকালীন পঞ্চম সংসদে একটি বেসরকারি বিল এনেছিল বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর ৩ বছর ৩ মাস পার হয়ে যাওয়ার পরও আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের মৌলনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের কোনো আইন প্রণয়ন করছেন না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় দৈনিক ও বার্তা

www.pathagar.com

সংস্থাসমূহের সম্পাদকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, বিচার বিভাগ ও সংবাদ মাধ্যমেরও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব শুধু সরকার ও জনপ্রতিনিধিদেরই নয়, সংবাদ মাধ্যম এবং বিচার বিভাগেরও জনগণের নিকট জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার নতুন আইন প্রণয়নের চিন্তা-ভাবনা করছেন। উল্লেখ্য যে, দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ তারিখে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তদানীন্তন পার্লামেন্টে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী আইন পাস করা হয়। ৪র্থ সংশোধনীর পূর্বে বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটিমঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলা বিধান এর ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। ৪র্থ সংশোধনীর পর তা ন্যস্ত করা হয় প্রেসিডেন্টের ওপর। উক্ত সংশোধনীতে আরও বিধান করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের নিয়োগদান করবেন এবং বিচারকগণ প্রেসিডেন্টের সন্তুষ্টি মোতাবেক তাদের পদে বহাল থাকতে পারবেন। এমনিভাবে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হাইকোর্ট/সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। পাবনা জেলায় একটি বৈদ্যুতিক টাওয়ার ভেঙে সরকার নাশকতামূলক কাজের অভিযোগে সাবেক মন্ত্রীসহ ৪ জন বিএনপির নেতাকে গ্রেফতার করেন এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশন দেন। গ্রেফতারকৃত নেতাদের পক্ষে হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করায় হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ সরকারের আটক আদেশ অবৈধ ও বেআইনী বলে ঘোষণা পূর্বক নেতৃবৃন্দকে মুক্তির আদেশ দেন। সাথে সাথে প্রত্যেক গ্রেফতারকৃত নেতার জন্য সরকারকে ১ লাখ টাকা করে জরিমানা করেন। কয়েক মাস পূর্বে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ফৌজদারি কেসে আটককৃত ৩৫৭ জন ব্যক্তিকে জামিন প্রদান করা হয় (যদিও কোনো কোনো পত্রিকা ১২০০ জনকে জামিন দেওয়া হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রীও ১২০০ জনকে জামিন দেওয়া হয়েছে বলে সাংবাদিকদের নিকট বলেছিলেন) এবং এজন্য প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে অত্যন্ত নাখোশ হয়ে সংশ্লিষ্ট বিচারপতি সম্পর্কে বক্রোক্তি করেন। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হলে সুপ্রিম কোর্ট প্রধানমন্ত্রীর এরূপ মন্তব্য ও বক্তব্যকে অশোভনীয়, অনভিপ্রেত ও দায়িত্বহীন বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে দেন। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগ তথা উচ্চতর আদালতের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয়। সর্বশেষ বিএনপির দু'জন এমপির সরকারের প্রতি/উপমন্ত্রী বানানোর কারণে তাদের সংসদ সদস্য পদ বাতিল সম্পর্কে স্পীকারের অন্যায্য সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য আদেশ দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী আরেকবার রেখে গেছেন নিঃসন্দেহে। এ

www.pathagar.com

সবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিমের জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে হাইকোর্ট সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা, যা সম্পূর্ণ নজিরবিহীন। বিচার বিভাগকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করার অভিলাষে সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদে সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তির সুযোগ গ্রহণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারকদের স্বাধীনতা হরণ সম্পর্কে এরূপ সাংঘাতিক বক্তব্য রেখেছেন।

এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধীরে ধীরে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে দলীয়করণের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছেন। আইনের নিজস্ব গতি বলতে কোথাও নেই। সচিবালয়, ডাইরেক্টরেট, জেলা ও থানা পর্যায়ের প্রশাসনকে চাপ, প্রলোভন ও অন্যান্য পন্থায় আওয়ামী প্রশাসনে পর্যবসিত করা হয়েছে। সচিব থেকে শুরু করে সহকারী সচিব, ব্যাংক, বীমা ও করপোরেশন ও স্বশাসিত সংস্থার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে কুখ্যাত জনতার মঞ্চের আওয়ামী সমর্থক অফিসারদের বসানো হয়েছে। তাদের দাপটে নিরপেক্ষ ও সৎ কর্মকর্তারা চুপ হয়ে গেছেন ও কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলছেন। বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা, কৃষি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়োগের মাপকাঠি হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য। পুলিশ প্রশাসনে থানার ওসি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামীকরণ করা হয়েছে, যার ফলে সাধারণ জনগণ আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের হুকুম ছাড়া থানায় কোনো কেস নেওয়া হয় না, যার ফলে আইনের শাসনের মূল উদ্দেশ্য–'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সর্বোপরি নিম্নতর আদালত বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টগুলো চলে গেছে প্রত্যক্ষ সরকারী নিয়ন্ত্রণে, এতে করে এ পর্যায়ে ব্যক্তিসাধারণ ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রশাসনের ছত্রছায়ায় বিভিন্ন নির্যাতন ও অবিচারের শিকার হচ্ছে।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। সংবিধানের ১১৬-ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকর্ম পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।' আইনের শাসন ব্যবস্থায় দেশের নাগরিকবৃন্দ ও সরকার উভয়েই নিরাপদ থাকতে পারে। সরকার যদি আইনের বিধিবিধান লংঘন করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করার প্রয়াসী হয় তবে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে। সংবিধানের মৌলনীতি ও বাধ্যবাধকতাকে উপেক্ষা করে যারা স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জবাবদিহিতার নামে বিচার বিভাগকে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে চান, তারা আসলে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চান না; বরং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগকে ধ্বংস করতে চান। দেশ ও জাতির জন্য এটা মোটেই শুভ নয়।

www.pathagar.com

বিচারকার্যে নিয়োজিত সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা রয়েছে এভাবে যে, নিম্ন আদালতের আদেশ/রায় সম্পর্কে সংক্ষুব্ধ পক্ষ/ব্যক্তি উচ্চতর আদালতে আপিল করতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট/সহকারী জজের সিদ্ধান্ত জেলা জজকোর্টে আপিলের মাধ্যমে পরিবর্তন, সংশোধন, বাতিল বা বহাল রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে জেলা জজের আদেশ/রায় হাইকোর্টে আপিলের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা যায়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়। এ ছাড়া বিচার বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ প্রশাসনিকভাবে তাদের কার্যাবলীর জন্য সরকারের কনডাক্ট রুলস এবং শৃংখলা ও আপিল বিধির আওতাধীন। তাদের যে কোনো বেআইনী কার্যকলাপ ও অসদাচরণের জন্য উক্ত আইনের আওতায় তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ সংবিধানে বিধান মতে নিয়োজিত হন এবং ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকেন। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্য দু'জন প্রবীণতম বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত) কোন বিচারককে তার শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অযোগ্য হলে অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হলে রাষ্ট্রপতির নিকট তদন্ত সাপেক্ষে রিপোর্ট করতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা উক্ত বিচারক কে তার পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। এ থেকে দেখা যায় যে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণেরও সাংবিধানিকভাবে জবাবদিহিতা রয়েছে। এরপরও বিচারকগণকে নির্বাহী বিভাগের তথা প্রধানমন্ত্রীর নিকট জবাবদিহিতা করার প্রয়াস বা চিন্তা-ভাবনা দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। আদালত ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সকল সভ্য দেশেরই কাম্য। কেননা, তারাই হচ্ছেন সংবিধানের পবিত্রতার সংরক্ষক এবং গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার মানবাধিকারের চূড়ান্ত রক্ষাকবচ। আইনের শাসনই দিতে পারে নাগরিকদের সরকারের অন্যায় ও নিবর্তনমূলক কার্যকলাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়।

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

গণতন্ত্র ও আইনের শাসন

ড: আফতাব আহমাদ ও ড: মাহাবুব উল্লাহ: আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতি

ড: এ কে এম শাহাদত হোসেন মন্ডল: দেশ আজ কোন পথে?

লে: ক: (অব:) এম এ লতিফ খান: সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের কালো অধ্যায়

মোবায়দুর রহমান: অবৈধ অস্ত্রের ভাণ্ডার এই বাংলাদেশ

শহিদুল ইসলাম: আওয়ামী শাসনে দেশ দুর্বৃত্তের স্বর্গরাজ্য

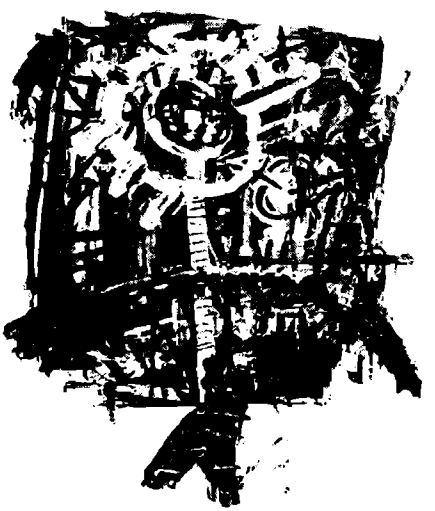

www.pathagar.com

প্রফেসর আফতাব আহমেদ ও প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতি

ডেটলাইন ঃ ২৪ অক্টোবর ১৯৯৯

মাহবুব উল্লাহ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কখনই খুব একটা ভালো ছিল না। বিশেষ করে '৭২-৭৫ রক্ষীবাহিনীর নির্মম নিপীড়ন এবং একদলীয় শাসনের কঠোরতা ও নির্মমতা এ দেশের দেশপ্রেমিক সাহসী যুবসমাজকে অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। রাজনীতি যখন তার সুস্থ ও স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয় না, এই স্বাভাবিক স্রোতকে যখন অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়, তখনই রাজনীতি একটা অস্বাভাবিক অবস্থার দিকে ধাবিত হয়। সেই জন্য রাজনীতি বিজ্ঞানীরা বলেন, স্বাভাবিক গতি প্রবাহকে, মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে, মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে কখনই নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে নেই এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যখনই ক্ষুণ্ন হয়, তখনই তা মানুষের অগণতান্ত্রিক পন্থা বেছে নিতে উৎসাহিত করে। তৎকালীন রক্ষীবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কারও কারও মতে এই দেশে ৩৭ হাজার, কারও মতে ৪২ হাজার যুবক নিহত হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো সরকারের আমলে এ ব্যাপারে কোনো তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি তখনকার এই ব্যাপারে নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানাভাবে, তাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের এই ক্ষতির জন্য সমবেদনা বা দুঃখ প্রকাশ করাও হয়নি। জিয়াউর রহমান এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর বহুদলীয় রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করে দেন এবং তিনি নিজে একজন সেনানায়ক হওয়া সত্ত্বেও দেশে গণতান্ত্রিক বিধিবিধান চালু করেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, তার রাজনীতি ছিল জাতীয় সমঝোতার রাজনীতি। সেখানে বহুদল থাকবে, বহুমত থাকবে, কিন্তু কেউ কারও বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না এবং জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে না—এটাই ছিল তাঁর নীতি। এর ফলে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আগে বেআইনী ছিল, তাদেরকেও তিনি প্রকাশ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং এই সুযোগ বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি, নকশালপন্থী থেকে শুরু করে ইসলামী দলগুলো সকলেই গ্রহণ করেছিল। ফলে এর একটা শুভ প্রভাব সমাজের মধ্যে পড়েছিল এবং আমরা নিরাপদে রাতে ঘুমাতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জিয়াউর রহমান তাঁর আরদ্ধ কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। কারণ , ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে হত্যা করেছিল। পরবর্তী সময়ে দেশে সামরিক শাসন আসে এবং এই সামরিক শাসনের সময়ে স্বাভাবিক রাজনীতির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে দেশে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, আন্দোলন ইত্যাদি হতে থাকে। এরপর যখন

www.pathagar.com

নব্বুইয়ের গণআন্দোলনের পথ ধরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুভ সূচনা হল, দেশে সুস্থ রাজনীতি করার একটা সুযোগ হল, তারপরেও আমরা দেখতে পেলাম যে, দেশে সেভাবে রাজনৈতিক সহমতের ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই না হওয়ার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, সেটা নীতি নির্ধারণের ভুলের কারণে হতে পারে। এরপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয় এবং এরা ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই প্রথমদিন তাদের কর্মীদের হাতে এক যুবক নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় এবং সে ছিলো বিরোধী দলেরই একজন কর্মী। এরপর বহু দুর্ভাগ্যজনক, লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগজনক, আতঙ্কজনক যে ক'টি ঘটনা সারা জাতিকে যেভাবে বিমূঢ় করে দিয়েছে, সারা জাতি যেভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কুষ্টিয়ায় জনসভা চলাকালে জাসদ নেতা কাজী আরেফসহ ৫ জনের নির্মম হত্যাকাণ্ড। তার পর পরই ঘটল পার্শ্ববর্তী যশোর উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা—যাতে ১০ জনের মতো নিহত হল, আরও বহু লোক আহত হল। সেই বোমা কারা পেতেছিল, এর উৎস কোথায় ছিল, এর পেছনে কারা ছিল, কী উদ্দেশ্যে তারা এটা করেছিল, সেটা কিন্তু দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়নি। সম্প্রতি বিরোধী দলের এক নেতাকে জড়িয়ে এ নিয়ে মামলা হয়েছে। কিন্তু তদন্তে এটাও দেখা যাচ্ছে যে, এ ঘটনার সাথে সম্ভবত সরকারি দলের স্থানীয় জনৈক নেতা জড়িত ছিলেন। সুতরাং এ ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। এরপরে আমরা বারবার শুনতে পেলাম দেশে একটা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে। আবার হত্যার রাজনীতি শুরু করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বিরোধী দল শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের রক্ষা করার জন্যেই সরকারকে উৎখাত করা এবং দেশ একটা অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য তৎপর রয়েছে এবং নানান ধরনের Cock and bill stones করা হচ্ছে, সব অমূলক কাহিনী করা হচ্ছে, ফাঁদা হচ্ছে। শোনা গেল, চট্টগ্রামের এক নিরীহ যুবক নূরুল আবছার এক ভয়ানক, মারাত্মক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের সাথে জড়িত এবং সে দেশে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চেয়েছিল। একটি ভূয়া ফ্যাক্সের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার ওপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়। কিন্তু পরে জানা গেল, এ ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতার বা কোনো চক্রান্তের সাথে তার কোনো আদৌ সম্পর্ক নেই। হাল আমলের অতি সম্প্রতি গত দু'মাসে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। জনকণ্ঠ অফিসে রেখে যাওয়া একটি ব্রিফকেস মারাত্মক ধরনের ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন আবিষ্কার হয়েছে। এরপরে খুলনার এক কাদিয়ানী উপসনালয়ে দুটো বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত হল। সেই সাথে ঢাকার কাদিয়ানী অফিস থেকেও দুটো বোমা উদ্ধার করা হয়। ঢাকার মিরপুরে একটি মসজিদ থেকেও বোমা উদ্ধার কর হল। কিছুদিন আগে বলা হল যে, প্রধানমন্ত্রী ইউনেস্কো পুরস্কার নিয়ে দেশে ফেরার পর তাকে পল্টন ময়দানে যে সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে যাওয়ার পথে বিজয়নগর থেকে পল্টন ময়দান পর্যন্ত কোনো একটি স্থানে বোমা নিক্ষেপ করে তাকে

www.pathagar.com

হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এ ছাড়া এসব ঘটনার ফলে সারাদেশে এক ধরনের আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঢাকার অনেক বহুতল আবাসিক ভবনেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সামান্য বাক্স বা কোনো কার্টুন পড়ে থাকতে দেখলেই লোকজন আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালাতে থাকে। পরে পুলিশ ডাকা হয়, সেনাবাহিনীর লোকজনও ডাকা হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, এসব ঘটনাগুলো যখন ঘটছে, তার আগে সেগুলো নিরোধ করা বা সেগুলো যাতে না ঘটে, সেজন্য নিরপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। অথচ পরে পেতে রাখা বোমা বা মাইন আবিষ্কার করা হয়। এ ধরনের মারাত্মক মারণাস্ত্র দেশের কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া এগুলো হ্যান্ডল করার জন্য খুব দক্ষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেনাবাহিনী এগুলো উদ্ধার করার পর এগুলোকে ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা হল, তারপরও সেগুলো বিস্ফোরিত হল না। অতঃপর সেগুলোকে সেনাবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করা হল। তাহলে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু খুলনার মসজিদের ঘটনাটা ছাড়া —যে বোমা বা মাইন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো কার্যকর অবস্থায় ছিল না। সেগুলো পুতে রাখা হয়েছিল হয়ত বিশেষ কোনো মতলবে বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। পৃথিবীতে দেখা গেছে, স্বৈরশাসকরা তাদের প্রতিপক্ষকে বা অপজিশনকে দমন করার জন্য নান ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। যেমন— হিটলার রাইখ্‌সট্যাগে আগুন দিয়ে বক্তৃতায় বললেন, কম্যুনিস্টরা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চাচ্ছে। তারপরে কম্যুনিস্ট দমনের জন্য হিটলার তৎপরতা শুরু করলেন এবং আপনারা জানেন, হিটলারের শাসন শেষ পর্যন্ত একটা মারাত্মক ধরনের ফ্যাসিস্ট শাসনে পরিণত হয়েছিল এবং এই ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করার জন্যই একটা অজুহাত বা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা, জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার জন্যই এই সমস্ত ঘটনাগুলোর অবতারণা করা হয়। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে এই যে একের পর এক ভয়াবহ কতগুলো ঘটনা ঘটেছে, এগুলো যদি সত্য হয় এবং সত্যি সত্যিই যদি কোনো সন্ত্রাসীরা এই নাশকতামূলক কাজগুলো করে থাকে, সেটা যেমন খুবই অশুভ ইঙ্গিত দেয়, ঠিক পাশাপাশি মিথ্যেমিথ্যি শুধুমাত্র কাউকে ফাঁসিয়ে দেয়া বা বিপদে ফেলার জন্য যদি এগুলো করা হয়, সেটাও কিন্তু সমানভাবে মারাত্মক এবং বিপজ্জনক। এ ছাড়া রাজনৈতিক মহল দাবি করেছে যে, আওয়ামী লীগের দুঃশাসন, অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ দিন দিন তীব্র হচ্ছে। জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই কারণে সম্ভাব্য একটা গণআন্দোলন সৃষ্টির যে পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, তা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার জন্যই এটা করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এসব ঘটনার সুযোগে বিরোধী মত বা বিরোধী দলের লোকদের বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেফতার করে নিপীড়ন, নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে এগুলো করা হচ্ছে বলে অনেকে ধারণা করছে। এ ছাড়া আমরা দেখেছি, সরকার জননিরাপত্তা আইন প্রণয়নের প্রস্তাব কেবিনেটে পাস করেছে এবং সেটা সংসদে পাস করিয়ে নেয়ার

www.pathagar.com

উদ্যোগ তাদের আছে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গেছে এবং তিনি এই আইনের কিছু কিছু বিধান সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছেন। এমনও তো হতে পারে, এ ধরনের মারাত্মক অধিকারহরণকারী ল'কে এনেক্ট করার জন্য একটা যে পরিবেশ বা অজুহাত সৃষ্টি করা দরকার, সেজন্যই এগুলো করা হচ্ছে। অন্যদিকে এই ঘটনাগুলোর আরেকটা দিক রয়েছে, যার সাথে আরেকটা নতুন মাত্রা জড়িত হয়েছে। সেটা হচ্ছে ধর্মীয় সংঘাতের মাত্রা এবং যারা আজকে বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে খর্ব করতে চায় বাংলাদেশকে তাদের ইচ্ছা ও নির্দেশ মতো পরিচালনা করতে চায় সেই বিদেশী গোষ্ঠীর একটা চেষ্টা থাকতে পারে, বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার। আমরা পাকিস্তানের রাজনীতি যদি লক্ষ্য করি, সেখানে আমরা দেখব যে, ধর্মীয় দিক থেকে পাকিস্তান মোটামুটি একটা হোমোজেনাশ কান্ট্রি। সেখানে শতকরা ৯৯ জনই মুসলমান। তৎসত্ত্বেও সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি, মোহাজির এবং স্থানীয় সিন্ধী মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় শত শত লোক নিহত হচ্ছে। পাকিস্তানের বাণিজ্য বন্দরনগরী করাচী প্রায় অচল হয়ে গেছে। এ ছাড়া গত কিছুদিনে শিয়া-সুন্নীদের বিরোধের সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু সাম্প্রতিককালে ২৮ জন শিয়া-সুন্নী বিরোধে নিহত হয়েছে। এগুলোকে খুব ছোট ঘটনা হিসেবে দেখা যাবে না। এর পেছনে যারা রয়েছে তারা ঐ রাষ্ট্রের শত্রু। যারা ঐ রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের বীজকে ব্যবহার করে সেই রাষ্ট্রকে ভেঙে তছনছ করে দিতে চায়—এটা তাদেরই ষড়যন্ত্রের বা নীলনকশার একটা অংশ বলে অনেক সন্দেহ করেন। সুতরাং সেখানেও রিলিজিওএথনিক গোষ্ঠীর ঐক্যের প্রয়োজনটি বেশ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশেরও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে মুসলামদের মধ্যে কি ওহাবী, কি সুন্নী, এই নানান ফেরকার কথা তুলে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালান হচ্ছে। দেয়ালের লিখন যদি আমরা পড়ি, তাহলে আমরা দেখব, ইসলামের মধ্যে যে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে—একগোষ্ঠী অন্যগোষ্ঠীকে অত্যন্ত কুৎসিত ও আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণ করছে। এর ফলে জনঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আজকে এসব কিছু বিবেচনা করে আমাদের ভাবতে হবে যে, দেশের ভিত্তির বিরুদ্ধে যেমন এই সরকার অনেকগুলো কাজ বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে ইতমধ্যেই করে ফেলেছে। এই সমস্ত ঘটনার পেছনে কোনো বিদেশী শক্তির হাত আছে কিনা, সে ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং তার ভিত্তিতে যথাযথ বিচারও হওয়া উচিত বলে জনগণ মনে করে।

আফতাব আহমাদ : সারাদেশে বর্তমানে বিরাজ করছে বোমাতঙ্ক। একটি ত্রাসের পরিবেশের মধ্যে মানুষ বসবাস করছে এবং এভাবেই দেশের মানুষ একটি ত্রস্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে। এই শাসনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন

www.pathagar.com

গোষ্ঠী তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটিকে চরিতার্থ করতে চাইছে। সেই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটিকে আজ আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমরা জানি, ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত বর্তমানের ক্ষমতাসীন দলটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং এই দেশের মানুষের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্খাকে ভুলুণ্ঠিত ও পদদলিত করে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো একদলীয় স্বৈরশাসন। এদেশের মানুষের মৌলিক, নাগরিক, মানবিক অধিকার হরণ করে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে এবং প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে যে গণবিরোধী লুটপাটের শাসন আওয়ামী গোষ্ঠী চালিয়ে ছিল, সে জন্য তারা যেমন ধিকৃত হয়েছিল, তেমনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহু যোজন দূরে নিক্ষিপ্তও হয়েছিলো। ১৯৯৫-৯৬-এ আওয়ামী লীগ এ দেশের দুর্বল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে অনিয়মতান্ত্রিক, বিধানবিরোধী সন্ত্রাসী ও সহিংস রাজনীতি শুরু করেছিল, তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল তারা কী চাইছিল। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে দলে দলে বিরোধ, মতদ্বৈততা থাকতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে, একদল আরেক দলকে মোকোবিলা করতে পারে। কিন্তু জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ফেলার মতো হীন কাজ কেবলমাত্র দেশদ্রোহী এবং রাষ্ট্রঘাতী চক্রের পক্ষেই সম্ভব। '৯৫-৯৬-এ আমরা লক্ষ্য করেছি, কীভাবে রেলস্টেশন ধ্বংস করা হয়েছে, রেললাইন উপড়ে ফেলে কীভাবে রেলের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে। বন্দরের বিভিন্ন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছিলো পরিস্থিতি, সে সবই আজ ইতিসাসের বিষয়বস্তু। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের কাছে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর দলের '৭২-৭৫ সময়ের অপকর্মের জন্য এবং কাকুতি-মিনতি করে বলেছিলেন দেশ শাসনের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে আর একবার দেশবাসী যেন অন্তত একটি সুযোগ দান করে। '৯৬-এর নির্বাচন সম্পর্কে আজ আর কারও মনে কোনো সংশয় নেই যে, নানা কুটচাল, কৌশল এবং কারসাজির মধ্যে দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করে এই দলটি ক্ষমতায় এসেছিল। ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় পুনরেকত্রীকরণ, জাতীয় পুনর্গঠনের এবং জাতীয় সমঝোতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, জাতিকে আরও নির্মমভাবে বিভক্ত করার জন্য একের পর এক তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সবকিছুতে ক্ষমতাসীন দলের প্রধানের জন্মদাতার স্বপ্ন খুঁজে পাওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে এই জাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন—সব কিছুর দলীয়করণ করে এবং একমাত্র দাবিদার ও প্রতিনিধিত্বকারী সেজে গোটা জাতির সঙ্গে চরম প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কাজটি হাসিনার আওয়ামী লীগ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। আওয়ামী শাসকচক্র বাংলাদেশকে ভারত-নির্ভরশীল একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভারতের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নীতি থেকে শুরু করে নানা ধরনের চুক্তি-

www.pathagar.com

বিশেষ করে গঙ্গার চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশকে আজ কার্যত একটি প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। দেশকে ফালি ফালি করে তার মধ্যে দিয়ে ভারতের সামরিক বাহিনীকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গমনাগমনের জন্য ট্রানজিট/ট্রান্সশিপমেন্টের নামে মিলিটারী করিডোর দেয়ার জন্য যেভাবে ক্ষমতাসীন দল উঠে পড়ে লেগেছে, সেটি আজকে এ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ তার এই রাষ্ট্রঘাতী, গণবিরোধী, এই বাংলাদেশে বিরোধী তৎপরতাকে ক্যামাফ্লাজ করার জন্য, জনগণের দৃষ্টি থেকে নাশকতামূলক কার্যক্রমকে আড়াল করে রাখার জন্য, সংগোপনে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজটি সুচারুভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য হাসিনা ও তার স্থাবকেরা একের পর এক ঘটনার এমন বিকৃত অথচ ব্যাপক প্রচার দিতে সক্ষম হয়েছে যে, জনগণ মাঝে মাঝে সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ক্ষমতায় আসার পরদিন থেকেই এই দলটি একটি 'পেট থিওরি' দাঁড় করায়– 'প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে'। সত্যি বলতে কি, একটি দেশের সরকার প্রধানকে যদি হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে, এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক তো আর কিছু হতে পারে না এবং দেশের যে কোনো নাগরিক চাইবেন যে, এই ষড়যন্ত্রের হোতা কারা, এই ষড়যন্ত্র কোথায় সংঘটিত হচ্ছে এবং ষড়যন্ত্র কীভাবে ফাঁস হল এবং ষড়যন্ত্র পরিপূর্ণভাবে নির্মূল হয়েছে কি-না, তার আদ্যোপান্ত তথ্য এ দেশের জনসাধারণকে অবহিত করা হোক। আজ পর্যন্ত সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের তরফ থেকে ষড়যন্ত্রের প্রকৃত চেহারাটা কী, কারা এই ষড়যন্ত্রের শরীক ছিল, এটি তুলে ধরা হয়নি এবং যতবারই প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়, ততবারই দেখা যায় যে, এ দেশের মানুষ বিদ্রূপাত্মকভাবে এই বক্তব্যটিকে গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি লক্ষ্য করা গেছে, ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে তাদের একেকটি সন্ত্রাসী চক্র যখন প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলভুক্ত সন্ত্রাসীচক্রকে আক্রমণ করে কিংবা পাল্টাপাল্টি গোলাবর্ষণ করে, তার দায়-দায়িত্ব বিরোধী দলের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়। এই প্রসঙ্গে আমি এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভেতরে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার সাথে কলহে লিপ্ত হওয়ার পর পত্র-পত্রিকায় খবর বেরুলো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার এক বিশাল ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদঘাটনের জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটিও নাকি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু দেশবাসী আজ পর্যন্ত কী সেই ষড়যন্ত্র ছিল, কারা এই গুলি নিক্ষেপ করেছিল, তার কিছুই জানতে পারেনি। যেটুকু জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্র ধরে, যেখানে নানা ধরনের নানা স্তরের কর্মচারী-কর্মকর্তা রয়েছেন—সেই সূত্র থেকে যেটা জানা গেছে, তা হলো এই যে, স্বয়ং শেখ হেলালের পিস্তল থেকেই গুলিটি বেরিয়েছিল এবং এখানে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার কোনো ব্যাপারই ছিল না। আমরা পত্রিকায় দেখেছি, রকেট লাঞ্চার নামক একটি যন্ত্র নাকি

www.pathagar.com

আবিষ্কার হয়েছিল কোনো এক জায়গায় এবং প্রধানমন্ত্রীকে মারার জন্যই নাকি এই যন্ত্রটি এদেশে আনা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তদন্তে দেখা গেল যে, ওটি আদৌ একটি রকেট লাঞ্চার নয়। এই যে ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে-এ নিঃসন্দেহে বিচলিত হবার বিষয় এবং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিরোধী দলকে দলন এবং দমন করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। হিটলার রাইখ্‌সট্যাগ পুড়িয়ে দিয়ে কমিউনিস্টদের ওপর দোষ চাপিয়ে সারাদেশে একটি দলন-পীড়নের জন্যই যে চারদিকে এই সন্ত্রাসের কল্পকাহিনী, এই বোমাতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এর আরও একটি মাত্রা আছে। এ দেশের মানুষ লক্ষ্য করছে, আপনি-আমি জানি যে, গত ক'মাস ধরে বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর চতুর্দিকে ভারতীয় আগ্রাসী শক্তি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর একের পর এক আক্রামণ পরিচালনা করছে। এমন কি সময় সময় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের বেশ গভীরে প্রবেশ করেছে তারা। সিলেটে এক পর্যায়ে তারা প্রায় ৩ মাইল গভীরে প্রবেশ করেছে। আমরা এও দেখেছি, পঞ্চগড়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য দু'দিন থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ পরিচালনা করেছিল ভারতীয় বিএসএফ। এসবের বিরুদ্ধে সরকারের যেমন কোনো প্রতিবাদ নেই, তেমনি জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য জনগণ যাতে এই সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ না হয় এবং ভারতের বিরুদ্ধে যাতে বোমাতঙ্কের নামে মানুষকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে এসব অভিনব ষড়যন্ত্রের কাহিনী পত্র-পত্রিকায় ছাপছে এবং এর ব্যাপক প্রচার দিচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয়, যখনই সন্ত্রাসমূলক কোনো ঘটনা ঘটে বা এই কাল্পনিক বোমাতঙ্ক যখন ছড়ান হয়, বিশাল আকারে বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া বা পত্র-পত্রিকায় আমরা লক্ষ্য করি, ব্যানার হেডিং দিয়ে এগুলো যেভাবে ছড়ান হয় এবং সে কাহিনী যখন কোনো পাঠক পড়তে যায়, দেখবে যে এর মধ্যে কোনো ঘটনা নেই। ঘটনার নায়কদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। একটি ব্লাঙ্কেট টার্ম তারা ব্যবহার করেন, বিরোধীরা 'বঙ্গবন্ধু' হত্যাকারীদের রক্ষার জন্য এগুলো করছে-প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের জন্য এসব ষড়যন্ত্র করছে ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী যেসব ক্রিয়াকলাপ দেশের ভেতরে ঘটছে, সেগুলো নিয়ে এই সরকার এবং সরকারে কৃপাপুষ্ট প্রিন্ট মিডিয়া উচ্চাবাচ্য করে না।

সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ পাখির মতো আমাদের নাগরিকদের হত্যা করছে। বিডিআর-এর জোয়ানরা ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে শহীদ হচ্ছেন। বিএসএফ আমাদের নাগরিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করছে। হালের বলদ অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাভাষী ভারতীয় মুসলমানদের সীমান্ত বরাবর লাখো লাখো জড়ো করা হচ্ছে বাংলাদেশে পুশইন করার জন্য। যুগপৎভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অরুণাচলবাসী চাকমাদের অভ্যন্তরীণ শরণার্থীর নামে অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। এসব বিষয়ে সরকার সরকারি দলের বা সরকার সমর্থক পত্রপত্রিকায় কোনো আলোচনা বা প্রতিবাদ প্রকাশ

www.pathagar.com

হতে দেখা যায় না। রাজশাহীর মসজিদ থেকে আরডিএক্স বিস্ফোরক আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ যৌথ অভিযানে যে উদ্ধার করে নিয়ে গেল এবং এ সম্পর্কে যে উস্কানিমূলক মন্তব্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখল আনন্দবাজার গোষ্ঠী এ সম্পর্কে সরকার উচ্চ-বাচ্য করে না, এ সম্পর্কে আওয়ামী সমর্থক ও আওয়ামী অনুগ্রহপুষ্ট পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক কোনো প্রতিবাদের ঝড় ওঠে না। আজ সীমান্তের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? আমাদের এক সীমান্ত ফাঁড়ি (বিওপি) অন্য সীমান্ত ফাঁড়িতে যাবার কোনো motorized road নেই। কিন্তু ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়িগুলো একে অপরের সাথে motorized road দ্বারা সংযুক্ত। এখানেই বাহিনীর শেষ নয়। ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়ি আমাদের সীমান্তের সড়কগুলোর সঙ্গে motorized road দ্বারা সুবিন্যস্তভাবে link করা। Daily Star (৭ অক্টোবর ১৯৯৯)-এর ভাষ্য অনুযায়ী সর্বশেষ খবরে জানা গেছে যে, ২০০১ সাল নাগাদ ঢাকার সঙ্গে ভারতের যতোগুলো রেল স্টেশনের সাথে সম্ভব ততগুলো রেলসংযোগ স্থাপন করা হবে। এই অবকাঠামোগত বিন্যাস আমাদের জন্য যে কত বিপজ্জনক ও ভয়াবহ এবং ভারতীয় আগ্রাসী তৎপতার সহায়ক তা কি অধিক বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে?

উদীচীর বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে বিএনপির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা তরিকুল ইসলামকে জড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা সরকার করে যাচ্ছে। অথচ দেড় সপ্তাহ আগে দেখলাম যে, পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের মুখে গ্রেফতারকৃতদের একজন স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতার নাম উল্লেখ করেছে। তার বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি না। যশোরের 'রানার' পত্রিকার সম্পাদক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন। জনান্তিকে প্রকাশ, সুষ্ঠু তদন্ত হলে আওয়ামী গডফাদারদের জড়িত থাকার ঘটনা বেরিয়ে পড়বে। এক্ষেত্রেও তাই আগাম বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামের নাম জড়ানোর চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। অথচ রানার সম্পাদকের পরিবার পরিজনরা আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছেন যে, প্রকৃত হত্যাকারীদের আড়াল করে এই ধরনের অপচেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এতদসত্ত্বেও আওয়ামী কুচক্রীরা তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত হয়নি। আজকে সারা দেশে যে বোমাতঙ্কের কথা বলা হচ্ছে, সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রকাশ্য জনসভায় বলেছেন যে, বিরোধী দল, বিশেষ করে বিএনপি এই বোমাতঙ্ক বা বোমা বিস্ফোরণের পেছনে রয়েছে। অথচ জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ রয়ে গেছে যে, বোমাবাজি যদি কেউ করে থাকে, সেটি হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের লুটপাট সমিতির নায়করা, সন্ত্রাসীরা। সিলেটে আওয়ামী লীগ এমপি মানিকের ঘরে বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে পুরো বাড়িটির ছাদ উড়ে যায়। দুজন মারা যায় এবং এই দুজনেই আওয়ামী যুবলীগের সন্ত্রাসী সশস্ত্র ক্যাডারভুক্ত খলনায়ক। অথচ দেখা গেল যে, ক্ষমতাসীন দলের সেই সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো

www.pathagar.com

হলই না, উপরন্তু সেই সংসদ সদস্য উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে বললেন যে, বিরোধী দল এটা ঘটিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তার এবং আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য। এই ঘটনাগুলো থেকে আমাদের বোঝা দরকার যে, একদিকে জননিরাপত্তা আইন এবং সন্ত্রাস দমন আইনের মতো কঠোর গণনিপীড়নমূলক গণবিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য এই সরকার বদ্ধপরিকর ও হন্যে হয়ে উঠেছে। আরেক দিকে তারা পর্যায়ক্রমে ভারতের কাছে বাংলাদেশের ভাগ্য তুলে দিচ্ছে—এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ভারতীয় আগ্রাসনের ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার জন্য একটার পর একটা এই ধরনের কল্পিত ঘটনার অবতারণা করছে দেশের নাগরিকদের অধিকার আছে জানার যে, কারা, কোথায়, কীভাবে এসব বোমা স্থাপন ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটাচ্ছে। এটি একটি সরল প্রশ্ন, এন্টিট্যাংক মাইনের মতো একটি বিস্ফোরক দ্রব্য সাধারণত মানুষের চেনার কথা নয় এবং এটি জনকণ্ঠের মতো একটি পত্রিকা অফিসে ব্রিফকেসে করে যে ব্যক্তিটি বহন করে নিয়েছিলেন বলে জনকণ্ঠ পত্রিকাতেই লেখা হয়েছে, সেই ব্যক্তিটি জনকণ্ঠ অফিসে বেশ কিছুক্ষণ বসে, অনেকের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে ওটি ফেলে চলে যান। ঐ ব্যক্তির চেহারাটি পর্যন্ত কেউ মনে রাখতে পারল না। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে? এবং ব্রিফকেসটি লক্‌ডও ছিল না। কোনো এক ব্যক্তি ওটি খুলেই চিনে ফেলল যে, ওর ভেতরে যা আছে, সেটি এন্টিট্যাংক মাইন। কি চমৎকার। এভাবে মানুষকে বেকুফ ভাবা যে কত বড় বোকামি তা বলাই বাহুল্য। আরো একটি বিষয় এখানে প্রণিধান করার আছে। এসব বোমা বা এন্টিট্যাংক মাইন কোথাকার তৈরী সে সম্পর্কে এ পর্যন্ত সরকার কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। এগুলো যে ভারত থেকে আগত সে সম্পর্কে আজ সকলেই নিশ্চিত। আর তাই সরকার এ প্রসঙ্গে টু শব্দটি করছে না। একইভাবে আমরা দেখি যে, হত্যাকারী বা ষড়যন্ত্রকারীরা আগাম পয়গাম দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ যে ব্যক্তিটিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তিনি ফ্যাক্স কিংবা ই-মেইল বার্তা পাঠিয়ে তার এই অভিলাষ চরিতার্থ করার কথা ব্যক্ত করেছে। চমৎকার এ ধরনের অশ্রুতপূর্ব ঘটনা রাজনীতির জগতে বা ইতিহাসে কেউ পাঠ করেছে বলে আমার জানা নেই। এর সঙ্গে আরো যোগ হয়েছে সম্প্রতি। যে আজিজ মোহাম্মদ ভাই প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী তহবিলে বিশাল অংকের অর্থ '৯৬-এর নির্বাচনে চাঁদা দিয়েছিলেন বলে কথিত, সেই আজিজ মোহাম্মদ ভাইও নাকি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত। এ ষড়যন্ত্র মামলায় এ নামটিও জুড়ে দেয়ার জোর কোশেশ চলেছে। আসলে ঘটনা কী? হয় বর্তমান অযোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধিকতর অনুগ্রহ বা কৃপা লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কথিত প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র বানচাল করতে পারা কৃতিত্বের ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন, না হয় খোদ আওয়ামী লীগের উপদলীয় চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য নাসিমের এই অতি উৎসাহ।

www.pathagar.com

শামসুর রাহমান, আমাদের একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। তাঁর পুত্রবধূর সাথে পাড়ার মস্তানদের ছিল একটি রেষারেষি ও কলহ-বিবাদ। কিছু যুবক শামসুর রাহমানের শয়ন কক্ষে ১৫ মিনিট অবস্থান করার পরও তাঁকে হামলা করার কোনো কারণ বা সুযোগ খুঁজে পাননি। ঘরটি ছেড়ে দেয়ার মুহূর্তে কবির পুত্রবধূর সাথে কথা বলে প্রকৃতির ডাকে বাথরুমে যাবে বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করল। এ ঘটনা নিয়ে সাথে সাথে পত্র-পত্রিকায় প্রচারণা করা হল যে, তালেবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এরা ওসামা বিন লাদেনের ভক্ত, এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো দরকার—এ কথা বলে এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যেসব মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন, সেসব মাদ্রাসার ওপর এক ধরনের আক্রমণ চালানো হল। অর্থাৎ এখানকার মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক বিশ্বাস, জনগণের মধ্যে যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, এ সবকিছু বিনষ্ট করে দিয়ে মানুষকে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে অনৈক্য, ফাৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে ভারতীয় অধিপতি গোষ্ঠী সম্প্রসারণবাদী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের যে নীল নকশা বাংলাদেশকে কুক্ষিগত করার, সেই নীল নকশা অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হরণ করার পথটাকে সুগম করে দেয়াই এদের মুল লক্ষ্য।

মাহবুব উল্লাহ : আমরা জানি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। এসব গোষ্ঠী কখনও তালেবান, কখনও হরকাতুল জিহাদ বা অন্য কোনো ফান্ডামেন্টালিস্ট নামের সংগঠন। এর পাশাপশি আরেকটি ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সীমান্তের ওপারে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় একটি অর্কেস্ট্রেটেড ক্যাম্পেইন চলছে। সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে আইএসআই উলফারা অনেকগুলো ঘাঁটি গড়েছে এবং যেখান থেকে তারা ভারতে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। সুতরাং আমার মনে হয় যে, বাংলাদেশের সরকারপন্থী ভারতপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলো যে ধরনের প্রচারণা অর্থাৎ একটি মিথ্যাকে বারবার বলে সত্যে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে প্রপাগাণ্ডার বিশেষ গুরুত্বের কথাই মনে পড়ছে। জনমত তৈরীর এ কৌশলকে Walter Lippmann অভিহিত করেছেন manufacture of consent হিসেবে। এ কৌশলকে Lippmann সরকারের একটি regular organ হিসেবেও অভিহিত করেছেন। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সরকারের এবং সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত অভিলাষকে চরিতার্থ করার জন্য একটা পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন বিশ্বব্যাংক থেকে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল। তাতে প্রতিবেদক উল্লেখ করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর, এই একুশ বছর পরে যারা তাদেরকে ক্ষমতায় আনার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, যাদের আশীর্বাদে তারা পুষ্ট হয়েছে, তাদের সেই আশীর্বাদ ও সমর্থনের ঋণ যদি আওয়ামী লীগ পরিশোধ করতে চায়, তাহলে দেশের জন্য সেটা খুব বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ সরকার ব্যর্থ হবে। ঘটনাদৃষ্টে এখন আমার মনে হচ্ছে, আজকে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘটনার নায়কই হচ্ছে শাসক দলীয় লোকেরা এবং এসব ঘটনার পেছনে মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধই কাজ করছে। সাম্প্রতিক ইউসিবিএল-এর যে বিরোধ, সেখানেও কিন্তু একটা বিরাট অর্থনৈতিক স্বার্থগত বিরোধ কাজ করছে। এ ছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেন্ডার নিয়ে, চাঁদাবাজির ভাগ নিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর দিকে কিন্তু সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের বা নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো নজর নেই। শাসক দল এ ব্যাপারে চোখ বুজে থাকাটাকেই পছন্দনীয় মনে করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত ক্রোনিজরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নানাভাবে সহায়তা করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্য কাজ করেছে, আজকে তাদেরকে লুটপাটের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একুশ বছরের ঋণ শোধ করা হচ্ছে। আর এই একুশ বছরের ঋণের মধ্যে ভারতের কাছে আওয়ামী লীগের একটা বড় ঋণ আছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না। শুধু একাত্তর সালেই নয়, পচাত্তর সালের পরেও তাদের একটা ঋণ আছে। সেই ঋণ পরিশোধের একটা পালা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন চুক্তির মধ্যে দিয়ে বা এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে। এভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে, সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা ঋণ পরিশোধের চর্চা বা প্রচেষ্টা। দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশ বিরোধী শক্তি; তাদের কাছে তারা ঋণী এবং তাদের এই ঋণ পরিশোধ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা হন্যে হয়ে উঠেছে। আর এই টিকে থাকার জন্য যত রকম অপপ্রচার, মিথ্যার বেসাতি করা যায়, তারা করছে। সেটা করতে গিয়ে তারা জনমতকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত করেছে। তারা প্রথমেই একটা কথা বলেছে যে, তারা ঐকমত্যের সরকার গঠন করেছে। সেটার পরিণতি যে কী হয়েছে, আমাদের সবার জানা আছে। সুতরাং এই সরকার যে অত্যন্ত সুকৌশলে জনমতকে বিভ্রান্ত করে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আফতাব আহমাদ : আওয়ামী লীগ জনগণকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষ এবং পটু, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং আওয়ামী লীগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছদ্মাবরণে, অপকৌশলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে প্রতারিত করে একটি মজবুত অবস্থান গ্রহণ করা। ১৯৯৬-এও তারা ঠিক এই কৌশলটিই অবলম্বন করে আজকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তবে তারা জনগণের কাছে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশ গঠন এবং জাতি গঠনে তাদেরকে আরেকটি সুযোগ করে দেয়ার আবেদন করে, সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তারা আদৌ যত্নবান বা সচেষ্ট নয়। প্রকৃত অর্থে দেশসেবায় বা জাতি গঠনের জন্য তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। এদেশের মানুষকে নির্যাতন-নিপীড়ন করার জন্য। তারা দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে সম্প্রতি ও উদারতার আলোকে মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ করার কর্মযজ্ঞে কখনই উৎসাহিত হয়নি এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আমি একটি ছোট ঘটনার উদাহরণ দেই। প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ

www.pathagar.com

বছরেই কক্সবাজারে কাঙালীভোজের সময়ে খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল এবং বেশ কিছু লোক সেই খাবার খেয়ে মারাও গিয়েছিলেন। সাথে সাথে ক্ষমতাসীন দলের অনুগ্রহপুষ্ট মিডিয়া এবং পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে বলা হয়, বিরোধী দল ষড়যন্ত্র করে এই খাবারে বিষ মিশিয়ে নিরীহ দরিদ্র লোকগুলোকে হত্যা করেছে। অথচ পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি তদন্তে বেরিয়ে এলো যে, কক্সবাজার অঞ্চলের আওয়ামী লীগের ভেতরকার দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে পরস্পর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য কাঙালীভোজের সেই খাবারে বিষ মিশিয়েছিল। এই হচ্ছে আওয়ামী লীগ। নিজেরা হত্যা, গুম, খুন, লুটপাট, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি করে বেড়ায়। অথচ সব সময় দেশের নিরীহ মানুষ দেশপ্রেমিক ঈমানদার মানুষের উপর, বিরোধী দলের ওপর এসব দোষ তারা চাপিয়ে দেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ঢাকার বইরে পাওয়ার গ্রীডের একটি টাওয়ার বিএনপির চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতা নাকি নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং সেই চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে যখন বলল, প্রাইমাফেসি কেইস হিসেবে কিছু এভিডেন্ট কেইস হিসেবে কিছু এভিডেন্স আনো। সরকার অপারগতা প্রকাশ করলো। সুপ্রমি কোর্ট সেই চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে কেবল মুক্তিই দেয়নি, সরকারকে জরিমানাও করেছিল। আসলে এই সরকার অসত্য ও মিথ্যা প্রচারণার মধ্যে দিয়ে এদেশের জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে-সরকারের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করছে না। আমি বলব, এই রাষ্ট্রঘাতী চক্র জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। বাংলাদেশ বিরোধী এই রাষ্ট্রঘাতী চক্রের যে hidden agenda রয়েছে, দেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে আজ শুধু সোচ্চারই নয়-এ সরকারকে প্রকাশ্যে গণশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে উচ্ছেদের এক জঙ্গী গণতান্ত্রিক আন্দোলন রচনায় তৎপর। ভারতপন্থী ও আওয়ামী কৃপাপুষ্ট পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় যে, সীমান্ত এলাকায় মৌলবাদীদের কমপক্ষে ৫০টি ঘাঁটি গড়ে উঠেছে। সেখানে আইএসআই তৎপর এবং তার পরপরই আমরা দেখি যে, এসব সংবাদের উসিলায় ভারতীয় গোষ্ঠী সীমান্ত বরাবর বিএসএফ এবং সামরিক শক্তি দিয়ে অভিযান চালাচ্ছে। অতএব, আজকে আমার মনে হয়, দেশব্যাপী যে মিথ্যা প্রচারণা চলছে, বোমা আতঙ্ক সৃষ্টির নামে বিরোধী দলকে দলন করার যে ষড়যন্ত্র চলছে, তার মূল রহস্য স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধভাবে জনগণের কাছে উন্মোচিত এবং জনগণ সরকারি খেলাটা পুরোপুরি ধরে ফেলেছে। আজকে প্রয়োজন হচ্ছে সমাজের সর্বস্তর থেকে সরকারের একটি সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করা যে, এ ধরনের গণবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত থেকে বিরত হও। আর সত্যিই যদি এদেশের রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র থাকে, তাহলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণপঞ্জিসহ খোলামেলাভাবে মানুষের কাছে তুলে ধর—কী সেই ষড়যন্ত্র। কারা এই ষড়যন্ত্রের হোতা? ঢালাওভাবে বিরোধী দল ষড়যন্ত্র করছে প্রধানমন্ত্রীর পিতার

www.pathagar.com

হত্যাকারীদের বিচার যাতে না হতে পারে, এগুলো দেশের মানুষ গ্রহণ করবে না। কারণ তারা ভালোভাবেই বুঝে ফেলেছে যে, এগুলো হচ্ছে ধাপ্পা, প্রতারণা শঠতা ও অজুহাত। মূল লক্ষ্য হচ্ছে এদেশের মানুষকে গোলামে পরিণত করা, এই দেশ, এই রাষ্ট্রটিকে ভারতের কাছে তুলে দেয়া। এদেশের মানুষ নিঃশ্বাস থাকতে এবং তাদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের স্পন্দন থাকতে, তা হতে দেবে না।

মানবাধিকার লংঘন

মাহবুব উল্লাহ : গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন থেকে এপি জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বাংলাদেশে সহিংসতার সর্বশেষ বিস্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং এই মর্মে অভিমত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, সকল প্রধান দলের উচিত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ও রাজনৈতিক সহাবস্থান করা। সম্প্রতি পরস্পরবিরোধী হরতালের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ ব্যক্তি নিহত হবার পর মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র রিচার্ড বাউচার বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সহিংসতা আরও একবার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। বাউচারকে প্রশ্ন করা হয়, ঢাকায় আবারও খুবই ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের মদদে উচ্ছৃংখল লোকের হামলায় ৫ ব্যক্তি নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। জাতীয় সংসদের সরকার দলীয় একজন সদস্য এ ঘটনায় জড়িত ছিলেন এবং মধ্যপন্থী ইসলামী গোষ্ঠীর একাংশ হামলার শিকার হয়েছে যা থেকে দিনে দিনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে এখন দৃশ্যমান ভয়ানক রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক বিচ্যুতি সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের অবস্থান কি? মি. বাউচার বলেন, আমি বলবো ঢাকায় সরকার সমর্থক ও বিরোধী দলের বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ সম্পর্কে আমাদের দূতাবাসগুলো থেকে আমরা খবর পেয়েছি। তারা খবর দিয়েছেন যে, কমপক্ষে ৪ ব্যক্তি—আপনি বলছেন এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৫ জন নিহত হয়েছে। আমরা সহিংসতায় উদ্বিগ্ন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সহিংসতার জন্য বাংলাদেশে আরেকবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা বারবার বলেছি যে, সরকার ও সকল প্রধান দলের উচিত, সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে রাজনৈতিক সহাবস্থানের পথ বেছে নেয়া। আমরা জেনেছি, বিরোধী দল ১৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় দিনের মতো হরতাল আহবান করে। শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক মতপ্রকাশের সময় আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার করার আহবান জানাই। বলা যায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র খুব ত্বরিত গতিতেই মার্কিন সরকারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। মার্কিন মুখপাত্র মি. বাউচারের মন্তব্যে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করি। এর একটি হচ্ছে সহিংসতা আরও একবার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার করার আহবান জানাই। উল্লেখ্য যে, মি. বাউচারকে যে সাংবাদিক একাংশ হামলার শিকার হয়েছে । এ ছাড়া মি. বাউচার মার্কিন নাগরিকদের বাংলাদেশ সফর সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের উল্লেখ করতে গিয়ে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাপেক্ষ বাংলাদেশে বর্তমান মজুদের অতিরিক্ত আরো ৮ দশমিক ৪ থেকে ৬৫ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ঘটফুট অনাবিষ্কৃত গ্যাস রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তোলন সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ ধরলে বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত ৮.৪ টিসিএফ গ্যাস রয়েছে। আবার এই সম্ভাবনা মাত্র ৫ শতাংশ ধরলে গ্যাস সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৫.৭ টিসিএফ। আর পাওয়ার সম্ভাবনা ৫০ঃ৫০ ধরলে গ্যাস সম্পদের পরিমাণ ৩২.১ টিসিএফ। বিশেষজ্ঞরা আছেন, শেষটাই যা মধ্যগড় নামে আন্তর্জাতিকভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য হিসাব। গ্যাস সম্পর্কে এসব তথ্য গ্রহণযোগ্য কিনা, সে প্রশ্নে সন্দেহ রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক ভূতাত্ত্বিক এসব পরিসংখ্যান প্রশ্নের চোখেই দেখেন। তৎসত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, বিশ্বের জ্বালানি মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে কারণে বিদেশী তেল কোম্পানীগুলো বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ সম্পর্কে উৎসাহ দেখাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্বেরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্রের বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে হবে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদেশী বিনিয়োগের জন্য সহায়ক নয়। সুতরাং, গ্যাস সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে চাইবে। এটাই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হলো, এই স্থিতিশীলতা গণতান্ত্রিক ক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার মূল্যের বিনিময়ে অর্জিত হবে কি?

আফতাব আহমাদ : গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ওয়াশিংটনে মানবাধিকার বিষয়ক বার্ষিক রিপোর্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। ঐ রিপোর্টে বাংলাদেশে মানবাধিকার হরণের ব্যাপক করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়। বিশ্বের দেশে দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করে প্রতি বছর মানবাধিকার বিষয়ক একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের একটি রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন সময়ে কতগুলো কোনো ইস্যুকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়। বিশেষ করে জিমি কার্টারের আমল থেকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রায়নের ইস্যুগুলো মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কোনো ইস্যুতে পরিণত হয়।

এ বছর ওয়াশিংটনে প্রকাশিত মানবাধিকার রিপোর্টে বাংলাদেশের যে চিত্র পরিদৃষ্ট হয়েছে তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতিটি আদৌ সন্তোষজনক নয়। রিপোর্টের ভাষ্যমতে, বিচার বহির্ভূত পন্থায় পুলিশের হাতে খুন হওয়া ছাড়াও পুলিশী হেফাজতে রহস্যজনকভাবে নিহতের সংখ্যা অনেক। রাজনৈতিক প্রতিবাদের কথা বাদ দিলেও জনজীবচনের যে কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে তার ওপর পুলিশের লাঠিপেটা করার ঘটনা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জিজ্ঞাসাবাদের নামে সন্দেহভাজনদের ওপর নির্মম পুলিশী নির্যাতন এবং মারপিটসহ নানা কিসিমের দৈহিক নির্যাতন একটি নিয়মিত রেওয়াজে পর্যবসিত হয়েছে।

www.pathagar.com

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মতে, বাংলাদেশে মহিলা কয়েদীদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। নিরাপত্তা হেফাজতে প্রায়ই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। গ্রেফতারের সময়ে পুলিশ অনেককেই গুলি করে হত্যা করেছে বলেও ওই রিপোর্টে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ রিপোর্টে বলা হয় যে, গত বছর ৯ ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদ আহমদ হোসেন সুমন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সময় পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। গত বছর ১৮ সেপ্টেম্বর পুলিশের ভয়ে মাহবুব হোসেন খান নামক এক ব্যক্তিকে ঝিলে ঝাঁপ দিতে হয়। এতে সে ডুবে মারা যায়। রিপোর্টের মতে, ১৯৯৯ সালে বিরোধী দলের হরতালের সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুযায়ী আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজী মকবুল হোসেনের নির্দেশে তার সশস্ত্র অনুসারীরা বিএনপির দুইজন তরুণ কর্মীকে হত্যা করে। এক ডজন পুলিশ আশপাশে থাকা অবস্থায়ও তারা এর সাহায্যাকারে এগিয়ে আসেনি। ১৬ জুলাই যশোরের প্রখ্যাত সাংবাদিক শামছুর রহমান অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে নিহত হন। ১৯৯৯-এর মার্চে সরকার দলীয় এমপি মুহিবুর রহমান মানিকের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে দুজন মারা যায়। পত্র-পত্রিকার ভাষ্য অনুসারে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যই মানিকের বাড়িতে ওই বোমা তৈরি করা হচ্ছিল। গত বছর ১২ জুলাই চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ৮ জন নিহত হয়। এর মধ্যে ৬ জন ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্য। এ ঘটনার জন্য শেখ হাসিনা 'স্বাধীনতা বিরোধী' চক্রকে দায়ী করে তার সমর্থকদের একজনের মৃত্যুর বদলা হিসেবে দশটি লাশ ফেলার আহবান জানান। রিপোর্টে আরও বলা হয়, পুলিশের বাড়াবাড়ি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ যে কারও বাড়ি, বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে থাকে। পুলিশের ক্ষমতা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে জননিরাপত্তা আইন বলবৎ করার মধ্য দিয়ে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে মানবাধিকার যেভাবে লংঘিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, তার বিবরণ দেশে যে কয়টি মানবাধিকার সংস্থা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের বার্ষিক প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উপরন্তু মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে এ যাবৎকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি রায় হচ্ছে, আওয়ামী শাসন ও মানবাধিকার বাংলাদেশে যুগপৎভাবে নির্বিরোধ সহাবস্থান করতে পারে না। বাংলাদেশে মানবাধিকার শুধু নয়, মানুষের জীবনই আজ সংশয়ের মুখে পড়েছে।

ফেনীর নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক টিপু পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ফেনীর ইচ্ছাপিতা জয়নাল হাজারীর সন্ত্রাসী বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছেন। অথচ এ বিষয়ে সরকার কিংবা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনো অর্থবহ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তবে, প্রধানমন্ত্রী হতভাগ্য সাংবাদিক টিপুকে তাঁর বদান্যতার নিদর্শন হিসেবে এক লাক টাকা দান করেছেন।

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুরের এডভোকেট নূরুল ইসলাম মানবাধিকার লংঘন বিষয়ক বিভিন্ন মামলায় নির্যাতিত ও নিগৃহীত নাগরিকদের পক্ষাবলম্বন করে আসছিলেন। এমনকি সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আইনী লড়াইয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদান রেখে আসছিলেন। 'জনকণ্ঠ' থেকে শুরু করে সকল মতের সংবাদপত্র এডভোকেট নূরুল ইসলামের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে এসেছে। এই সাহসী কর্মীকে লক্ষ্মীপুরের ইচ্ছা পিতা তাহেরের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছেন, শুধু তাই নয়, প্রভাবশালী এক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাহের প্রকাশ্য সভায় সাংবাদিকদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, তার বিরুদ্ধে কোন সাংবাদিক কিছু লিখলে সেই ব্যক্তির হাত পা গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের মানবাধিকারের বাস্তব চিত্র। মন্ত্রী পুত্র কিংবা সংসদ সদস্যের পুত্র সরাসরি খুনের সঙ্গে জড়িত, এ মর্মে সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট বের হলেও পুলিশ কোনোকিছু করতে অক্ষম। আসলে দলীয়করণ এবং দলবাজির ফলে গোটা পুলিশ প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। নিবেদিতপ্রাণ, নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক পুলিশের পক্ষে যথাবিহিত আইন অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন দুরুহ হয়ে পড়েছে। এদের চাকরির নিরাপত্তা সব সময়ে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। আর, নির্বাহী বিভাগের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে পুলিশকে দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীতে পরিণত করার যে অসুস্থ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা কারও জন্যই যে মঙ্গলজনক নয়,ক্ষমতাসীনরা তা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। বাকশালী শাসনামলে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন কারাগারসমূহের আইজির দপ্তরটিকে কারাগারের অংশে রূপান্তরিত করা হয়। এই অংশটিকে কয়েদীদের মুখে মুখে নাম দেয়া হয় New Jail এই নিউ জেলের বৈশিষ্ট্য ছিল কায়েদীদের রাখার জন্য সংকীর্ণ প্রকোষ্টসহ আরও নানা ধরনের পীড়াদায়ক ব্যবস্থা। প্রবেশ পথে কাঠের ফলকে কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে হাতের লেখা একটি বিজ্ঞপ্তি সাঁটা ছিল। ওতে বলা হয় এখানে রাষ্ট্রবিরোধী, সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী ও নাশকতামূলক কাজে জড়িত অপরাধীদের রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস ওই নিউ জেলে বাকশালী শাসনামলে কোনো হাজতী বা কয়েদীকে বাস করতে হয়নি। কিন্তু বাকশালী শাসন উৎথাত হওয়ার পর বাকশাল আমলের প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীসহ আওয়ামী নেতাদের যখন বন্দী করা হয় তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বাসিন্দাদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ও নিরাপত্তাজনিত কারণে আওয়ামী বাকশালী নেতাদের ঐ নিউ জেলেই থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। নিউ জেলের প্রবেশপথে কাঠের ফলকে সাঁটা হাতের লেখা বিজ্ঞপ্তিটির ভাষ্য পড়ে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দীন আহমদ বাকশাল আমলের প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর দিকে মুচকি হেসে বলেছিলেন : "নিন প্রধানমন্ত্রী আপনার জেলে আপনি প্রবেশ করে আপনি উদ্বোধন করুন।"

ক্ষমতা লাভ করেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যারা মাত্রা ছাড়িয়ে থাকেন, তারা এই নিউ জেল নির্মাণের ঘটনা ও মনসুর আলীর উদ্দেশ্যে তাজউদ্দীনের উক্তি থেকেও কি ইতিহাসের বিকাশ ধারাকে বুঝতে চাইবেন না?

www.pathagar.com

ড. কে. এ. এম শাহাদত হোসেন মণ্ডল

দেশ আজ কোন পথে?

ডেটলাইন ঃ ৩০ অক্টোবর ১৯৯৯

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে আজ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পাশাপাশি জনগণের নিরাপত্তা চরমভাবে বিপন্ন। দেশবাসীর প্রত্যাশা অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত নিরাপদ বাংলাদেশে এক মুঠো খেয়ে-পরে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। থাকবে না কোনো রক্তের হোলিখেলা। সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করবে। কিন্তু চরম দুঃখজনক যে, বাংলাদেশ আজ দেশবাসীর জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। দেশটি আজ সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। শান্তিকামী প্রতিটি নাগরিকের জীবন আজ বিপন্ন। দেশে আজ স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টির বড়ই অভাব। সরকারের প্রধান ও পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বর্তমান সরকার এই দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ। প্রশাসনিক ব্যর্থতার পাশাপাশি সরকারের ঐকান্তিকতার অভাব, পক্ষপাতিত্ব ও সর্বোপরি সকল অরাজকতার জন্য বিরোধী দলকে এককভাবে দায়ী করার প্রবণতাই দেশে বর্তমান অবস্থা সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী। দেশবাসী আজ সরকারের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়েছে। কিন্তু সরকার এই চরম সত্যটুকু অনুধাবন করতে ব্যর্থ কিংবা মেনে নিতে কোনোক্রমেই রাজি নয়। ফলে জনগণের সাথে সরকারের দূরত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। অপরপক্ষে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রবাজদের সাথে সরকারের দূরত্ব কমতে শুরু করেছে, যা দেশ ও জাতির জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়।

এ কথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সারাদেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটপাট, অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড মাহামারী আকার ধারণ করেছে। প্রতারণা, জালিয়াতি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি চলছে সমানতালে প্রতিযোগিতার আকারে, যা মানব জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। আর এসব ঘটনার অধিকাংশই ঘটেছে প্রতিনিয়ত প্রকাশ্য দিবালোকে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের চোখের সামনেই-থানা কিংবা পুলিশ ফাঁড়ির অনতিদূরে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়েছে প্রায় ৪০ মাস পূর্বে। কিন্তু দেশ পরিচলনায় সরকারের সফলতার চেয়ে ব্যর্থতার তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ, বলতে গেলে আকাশচুম্বী। ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, অর্থনীতি ছাড়াও জনগণের মৌলিক অধিকার, বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সুস্থ নিরাপদ পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বদল

www.pathagar.com

হবার পরেও এই অভিশাপ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না জনগণ। রাজপথে এখন মৃত্যুর বিভীষিকা। চারদিকে এই দাবি উঠেছে-স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই।

দেশের জনগণ আজ দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কবলে জর্জরিত। এ কথা সত্য যে, অতীতের সরকারগুলোর সময়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলেও তা জনগণের স্থানীয় সীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগের সাথে সাথে সন্ত্রাসীরাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বিগত ৩ বছর ধরে সন্ত্রাস চললেও গত কয়েক মাসে এর মাত্রা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশবাসীকে আতংকিত করেছে। বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি যেমন হরতাল ও মিছিলে প্রতিপক্ষের আক্রমণের পাশাপাশি প্রকাশ্য জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এমনকি মসজিদে গ্রেনেড ও বোমা বিস্ফোরণে হত্যাকাণ্ড সংযোজিত হল সন্ত্রাসী কর্মসূচিতে দেশবাসীর স্মরণে রয়েছে যে, কুষ্টিয়ায় জাসদের কেন্দ্রীয় নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কাজী আরেফ আহমদসহ পাঁচজন হত্যাকাণ্ডের রক্ত শুকাতে না শুকাতে সংঘটিত হল যশোরের মর্মান্তিক ঘটনা। উদীচীর অনুষ্ঠানে শক্তিশালী গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহত হল দশটি মানব সন্তান। মারাত্মকভাবে আহত হল দু'শরও বেশি। যশোরে উদীচী ট্রাজেডির রেশ কাটতে না কাটতেই গত ৮ অক্টোবর '৯৯ জুমার নামাজের খুতবা চলাকালে খুলনা শহরের নিরালা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মসজিদে বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় ৬ জন মুসল্লি মর্মান্তিভাবে নিহত হল। এ ছাড়া একই দিনে মিরপুরে জান্নাতুল ফেরদৌস মসজিদে ও জনকণ্ঠ কার্যালয়ে এবং সর্বোপরি গত ১০ অক্টোবর ঢাকায় কাদিয়ানী মসজিদে বোমা পেতে রাখার ঘটনা দেশবাসীকে আতংকিত করেছে। জনমনে সরকার সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে সরকার ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এই ঘটনাসমূহ সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। কারণ এসব বোমা শত শত মানুষের জন্য ট্রাজেডি বয়ে আনতে পারত। দেশব্যাপী এখন বোমাতংক বিরাজ করছে। আজ মসজিদেও মুসল্লীদের জীবন নিরাপদ নয়। পত্রিকা অফিসগুলোও আজ হামলার শিকার হচ্ছে– যা নজিরবিহীন।

দেশের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, পেশাজীবীরা আতংকগ্রস্ত। বিরোধী দল এসব ঘটনা রোধে ব্যর্থতার জন্য সরকারকে দায়ী করছে। কিন্তু চরম দুঃখজনক যে, এর জবাব দিতে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসব বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সরাসরি বিরোধী দল বিএনপিকে দায়ী করে মন্তব্য করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য দেশব্যাপী বিরূপ সমালোচনার ঝড় তুলেছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল পদে আসীন থেকে তথ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে কারও বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ উত্থাপন মোটেই সমীচীন নয়। কারণ যে কোনো সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বিরোধী দলকে এককভাবে দায়ী করার পাশাপাশি বিচারক ও আদালতকে অবজ্ঞা করার কারণেই দেশের সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস আজ বাংলাদেশের বুকে ড্রাকুলার ন্যায় জেঁকে বসেছে। ব্যক্তি, দলীয়, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস সমানভাবে চলছে। সন্ত্রাসের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে সরকারি দলের গডফাদাররা সরাসরি জড়িত-তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফেনী, খুলনা, দাগনভূঁইয়াসহ সারাদেশের জনগণ আজ এইসব গডফাদারদের সমর্থনপুষ্ট ক্যাডার বাহিনীর হাতে জিম্মি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়শ বলেন যে, সন্ত্রাসী সে যে দলেরই হোক তার সাজা হবে। সন্ত্রাসীদের কোনো দলীয় পরিচয় নেই। সরকারি দল কিংবা তার অঙ্গ সংগঠন দলে কোনো সন্ত্রাসী নেই। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে– প্রধানমন্ত্রী তাকে (আর নাসিম) স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী বানিয়েছেন সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন চালানোর জন্য নয়। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন সন্ত্রাসীদেরকে প্রয়োজনে মাটির নিচ থেকে ধরে আনা হবে। কিন্তু দেশবাসীর নিকট আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই। বরং সন্ত্রাসীদের সাথে তাদের দূরত্ব দিন দিন কমতে কমতে শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এর প্রমাণ জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের কালো হরফগুলো এবং দেশের জনগণ নিজেই। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশের সকল রাজনৈতিক দলে কমবেশী অস্ত্রধারী সমর্থক, ক্যাডার বা সন্ত্রাসী রয়েছে। সন্ত্রাস দমন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সরকারের নিরপেক্ষতা ও আইনের নিজস্ব গতি প্রধান শর্ত– যা পূরণে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ। অপরাধীদের ক্ষেত্রে সরকারের দুর্বলতার কারণে দেশে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কোনো অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দ্রুতগতিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের ক্ষেত্রে তা মোটেই দেখা যায় না। এর ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে। দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি মাত্র।

১। আত্রাই-এ দুইজন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হবার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় জড়িয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব আলমগীর কবীরকে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকায় গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অপরপক্ষে ছাতকের সরকারদলীয় এমপি মানিকের বাসায় বোমা বানানোর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সরকারদলীয় এমপি হবার সুবাদে তাকে বহুদিন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি। অবশ্য পরে জনমতের চাপে তাকে গ্রেফতার করে মাত্র কয়েকদিন হাজতে রাখা হয়।

২। বিরোধীদলীয় মিছিলে গুলি করে সজলকে হত্যার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার দলীয় এমপির বিরুদ্ধে আজও কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

৩। তথাকথিত শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিতে বিএনপির ৯ জুন ৯৮-এর ঐতিহাসিক লংমার্চের সময় কাচপুরে সরকারদলীয় সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের হাতে প্রায় ২০ জন তরুণী/নারী অপহৃত ও ধর্ষণের শিকার হলেও দায়ীদের বিরুদ্ধে আজও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি (দৈনিক দিনকাল, ১/১৯৯)।

www.pathagar.com

৪। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণে সেঞ্চুরীকারী সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতা আজও বহালতবিয়তে।

৫। ঠিকাদারি কাজের বখড়া ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের (দু'গ্রুপের) ক্যাডার/সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের শিকার বরিশালে ১৬টি দোকান, ২টি বাড়ি ভাঙচুর ও ২০ জন আহতের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একাধিক মামলার আসামি উক্ত ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার খোকাকে কোতোয়ালি থানা কর্তৃক গ্রেফতারের পর রহস্যজনক কারণে ছেড়ে দেয়া হয়। (দৈনিক জনকণ্ঠ ৭.৯.৯৯)

৬। গত ১৪.৯.৯৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসিন হলে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার শফিক বাহিনীর সদস্যরা এলিফ্যান্ট রোড থেকে দু'যুবককে ধরে এনে মারধর ও অস্ত্রের মুখে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়। শফিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় মোহসিন হলে অনেক দিন থেকে সন্ত্রাসীদের তৎপরতা চললেও সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। (দৈনিক জনকণ্ঠ ১৫.৯.৯৯)।

৭। সম্প্রতি ইউসিবিএল ব্যাংকে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত সরকারীদলীয় নেতা আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর বিরুদ্ধে আজও কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সরকারীদলীয় নেতা হবার সুবাদে তিনি শুধু প্রকাশ্যেই বিচরণ করছেন না, তিনি গত ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। চরম দুঃখজনক যে, গত ১০ অক্টোবর সকাল ১১টায় তিনি পুলিশের উপস্থিতিতে ২০/২৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে পুনরায় ইউসিবিএল ব্যাংকে চড়াও হন এবং চেয়ারম্যানের চেয়ারটি কয়েক ঘণ্টা দখলে রাখেন। উল্লেখ্য যে, গত ২৬ আগস্ট ন্যক্কারজনক সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনাব বাবু ইউসিবিএল ব্যাংক দখলের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই ঘটনা নিয়ে এ পর্যন্ত ৩ দফা তিনি একই সন্ত্রাসী কায়দায় ইউসিবিএল দখলদারিত্বের মহড়া চালালেন।

৮। গত ৭ জুলাই '৯৯ পুলিশের কনস্টেবল ফরহাদ খান হত্যার তদন্ত-বিচার ব্যতিরেকেই তৎক্ষণাৎ আসন্ন ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিএনপি নেতা জনাব সাদেক হোসেন খোকা এমপি, নাজমুল আলম এমপি, ছাত্রদল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১৮২ জন বিএনপি নেতাকর্মীর নামে মামলা দায়ের করা হয়। বিরোধী দলের নেতা তিনজন কমিশনারের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। অথচ সরকারদলীয় নেত্রী মুকুলী বেগমের প্ররোচনায় রুবেল হত্যার চার পলাতক আসামি নূরুল আলম, অংশে ডয়েন, আবুল কালাম আজাদ এবং জাকির হোসেনকে আজও গ্রেফতার করা হচ্ছে না কিংবা এই পলাতক আসামিদের অস্থাবর সম্পত্তি বা মালামাল ক্রোক করা হচ্ছে না। (দৈনিক দিনকাল, ৭.৯.৯৯)।

৯। খোদ রাজধানীতে বিরোধীদলীয় হরতালের দিনে মিছিলে হামলাকারী অবৈধ অস্ত্রধারীদের ছবি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরেও তাদেরকে আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে আজ পর্যন্ত সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির বিষয়ে সরকার যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাস্তবে তার কোনো অগ্রগতি নেই। কাজী আরেফ হত্যাকাণ্ড, উদীচী অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, জনকণ্ঠ অফিসে হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় অফিসে হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কারণেই, যা চরম দুঃখজনক। এসব হত্যাকাণ্ডের মামলার গতি কমে গেছে। অধিকাংশ মামলার তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদ রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। ওই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হবার পরপরই সরকার প্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এমপি এবং নেতারা বক্তৃতা বিবৃতিতে সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দায়ী করেন কোনো রকম তদন্ত কিংবা পুলিশী রিপোর্ট ছাড়াই যা কোনোক্রমেই কাম্য নয়। এছাড়া বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে সরকার কিভাবে পুলিশকে প্রভাবিত করে তা সবারই জানা। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং দলীয় স্বার্থের কারণে বিভিন্ন সময়ে মামলাগুলোর যে করুণ পরিণতি হয় তা বাস্তবে দেশে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসকেই উৎসাহিত ও বৃদ্ধি করে। কারণ একটি মামলার সুষ্ঠু বিচার না হলে বাস্তবে সন্ত্রাসীরাই শক্তিশালী হয়। আর একের পর এক বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ড তাই প্রমাণ করে। তাই তো আজ মসজিদ থেকে গানের অনুষ্ঠান, জনসভা, পত্রিকা অফিস কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কোথাও মানুষ নিরাপদ নয়। কিন্তু বর্তমানে সরকারের সেদিকে কোনো নজর নেই। এমনকি নিজ দলের মধ্যেকার ভয়াবহ সংকট ও দ্বন্দ্বের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সহিংস ঘটনাবলী ঘটেছে সেদিকেও সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। অথচ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নানান সময়ে তীব্র হুংকার দিয়ে থাকেন।

মাসের শেষদিকে ক্ষমতাসীন দলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত হয় ফটিকছড়িতে। বেদম প্রহারে মারাত্মকভাবে আহত ও প্রায় বিবস্ত্র হন স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি রফিকুল আনোয়ার। এ ধরনের ঘটনা অর্থাৎ নিজ দলীয় নেতাকর্মীদের হাতে এমপি প্রহৃত হবার ঘটনা সাম্প্রতিককালে ঘটেছে বলে জানা যায় না। এ ছাড়া ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর বরিশালে ১০ জন, ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে ২০ জন আহত হয়। ২০ সেপ্টেম্বর সোনাগাজীতে ১ জন নিহত হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন আহত হয়। সন্দ্বীপে ১ অক্টোবর ১ জন নিহত, ৮ জন আহত হয়। সরকারি দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে ১৯ সেপ্টেম্বর নরসিংদীতে ১ জন নিহত, চট্টগ্রাম ও টঙ্গিতে ২০ জন আহত হয়। (যায়যায়দিন ১২.১০.৯৯)। ১১ অক্টোবর বরিশালে ১ জনের হাতে ও অন্যজনের পায়ের রগ কেটে ফেলা হয়েছে। (দৈনিক জনকণ্ঠ ১২.১০.৯৯)। এগুলো কয়েকটি উদাহরণ মাত্র, যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে মাঠ পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অভ্যন্তরীণ কলহ কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

www.pathagar.com

এ ছাড়া দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির প্রমাণ হচ্ছে নারীদের ওপর অত্যাচার। গৃহকর্ত্রী কর্তৃক গৃহপরিচারিকা নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন শত শত নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এই পাশবিকতার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না তিন বছরের শিশু থেকে শুরু করে ষাট বছরের বৃদ্ধারাও। শহর, নগর, বন্দর, গ্রামাঞ্চল ছাড়াও পুলিশী হেফাজতে থানা, পুলিশ কন্ট্রোল রুম, আদালত প্রাঙ্গণ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, এমনকি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনসহ সরকারের মন্ত্রীর বাসভবনেও মহিলা ও শিশুরা নিরাপদ নয়, যা চরম লজ্জাজনক ও জাতীয় জীবনের এক কলঙ্কিত অধ্যায়–যার দায়-দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরীকারী সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের এক ক্যাডার-নেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এই ধর্ষণের প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৯৬, ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে সারাদেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে যথাক্রমে ২৭৭, ৭৩৮ ও ১৪২৫টি। আর '৯৯ সালের প্রথম ৬ মাসেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৭০০টি। এ সংখ্যা শুধু থানায় অভিযোগকৃত এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনার সমষ্টি। এর বাইরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার সংখ্যা এরচেয়ে অনেক গুণ বেশি হবে। (দৈনিক দিনকাল ১২.১০.৯৯)।

সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আদালত কর্তৃক জামিন সন্ত্রাস ও অপরাধের জন্য দায়ী। অথচ ৪ অক্টোবর '৯৯ একটি হত্যা মামলায় সরকারি দলের ৪ নেতাকর্মীর জামিন বাতিল করায় তাদের সমর্থক নারায়ণগঞ্জ আদালত এলাকায় যে নজিরবিহীন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে তা দেশবাসীকে বিস্মিত করেছে। কারণ জামিন বাতিল নিয়ে প্রশাসন ও আদালতের ওপর এমন হামলার ঘটনা এর আগে এ দেশে আর ঘটছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া গত ১২ অক্টোবর '৯৯ দুপুরে বরিশালে জনাকীর্ণ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণ থেকে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাররা ফিল্মি কায়দায় জনৈক চানের পরিবারের ৩ জন সদস্যকে অপহরণ করে। অবশ্য পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। (দৈনিক জনকণ্ঠ ১৩.১০.৯৯)

আগেই বলেছি, দেশের প্রতিটি নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার এই দায়িত্ব পালন করে দেশের অর্থে পালিত পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে। দেশের জনগণের জানমাল কতটা নিরাপদ তা নির্ভর করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর। আর আইন-শৃঙ্খলা নির্ভর করে সরকারে ঐকান্তিকতা এবং দেশের প্রশাসন তথা পুলিশ বাহিনীর নিরপেক্ষতা ও আইনের নিজস্ব গতির ওপর। কিন্তু চরম দুঃখজনক যে বর্তমানে দেশে এই শর্তগুলো কোনোক্রমেই পালিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক ও দলীয় কারণে ব্যবহারের ফলে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। দেশের আইন–শৃঙ্খলা এবং জনগণের জানমালের রক্ষার দায়িত্ব

www.pathagar.com

দেশের পুলিশ বাহিনীর। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনকারী পুলিশ বাহিনী আজ জনগণের জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা দুষ্টের দমনে ব্যর্থ। নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগে অপারগ। বর্তমান সরকার আমলে দলীয় সন্ত্রাসীদের সাথে সাথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীর একটি অংশও অপরাধ জগতে প্রবেশ করেছে। খুন, ছিনতাই ও ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ছে পুলিশের কিছু সদস্য। এর প্রমাণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশে মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত ১৯৯৮ সালের প্রতিবেদন। পুলিশের এই সমস্ত বিপথগামী সদস্যের অপকর্মের জন্য গোটা পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। খোদ পুলিশের মহাপরিচালকের হিসাব মতেই ১৯৯৮ সালে বিভিন্ন অপরাধে ১৬,৬৫৪ জন পুলিশকে বিভিন্ন শাস্তি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১,৪৬৬ জনকে গুরুদণ্ড এবং ১৫,০১৬ জনকে লঘুদণ্ড দেয়া হয়েছে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪.৩.৯৯)। অবশ্য অপরাধের সঠিক সংখ্যা এরচেয়ে কয়েকগুণ বেশি হবে তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। আইজিপির বক্তব্যানুযায়ী ১৯৯৭ সালের চেয়ে ১৯৯৮ সালে বিভিন্ন অপরাধের মামলার সংখ্যা বেড়েছে। ১২,০৬৫টি। ধর্ষণের মামলা বেড়েছে ১,৬৩০টি।

একথা সত্য যে পুলিশী হেফাজতে যুবদল নেতা তুহীন, বিশ্বাবিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র রুবেল, বিমানের পার্সার নুরুজ্জামান শরীফ, ইয়াসমনি ও সীমা হত্যা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের অভিযোগে চট্টগ্রামের নূরুল আবছারের গ্রেফতার, এজাহার দিতে গিয়ে গুলশান থানায় পুলিশ কর্তৃক ব্রিটিশ ভদ্র মহিলার শ্লীলতাহানী, সম্প্রতি টাংগাইলে পুলিশ কর্তৃক এক যুবতী ধর্ষণ পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। এই সমস্ত ঘটনা দেশবাসীর বিবেককে কষাঘাত করলেও আজও এই রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও হত্যার প্রক্রিয়া থেমে যায়নি। তাই তো মাননীয় নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরেও খোদ ডিবি অফিসের পানির ট্যাংকের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হয় তাদেরই সোর্স বলে পরিচিত এদেশেরই এক হতভাগ্য নাগরিক 'জালাল'-এর গলিত লাশ। প্রাণ দিতে হল ঢাকার দক্ষিণ বাসাবো এলাকার যুবক মজিবুর রহমানকে। (দৈনিক দিনকাল ১৯.৩.৯৯)।

আজ চরম দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে দেশে ভারত থেকে সীমান্ত পথে বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। খোদ পুলিশের মহাপরিদর্শক এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, দেশে অবৈধ অস্ত্রের প্রধান উৎস ভারত। গোলাবারুদের একটি অংশও ভারত থেকে আসে। সীমান্তের বেশিরভাগ এলাকাজুড়ে ভারতের অবস্থান যাওয়াতে সেখান থেকে এবং সমুদ্র পথে অবৈধ অস্ত্র আসে। (দৈনিক জনকণ্ঠ ১২.১০.৯৯)। এ ছাড়া বাংলাদেশে অস্ত্রের চোরাচালানে বাধা না দিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক নির্দেশই প্রমাণ করে ভারত বাংলাদেশে অবাধে অবৈধ অস্ত্র প্রবেশের সুযোগ দিয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে প্রত্যক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে। এটি যে ভারতীয় নীলনকশা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.pathagar.com

এ কথা সত্য যে, ১৯৯৬ থেকে এখন পর্যন্ত দেশে সুশাসনের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। দেশে যদি সুশাসন থাকত, তাহলে এত বোমা বিস্ফোরণ, বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের এত গুলিবর্ষণ, এত হত্যাকাণ্ড হত না। এত লুটতরাজ হত না। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আজ ছিনতাইকারী, অপহরণকারী ও সন্ত্রাসীদের আখড়া হত না। এত ধর্ষণ হত না। পুলিশকে আসামি হিসেবে দেখতে হত না। নরঘাতক এরশাদ শিকদারের মদদদাতা ও অর্থপুষ্টের তালিকায় মন্ত্রী, আমলা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও পুলিশের নাম থাকত না। মানুষের ঘর-সংসার করা, ব্যবসা বাণিজ্য করা, পথ চলা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ত না। সমাজে বিশৃংখল হয়ে যাবার অবস্থা হত না। সারাদেশে বোমাতংক হত না। সর্বোপরি সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হত না।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তথা সন্ত্রাসমুক্ত নিরাপদ বাংলাদেশ গঠনে সরকারের পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। তবে সরকার ও সরকারি দলের দায়িত্বই সর্বাধিক। এ জন্য চাই সরকারের ঐকান্তিকতা। আর এই ঐকান্তিকতার প্রমাণ হিসেবে এবং নিরপেক্ষতার স্বার্থে সর্বাগ্রে সরকারি দলের সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারী ক্যাডারদেরকে দল থেকে বহিষ্কার ও আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে। কারণ সরকারি দল সন্ত্রাসী বা অপরাধমুক্ত হলেই অন্য দলগুলোও আপনাআপনি সন্ত্রাসমুক্ত হতে বাধ্য। তবে সন্ত্রাস দমনের নামে বিরোধী দল দলনের কুৎসিত নীতি পরিহার করতে হবে। পুলিশ বাহিনীকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে হবে। পুলিশ বাহিনীকে অপরাধমুক্ত ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে উজ্জীবিত করতে হবে। পুলিশের ওপর জনগণের হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে যে নৈতিক চরিত্রবান, সুশৃঙ্খল ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নিরপেক্ষ বাহিনী দেশের সন্ত্রাস ও অপরাধ দমনের প্রধান শর্ত। আওয়ামী লীগ সরকারকেই বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলে প্রয়োজন হবে না ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন কিংবা বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত জননিরাপত্তা আইন। দেশের জনগণ জীবনের নিরাপত্তা চায়। চায় নিরাপদ বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে না কোনো রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সন্ত্রাস। সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলের ঐকান্তিকতায় সন্ত্রাসমুক্ত নিরাপদ বাংলাদেশ হবে একবিংশ শতাব্দীর একটি বড় উপহার– দেশের ক্রান্তিলগ্নে দেশবাসীর এই প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

লে. কর্নেল (অবঃ) এম এ লতিফ খান

সন্ত্রাস দলীয়করণ আর দুঃশাসন প্রতিষ্ঠার এক কালো অধ্যায়

ডেটলাইন ঃ ৫ মার্চ ২০০১

শেখ হাসিনা কয়েক দিন আগে কথা দিয়েছেন, এ বছর জুলাই মাসে তার সরকার পদত্যাগ করবে। খবরটি পড়ে অনেকের মতো আমার মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মনে প্রশ্ন জেগেছে, একটি সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে তার উত্তরসুরিদের জন্য কি রেখে যায়? প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক এ কারণে যে, নতুন একটি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন তার পূর্বসূরিদের অনেক দায়ভাগই সেই নতুন সরকারের ওপর বর্তায় এবং বলা চলে পূর্বসূরিদের পজিটিভ কাজের চেয়ে নেগেটিভ কাজের ক্ষতিকর দিকগুলোকে নতুন সরকারকেই সামলাতে হয়। যদি বর্তমান সরকারই নতুন করে ক্ষমতায় যায় তাহলে তাকে এসব সমস্যায় পড়তে হয় না। '৯১ সালে বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন তাকে তার পূর্বতন সরকারের অনেক কিছুই মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং যা সামাল দিতে সে সময়ের নতুন সরকারকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সাড়ে চার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ নজির বোধহয় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি। প্রশাসনসহ সর্বদিক আওয়ামীকরণের প্রয়াস খুব নগ্নভাবে প্রকাশ পেলেও সম্ভবত আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতিই ছিল সবচেয়ে বেশী হতাশাজনক। এই সময়ের মধ্যে দুজন জাঁদরেল মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকলেও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঠেকাতে পারেননি কেউই। একজন তো এর ব্যর্থতার দায়ভাগ দিয়ে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাটির নিচ থেকে সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে আনার যে হুঙ্কার দিয়েছিলেন তা যে কতটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এই লেখার মধ্যে সন্নিবেশিত পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। '৭১ থেকে '৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসনের ২১ বছর পরে ক্ষমতায় এসেছে তারই উত্তরাধিকারী কন্যা শেখ হাসিনা। শেখ মুজিব ক্ষমতা স্থায়ীকরণের জন্য ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণকল্পে কখনও হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আবার কখনও হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য তৈরি করেছিলেন বাকশাল। নিষিদ্ধ হয়েছিল অন্যান্য দল। এক দেশে এক নেতা বনে গেলেন শেখ মুজিব, একদল হলো বাকশাল পিতৃ আদর্শে অনুপ্রাণিত হাসিনা দেশে পিতার স্বপ্ন প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। এর জন্য চলছে যত সম্ভব জোর প্রচেষ্টা। মনে হচ্ছে হাসিনার উদ্দেশ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা নয়, ক্ষমতায়ন। সারাদেশে চলছে আওয়ামী শাসনের স্থায়ীকরণের হীন চক্রান্ত। পুলিশকে কব্জা করে, বশংবদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের। বিশেষ ক্ষমতা হয়েছে ওদের। এদের ক্ষমতার দাপটে দেশবাসী আজ শঙ্কিত। অন্যায়-অনাচার সংকীর্ণতা নিয়ে দেশের সেবা করার

www.pathagar.com

মতো মহানব্রত পালন করা অসম্ভব। নৈতিকতা বিবর্জিত রাজনীতিতে বিবেচনা থাকে না দুর্নীতিযুক্ত রাজনীতি আদর্শবিহীন। যে রাজনীতিতে নৈতিকতা নেই সে রাজনীতিতে মনুষ্যত্ব নেই। আর মনুষ্যত্ববিহীন রাজনীতি জনগণের কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হয় না সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শবাদিতা রাজনীতিতে অপরিহার্য। সীমাহীন দুর্নীতি আর সন্ত্রাস সংক্রামক রোগের মতো জর্জরিত করছে দেশটাকে। আওয়ামী কপট শাসনে দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, আন্তর্জাতিক তথা সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই অবক্ষয় ঘটেছে সীমাহীন দলীয়করণের জন্য। সর্বক্ষেত্রে আওয়ামী বিশ্বাসীদের ক্ষমতায় বসানোর প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পর্যায়ে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে আওয়ামী প্রধান নেই। আদালত দখলের প্রচেষ্টায়ও এরা কুণ্ঠিত হয়নি। সমালোচনা করছে বিচার বিভাগ ও বিচারকদের। একতরফাভাবে লাঠি মিছিল হয়েছে বিচারকদের বিরুদ্ধে, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন আওয়ামী নেতা-মন্ত্রী। একটি সভ্য সমাজে যা কখনই ভাবা যায় না। এ ধরনের ঘটনায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের মধ্যে কি ধরনের নেতিবাচক ধারার সৃষ্টি হয় তা সহজেই অনুমেয়।

সন্ত্রাসের মতো কালো ব্যাধিকে দমন করার জন্য রয়েছে আইন। সরকার যখন সন্ত্রাসকে লালন করে, আইন তখন নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য। সন্ত্রাস নির্ভর সরকারের কাজ হলো সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করা, আইনকে পর্যুদস্ত করা। দেশের মানুষের আজ নিরাপত্তা নেই। নিরাপত্তা নেই জানমাল, ইজ্জতের। হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, অপহরণ, ধর্ষণ, দখলের কোনো বিচার নেই। আদালতপাড়ায় একের পর এক চলছে হত্যাকাণ্ড। সন্ত্রাস এখন উপরে ওঠার একমাত্র শক্ত সিঁড়ি। এই সরকার রেকর্ড ভঙ্গ করেছে সমস্ত অপকর্মের। সারাদেশে সন্ত্রাস চলছে অবাধে। এই সরকারের গণতান্ত্রিক শাসনের নামে চলছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, অত্যাচার, হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন। বীভৎস কাণ্ড ঘটছে একের পর এক। মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে অনেক জনপদ। প্রত্যহ লাশের ছবি পত্রিকার বিশেষ অংশ জুড়ে থাকে। যেখানে ঠাঁই পায় ধর্ষিতার লাশ, চাঁদা না দেয়ায় চাঁদাবাজদের হাতে নিহত লাশ, সরকারের সমালোচনা করায় সরকারি সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীর লাশ। হাসিনা সরকার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে ধর্ষণকারী, চাঁদাবাজ, খুনী, দখলদার, অপহরণকারী, কালোবাজারীদের। এরা আজ স্বাধীন। পরাধীন সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম। অহর্নিশ মিথ্যা আশ্বাস আর সাফল্যের কথা প্রচার করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার ডকুমেন্ট সেলসহ অন্যান্য সংস্থার জরিপ অনুযায়ী দেয়া তথ্যানুসারে ১৯৯৬ সালের জুন থেকে ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে খুন হয়েছে ৯ হাজার ৮২৮ জন। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৬ জন করে। এ ছাড়া উল্লিখিত সময়ে ধর্ষণ, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের কারণে হত্যাসহ আনসার, পুলিশ ও বিডিআরের হাতে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপের তথ্যানুযায়ী গত দুই যুগের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশী।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে এবং পরে দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সে সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। পরবর্তী সে কারণে সরকার গঠনের ৯৬ সালের অবশিষ্ট ৬ মাসে খুনসহ বিভিন্ন অপকর্ম চরমভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রায় দেড় হাজারের মত খুনের ঘটনা ঘটে এবং খুনের গড় প্রতিদিন প্রায় ৭-এ দাঁড়ায়। এরপর ১৯৯৭ সালে দেশে খুনের ঘটনা কিছুটা কমলেও অন্যান্য অপকর্ম বৃদ্ধি পায়। এ সালে খুন হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৬৫৭টি। প্রতিদিন গড়ে যে খুনের হার ছিল ৫-এরও নিচে। ১৯৯৮ সালে দেশে খুনের সংখ্যা '৯৭ সালের তুলনায় বেশ বৃদ্ধি পায়। এ সময় গোটা দেশে মোট খুনের ঘটনার শিকার হন ১ হাজার ৮৭৭ জন, যা দৈনিক গড়ে ৫ জনেরও অধিক। '৯৯ সাল দেশে খুনসহ বিভিন্ন অপকর্মের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সাথে সাথে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির নিম্নস্তরে উপনীত হয়েছিল। এ বছরে খুন হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৩০৮ জন। গড়ে প্রতিদিন খুনের সে হার দাঁড়ায় ৭-এর কাছাকাছি। ২০০০ সালে খুন হয় ২ হাজার ৪২৪ জন। ধর্ষণ ১ হাজার ১২১, এসিডের শিকার ৩৪৯, যৌতুকের কারণে মৃত্যু ১২৭, পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু ২৭, পুলিশী অত্যাচারের শিকার ১৭৬, অপহৃত হয়েছে ৬৭৮, জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে ২৮২। (তথ্য সূত্র ঃ বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন ডকুমেন্টেশন সেল)।

একটি সরকারের বিদায়ের বছরে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির এই চিত্র খুবই কি আশাব্যঞ্জক? ক্ষমতায় আসার সময় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রথম ৩ দফায় বলা হয়েছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, কঠোর হস্তে সন্ত্রাস, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানিসহ সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, সন্ত্রাসী যে দলের, এমনকি আমার দলের হলেও তাকে রেহাই দেয়া হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, সন্ত্রাসী যদি মাটির নিচেও লুকিয়ে থাকে, তবে তাকে টেনে বের করে আনা হবে। কিন্তু সবই অসাড়, গত সাড়ে ৪ বছরে এ দেশের জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে আওয়ামী দুঃশাসনের এক ভয়াবহ চিত্র। জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে সরকারি দল এবং পুলিশ বাহিনী একযোগে সন্ত্রাস করেছে, সন্ত্রাস লালন করেছে, সন্ত্রাস উসকে দিয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে দেশে আইন-কানুন আর প্রশাসন রয়েছে সে দেশে এমনটি ঘটতে পারে এটা কি বিশ্বাস করা যায়? অবিশ্বাস্য মনে হলেও তা মেনে নিতে হয়। কারণ এখানে শাসক দলের চীফ হুইপের পুত্র অন্যের বাড়ি দখল করে নেয় অবলীলায়। তার বিরুদ্ধে মামলা হয় না। সরকারি দলের একজন এমপির পুত্র প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে রাজধানীর অভিজাত এলাকার একজন ব্যবসায়ীকে। মামলা হলেও পুলিশ ওই এমপি পুত্রের কেশও স্পর্শ করতে পারেনি। আইন-প্রণয়নের সর্বোচ্চ ফোরামের সদস্য এমপি সাহেব দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই বোধহয় স্বীয় পুত্রকে বিদেশ পাঠিয়ে দায়মুক্ত হতে চেয়েছেন। শাসক দল আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রী-নেতারা জন্ম দিয়েছেন অনেক ন্যক্কারজনক ঘটনার। ফেনীর এমপি জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের আবু তাহের, সাতক্ষীরায় প্রতিমন্ত্রী মোজাম্মেল হোসেন ছিলেন

www.pathagar.com

সমালোচনার শীর্ষবিন্দুতে। ক্ষমতাসীন দলের এমপি জয়নাল হাজারী সম্পর্কে কমবেশী সবাই অবগত এ দেশে। তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অনেক আগে থেকে চলে আসলেও গত বছর তা ওঠে তুঙ্গে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর চড়াও হওয়া ছাড়াও এ বছর তিনি নতুন ঘটনার জন্ম দেন অনেক। বিল না দেয়ায় গ্রামীণ ফোন কর্তৃপক্ষ হাজারীর টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে ক্ষিপ্ত হাজারী গ্রামীণ ফোনের ফেনীর সুইচরুম অফ করে দেয়। হাজারীর লাইন কাটা থাকবে আর অন্যদের টেলিফোন থাকবে সচল এটাও কি সম্ভব? না, এই চরম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য হাজারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি। অবশ্য গ্রামীণ ফোন কর্তৃপক্ষও বেশী দূর অগ্রসর হননি বিষয়টি নিয়ে। শোনা যায়, গ্রামীণ ফোনের উচ্চ পর্যায়ের কর্তাব্যক্তির সাথে সরকারের শীর্ষ ব্যক্তির সমঝোতার ফলেই বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়।

আওয়ামী লীগের চতুর্থ সারির এক নেতা লক্ষ্মীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আবু তাহের। তার নেতৃত্বে তারই পুত্র অপহরণ করলো লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট নূরুল ইসলামকে। তারপর আজ পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এটা এখন স্পষ্ট যে, এডভোকেট নূরুল ইসলামকে হত্যা করা হয়েছে। তাকে কারা অপহরণ করেছে, হত্যা করেছে এ কথা সবাই জানে। কিন্তু পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেয়নি। উপরন্তু নুরুল ইসলাম অপহরণ সম্পর্কে কিংবা আবু তাহেরের বিরুদ্ধে কেউ পত্রিকায় কিছু লিখলে সেই সাংবাদিকের হাত কেটে নেয়ার হুমকি দেয় আবু তাহের। আর সে হুমকি দেয়া হয়েছিল একজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক জনসভায়। না, আবু তাহেরের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। বরং প্রধানমন্ত্রী তাকে সমর্থন করেছেন এই বলে যে, একজন লোকের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে সে অনেক কিছুই করতে পারে। ঠিক একই কায়দায় সাংবাদিকের হাত-পা ভেঙে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতিমন্ত্রী মোজাম্মেল হোসেন। তিনি এই বলে স্থানীয় লীগ নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সাতক্ষীরার রিলিফ চুরি সম্পর্কে কোনো সাংবাদিক কিছু লিখলে তার হাত-পা ভেঙে দেবেন, থানায় কোনো মামলা হবে না। তার নির্দেশে এক চেয়ারম্যান একজন সাংবাদিককে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে, পত্রিকা অফিস ভাঙচুর করেছে। কি চমৎকার আইনের শাসনের উদাহরণ। আইনের শাসনও এ সরকারের সময় লাঞ্ছিত-নিগৃহীত হয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বারবার আক্রমণ–শাসিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত আর মাননীয় বিচারপতিদের ওপর। আর তার মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে লাঠি মিছিল করেছে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে। একজন অতিভক্ত মন্ত্রী তো সাফ সাফ বলেই ফেললেন, লাঠি কোথায় মারতে হবে তা তাদের জানা আছে। অর্থাৎ একটি বিশেষ মামলার রায় তাদের মনঃপুত না হলে লাঠি তারা জায়গা মতোই মারবেন। সেই মন্ত্রীর হুমকির বাস্তবায়ন দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ করেছে। গত বছর ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার রাজপথে। মুজিব হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স রায় হবার পর থেকে আওয়ামী সন্ত্রাস চলে দেশ জুড়ে। অথচ মজার ব্যাপার হলো কথায় কথায় সামান্য পান চুন খসলে বিরোধী দলের নামে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয়, সেখানে সরকারি দলের

www.pathagar.com

সদস্যদের হাতে গাড়ি ভাংচুর, প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ানোর দৃশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পড়েও তাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয় না। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগ ও কার্যকর করার পর বিগত সাড়ে ১০ মাসে সারাদেশে সরকারি দলের নেতা কর্মী-সমর্থকদের দ্বারা এ আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য এত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যে, তাদের বিরুদ্ধে শত শত মামলা হতে পারত। প্রকাশিত এক খবরে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত খোদ রাজধানীতে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হবার যোগ্য অন্তত ১০টি অপরাধমূলক বড় ঘটনায় জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয়নি। পরিসংখ্যান বলে এই ১০টি ঘটনার মধ্যে ৯টি ঘটিয়েছে সরকারি দলের কর্মী ও সমর্থকরা। এ থেকে জননিরাপত্তা আইনের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এই আইনটি প্রণীত হবার সময়েই সকলের আশঙ্কা ছিল, এটি বিরোধী দলের দলনে অপপ্রয়োগ হতে পারে। ধীরে ধীরে হলেও এ আশঙ্কাটা যেন প্রমাণিত হতে চলেছে। ভুক্তভোগী জনগণ ১৯৭৪ সালের আওয়ামী লীগ সরকারে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপপ্রয়োগে যেমন বারবার আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি সেই আওয়ামী লীগ সরকারেরই প্রণীত আর এক কালো আইন জননিরাপত্তা আইন-এ জনগণ আবার নিষ্পেষিত হচ্ছে। জননিরাপত্তার নামে কালো আইনটি প্রণয়নের সময় সরকারি দল ও মহলের পক্ষ থেকে এ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এরূপ একটি আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা যে বাস্তবতার নিরিখে অবশ্যক, তাও বলা হয়েছে। এই সঙ্গে আইনটির অপপ্রয়োগ হবে না, নিরীহ-নির্দোষ ব্যক্তি এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং রাজনৈতিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ হবে না, এই মর্মে আশ্বাসও প্রদান করা হয়েছে। সরকারি দল ও মহলের এই বক্তব্যের প্রথমাংশ যেখানে আইন-প্রণয়ন ও কার্যকরণের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে– সে সম্পর্কে কেবল এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, যে সব বিষয় বা অপরাধকে এ আইনের আওতায় ন্যস্ত করা হয়েছে সে সব বিষয় বা অপরাধের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত আইনেই সম্ভব ছিল। এজন্য পৃথক আইনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। উল্লেখ করা যেতে পারে, গাড়ি ভাংচুর, সম্পদের ক্ষতিসাধন, রাস্তায় যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দরপত্রে হস্তক্ষেপ, মুক্তিপণ দাবি বা আদায়, ত্রাস সৃষ্টি, মিথ্যা মামলা বা অভিযোগ এবং অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তা এই ক'টি সুনির্দিষ্ট অপরাধ দমনের জন্যই জননিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত অপরাধ করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকার পরেও তাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হচ্ছে না। বলাবাহুল্য, যারা এসব ভাগ্যবান তারা সবাই সরকারি দলের সদস্য। সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা জননিরাপত্তা আইনের আওতাধীন অপরাধ সংঘটিত করে পার পেয়ে যাওয়ায় জনমনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, আইনটি কেবল সরকারি দলের নেতা-কর্মী বা সমর্থক নয় এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যই প্রণীত হয়েছে। এরা ওই আইনের আওতামুক্ত থাকলে এই বিশ্বাস কিংবা আশ্বাসে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষও তাদের সম্পদ-সম্পত্তি এদের দ্বারা ক্ষতির শিকার হচ্ছে। প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, জননিরাপত্তা আইনের আওতায় এ পর্যন্ত ২ হাজারের মতো মামলা হয়েছে। যার মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে ছিনতাই ও চাঁদাবাজির অভিযোগ বেশী। যাই হোক, জননিরাপত্তা আইন প্রণীত হবার পর থেকে যে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়েছে তা নয়, বরং তা দিন দিন বাড়তে বাড়তে কোন পর্যায়ে গেছে তা এই লেখায় প্রদত্ত পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে। যদিও এই পরিসংখ্যান সরকার বা বিরোধী দল কারোরই জন্য সুসংবাদ নয়। সন্ত্রাস আজ আমাদের সব মহৎ অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। সন্ত্রাসীদের বিস্তার ঘটছে গডফাদার নামে অদৃশ্য এক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়। এদের রক্ষা করছে দেশের ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর নায়ক কুশলীলবরা। এই গডফাদারদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন। এমনকি কলঙ্কিত করছে আমাদের ধর্মীয় পরিবেশ। এদের আগ্রাসন থেকে আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, এমনকি আমাদের কষ্টার্জিত গণতন্ত্রও আজ বিপন্ন। দেশবাসীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাসহ সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা বলতে এখন কিছুই নেই। বলা চলে এদের কাছে গোটা দেশই আজ জিম্মি। এ থেকে একটা কথাই প্রমাণিত হয়, আসলেই আইন-প্রণয়নই বড় কথা নয়, তার যথাযথ প্রয়োগই বড় কথা। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সরকারের যদি কমিটমেন্ট থাকে যে কোনোভাবে সন্ত্রাস দমন করার, তাহলে তা হতে বাধ্য। এখানে আরও একটা কথা বলতে হচ্ছে যে, সরকার বিরোধীদের ওপর আইনের খড়গ হস্ত আরোপ করলে সন্ত্রাস দমনে সরকারের আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। অতীতে এর বহু নজির আমরা দেখেছি। সরকারকে অন্তত এ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে হবে যে, জনগণ সবই বোঝে। তারা সিদ্ধান্ত নিতে কখনও ভুল করে না। তাদেরকে বোকা বানাতে গেলে এক সময় ঠিকই তারা রুখে দাঁড়ায়। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, এ কথা সত্যি যে তুমি কিছুদিনের জন্য সকলকে বোকা বানাতে পার, এমনকি তুমি কিছু লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পার। কিন্তু তুমি সকলকে সব সময়ের জন্য বোকা বানাতে পার না। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট মহল এই উপলব্ধিটা যত তাড়াতাড়ি করবেন দেশ ও জাতির জন্য তত তাড়াতাড়ি তা মঙ্গলজনক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

মোবায়েদুর রহমান

অবৈধ অস্ত্রের এক বিশাল ভাণ্ডার বাংলাদেশ

ডেট লাইন ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০১

কথায় বলে দিন যায় কথা থাকে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ডাঃ ইকবাল এমপির মিছিল থেকে দিনে-দুপুরে চার ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করা হলো। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড নিয়ে শাসকগোষ্ঠী বিভ্রান্তি সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিল। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অনেক অপচেষ্টাও হয়েছিল। এমন কথাও বলা হয়েছিল যে, ছবিও নাকি মিথ্যা কথা বলে। সারা দুনিয়ার মানুষ জেনে এসেছে যে, ছবি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে না। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানুষকেই নয়, বিবিসি'র মতো বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানকেও এ ব্যাপারে জ্ঞান বিতরণ করেছেন।

বিবিসিকে তিনি সবক দিয়েছেন যে, আলোকচিত্র বা ছবিও উল্টাপাল্টা কথা বলে। আমি জানি না বিবিসি'র কর্তাব্যক্তিরা হিন্দু পুরাণ রামায়ণ পড়েছেন কিনা। পড়ে থাকলে আওয়ামী নেতার বয়ান শুনে বলতেন ধরণী দ্বিধা হও। আমি ওর মধ্যে ঢুকে পড়ি। এই হত্যাকাণ্ডের পর পাঁচদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ডাঃ ইকবাল গ্রেফতার হননি। শুধুমাত্র এমপি ইকবাল কেন, অতগুলো অস্ত্রবাজ ঐ মিছিলে ছিল, তাদের একজনও গ্রেফতার হয়নি। উল্টো মুরাদ নামে বিএনপির এক যুবনেতা গ্রেফতার হয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে নতুন করে আবার ঐ কবিতাটি লিখতেন, তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।

এভাবে দিন গড়িয়ে যাবে। মানুষ ধীরে ধীরে অনেক কিছুই ভুলে যাবে। দগদগে ঘা চিরদিন দগদগে থাকে না। এক সময় সেটাও শুকিয়ে যায়। কিন্তু ডাঃ ইকবাল সেদিন কাদেরকে নিয়ে ঐ মিছিল করেছিলেন? দৈনিক ইনকিলাব, যুগান্তর, প্রথম আলো ইত্যাদি পত্রিকা যে অস্ত্রবাজদের ছবি ছাপিয়েছে তারা ছাড়া আর কোনো সশস্ত্র ব্যক্তি এবং অস্ত্রবাজ কি ঐ মিছিলে ছিল না? আওয়ামী সরকারের আমলে হয়তো ওদের বিচার হবে না। কিন্তু ইতিহাসে রেকর্ড তো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। সেদিন কারা সেই মিছিলে ছিল?

মতিঝিল এলাকা থেকে কিছুদিন আগে প্রকাশিত বাংলা দৈনিকটিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সেদিনের সশস্ত্র ব্যক্তিরা সবাই ছাত্রলীগ, যুবলীগের ক্যাডার। ১৫ তারিখে যুগান্তরে বলা হয়েছে, মঙ্গলবারের মিছিলে প্রায় একডজন সশস্ত্র ক্যাডার অংশ নেয়। এদের হাতে ছিল বিদেশী পিস্তল। চেক গেঞ্জি পরা অস্ত্রবাজ যুবকের নাম দুলাল। হাফ হাতা চেক শার্ট পরা ক্যাডারের নাম খোরশেদ আলম। ওরা মঙ্গলবারের মিছিল থেকে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। অস্ত্র চালানের ওপর তার বিশেষ প্রশিক্ষণ রয়েছে। গত মঙ্গলবার মালিবাগ মোড়ে কমান্ডো স্টাইলে বিশেষ ভঙ্গিতে বসে দুলাল পিস্তল দিয়ে গুলি চালায়। তার হাতে ছিল ইতালীয় তৈরি সর্বাধুনিক

www.pathagar.com

পেট্রোবেট পিস্তল। হাফ হাতা চেক শার্ট পরা সুদর্শন যুবকের নাম খোরশেদ আলম মিঠু। মিঠুর পেছনে দুজন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে ছিল রমনা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুল বাসার ও আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ার। অপর একটি ছবিতে জিন্স প্যান্ট, সাদা কেডস, হাফ হাতা শার্ট পরা যুবকটি ছোট হান্নান। সে ইস্কাটন এলাকার প্রভাবশালী যুবলীগ নেতা লিয়াকতের ছোট ভাই।

এ ছাড়া পত্রিকার ছবিতে চেহারা অস্পষ্ট কিন্তু মঙ্গলবারের সশস্ত্র মহড়ায় যারা অংশ নিয়েছিল তাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া গেলো। উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছে– মগবাজার এলাকার আরমান, বাঁশপট্টি বস্তির কিরণ, মহাখালীর রবু, বেগুনবাড়ির অপু ও নানু। সবচেয়ে ভীতিজনক খবর ছাপিয়েছে দৈনিক প্রথম আলো। সংবাদটির শিরোনাম হল ইকবালের মিছিলে সন্ত্রাসী মুখ। ১৫ তারিখে প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়, ওই মিছিলে সেদিন কম করে হলেও শতাধিক ব্যক্তির কাছে বৈধ-অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তারা সবাই সংসদ সদস্য ইকবালের রাজপথের সার্বক্ষণিক সৈনিক হিসেবে পরিচিত। এদের অধিকাংশের বাসা রমনা ও তেজগাঁও এলাকায়। একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে, বড় ডোরা কাটা গেঞ্জি গায়ে অত্যাধুনিক পিস্তল হাতে যে যুবকের ছবি অধিকাংশ ছাপা হয়েছে তার নাম দুলাল। বন্ধুদের কাছে কমান্ডো দুলাল বা ঘোড়া দুলাল হিসেবে পরিচিত। সংসদ সদস্য ডাঃ ইকবাল এবং রমনা থানা আওয়ামী লীগ নেতা আবুল বাশারের ঘনিষ্ঠজন হওয়াতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার দিন তার হাতে যে অস্ত্রটি ছিল সেটি ইটালির তৈরি পেট্রো বেটা পিস্তল। কালোবাজারে দাম প্রায় ২ লাখ টাকা। হাফহাতা চেকশার্ট, হাতে কালো বেল্টের ঘড়ি পরা এই যুবকের ছবি গতকাল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। তার হাতেও ছিল একটি অত্যাধুনিক পিস্তল। মিঠু সংসদ সদস্য ইকবালের বিভিন্ন প্রকাশ্য কর্মসূচিতে থাকে। ছবিতে দেখা জিন্স প্যান্ট পরা লম্বা ডোরাকাটা হাফশার্ট গায়ে। আর কেডস গায়ে আরেক সশস্ত্র যুবক যুবলীগ নেতা লিয়াকতের ছোট ভাই হান্নান বলে জানা গেছে। সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, আলোচিত মিছিলে সশস্ত্র যুবকদের মধ্যে আরো যারা অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে ৫০ জনের নাম তারা পেয়েছে। এরা সবাই রমনা, তেজগাঁও এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সরকারদলীয় ক্যাডার হিসেবে পরিচিত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– কিরণ, হালিম, আরমান, বাদল, অপু, রবু, হেমায়েত, পাপ্পু, আনোয়ার, নান্নু এবং পান্না। প্রথম আলোয় প্রকাশিত ছবিতে সংসদ সদস্য ইকবালের ডান পাশে উদ্যত পিস্তল হাতে যাকে আংশিক দেখা যায় সে কিরণ।

বলা বাহুল্য, যে দুটি পত্রিকার তথ্য উপরে উদ্ধৃত করা হলো, সে দুটির কোনোটিই বিরোধী দলসমূহের সমর্থক নয়। এদের মধ্যে একটি দৈনিক প্রায়ই বিএনপিকে খোঁচা মারে এবং জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের কঠোর সমালোচনা করে। অপর পত্রিকাটি জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোটের তীব্র সমালোচক। উভয় পত্রিকাই দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগ অথবা ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

হাসিনা বা অন্যান্য শীর্ষ আওয়ামী নেতাদের সমালোচনা করে না। অন্য কথায় এরা সূক্ষ্মভাবে এবং সুকৌশলে শাসকদল আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন যোগায়। তারপরও তারা আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি ডাঃ ইকবাল এবং তার টেরোরিস্ট ব্রিগেডের কুকীর্তি প্রকাশ করেছে। এসব কঠোর সত্য প্রকাশের পরেও সরকার ডাঃ ইকবাল অথবা তার বাহিনীর কোনো ব্যক্তিরই চুলের আগা স্পর্শ করেনি। কিভাবে করবে?

আওয়ামী সরকারের বিগত সাড়ে চার বছরের রাজত্বে সারা বাংলাদেশই এক বিশাল অবৈধ অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার সারাংশ নিম্নরূপ : সারাদেশে ৮০টি সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট রয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি রাজধানী ঢাকা শহরে। এ ছাড়া ঢাকা শহরে ৫০ হাজারসহ সারাদেশে প্রায় ২ লাখ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। এই অস্ত্র ব্যবহারের কারণে দেশে প্রতিদিন চারজন লোক নিহত ও ১০ জন আহত হয়। তথ্যে বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার ঘটেছে। সীমান্ত পথে প্রতিবেশী দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আসছে।

॥ দুই ॥

বাংলাদেশে বেআইনী অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ও ছড়াছড়ি সম্পর্কে এখন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এখন আর শুধু পত্রিকার রিপোর্টার এবং কলামিস্টরাই এসব তথ্য দিচ্ছেন না, গবেষকরাও এখন নতুন নতুন তথ্য দিচ্ছেন। এক সময় পেশাদার সন্ত্রাসী, দাগী অপরাধী এবং রাজনৈতিক ক্যাডারদের অস্ত্র, স্বদেশী পিস্তল, কাটা রাইফেল এবং পাইপগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু এখন অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রতিদিন তাদের হাতে আসছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে একে-৪৭ রাইফেল, জার্মান রিভলবার, ফাইভ স্টার পিস্তল, এম-১৬ নাইনশূটার প্রভৃতি। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, সীমান্ত পথে প্রতিদিন প্রায় ১০০ অস্ত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে আরেকটি সূত্র বলে যে ১০০ নয়, প্রতিদিন ৬০০ থেকে ৭০০ অস্ত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে, ঢাকা শহরে অন্তত ২৮টি সন্ত্রাসী চক্র রয়েছে। প্রতিটি চক্রের কাছে গড়ে ৭০ থেকে ৮০টি অস্ত্র রয়েছে। একটি সূত্রে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ২ দশক অর্থাৎ ২০ বছর ধরে যে চাকমা বিদ্রোহ চলেছে সেই বিদ্রোহীদের কাছে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র দেয়া হয়েছে। এগুলো দিয়েছে ভারত। বর্তমান সরকারের তথাকথিত শান্তিচুক্তির পর যে কয়টি অস্ত্র সমর্পণ করা হয়েছে সেটা মোট অস্ত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এসব অস্ত্রের বিশাল অংশটি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে এখনও রয়ে গেছে। উপরে যে চিত্রটি তুলে ধরা হলো সেটি এক কথায় ভয়াবহ। দেশের সুশীল সমাজ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ আশা করেছিলেন যে, সরকার এসব অবৈধ অস্ত্রের সর্বনাশা পরিণতি থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা না করে খোদ সরকার এবং সরকারি ইঙ্গিতে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা এবং একটি চিহ্নিত মহল উইচ হান্টিং শুরু করেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বেআইনী অস্ত্রের ছড়াছড়ি এবং উন্মত্ত সহিংসতা প্রতিরোধের পরিবর্তে সরকার নিত্যনতুন দুশমন খুঁজে বেড়াচ্ছে। জনগণের দৃষ্টিকে দেশের সীমাহীন সমস্যা থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য এবং নিজেদের পর্বত

www.pathagar.com

প্রমাণ ব্যর্থতা ঢাকার জন্য মৌলবাদ নামক শব্দের আবরণে দেশের ইসলামী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নন্দঘোষ ঠাওরানো হচ্ছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, এমন সব দৈনিক পত্রিকা এসব উদ্ভবট প্রচারণায় শামিল হয়েছে যারা এক সময় এইসব গীবত রটনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। এই ধরনের একটি ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা গত ৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান সংবাদ লিখেছে, গত সপ্তাহে গোয়েন্দা সংস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি রিপোর্ট দাখিল করেছে। প্রতিবেদনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ছাড়াও উগ্র ইসলামপন্থী সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ডানপন্থী একটি রাজনৈতিক দল মদদ দিচ্ছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, "রাজনীতির নামে ইসলামপন্থী একাধিক দল ও সংগঠন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাইতে পারে। এইসব কার্যকলাপের দায়ভার বামপন্থী দল কিংবা সরকারের ওপর চাপাইয়া দেয়ার চেষ্টা করা হইবে।" সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সভা-সমাবেশের বক্তব্যও ছিল উস্কানিমূলক। গত ২৬ জানুয়ারি বাদ জুমা বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে এক সমাবেশে ঘোষণা দেওয়া হয়, ফতোয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে মূলত কোরআন-হাদীস তথা শরীয়তকে নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই রায় বাতিল করা না হইলে দেশে ইসলামের অস্তিত্ব থাকিবে না। জাতীয় সংসদে ফতোয়ার বিরুদ্ধে আইন পাস হইলে দেশে ওয়াজ, নসিহত, মাদ্রাসা, মসজিদ ও সব ধরনের ধর্মীয় কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। সূত্র আরও জানায়, এই ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণেই মোহাম্মদপুরে নূর মসজিদের ভিতরে পুলিশ কনস্টেবল মোঃ বাদশা মিয়া নির্মমভাবে খুন হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেল লাইন উৎপাটন, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের দুই হাতের কব্জি কর্তন, বিডিআর মেজরকে জখম করা ও হত্যাকাণ্ড ঘটে। ফেনীর অদূরে ফিসপ্লেট খুলিয়া ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটান হয়। এর চেয়েও আরো বিষাক্ত প্রচারণা চালানো হচ্ছে আরো কয়েকটি কাগজে। এরা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করছে। এক সময় একটি রাজনৈতিক দল অপর একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থককে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে সারা দেশব্যাপী ওরা শোরগোল তুলতো। সেটা করা যে ভুল হয়েছিল সে কথা আমরা বলছি না। কিন্তু এখন যখন প্রকাশ্যে দিবালোকে আওয়ামী ঝটিকা বাহিনী গুলি করে মানুষ মারছে তখন ওরা রহস্যময়ভাবে খামোশ কেন? পুলিশ লাঠিপেটা করলে সেদিন ওরা বিএনপি বা মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছে। আজ এক সপ্তাহের ব্যবধানে ১৩ জন মানুষকে সরকার ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পরেও ওরা সরকার তো দূরের কথা, কোনো মন্ত্রীরও পদত্যাগ দাবি করে না কেন?

কেন করে না সেটা জনগণের বুঝতে আর বাকি নেই। ওদের জারিজুরি ধীরে ধীরে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। আজ সময় এসেছে ওদেরকে চিহ্নিত করার। প্রতিহিংসার জন্য চিহ্নিত করা নয়, ভবিষ্যতে যেন উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে মানুষকে আর বিভ্রান্ত করতে না পারে সে জন্যই তাদেরকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

শহিদুল ইসলাম

আওয়ামী শাসন দেশকে বানিয়েছে দুর্বৃত্তের স্বর্গরাজ্যঃ শান্তিকামীর নরক

ডেটলাইন ঃ ১৪ জুলাই ২০০১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। এর পুরো দায়ভার আওয়ামী লীগের একার। তাদের পূর্ববর্তী শাসনকালে দেশের জন্য খেতাব এনেছিলেন 'তলাবিহীন ঝুড়ি'। এবার এনেছে 'বিশ্বের সেরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ' এই খেতাব। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এই খেতাব দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো সংস্থা সন্ত্রাসের শীর্ষস্থান এখন পর্যন্ত ঘোষণা করেনি। হয়তো কোনো মানবাধিকার সংগঠন বা সামাজিক সংস্থা সন্ত্রাসের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে নিয়ে জরিপ রিপোর্ট তৈরী করলে এটাতেও আওয়ামী লীগ শীর্ষস্থান দখল করতে পারতো। গত ৫ বছরের বিশাল অপরাধ চিত্রের ফিরিস্তি দেশবাসীকে আতংকগ্রস্ত করে চলেছে। ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন থেকে ২০০১ সালের ২৩শে জুন পর্যন্ত ৫ বছর বা ১৮২৬ দিনে পুলিশের রেকর্ডভুক্ত অপরাধই হয়েছে ১২ লাখ। এই সময়ে ২০ হাজার মানুষ খুন হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন খুন হয়েছে ১১ জন মানুষ। যারা খুনের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে সাড়ে ৩ হাজার খুন হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। এর বাইরেও বহু ঘটনা ঘটেছে যা পুলিশের রেকর্ডে আসেনি। সেসব ধরলে প্রকৃত চিত্র আসবে আরো ভয়াবহ।

রেকর্ডভুক্ত ১২ লাখ অপরাধের মধ্যে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, বাসাবাড়িতে ডাকাতি, বাস ডাকাতি, নৌযানে ডাকাতি, ব্যাংক ডাকাতি, দস্যুতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংঘাত, সংঘর্ষ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, চুরি, এসিড নিক্ষেপ, মাদক ব্যবসাসহ মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ৫ বছরের এই অপরাধ পরিসংখ্যান রীতিমত গা শিউরে ওঠার মতো এক চিত্র। আওয়ামী লীগের নেতা, মন্ত্রী, এমপি-রা অপরাধীচক্রের গডফাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ থাকা, সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়ই এসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। সরকারের দায়িত্ব যেখানে রক্ষকের ভূমিকা সেখানে নিজেই যখন ভক্ষক বা অপরাধের নেতৃত্ব দেয় তখন সাধারণের নিরাপত্তা থাকে কোথায়?

পুলিশের সূত্র মতে, ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে ঐ বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সোয়া ৫ মাসে খুন হয়েছে ১ হাজার ৮শ ৯৮ জন। এই সময়ে বাসাবাড়ি, অফিস, কল-কারখানা অথবা ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৫শরও বেশী। দস্যুতা হয়েছ ৯শ ৬০টি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে ৩ হাজার ২শ

www.pathagar.com

৮০ টি। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২ সহস্রাধিক। ১শ ৮৯টি শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের শিকার হয়েছেন ৬শ ৩০জন, প্রায় দেড়শ পুলিশ সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। সিঁধেল চুরি হয়েছে ৩হাজার ১শ ৭৭টি। সাধারণ চুরি হয়েছে ৬ হাজার ২শ ৭৩টি। ৫৪ ধারা বা সন্দেহজনক অপরাধ হয়েছে ৪ সহস্রাধিক। চোরাচালানির মামলা হয়েছে ২ হাজার ১শ ৪৬টি। মাদক কেনা-বেচার মামলা হয়েছে ২ হাজার ৫শ ৮৬টি। ছিনতাই এবং চাঁদাবাজির মতো অপরাধ হয়েছে ১১ শতাধিক।

১৯৯৭ সালের অপরাধ চিত্রে দেখা যায়, পুরো এক বছরে খুন হয়েছে প্রায় ৪ হাজার, গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১১টি করে খুন হয়েছে। ১২ শতাধিক ডাকাতি হয়েছে। দস্যুতা হয়েছে ২ হাজার ৭শত ৬৭টি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে ৫ হাজার ৮শ ৬৭টি। নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৬ হাজার ৮শ ৪৮ জন। ৬শ ৫৮টি শিশু ঐ বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ঐ বছর ১ হাজার ২শ ২৭টি। সিঁধেল চুরি হয় ১২ হাজার ২শ ৩৭টি। পুলিশ আহত হয়েছে ৩শ ৯০ জন। সারাদেশে মোট চুরি রেকর্ড হয়েছে ১২ হাজার ২শ ৩৭টি। ৫৪ ধারা বা অন্যান্য বিষয়ে মামলা হয়েছে ৬০ হাজার ৬শ ৭টি। অবৈধ অস্ত্রের মামলা হয়েছে ১ হাজার ৯শ ৬৯টি। বোমা বা বিস্ফোরক আইনে মামলা হয়েছে ৬শ ৬০টি। হেরোইন, ফেনসিডিল, মদসহ মাদক সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ৫ হাজার ১শ ৩২টি। চোরাচালান সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ৩ হাজার ১শ ৭টি।

১৯৯৮ সালে খুন হয়েছে ৪ হাজার ৪শ ৩৫ জন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে ৫ হাজার ১শ ২৮টি। কিন্তু নির্যাতন হয়েছে ৮শ ৭৭টি। অপহৃত হয়েছে ১ হাজার ৫শ ৭৮ জন যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু রয়েছে। হরতালসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘর্ষে পুলিশ আহত হয়েছে ৩ শতাধিক। ঐ বছর সিঁধেল চুরি হয়েছে ৭ জাহাজ ৮শ ২৭টি, চুরি হয়েছে ১২ হাজার ৮৬টি। অস্ত্র ও গুলি সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ২ হাজার ১শ ৯৮টি। বোমাসহ বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ৮শ ৩০টি। মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানির মামলা হয়েছে ১২ হজার ২শ ৭৮টি।

১৯৯৯ সালে খুন হয়েছে ৪ হাজার ৫শ ১ জন। দাঙ্গা হয়েছে ৫ হাজার ১শ। ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৯ হাজার ২শ ৭০টি। শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৬শ ৬৭টি। মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৫শ ৬৩টি। পুলিশ আহত হয়েছে ৪শ ১৯ জন। সিঁধেল চুরিসহ মোট চুরি হয়েছে ১৫ হাজার ৫শ ৬৭টি। অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে ২ হাজার ৪শ ১৯টি। চোরাচালান ও মাদক সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ৮ হাজার ২শ ৯৪টি।

www.pathagar.com

২০০০ সালে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে ১ হাজার ৮শ ৭১টি। খুন হয়েছে ৪ হাজার ২শ ৮০টি। বাসাবাড়ি, অফিস, ব্যাংক, কল-কারখানা বা বাস ট্রাকে ডাকাতি হয়েছে প্রায় ১ হাজার। ঐ বছর দস্যুতা হয়েছে ১ হাজার ৮শ ৮৩টি। চোরাচালান সংক্রান্ত অপরাধের মামলা হয়েছে ৮ হাজার ২শ ১টি। মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ৬ হাজার ২শ ৭০টি। নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে ১১ হাজার ৫শ ৪০টি। অপহরণ ও মুক্তিপণ সংক্রান্ত মামলা রেকর্ড হয়েছে একশ ১৩টি। চুরি হয়েছে ১৪ হাজার ৩শ ৩১টি।

চলতি ২০০১ সালের ২২শে জুন আওয়ামী লীগের ৫ বছর পূর্তির দিন পর্যন্ত এই পৌনে ৬ মাসে খুন হয়েছে ১ হাজার ৫শ আর রাজনৈতিক কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১শ ২০টি। এই সময়ে বাসা-বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে ৮শ ৬০টি। বাস ট্রাক ও ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে ১শ ৩০টি। নৌযান ও মিল-কারখানায় ডাকাতি হয়েছে ২৮টি। দস্যুতা হয়েছে ১ হাজার ২শ ৩টি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সংঘর্ষ হয়েছে ৪শ ৩৩টি। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ২শ ৮৫টি। এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে ৭০জন। ছিনতাই-চাঁদাবাজি হয়েছে ৭শ ৫৪টি। দরপত্র ও টেন্ডার ছিনতাই হয়েছে ২০টি। গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে ২০১টি। অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত মালা হয়েছে ৫১টি। ত্রাস সৃষ্টিসহ অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ১ হাজার ২শ ১২টি। শিশু নির্যাতন হয়েছে ২শ ১০টি। পণবন্দী করা হয়েছে ৪০জনকে। চুরি হয়েছে ১ হাজার ৯শ ৮টি, গবাদিপশু চুরি হয়েছে ৯শ, গাড়ি চুরি হয়েছে ৮শ ৮৩টি। চোরাচালান সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ১ হাজার ৫শ ৭৭টি। মাদক কেনাবেচা সংক্রান্ত অপরাধের মামলা হয়েছে ২ হাজার ৫শ ৯০টি।

সব মিলিয়ে ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন থেকে ২০০১ সালের ২২ শে জুন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের ৫ বছর বা ১৮২৬ দিনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে প্রায় ১২ লাখ। গড়ে প্রতিদিন পুলিশের রেকর্ড অনুসারেই ৬শ ৫৭টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এই সময়ে খুন হয়েছে ২০ হাজার নারী ও পুরুষ। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১১টি করে খুন হয়েছে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সাড়ে ৩ হাজার। এসব তথ্য জানা গেছে সারাদেশের ৪৭০টি পুলিশ স্টেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে পুলিশ সদর দফতরের যোগ করা রেকর্ড থেকে। বহু অপরাধ সংঘটনের পরও পুলিশ মামলা নেয় না। আবার অনেকেই পুলিশী হয়রানির ভয়ে থানায় মামলা করতে যায় না। যে সব ঘটনা এই রেকর্ডে নেই। যা রেকর্ডে আসেনি তার সবই যদি রেকর্ডভুক্ত হতো তাহলে প্রকৃত অপরাধের চিত্র হতো আরো ভয়াবহ। পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়াতো কয়েকগুণ বেশী। তারপরেও যা রেকর্ডভুক্ত হয়েছে তার চিত্র রীতিমত আতকে ওঠার মতো। এ থেকেই আওয়ামী শাসনের নমুনা ফুটে ওঠে। সারাদেশে আওয়ামী শাসনকালে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি ঘটেছে এ থেকেই স্পষ্ট।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের ৫ বছরের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাস হয়েছে বোমাবাজির মাধ্যমে। যশোরের উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন নিহত হয়। সে ঘটনা দু বছর আগের। তার পরেই জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় কুষ্টিয়ায়। পরবর্তীতে বোমা বিস্ফোরণের অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। অন্তত ১০টি বড় ধরনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত হয়েছে প্রায় একশ মানুষ। আহত হয়েছে প্রায় ৩শ। সিলেটে আওয়ামী লীগের একজন এমপির বাসায় বোমা বানানোর সময় তা থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কয়েকজন মারা যায়। পল্টন ময়দানে সিপিবির সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ৪জন। গত ১লা বৈশাখ রমনা বটমূলে বাংলা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ১১জন। সর্বশেষ দেশের অন্যতম সেরা সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসীদের গডফাদার বলে পরিচিত নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমানের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণে ২৩ জন নিহত হয়। এসব বোমা বিস্ফোরণের একটিরও নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি। বরং ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই সরকার প্রধান নিজে অথবা তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক একটি মন্তব্য করেছেন। ফলে পুলিশ কিভাবে চার্জশিট বানাতে হবে তা তদন্ত রিপোর্টে কি দিলে সরকার খুশী হবে তা জেনে ফেলার কারণে নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি। বরং সরকারের মন্ত্রীদের মন্তব্যকে গাইড লাইন হিসেবে ধরে নিয়ে চার্জশিট তৈরী করা হয়েছে যাতে বিরোধী দল বা 'মৌলবাদী'দের দায়ী করা হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণ ছাড়াও অপরাপর সন্ত্রাস ও আলোচিত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও সরকার এরূপ মন্তব্য করে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করেছে। তাদের ভয় যে আসল ঘটনা ফাঁস হয়ে যায় কিনা। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সন্ত্রাসী ক্যাডাররাই যে এসবের সাথে জড়িত তা আর দেশবাসীর জানতে বাকি নেই।

আওয়ামী লীগ সরকারের নির্দেশে তার পুলিশ বাহিনী মেধাবী ছাত্র রুবেলকে পিটিয়ে মেরেছে। যুবদল কর্মী তুহিনকে মতিঝিল থানায় পিটিয়ে হত্যার পর জুতার ফিতা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বান্ধবীর ছেলে সূত্রাপুরে দুই যুবককে কেটে ১২ টুকরা করে ম্যানহোলের ভিতর লাশ ফেলে রেখেছিল। বিশিষ্ট আইনজীবী বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান মণ্ডলকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। দীর্ঘ ১০ মাস পর যে চার্জশিট দেয়া হয়েছে তাও কোনো খুনির নাম বা অসামির নাম উল্লেখ না করে আওয়ামী ঘাতক চক্রকে কৌশলে বাঁচিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আওয়ামী দু:শাসনের শ্বেতপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র

সিরাজুর রহমান: ব্যক্তি বিদ্বেষ, সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্র

আমানুল্লাহ কবীর: বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

রাশেদ খান মেনন: আক্রান্ত সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা

আলী রীয়াজ: সাংবাদিকের ওপর হামলা ও লেখকের স্বাধীনতা

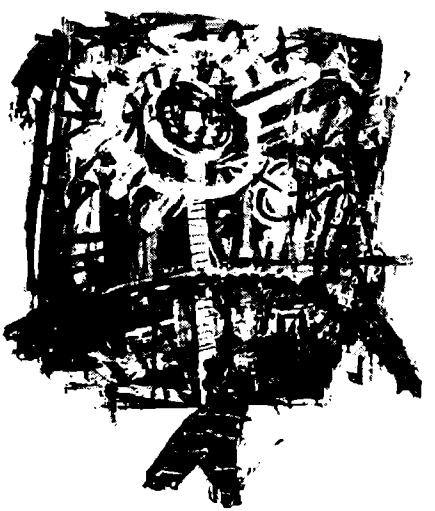

www.pathagar.com

সিরাজুর রহমান

ব্যক্তি বিদ্বেষ সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্র

ডেটলাইন ঃ ৩ এপ্রিল ২০০০

'পত্রিকার' ১৪-২১ মার্চ সংখ্যায় এস এ মুমীন ও জামিল রেজার 'অল্প-বিস্তর জিজ্ঞাসা' শীর্ষক চিঠিতে আমার সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। তারা লিখেছেন, সিরাজুর রহমান বিবিসি বাংলা বিভাগের কল্যাণে লাখো মানুষের কাছে সুপরিচিত একটি নাম। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় তার সুললিত কণ্ঠ ছিল আমাদের জন্য প্রেরণাদায়ক। সেই সিরাজুর রহমান যখন লেখালেখি আরম্ভ করলেন, অনেক পাঠকই তার লেখার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই অনেক পাঠক নিরাশ হলেন। সিরাজুর রহমানের প্রতিটি লেখার ছত্রে ছত্রে শেখ হাসিনার কঠোর সমালোচনা। একজন লেখক যে কোনো নেতা নেত্রীকে সমালোচনা করতে পারেন, এটা তার নাগরিক অধিকার। কিন্তু সমালোচনা যখন ব্যক্তি-বিদ্বেষের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তখন তা গ্রহণযোগ্যতা হারাতে বাধ্য।

লেখকদ্বয় উদার প্রশংসার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। মনে হচ্ছে তারা বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। নইলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে, সত্তরের ঘূর্ণি-প্রলয়ের সময় এবং ভাষা আন্দোলনে আমার আপসবিমুখ ভূমিকার কথাও তাদের জানা থাকার কথা ছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, বাংলাদেশের কোনো সরকারি কিংবা রাজনৈতিক দলের প্রতি কখনও আমার আনুগত্য কিংবা বাধ্যবাধকতা ছিল না; ছিল না চাওয়া এবং পাওয়ার সম্পর্ক। সেজন্যই স্বাবকতা আমাকে করতে হয়নি; এ-ও হয় ও-ও হয় কিংবা যখন যেমন তখন তেমন মার্কা সুবিধাবাদী লেখার তাগিদ আমি বোধ করিনি। অন্যদিকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি দীর্ঘ কর্মজীবনে বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুসের স্নেহ-ভালোবাসা আমি পেয়েছি। তাদের কাছে আমার স্থায়ী একটা ঋণ রয়ে গেছে। কর্মজীবন থেকে অবসর নেয়ার পরও যে নতুন করে কলম ধরতে হয়েছে সেটা সেই কৃতজ্ঞতা বোধের তাগিদেই। এদেশের মানুষগুলোর ভালোর জন্য কিছু করে যাওয়ার তাড়না আমি সত্যি বোধ করি।

গণতন্ত্রে মত ও পথ নিয়ে বিবাদের অবকাশ থাকে। ত্রুটি-বিচ্যুতি, সাফল্য-ব্যর্থতার মাপকাঠি নিয়েও। বাংলাদেশে দুর্নীতির কথাও প্রায়ই শোনা যায়। ভবিষ্যতে আরও শোনা যাবে কেননা ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত হলে নেতৃত্বেও দুর্নীতি আসতে পারে, এজন্য যে নেতৃত্বের উত্থান হয় সাধারণ মানুষের কাতার থেকেই । বাংলাদেশের বেলায় আরও কিছু সমস্যা আছে যেগুলোর গুরুত্ব আরও বেশি এবং আরও সুদূরপ্রসারী। পাকিস্তানের সুদীর্ঘ সামরিক স্বৈরতন্ত্রের ঐতিহ্য নিয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। এটা সকলেরই জানা

www.pathagar.com

কথা যে, গণতন্ত্রের সময় বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরতন্ত্র চলেছে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের শেকড় বাংলাদেশের মাটিতে গেড়ে বসার সুযোগ পায়নি। সমস্যাটা সঙ্কটে পরিণত হয়েছে দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেত্রীদ্বয়ের পারস্পরিক জাত-ক্রোধ ও ঘৃণার কারণে। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে যে, অপরজনকে ক্ষমতার বাইরে রাখা তাদের জন্য নিজের ক্ষমতা পাবার এবং দল দুটো যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন করে, তাহলে আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি এবং লিখেওছি-যে এই দুই নেত্রী যদি সরে দাঁড়ান ও বিএনপি সহাবস্থানের ভিত্তিতে দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কার্যকর করতে পারবে। দুর্ভাবগ্যবশত সে সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন আরও কিছু উপসর্গ যোগ হয়েছে যার ফলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথও হয়ত পাকাপাকি রুদ্ধ হতে চলেছে। আমি আন্তরিক বিশ্বাস করি যে, সে উপসর্গগুলোর জন্য দায়ী একমাত্র শেখ হাসিনা। আমরা সবাই জানি মাথা ধরলে অ্যাসপিরিন খেতে হয়, পায়ের নখ কাটলে মাথাধরা আরোগ্য হয় না; গাড়ির ইঞ্জিনে ত্রুটি ঘটলে টায়ার বদল করে কিংবা বুটে হাতুড়ি ঠোকাঠুকি করে লাভ নেই। এক্ষেত্রেও শেখ হাসিনা যদি তার ভুলগুলো সংশোধন না করেন অথবা যদি তাকে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করা না হয়, তাহলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে না। সেজন্য দেশের এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অশুভ উপসর্গগুলোর ওপর আলোকপাত করার তাড়না প্রকৃতই আমি বোধ করি।

শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে বলেছেন এবং অনেকেই সেটা জানেন যে, পিতৃ হত্যার-প্রতিশোধ নিতেই তিনি রাজনীতিতে নেমেছেন। অথচ আমরা সবাই জানি যে, রাজনীতি ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়, রাজনীতি হচ্ছে মানুষের জন্য, সকল মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য। সমস্যাটা আরও জটিল হয়েছে এ জন্য যে, শেখ হাসিনার ধারণায় তার পিতা হত্যা এবং তার নিজের ক্ষমতা লাভ এই দু'টি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে যারা রাষ্ট্রযন্ত্রের হাল ধরেছিলেন তাদের সবাই হয় তার পিতার ঘাতক, নয়ত ঘাতকদের সহায়তাদানকারী। তাছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যায় কান্নায় উতরোল সৃষ্টি করেনি, অশ্রুর বন্যা বইয়ে দেয়নি বলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকেও তিনি ক্ষমা করতে পারছেন না। তিনি মনে করেন, সে জন্য বাংলাদেশের মানুষের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের সময় থেকে শেখ হাসিনার উক্তি ও কাজকর্মে এই অস্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়ই গোপন থাকে না।

জিয়াউর রহমানের হত্যা এবং পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার কোনো ভূমিকা ছিল কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা সত্যি যে, জেনারেল

www.pathagar.com

এরশাদ সামরিক স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করায় হাসিনা খুশি হয়েছিলেন, তার নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলার বাণী পত্রিকা সামরিক সরকারের সাফল্যের জন্য মোনাজাত করেছিল। শেখ হাসিনা খুশি হয়েছিলেন, এ জন্য তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হল। শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসন এত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত না। ১৯৮৬ সালে তিনি অন্য বিরোধী দলগুলোর সাথে সমঝোতা করেছিলেন যে, এরশাদের নির্বাচনে কেউ অংশ নেবে না; এ কথাও তিনি বলেছিলেন যে, কেউ অংশ নিলে যে রাজনৈতিক মোনাফেক বলে গণ্য হবে। কিন্তু এ ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাতারাতি এই ডিগবাজির কারণ নিয়ে সে সময় বিস্তর জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল, সাড়ে ৪ কোটি টাকার হাত বদল নিয়েও গুজব ছড়িয়েছিল। গুজবের সত্যতা-অসত্যতা প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু এও সত্যি যে, সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ বিদেশীদের চোখে সামরিক স্বৈরতন্ত্রকে কিছু পরিমাণ বৈধতা দিয়েছিল। ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে শেখ হাসিনা ঢাকার শহীদ মিনারে সমাবেশ ডাকেন। বেগম জিয়াসহ বেশ করেয়কজন নেতা এবং প্রায় ৪০ হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হলেও শেষ মুহূর্তে অজ্ঞাত কারণে শেখ হাসিনা সে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন না। ফলে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের ওপর চাপ সাময়িকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। সমবেত ছাত্র আন্দোলন তার ওপর চাপ না দিলে সম্ভবত শেখ হাসিনা সামরিক সরকারকে উৎখাত করার চূড়ান্ত আন্দোলনেও শরীক হতেন না।

এরশাদের পতনের পরেও শেখ হাসিনার হিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণ রাজনীতির অবসান হয়নি। '৯১ সালের নির্বাচন হয়েছিল একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এবং বিরাট একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের চোখের সামনে। শেখ হাসিনা সে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেন, তার রক্তের শত্রু খালেদা জিয়া সে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন বলেই। বিএনপি সরকার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি সে সরকারকে টেনে নামানোর আন্দোলন শুরু করেন। শেখ হাসিনা সংসদে যেতেন শুধুমাত্র ওয়াক আউট করার অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে গুণ্ডার জোরে টেনে নামানোর লক্ষ্যে রাজনীতিকে সংসদ থেকে পথে টেনে নামানোর নজির সৃষ্টি করেছিলেন শেখ হাসিনাই। লাগাতার ১১ দিনসহ মোট ১৭৫ দিনের হরতাল ও ভাঙচুর এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে সংসদ বর্জনের নজিরও শেখ হাসিনাই সৃষ্টি করেছেন। সফরকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে তিনি গণতান্ত্রিক সরকারগুলোকে সমর্থন দান এবং সরকারসমূহের অসাংবিধানিক ও অবৈধ পরিবর্তনকে নিরুৎসাহিত করার' আহবান জানিয়েছেন। এই কথাগুলো কি ভূতের মুখে রাম নামের মতো শোনায় না? হাসিনা কি চান যে, ক্লিনটন শুধুমাত্র তার সরকারকেই গণতান্ত্রিক এবং বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনকে 'অসংবিধানিক ও অবৈধ' বলে বিবেচনা করবেন? এই মামাবাড়ির আবদার

www.pathagar.com

করার অধিকার কি তিনি বাংলাদেশের গ্যাস ও তেল ভারতে রফতানীর জন্য মার্কিন তেল কোম্পানীগুলোর কাছে বিকিয়ে দেবার মূল্যে অর্জন করেছেন?

১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা একটি সুবুদ্ধির কাজ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, অতীতে বহু ভুল-ভ্রান্তি তিনি করেছেন এবং সেগুলোর জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। বাংলাদেশের ভোটদাতারা আশা করেছিলেন যে, অবশেষে আওয়ামী লীগ নেত্রীর বোধোদয় হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের পর দেশবাসী প্রমাণ পেলেন যে, কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। নেকড়ে বাঘের গায়ে ভেড়ার চামড়া মুড়ে দেয়া হলেও তার দন্ত-নখর লুকানো থাকে না। সরকার গঠনের সাথে সাথেই তিনি রাজনীতিক বিরোধীদের নির্যাতন-নিপীড়ন ও উস্কানি শুরু করে বিরোধী নেতা-কর্মীদের ধরপাকড়, তাদের বিরুদ্ধে অজস্র সাজানো মামলা এবং সর্বশেষে সংসদে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী সম্বন্ধে কুৎসিত মন্তব্য ইত্যাদি দ্বারা শেখ হাসিনা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষাক্ত করে তোলেন। অথচ এ কথা সবাই জানেন যে, মোটামুটি মতের মিল, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আপস ও সমঝোতার মনোভাব ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের এই পূর্বশর্তগুলোতে বিশ্বাসী নন। শুধু তাই নয় বিরোধীদের প্রতিবাদের ভাষাও কেড়ে নেবার চেষ্টায় তিনি তাদের সভা-সমাবেশের সুযোগ দিতেও অস্বীকার করছেন, বিরোধীদের বিক্ষোভ-মিছিল দলীয় ও আজ্ঞাবহ পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের গুণ্ডাবাহিনীর লাঠি-বোমা ও গুলির ঘায়ে বহু লোক নিহত, এমপিসহ শত শত লোক আহত-এমনকি নারীর বস্ত্রহরণও চলছে। অথচ তুলনীয় এই যে, বিএনপি সরকারের আমলে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব সত্ত্বেও ১৭৫ দিনের হরতালে কেউ মারা যায়নি। হাসিনা সরকারের আমলে বিচার বিভাগকেও আজ্ঞাবহ করার সর্বময় চেষ্টা চলছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টসহ বিদেশীরাও সেসব কথা বলতে শুরু করেছে। শেখ হাসিনার পিতার বিচারের ব্যাপারে কোন বিলম্ব হয়নি। কিন্তু দেশের আর কোনো বিচার নেই। বুদ্ধিজীবী হত্যারও কোনো বিচার হয়নি এবং হবে না। মুজিব হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত তিন প্রাক্তন সামরিক অফিসারকে প্রত্যর্পণের জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে তদ্বির করেন। (যে কাজ সাধারণ অবস্থায় আমলাদের পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবার কথা)। কিন্তু বৃটেনে প্রবাসী বাংলাদেশীরা সুরৎ মিয়ার হত্যার বিচার পায়নি, যদিও শেখ হাসিনা স্বয়ং প্রকাশ্য সমাবেশে বিচার হবে, অভিযুক্তরা সাজা পাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী শাস্তির পরিবর্তে অভিযুক্তরা সকলেই এখন পদোন্নতি পেয়েছে। সুরৎ মিয়ার সন্তানরা এখন শেখ হাসিনার কাছে কৈফিয়ৎ চায়, তারা বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে বিচার প্রার্থী। অন্য কোনো পথ তাদের জন্য খোলা নেই।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, রাজনীতি মানুষের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু শেখ হাসিনার চিন্তা ও মানসিকতার সেসব প্রসঙ্গের জন্য কোনো স্থান বা সময় নেই। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের চিন্তাতেই তার সকল সময় ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত হয়। এদিকে দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি আতঙ্কজনক। প্রতিবারই বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে ঘুরে কৃষককুলের আপ্রাণ পরিশ্রম দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তারা হাড়ভাঙা খাঁটুনি দিয়ে ফসল ফলাচ্ছেন বলেই দেশের মানুষ এখন না খেয়ে মারা যাচ্ছে না। কিন্তু এ অবস্থা আর কদ্দিন চলবে? চোরাচালানি পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারছে না বলে বাংলাদেশের ছোটখাটো শিল্পগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেছে। মফস্বলের মানুষের রুজি-রোজগারের সকল পথ বন্ধ; তাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই বলে চাল-ডাল সংগ্রহ করাও এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রিকশা চালাতে কিম্বা ভিক্ষা করতে হাজার হাজারে মানুষের শহরগুলোতে ভিড় জমানোর এটাই হচ্ছে রহস্য। ঘন ঘন অর্থহীন ডিগ্রী সংগ্রহ কিংবা হজ-ওমরার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর, ঠাট দেখানোর নানান পরিকল্পনা, সর্বোপরি কুশাসন ও অর্থনীতির প্রতি চূড়ান্ত অবহেলার কারণে দেশের আর্থিক অবস্থাও চরমে উঠেছে। শোনা যায়, ব্যাংকে গচ্ছিত সাধারণ মানুষের অর্থ মোট সুদে ঋণ নিয়ে সরকারের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

এ কথা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না যে, অবিলম্বে এসব অব্যবস্থার প্রতিকার না হলে দেশ দেউলিয়া হয়ে যাবে। পরবর্তী প্রশাসনগুলোর জন্য তখন দেশ চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে দেউলিয়া করে যাবার আরও একটি ব্যবস্থা করেছেন হাসিনার সরকার বিদেশী তেল কোম্পানীগুলোর কাছে গ্যাস ও তেলের মজুদ বিক্রি করে যাবার ব্যবস্থা করে। হাসিনা বলেছেন যে, দেশের ৫০ বছরের চাহিদা মজুদ রেখেই গ্যাস ও তেল রফতানী করা হবে। কিন্তু আমরা জানি দেশে এখন শিল্প বলতে গেলে নেই। সুতরাং জ্বালানির চাহিদাও বলতে গেলে শূন্য। শূন্যকে ৫০ দিয়ে গুণ করলেও ফলাফল শূন্যই থেকে যায়। তাছাড়া বাংলাদেশে মোট কত গ্যাস এবং তেল মজুদ আছে তার কোনো সঠিক জরিপ এখনও হয়নি। অর্থাৎ কথার মারপ্যাঁচে গোটা মজুদই বিদেশে রফতানী করা হবে। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলোর মুনাফার লালসা কি আমাদের জানা নেই। শেখ হাসিনার এই নীতিকে একমাত্র বাড়ি-জমি বিক্রি করে দিন কয়েকটি ফুটানি করার সাথেই তুলনা করা যায়। এর পরিবর্তে বাংলাদেশের গ্যাস ব্যবহার করে সার কিম্বা বিজলী উৎপাদন করে রফতানী করলেও অনেক বেশি বিদেশী মুদ্রা অর্জন সম্ভব এবং তাতে বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। উপরোক্ত কারণগুলোর জন্যেই আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, শেখ হাসিনা যদি তার মত ও পথ সম্পূর্ণ সংশোধন না করেন, অথবা যদি তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ না করা হয় তাহলে বাংলাদেশের দৃশ্যমান ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

www.pathagar.com

সর্বশেষে ব্যক্তিবিদ্বেষের প্রশ্ন। এ কথা কারও অজানা নয় যে, বেতার–টেলিভিশন তো বটেই, বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো পত্র-পত্রিকারই একমাত্র কাজ শেখ হাসিনা, তার নিহত পিতা ও পরিবার এবং তার সরকারের গুণ-কীর্তন। সে উদ্দেশ্যে সরকারি আনুকূল্য দিয়ে পত্রিকাগুলোকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। এই পত্রিকাগুলো এমনকি বেতার-টেলিভিশনও দিনের পর দিন সরকারবিরোধী নেতা-নেত্রীদের জিয়াউর রহমানের, খালেদা জিয়ার, গোলাম আযমের সমালোচনা এবং গালিগালাজ করা হচ্ছে। সেগুলো যদি ব্যক্তিবিদ্বেষ না হয় তাহলে শেখ হাসিনার সমালোচনা ব্যক্তিবিদ্বেষ হতে যাবে কেন? আরেকটি কথা– দেশের এবং দশের ভালো করার ক্ষমতা যেমন অন্য কারও চাইতেই সরকার প্রধানের বেশি, তেমনি সরকার প্রধান সর্বনাশ ও অন্য যে কারও চাইতে বেশি করতে পারেন। সেজন্যই যে কোনো দেশে সরকার প্রধানের সমালোচনা অন্য যে কারও চাইতে বেশি হয়। বর্তমান বৃটেনের টনি ব্লেয়ারের সমালোচনা যতখানি হয়, উইলিয়াম হেইগকে কি ততখানি সমালোচনা সহ্য করতে হয়?

www.pathagar.com

আমানুল্লাহ কবীর

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকার

ডেটলাইন ঃ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

অনেকটা নীরবেই বিচার বিভাগের সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের একটা নজীরবিহীন দ্বন্দ্ব ঘটে গেল। নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব নতুন নয়। কিন্তু তা যখন জনসমক্ষে প্রকাশ পায়, তখন তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বন্দ্বের উৎস ঢাকা নগরী থেকে বস্তি উচ্ছেদ। বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কেউ নয়। হাইকোর্টও বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কোনো রায় দেয়নি। বস্তির সৃষ্টি হয় কেন, সেটাই বড় কথা-বস্তি উচ্ছেদ বড় কথা নয়। যে কারণে বস্তির জন্ম হয়, সে কারণ দূর করা না গেলে বস্তি যতই উচ্ছেদ করা হোক, আবার তার জন্ম হবেই। যারা বস্তিতে বসবাস করে তারা সরকারের মন্ত্রী, প্রশাসনের কর্মকর্তা, ধনাঢ্য অট্টালিকাবাসীর মতোই এদেশের নাগরিক-সংবিধানে তাদের মৌলিক অধিকারও সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সাধ করে বস্তিতে কেউ বসবাস করে না-দারিদ্র্য তাদের তাড়া করে নিয়ে আসে বস্তিতে। বেঁচে থাকার সকল অবলম্বন থেকে বঞ্চিত হয়েই তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে হয় বস্তিতে। বস্তিবাসী মানেই অপরাধী নয়। বরং যে শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত সরকারও। সরকার যে দলেরই হোক না কেন, এক্ষেত্রে তাঁর অপরাধ অমার্জনীয়, কারণ প্রতিটি নাগরিকের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সংস্থান করার সাংবিধানিক দায়িত্ব সরকারের। রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সে দায়িত্ব এড়াবে কিভাবে? সংবিধানের ধারা (১৫) তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বুলডোজার দিয়ে সরকার তাদের সে অধিকারকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সে অধিকার রক্ষার জন্য যখন আদালতের আশ্রয় নেয়া হয়, তখনই বিচার বিভাগের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় নির্বাহী বিভাগ তথা সরকার।

ঘটনার সূত্রপাত ৬ আগস্ট (১৯৯৯)। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গভীর রাতে হামলা করে গোপীবাগ পুলিশ ফাঁড়িতে। সন্ত্রাসীদের গুলিতে একজন পুলিশ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, অপর একজন আহত হয়। পরে জানা যায় হামলার ঘটনা ঘটেছে পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের বখরা নিয়ে। সন্ত্রাসীদের এক গ্রুপকে সমর্থন দিত পুলিশ। বদলা নেয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ হামলা করে পুলিশ ফাঁড়িতে। এর একদিন পরই পরিকল্পনাবিহীনভাবে ঢাকা নগরীতে বস্তি উচ্ছেদ শুরু হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পরদিন টিটিপাড়া, ব্যারাক ও বালুরমাঠের বস্তি উচ্ছেদ করা হয়। দ্বিতীয় দিন রেল লাইনের দু'পাশে গড়ে ওঠা বস্তি কয়েক হাজার অবৈধ ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়। সরকার বেকায়দায় পড়ে

www.pathagar.com

আগারগাঁওয়ে বিএনপি বস্তি উচ্ছেদ করতে আসে। বস্তিবাসীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে পুলিশের বিরুদ্ধে। রাস্তা অবরোধ করে কয়েক ঘণ্টার জন্য অচল করে দেয় গোটা মিরপুর এলাকা। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বস্তিবাসীদের। ইতিমধ্যে কয়েকটি এনজিও বস্তিবাসীদের পক্ষে থেকে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রীট করা হয় হাইকোর্টে। হাইকোর্ট ১৯ আগস্ট পর্যন্ত বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ রাখার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু হাইকোর্টের এই নির্দেশ অমান্য করেই সরকার আগারগাও বস্তি উচ্ছেদ করার আয়োজন করে। হাইকোর্টের চোখে ধুলি দেবার জন্য হাতে নির্দেশ পৌছার পূর্বেই সাত-সকালে পুলিশ পাঠিয়ে ঘেরাও করে ফেলা হয় আগাঁরগাঁও। এরই মধ্যে একদিকে হাইকোর্টের নির্দেশ গিয়ে পৌছে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে, অপর দিকে শত শত বস্তিবাসী প্রতিরোধের মুখে পুলিশের উচ্ছেদ অভিযান। এমনিভাবে আদলতের নিষেধাজ্ঞা ও বস্তিবাসীদের প্রতিরোধের মুখে পুলিশের দু'দিনব্যাপী অভিযান ব্যর্থ হয়। হাইকোর্ট এটর্নি জেনারেলের আবেদনক্রমে ১৭ আগস্ট শুনানির তারিখ নির্ধারিত বেঞ্চ রীট শুনানির ব্যাপারে বিব্রত বোধ করেন। অতঃপর প্রধান বিচারপতির নির্দেশে অন্য বেঞ্চে রীট শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আদালতের রায়ের কথায় পরে আসছি। তার আগে প্রশ্নঃ হঠাৎ সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বস্তিবাসীরা অবস্থান নিল কেন? কারা এর পেছনে প্ররোচনা দিয়েছিল? এবং কেন? সরকার সমর্থক ও বিরোধী দল সমর্থক সকল বাংলা-ইরেজি দৈনিকই পরের দিন যে রিপোর্ট ছাপে, তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসেই গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বস্তিবাসীদের সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

বাস্তুহারা সমিতির নেতা–নেত্রীরা হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রী। তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানেই উচ্ছেদকৃত বস্তিবাসীরা এসে ডেরা বাঁধে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে। এরপর আরও পাঁচ-ছশ বস্তিবাসীকে উস্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আবেদকারীদের আইনজীবী ও গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেনের বেইলী রোডস্থ বাসভবন এলাকায় এবং সেখানেও তারা একইভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। সৃষ্ট আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতা চাইলে পুলিশ কর্মকর্তারা অপারগতা প্রকাশ করে বলে, যেহেতু বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেহেতু তাদের পক্ষ কোনো প্রকার এ্যাকশন নেয়া সম্ভব নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমও সংবাদপত্রগুলোকে একই কথা বলেন যদিও বিবিসি'কে একই কথা ঘুরিয়ে বলেছেন। সব ঘটনাই প্রায় প্রতিটি জাতীয় দৈনিক বস্তুনিষ্ঠভাবে সচিত্র রিপোর্ট করছিল। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ সংস্থাগুলোর সম্পাদকদের ডাকলেন মতবিনিময়ের জন্য। বক্তব্যের এক পর্যায়ে প্রশ্নাকারে তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হলে সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা থাকবে না কেন।' উপযুক্ত সময়েই তিনি

www.pathagar.com

তার মনের কথাটা প্রকাশ করেছেন যখন বস্তি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলো খবর করছিল। যেদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী সম্পাদক সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, সেদিন বিকাল বেলায়ই সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ঢুকিয়ে দেয়া হয় বস্তিবাসীদের। হাইকোর্ট যেহেতু সরকারের খেয়াল খুশীর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন ২৩ আগস্ট পর্যন্ত বস্তি উচ্ছেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, সেহেতু সর্বোচ্চ আদালতকে বিব্রত করাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতাসীন দলের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারেই যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিশিষ্ট আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এ ধরনের ঘটনাকে আদালত অবমাননার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন।

এখন একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবেই বিচার বিভাগের সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের দ্বন্দ্বকে শাণিত করতে চাচ্ছে। শেখ হাসিনা প্রায়ই দাবি করেন যে তার সরকার দেশে আইনের বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছে। সরকার প্রধান ও সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীরা কথায় ও কাজে আদালতকে অবমাননা করলে আইনের বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে? কিভাবে তারা আশা করেন যে, সাধারণ মানুষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে? শেখ মুজিব সরকার শেষ পর্যায়ে বিচার বিভাগ ও সংবাপত্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে গিয়েছিল। চারটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক বাদে সব পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা বাতিল করা হয়েছিল এবং ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগকে ন্যস্ত করা হয়েছিল নির্বাহী বিভাগের অধীনে। শেখ মুজিবের এ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা অসাংবিধানিক শক্তিকেই প্রলুব্ধ করেছিল। শেখ হাসিনাও পিতার মতো একই ধরনের আচরণ করছেন। বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে গিয়ে প্রকারান্তরে অসাংবিধানিক শক্তিকেই উৎসাহিত করছেন। বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের ব্যাপারে শেখ হাসিনা ও তার সরকারের গাত্রজ্বালার কারণ অনেক। বস্তিবাসীরা যখন অবস্থান গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে, তখন একজন সাংবাদিক পেশাগত কাজে দেখা করতে গিয়েছিলেন একজন সিনিয়র মন্ত্রীর অফিসে। মন্ত্রী টেলিফোনে কথা বলছিলেন ঃ 'ভালই খেলা দেখাইলা..... বস্তিওয়ালাদের ঢুকাইয়া দিলা একেবারে সুপ্রিম কোর্টের ভিতরে।' তারপর হা-হা করে হেসে উঠলেন। এমনিভাবে আড়ালে তারা কটাক্ষ করেন আদালতকে। প্রথমে ঘটনা ঘটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে। পাবনার ঈশ্বরদীর কাছে বিদ্যুৎ টাওয়ার উপড়ে পড়লে সাবোটাজের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রীসহ চারজন বিএনপি নেতাকে। হাইকোর্ট কেবল তাদের মুক্তিরই নির্দেশই প্রদান করেননি; অহেতুক তাদের হয়রানি করার জন্য সরকারকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন। দ্বিতীয়তঃ প্রধান বিচারপতি ও আদালত সম্পর্কে অসংযত কথাবার্তা বলার জন্য শেখ হাসিনা স্বয়ং তিরস্কৃত হয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক। তৃতীয়ত, বিএনপি এমপি ডাঃ

www.pathagar.com

আলাউদ্দিন ও স্বপনের সরকারে যোগদানের পরিপ্রেক্ষিতে স্পীকার যে রুলিং দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট তার বিরুদ্ধে সরকারকে নির্দেশ প্রদান করেন বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে। চতুর্থত সাম্প্রতিক বস্তি উচ্ছেদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের আইনগত ভূমিকা। সর্বশেষ হাইকোর্ট সরকারকে বলে দিয়েছেন আদালতের আদেশের কপি না পাওয়া পর্যন্ত বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ রাখতে। হাইকোর্ট তার আদেশে সরকারকে ঢালাওভাবে বস্তি উচ্ছেদ না করে পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া বিচার বিভাগ, বিশেষত উচ্চ আদালতের প্রতি সরকারের ক্ষোভের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে সরকার বিরোধী দলকে কোণঠাসা করার জন্য নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিদিনই (বিশেষত বিএনপি'র) নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কয়েক শত মামলা করছে, অভিযুক্ত হিসেবে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করছে, কিন্তু তাদের অনেকেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে জামিন অথবা বেকসুর খালাস পাচ্ছে।

বিচার বিভাগের মতোই সংবাদপত্র আওয়ামী লীগ সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার ও সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের ঘটনা প্রতিদিনই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে পত্র-পত্রিকাগুলোতে। আলোচনা-সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের কর্মকাণ্ড। কোন কোন বিষয়ে সরকারকে প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে সরকার সমর্থক সংবাদপত্রগুলোর কাছ থেকেও। স্বাভাবিক কারণেই প্রশাসনকে সংবাপত্রগুলো সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। বিশেষত গণতান্ত্রিক বিশ্বে সংবাদপত্রগুলো জনগণের পক্ষে 'ওয়াচডগ' হিসেবে কাজ করে বলেই এ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বিশ্বের একটি গণতান্ত্রিক দেশ হলেও সংবাপত্রগুলো (দু'চারটি বাদে) গত তিন বছরে সরকার ও সরকারের প্রশাসনকে যে সমর্থন দিয়েছে তা নজিরবিহীন। এসব সংবাদপত্র যে ভূমিকা পালন করেছে, তাতে মনে হয় সরকারকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে তারাই। সেক্ষেত্রে দেশ বা জনগণ বড় নয়। নয়তো নিজের ব্যর্থতার ভারেই এ সরকারের পতন হওয়ার কথা অনেক পূর্বেই।

কিন্তু সরকারের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি ও ব্যর্থতা এখন পত্র-পত্রিকাগুলোও আর চেপে রাখতে পারছে না। রাখতে গেলে পাঠকের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না। সৃষ্ট পরিস্থিতিই তাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষত রিপোর্টিংয়ে বস্তুনিষ্ঠ হতে বাধ্য করছে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ এটাই। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। গত ২৬ আগস্ট ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে যে ঘটনা ঘটে গেলো, তা বাংলা ও ইংরেজি সকল দৈনিক পত্রিকাতেই ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। নজিরবিহীন এ ঘটনার মূল নায়ক হচ্ছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক এমপি আখতারুজ্জামান বাবু। বাবু দিনে

www.pathagar.com

দুপুরে অস্ত্রের মুখে দখল করেছে ইউসিবিএল-এর পরিচালনা পরিষদ। মারধর করে ব্যাংক থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে বৈঠকরত পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ পরিচালকদের। পরিচালকরা এতিমের মতো ঘুরেছেন প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারে দ্বারে। অথচ এই বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটে পুলিশের উপস্থিতিতেই। যে দেশে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা এমন ধরনের ঘটনা ঘটায়, সে দেশে বিনিয়োগকারীরা কেন আসবে বিনিয়োগ করতে? এরপর উল্লেখ করা যায় রাশিয়া থেকে মিগ ক্রয় কেলেঙ্কারি এবং ভারতকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুযোগ প্রদানের বিষয়। এ দু'টি বিষয় নিয়েই পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে সরকার বেকায়দায় পড়ে। গ্যাস ব্লক বণ্টন ও গ্যাস উত্তোলন চুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের অস্বচ্ছলতা এবং ভারতের গ্যাস রফতানীর কথিত প্রতিশ্রুতিও সরকারকে তোপের মুখে ফেলেছে। এ ছাড়া শেখ হাসিনাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া ও দলীয় এমপি কাদের সিদ্দিকী যেসব কথাবার্তা বলছেন তা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়ার ফলে তিনি ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। পত্র-পত্রিকার এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা সহ্য করবেন কেন? সরকার যে 'সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন বিল পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনে উত্থাপন করতে যাচ্ছে তা আইনে পরিণত হলে বিচারকেরও বিচার করা যাবে এবং 'প্রবেশ' দেয়ার জন্য সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। সন্ত্রাস দমন আইনের চূড়ান্ত খসড়ার ধারা(২)-তে বলা হয়েছে ঃ কোনো বাড়িতে, দোকানে, হাটে-বাজারে, রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, প্রতিষ্ঠানে ও ব্যাংকে, কল-কারখানা বা অন্য কোনো স্থানে পরিকল্পিতভাবে বা আকস্মিকভাবে একক বা দলবদ্ধভাবে শক্তি বা দাপট প্রদর্শন করিয়া ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা অথবা বিশৃংখলা বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। খসড়ায় এমনি আরো একাধিক ধারা রয়েছে, যেসব ধারা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এসব কাজে কেউ 'প্ররোচনা বা সহায়তা দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে তার বিচার করা যাবে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি ও প্ররোচনা বা সহায়তাদানকারীর শাস্তি হবে একই-সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন অনধিক বিশ বছর এবং ন্যূনতম সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড। সহজেই বোধগম্য যে এই ধারার আওতায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। যিনি অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োজিত হবেন তিনি যদি বিচারকার্যে ব্যর্থ হন তবে এইরূপ ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের বিচারকের বিরুদ্ধে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।" বিশেষ ক্ষমতা আইন থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিপন্থী যেসব ধারা ১৯৯১ সালে বাতিল করা হয়েছিল সন্ত্রাস দমন আইনে ধারা(২)-তে প্ররোচনা ও সহায়তা শব্দ দু'টি যোগ করে বস্তুত বাতিলকৃত ধারাগুলোকেই পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমন বিল পার্লামেন্টে পাস হলে বিশেষ ক্ষমতা আইনের পাশাপাশি আরেকটি নিবর্তনমূলক

www.pathagar.com

আইন প্রবর্তন করা হবে। গত বিএনপি সরকারের সময়েও অনুরূপ সন্ত্রাস দমন আইন (তবে বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্র সংক্রান্ত কোন ধারা ছিল না) পাস করা হয়েছিল, কিন্তু তা সাময়িকভাবে কার্যকর ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার যে সন্ত্রাস দমন আইন পাস করতে যাচ্ছে তা স্থায়ীভাবে কার্যকর হবে।

বর্তমান সরকারের সময় আদালতের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করা হয়েছে তার বহু নজির পাওয়া যাবে আদালত প্রাঙ্গণে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে। কিছুদিন পূর্বে সাতক্ষীরার নিহত সম্পাদক আলাউদ্দিন আহমদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জামিন নিয়ে আদালতের অভ্যন্তরে বিচারককে যেভাবে অপমাণিত করা হয়েছে তা কেবল দুঃখজনকই নয়, বিচার বিভাগের প্রতি ক্ষমতাসীন দলের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের আরেক উদাহরণ। আদালত প্রাঙ্গণে খুন, জখমের ঘটনাও ঘটেছে প্রায়শ। আদালতের কাছে বিচার প্রার্থীও নিহত হয়েছে আদালত প্রাঙ্গণে সন্ত্রাসীদের গুলিতে। কিন্তু পুলিশ তথা নির্বাহী বিভাগের অসহযোগিতার কারণে আদালত তাদের প্রোটেকশন দিতে পারেননি। এভাবে আদালতকে নিপতিত করা হয়েছে একটা অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে। আদালতের ওপর মানুষের আস্থাকে নষ্ট করাই এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

আমরা স্মরণ করতে পারি যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একবার ক্ষুব্ধ হয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়েছিলেন উচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। উচ্চ আদালতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাইলে তাকে অবহিত করা হয় যে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার জন্য সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারেই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রয়েছে। এখানে প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামালের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, বিচারকরা কেবল তাদের বিবেকের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য, অন্য কারো কাছে নয়। আমরাও বিশ্বাস করি, বিচারকদের জন্য সে সুযোগ যথাযথভাবে সংরক্ষিত করার প্রধান দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু সরকার সুযোগকে প্রসারিত না করে সংকুচিত করার চেষ্টা করছে-বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার নামে। যাহোক বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বিচারকরা যেমন দায়বদ্ধ বিবেকের কাছে, তেমনি সংবাদপত্রগুলো দায়বদ্ধ তাদের পাঠক তথা জনগণের কাছে। সংবাদপত্রকে প্রতিদিনই দাঁড়াতে হয় পাঠকের কাঠগড়ায় জবাবদিহি করতে হয় মুদ্রিত প্রতিটি শব্দের জন্য। কোনো পাঠকের কোনো অভিযোগ থাকলে সে যেতে পারে প্রেস কাউন্সিলের কাছে। প্রেস কাউন্সিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েও কোনো সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাহলে জবাবদিহিতা নেই কার? ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কি বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রীয় মাস্তানির পথ উন্মোচিত করতে চায়?

www.pathagar.com

রাশেদ খান মেনন

আক্রান্ত সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা

ডেটলাইন ঃ ৮ মে ২০০১

প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদ বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসে 'আক্রান্ত সাংবাদিকতা ঃ প্রতিকারের উপায়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বলেছেন পত্রিকার মালিক-সম্পাদক মুক্ত। কিন্তু আমরা সাংবাদিকরা আক্রান্ত হচ্ছি বারবার। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিকভাবেই বর্তমান সময়টি সাংবাদিকদের জন্য খুব খারাপ যাচ্ছে। ষাটের দশকের মতো আবার সহিংসতা দেখা দিয়েছে। তিনি এ ধরনের সহিংসতা মোকাবিলায় সাংবাদিকদের ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি এসব নির্যাতন তদন্ত করে দেখতে সাংবাদিকদের একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ কেবল সাংবাদিকদের উদ্বেগের বিষয় নয়, এটা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও উদ্বেগের বিষয়। কারণ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা আক্রান্ত হলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনও বিপর্যস্ত হয়। বিপর্যস্ত হয় মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কণ্ঠ রোধ করতে পারলে, অথবা তাদের ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করে দিতে পারলে জনগণের মত প্রকাশ করার ও প্রকৃত তথ্য জানার অধিকারও ক্ষুণ্ন হয়। অতীতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে এর অভিজ্ঞতা এ দেশের জনগণের আছে।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র কখনই নির্বিঘ্ন ছিল না। পাকিস্তানি শাসনামলে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্টের কালাকানুনের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ দেশের স্বনামধন্য সম্পাদক ও সাংবাদিকদের জেল খাটতে হয়েছে। সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি শাসনের সেই সময়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্য সাংবাদিকরা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ভূমিকা ওই সব আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। সে কারণেই একাত্তরের ২৬ মার্চের কালো রাতে দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলোকে পাকিস্তানি সামরিকজান্তার সশস্ত্র হামলার শিকার হতে হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে এবং নয় মাসের যুদ্ধকালীন সাংবাদিকদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে। অপরাধ ও প্রেপ্তার করে নির্যাতন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-পরবর্তীকালে ওই পাকিস্তানি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। স্বাধীনতার পর অব্যবস্থা, লুটপাট, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ একইভাবে প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট ও স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টের আওতায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিক দলন নীতি অনুসরণ করে। পরে সংবিধানের কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনীর আওতায় 'বাকশাল' গঠিত হলে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি মাত্র সংবাদপত্র রাখা হয়। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার অপমৃত্যুর ওই দিন ১৬ জুনকে এখনো 'কালো দিবস' হিসেবে পালন করেন। অবশ্য সাংবাদিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদের কারণে এখন আর ঐক্যবদ্ধভাবে ওই দিনটি পালিত হয় না।

বাংলাদেশের সামরিক শাসনামলের ১৫ বছর (মাঝখানের জিয়াউর রহমানের তথাকথিত বেসামরিক শাসনসহ) এ দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের একইধরনের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে সামরিক কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংবাদ প্রেরণ করায় বিবিসির সংবাদদাতা আতাউস সামাদকে স্বয়ং বেশ কিছুদিন জেল খাটতে হয়। উপুর্যপরি জেলবাস এবং শারীরিক নির্যাতনে যশোরের রানার সম্পাদক গোলাম মাজেদ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার মাত্র দু'দিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্য এ সময় সাংবাদিকদের তীব্র লড়াই করতে হয়েছে। মাঝে মাঝেই পুলিশ প্রেসক্লাবে ঢুকে সাংবাদিকদের লাঠিপেটা করতে দ্বিধা করত না। গ্রেপ্তার-নির্যাতন সবই সাধারণ ঘটনা ছিল।

এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের লড়াই এ সময় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। সংবাদ প্রকাশের ওপর এরশাদের সামরিক শাসনের হুকুমদারীর বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রেখেও প্রতিবাদ জানান। সর্বশেষ এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হলে সাংবাদিকরা ওই জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। এরশাদের পতন হওয়া পর্যন্ত সাংবাদিকদের ওই ধর্মঘটের কারণে সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ ছিল। এরশাদ স্বৈরাচারের পতন কেবল দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়কে সূচিত করেনি। এ দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার বিজয় সূচিত করেছিল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টের সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্টের ধারাসমূহের সংশোধন ও বাতিল করার মধ্য দিয়ে এ দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাকে অনেকখানি নিষ্কণ্টক করে দেওয়া হয়।

বস্তুত সংবাদপত্রের ওপর আইনি বিধিনিষেধ ও সরকারি আইনগত নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ায় দেশের সংবাদপত্র জগতে এক ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে। এই সময়কালে

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের এত আধিক্য ঘটে যা আর কোনো সময়ই দেখা যায়নি। এই সময়কালেই আবার সংবাদপত্রে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পুঁজি বিনিয়োগ ঘটে। আগে এ দেশের সংবাদপত্রগুলো এক ধরনের রাজনৈতিক আদর্শবাদিতা ক্ষেত্র বিশেষে দলীয় আদর্শবাদিতা দ্বারা পরিচালিত হতো। ষাটের দশক থেকেই সংবাদপত্র শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য কারণে সেই শিল্পে ব্যক্তি পুঁজির সে ধরনের বিনিয়োগ ঘটেনি। নব্বইয়ের দশকে এসে সংবাদপত্রে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী হাউসের বিনিয়োগ ঘটতে থাকে। সংবাদপত্র অতীতের সাংবাদিকতার আদর্শ ও ঐতিহ্য হারালেও সমস্ত সমাজ জীবনে তার প্রভাব বেড়েছে অনেকগুণ। বর্তমান সময়কে মিডিয়ার সময় বলা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। বিশ্বের অন্যত্র অবশ্য প্রিন্ট মিডিয়ার চেয়ে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অধিক শক্তিশালী। বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকায় এখনো মানুষ প্রিন্ট মিডিয়ার ওপরই ভরসা করে।

বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এ দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাস বয়ান করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। সেটা অনেক বড় বিষয়। বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদের যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে যাওয়া যাক। অর্থাৎ বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে সাংবাদিকদের জন্য খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য যে এই সময়টি আরো খারাপ সেটা 'রিপোটার্স স্যানস ফ্রন্টিয়ার'-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের রিপোর্টই প্রমাণ করছে। বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে প্রকাশিত ওই রিপোর্ট বলছে যে, গত এক বছরে ৪৫ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নিহত হয়েছেন দুজন। নয়জন গ্রেপ্তার হয়েছেন, দশজনকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের তিনটি ঘটনা জাতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। সাংবাদিকদের ওপর অন্যান্য আক্রমণের ঘটনাবলিও মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওই সময়ের ঘটনাবলি যেমন সাংবাদিকতার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির বিষয়ে প্রমাণ দেয়, তেমনি দেশের সমাজ ও রাজনীতির বাস্তব চিত্রটাও তুলে ধরে। তবে এর মাঝে জনকণ্ঠের যশোরের সংবাদদাতা শামছুর রহমান, ফেনীর সাংবাদিক টিপু সুলতান ও ফরিদপুরের সাংবাদিক প্রবীর শিকদারের ওপর আক্রমণ সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে। আর এর সংগে চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ অফিসে সন্ত্রাসী ওয়ার্ড কমিশনার মামুনের আক্রমণকে কেন্দ্র করে রাজনীতি ও প্রশাসনের নাটক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ওপর আক্রমণের অব্যাহত ঘটনাবলিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করেছে।

যশোরের সাংবাদিক শামছুর রহমান কেবলের নির্ভীক সাংবাদিকতা যশোর তথা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি সৃষ্টি ও তার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সরকার বাধ্য হয়েছিল ওই

www.pathagar.com

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে। সন্ত্রাস ছাড়াও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে চোরাচালান, অস্ত্র ব্যবসা, হুণ্ডি ব্যবসা, সব বিষয়েই শামছুর রহমানের অনুসন্ধিৎসু রিপোর্ট ওই অন্ধকার বাস্তবকে তুলে এনেছে প্রকাশ্যে। শামছুর রহমানকে নিজ সংবাদপত্র কার্যালয়ে কাজ করার সময় জীবন দিতে হয়েছে সে কারণে।

ফেনীর সাংবাদিক টিপু সুলতানের জীবনহানি ঘটেনি ঠিকই। কিন্তু চিরদিনের জন্য তার পঙ্গু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তার চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে দু'টি পত্রিকার উদ্যোগে। ইউএনবির কেন্দ্রীয় সংবাদদাতা টিপু সুলতানের দোষ হয়েছিল ফেনীর সরকারদলীয় সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারীর সন্ত্রাসী বাহিনীর সন্ত্রাসী তাণ্ডবের খবর প্রকাশ করা। ওই খবরের জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করেছিল। মৃত ভেবে তাকে ফেলে রেখে গেছে। পরে তাকে ঢাকায় চিকিৎসার জন্য আনা হলেও এখানেও প্রথম দিকে তার জীবন ও চিকিৎসার নিরাপত্তা ছিল না। এ নিয়ে সংবাদপত্রে লেখালেখি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সরকারের টনক নড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে তার চিকিৎসার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে দেখতে হাসপাতালে গেছেন।

ফরিদপুরের সাংবাদিক প্রবীর শিকদারের দোষ হয়েছিল তিনি জনকণ্ঠে দেশে স্বঘোষিত ধনী একাত্তরের রাজাকার 'নুলা মুসা'র সে সময়ের কার্যকলাপ ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তাকে হত্যার জন্যই আক্রমণ করা হয়েছিল। ঢাকার হাসপাতালে প্রবীর শিকদারের একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে। চিরদিনের জন্য পা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে তাকে বাঁচতে হবে।

এই তিন সাংবাদিককে তাদের লেখার জন্য, সংবাদের জন্য ওই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রামের ঘটনা ভিন্ন। সেখানে সন্ত্রাসী আক্রমণ ঘটেছে সংবাদপত্রে ওই সন্ত্রাসীর খবর তার ইচ্ছামতো গুরুত্ব দিয়ে না ছাপার জন্য চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ দপ্তরে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসী মামুন সাংবাদিকদের আহত করেছে। সংবাদপত্র অফিস তছনছ করেছে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, সাংবাদিকরা ওই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করার জন্য সে কোথায় আছে, কীভাবে আছে সেসব তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করলেও পুলিশ নাকি তাকে খুঁজে পায়নি। চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের ক্ষোভ প্রশমন করতে প্রথমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী ওই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তারের জন্য সময় বেঁধে দিলেও এই লেখা পর্যন্ত সে ধরা পড়েনি। বরং তাকে গ্রেপ্তার নিয়ে বিভিন্ন পুলিশি নাটকের কাহিনী প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।

এসব সংবাদপত্র জগৎ কাঁপানো ঘটনাবলি একটি বিষয়ই প্রমাণ করে যে, বিশ্বের মতো বাংলাদেশের সাংবাদিকতা কেবল প্রতিকূল অবস্থাতেই নেই, এ নিয়ে দেশের সরকার, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক মহলেরও বিশেষ উদ্বেগ নেই। তার চেয়ে বড় কথা,

www.pathagar.com

এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দলের সংশ্লিষ্টতা বা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আশ্রয়-প্রশ্রয় রয়েছে। আর সে কারণেই এসব ঘটনার যথাযথ তদন্ত এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচার হয় না।

সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যার পর সর্বমহলে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠলে সরকার ও কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়েছিলেন। শামছুর রহমানের হত্যাকারীদের যেকোনো স্থান থেকে খুঁজে বের করার দৃঢ় প্রত্যয়ও ব্যক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে সরকার দলের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার কারণেই সম্ভবত ওই মামলার চার্জশিট প্রদান থেমে আছে। আর চার্জশিট হলেও অনেক অপরাধী ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকবে। আর ফেনীর টিপু সুলতানের ক্ষেত্রে ওই আক্রমণের বিরুদ্ধে এক প্রহসনমূলক মামলা দেওয়া হয়। যারা আক্রমণকারী তারাই ওই মামলা দায়ের করে। আক্রান্ত টিপু সুলতান পরবর্তী সময়ে মামলা দিলে সেটা প্রথমে নেওয়া হয়নি। পরে হাইকোর্টের নির্দেশ নিতে হয় ওই মামলা গ্রহণের জন্য কিন্তু তার কোনো তদন্তের অগ্রগতি কেউ জানে না। প্রবীর শিকদারের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃতদের একজন নিজেকে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে এর পেছনের ঘটনার নায়কদের কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু ক্ষমতার কাছে পুলিশের বাহু দুর্বল হওয়ায় সে পর্যন্ত তা পৌঁছুতে পারেনি। বরং উল্টোটাই সত্য। প্রবীর শিকদারের জন্য বিচার নয়, অনুকম্পা জুটছে কেবল।

সাংবাদিকদের রক্ষায় ক্ষমতাসীনদের সংশ্লিষ্টতা, সরকার ও প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ব্যবহার ও অবহেলা এবং রাজনীতিসহ বিভিন্ন মহলের এক ধরনের উদ্বেগহীনতা পীড়াদায়ক নিঃসন্দেহে। কিন্তু সাংবাদপত্র ও সাংবাদিকরাই বা কী করছেন। এর উত্তর প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদসহ ওই আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রত্যেক বক্তার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে- সেটা সাংবাদিকদের অনৈক্য। ইউনিয়নের অনৈক্য। সাংবাদিকদের দুর্বল করেছে বহুদিন থেকেই। তার চেয়েও বড় ক্ষতি সাধন করেছে সাংবাদিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন। বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসে আক্রান্ত সাংবাদিকতার ওপর আলোচনার উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকাস্থ ফেনী সংবাদিক ফোরাম- জাতীয়ভিত্তিক এমনকি রাজধানীভিত্তিক কোনো সংগঠন হয়। আহত টিপুর চিকিৎসার জন্য সাংবাদিকদের কোনো সংগঠন পাশে দাঁড়ায়নি। দুটি পত্রিকা উদ্যোগ নিয়ে তহবিল গঠন করেছে। প্রবীর শিকদারের পা হারানোর পর সাংবাদিকদের কোনো প্রতিবাদ সেভাবে চোখে পড়েনি।

এসবের কারণ সাংবাদিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন। প্রেসক্লাবে এখন কোনটা আওয়ামী লীগের টেবিল, কোনটা বিএনপির টেবিল। সাংবাদিকদের কোনো টেবিল আছে বলে মনে হয় না। সাংবাদিকদের এই রাজনৈতিক বিভাজন অবশ্য দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতারই প্রতিফল। উকিলের ক্ষেত্রেও আওয়ামী উকিল,

www.pathagar.com

বিএনপির উকিল, ডাক্তারের ক্ষেত্রেও বিএনপির ডাক্তার, আওয়ামী লীগের ডাক্তার। অর্থাৎ এসব প্রতিটি পেশার মানুষ তাদের পেশাগত পরিচয়ের পরিবর্তে রাজনীতির পরিচয়ে পরিচিত হতে চান। তাতে কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু এখানে এই বিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গিটা হুবহু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট-ওই রাজনীতির পরিচয়ের মধ্য দিয়ে নিজের অথবা গোষ্ঠীগতভাবে ক্ষমতার সুবিধা আদায় করা। সুতরাং পেশার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পেশার অধিকারের প্রশ্ন এ কারণে এ অবস্থায় গৌণ হয়ে যায়। শামছুর রহমান হত্যা মামলার তদন্তে অগ্রগতি হয়নি, টিপু, প্রবীররা পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে তাদের আক্রমণকারীরা যে নির্বিঘ্নে বিচরণ করে অথবা একটি সংবাদপত্র আক্রান্ত হওয়ার আঞ্চলিকভাবে প্রতিবাদ করা ছাড়া জাতীয়ভাবে যে প্রতিবাদ হয় না-এসবই এ কারণে।

কিন্তু সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা তো কেবল নিজেদের কাছে, নিজেদের পেশার কাছেই দায়বদ্ধ নয়, দায়বদ্ধ জনগণের কাছেও, সংবিধানে বর্ণিত প্রকৃত তথ্য জানা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের কাছেও। তাইতো কেবল নিজেদের নিরাপত্তা বা পেশাগত স্বার্থ রক্ষাই নয়, জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে তাদের পেশার যে যোগসূত্র আছে সে কারণে নিজেদের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতি, দেশের প্রতিও তাদের কর্তব্য আছে। অবশ্য তাদের এই কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কোনো ঔদ্ধত্য আমি দেখাচ্ছি না। এক্ষেত্রে প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদের কথা ধরেই বলতে চাই, একজন সাংবাদিক যে কোনো রাজনীতি করতে পারে, কিন্তু কাজের মধ্যে রাজনীতি টেনে না আনলেই চলে। তার চেয়ে বড় কথা এ ধরনের আক্রমণের মোকাবিলায় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। সে অভিজ্ঞতা এ দেশের মানুষের যেমন আছে, তেমনি সাংবাকিদের আছে। সুতরাং সে নিয়েও আর বিশেষ কথার প্রয়োজন নেই।

শামছুর রহমানের জীবন গেছে, টিপু সুলতান পঙ্গু, প্রবীর শিকদার পা হারিয়েছে, সন্ত্রাসী মামুন সমস্ত সংবাদপত্র সমাজকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে। বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো বিষয় ছিল না।

সেটা হয়নি। তবে হবে সে আশাই করছি। কারণ পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় তখন রুখে দাঁড়াতে হয়। সেই রুখে দাঁড়ানোর সময় বোধ হয় এসেছে।

www.pathagar.com

আলী রীয়াজ

সাংবাদিকের ওপর হামলা ও লেখকের স্বাধীনতা

ডেটলাইন ঃ ১ মে ২০০১

বাংলাদেশে আরও একজন সাংবাদিক সন্ত্রাসীদের হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। একটি জাতীয় বাংলা দৈনিকের ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধি প্রবীর সিকদার সন্ত্রাসীদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আক্রমণে আহত হলে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে— দাবি করা হচ্ছে দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে শাস্তি। ঘটনাটি ঘটেছে এমন এক সময়ে যখন দেশেরই অন্য এক এলাকায় একটি সংবাদপত্র কার্যালয়ে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং কর্মরত সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। এই ঘটনারও প্রতিবাদ উঠেছে। অনেকে দাবি করেছেন, দায়ীদের শাস্তি দেওয়া হোক। চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ কার্যালয়ে হামলার ঘটনাটি প্রবীর সিকদারের ওপর হামলা থেকে খানিকটা ভিন্ন বলেই মনে হচ্ছে। প্রবীর সিকদারের ওপর হামলাকারী প্রকৃত অপরাধীরা আড়ালে থেকে ভাড়াটে খুনিদের সাহায্যে হামলা পরিচালিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পূর্বকোণ কার্যালয়ে যারা হামলা করেছে তারা তাদের পরিচয় গোপনের চেষ্টা করেনি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী সরকারি দলের যুব শাখার একজন নেতা মামুনুর রশীদ মামুন এই হামলার নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, খবরে বলা হচ্ছে, একজন মন্ত্রীর মাধ্যমে অভিযুক্ত মামুন নিঃশর্ত ক্ষমার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সাংবাদিকদের কাছে।

সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা বাংলাদেশে নতুন নয়; পত্রিকা অফিসে চড়াও হয়ে ভাঙচুর করা, সাংবাদিকদের হুমকি প্রদানের ঘটনার মধ্যেও নতুনত্ব কিছু নেই। এ কথা বললে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না যে, এই ধরনের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়েই পরিণত হচ্ছে। প্রবীর সিকদারের আহত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কমবেশি সবাই ফেনীতে প্রায় একই ধরনের ঘটনার শিকার টিপু সুলতানের প্রসঙ্গ টেনেছেন। কিন্তু যারা নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন বা এ ধরনের খোঁজখবর রাখেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, গত চার মাসেরও কম সময়ে অন্ততপক্ষে ২৪ জন সাংবাদিক কোনো না কোনো ধরনের হামলার শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশের একটি মানবাধিকার সংস্থার হিসাবে এই সংখ্যা ২৬। এদের মধ্যে ১০ জন হামলার শিকার হয়েছেন রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীদের দ্বারা। কারণটি নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হয় না। ওইসব সাংবাদিক যা লিখেছেন তা রাজনৈতিক কর্মীদের পছন্দ হয়নি। টিপু সুলতানের ক্ষেত্রে হামলার জন্য সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্যকে দায়ী করা হয়েছে। অনেকে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিতও করেছেন, কিন্তু তাতে ফলোদয় হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ নিয়ে কোনো তদন্তও হয়নি।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের পূর্বকোণ অফিসে হামলার জন্য সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করার পর একজন মন্ত্রী মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছেন। এই ঘটনা ওই হামলার চেয়ে কোনোভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে আমার ধারণা। অতীতে একজন সরকারি সাংসদ প্রকাশ্য জনসভায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার জন্য উস্কানি দিয়েছিলেন, একজন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও এমন অভিযোগ আছে। এই অবস্থায় একজন মন্ত্রীর এই উদ্যোগে প্রশংসনীয় বলে বিবেচ্য হতে পারে না। শুধু এই কারণে নয় যে, এতে করে সন্ত্রাসীরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা করতে আস্কারা পাবে। বরং আরো বেশি এই কারণে যে, মামলার স্বাভাবিক গতি তাতে মারাত্মকভাবে বাধ্যগ্রস্ত হবে। সত্যি কথা হলো এই যে, ইতিমধ্যেই তা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ কমিশনার স্বীকার করেছেন যে, তিনি নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত মামুনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনা যেমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে, তেমনি তা নিয়ে প্রতিবাদ করার ঘটনাও। কিন্তু এর বেশি আর কিছু হয় বলে মনে করার কারণ নেই। যশোরে সাংবাদিক শামছুর রহমানকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করার পর পুলিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের ইউনিয়নগুলোর কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল যে, এর একটা দ্রুত তদন্ত হবে, দোষীদের খুঁজে বের করা হবে– তাদের শাস্তিও হবে। কাকস্য পরিবেদনা। ভয়াবহ ব্যাপারটি হলো এই যে, শামছুর রহমানের হত্যার ঘটনার আগে তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছিল। তখন কেউই তা ধর্তব্যের মধ্যে নেননি। শামছুর রহমানের মৃত্যুর পর এ নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে যে ঐক্য দেখা গিয়েছিল তা বেশি দিন টেকেনি বলেই আজও ওই হত্যার বিচার হয়নি। হত্যার হুমকি যে কেবল শামছুর রহমানকেই দেয়া হয়েছিল তা নয়, আরো অনেক সাংবাদিক এ ধরনের হুমকির মুখোমুখি হন– তাদের রক্ষা করার জন্য সাংবাদিক, সংবাদপত্র, সিভিল সোসাইটি ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো কি ধরনের ব্যবস্থা নেন তা আমাদের জানা নেই।

অনেকেই হয়তো বলবেন যে, নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। সাংবাদিকদের ওপর হামলা বন্ধের ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব ছোট করে দেখা বা দেখানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করবেন যে, যেখানে মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীর হয়ে ওকালতি করেন, সরকারি সাংসদরা সাংবাদিকদের ওপরে হামলার জন্য অভিযুক্ত হচ্ছেন– সেখানে কেবল সরকারের ওপর নির্ভর করাটা কি যথেষ্ট? সরকারের দায়িত্ব বেশি আবার হামলার জন্য সরকারি দলই বেশি অভিযুক্ত হচ্ছেন। অবশ্য বিরোধী দলগুলো যে ধোয়া তুলসী পাতা নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এপ্রিল মাসের গোড়াতে একাধিক ঘটনায় প্রধান বিরোধী দল বিএনপির কর্মীরা সাংবাদিকদের ওপরে চড়াও হয়েছেন। হরতালের সময় সংবাদপত্রের কর্মী বহনকারী এমনকি সংবাদপত্র বহনকারী গাড়িও হামলার শিকার হয়েছে। তাছাড়া বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তাদের রেকর্ড এই বিষয়ে খুব বেশি প্রীতিকর নয়। প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকে সাংবাদিকদের বেধড়ক পেটানোর ঘটনাও তখন ঘটেছে। ১৯৯৫ সালের ২৭ আগস্ট সাদা পোশাকধারী পুলিশ

www.pathagar.com

দিনাজপুরের তিনটি সংবাদপত্র অফিসে হামলা চালিয়ে সংবাদপত্রগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল। সোজা কথায়, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপরে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে সরকার ও সরকারি দল– তা নামে ভিন্ন হলেও, সব সময়ই অভিযুক্ত হওয়ার মতো কাজ করে এসেছে।

এ সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের ওপরে হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকরা হামলার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তারা কোনো অবস্থাতেই দেশের অন্যান্য স্থানের সাংবাদিকদের চেয়ে বেশি নিরাপদ নন। তবু বাস্তব সত্য হলো, ঢাকার বাইরে কর্মরত সাংবাদিকরা এখন অনেক বেশি বিপদাপন্ন। গত কয়েক বছরে ঢাকায় কর্মরত কোনো সাংবাদিক হামলার কারণে মৃত্যুবরণ করেননি বা পঙ্গু হয়ে যাননি। কিন্তু যশোরে রানার সম্পাদক শফিউল আলম মুকুল এবং জনকণ্ঠের সাংবাদিক শামছুর রহমানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ফেনীতে কর্মরত টিপু পঙ্গু, ফরিদপুরের প্রবীর সিকদারের একটি পা অস্ত্রোপচার করে ফেলে দিতে হয়েছে। খুলনায় প্রাণ দিয়েছেন নহর আলী। এগুলো আলোচিত কয়েকিট ঘটনা মাত্র।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা আসছে তিনটি শক্তি থেকে। সরকার ও সরকারি দল, বিরোধী দলগুলো এবং সংগঠিত সন্ত্রাসী চক্র (যেমন চোরাচালানি)। সন্ত্রাসী চক্রগুলো সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ লাভ করছে অথবা প্রশাসনের ব্যর্থতার সুযোগে তারা ক্রমাগতভাবেই শক্তি সঞ্চয় করছে। তদুপরি এ ধরনের হামলা ও হত্যাকাণ্ডের পর অপরাধীরা বিচার ও শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছে না। এখন তার সঙ্গে যদি মন্ত্রীরা যুক্ত হন এবং তাদের জন্য ওকালতি করেন তখন তা ভয়াবহ রূপ লাভ করতে বাধ্য। এর মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থন আশা করা বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো দেশের অতীত ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক দলের কর্মীরা নেতৃবৃন্দের ইঙ্গিতেই হোক, কী তাদের অজান্তেই হোক, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই এই ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে। আর সে কারণেই আগামী দিনগুলোতে পরিস্থিতির আরো অবনতি হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। এ অবস্থায় বহুধাবিভক্ত সাংবাদিক ও সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো যদি এই প্রশ্নে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন তবে তার দায়ভার তাদেরকেই বইতে হবে। দেশের সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন সঙ্কটে এবং পেশার খুব দুরূহ সময়ে ভূমিকা রেখেছেন বা রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে, সাংবাদিকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের এই প্রশ্ন মোকাবিলা করতেই হবে।

অবশ্য এই দায়িত্ব কেবল সাংবাদিকদের বলে আমি মনে করি না। বাংলাদেশের যারাই লেখালেখি করেন তাদের জন্যও এই পরিস্থিতি বড় পরীক্ষা তৈরি করেছে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে লেখকের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে বলে ভাববার কোনো কারণ নেই।

www.pathagar.com

আওয়ামী দু:শাসনের শ্বেতপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

পররাষ্ট্র নীতি ও সীমান্ত সঙ্কট

প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ: ভারত তোষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ড: এস এম লুৎফর রহমান: ওরা এত সাহস পায় কোত্থেকে?

ড: মোঃ তৌহিদুল আনোয়ার: আমাদের টিকে থাকার শানে নজুল

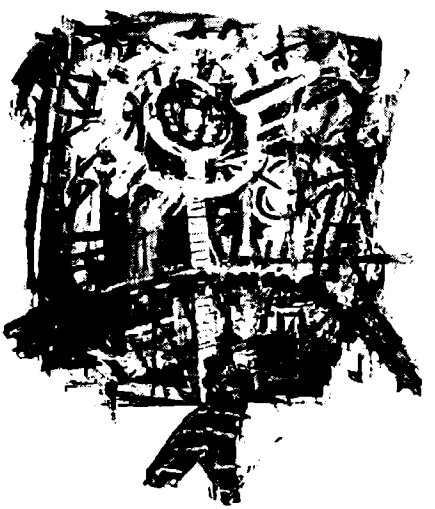

www.pathagar.com

প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ

ভারত তোষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ডেট লাইন ঃ ২৮ এপ্রিল ২০০০

পত্রিকার খবরে প্রকাশ আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আসামের স্বাধীনতাকামীদের বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর এই বক্তব্য কতদূর সত্য, তা আমরা জানি না। কারণ, মাত্র কয়েক মাস আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তুলেছিলেন যে, ত্রিপুরার স্বাধীনতাকামীদের বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার সে কথা অস্বীকার করেছেন। বিএনপি এবং জাপা বলছে, তাদের শাসন আমলে কোনো উলফা গেরিলাকে বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। খালেদা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন একবার ভারতীয় সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলাদেশে উলফা গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়া নিয়ে। খালেদা জিয়া বলেছিলেন, দেয়া হচ্ছে না। আসলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এখন ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে। এতো লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া বাংলাদেশের পক্ষে কি আদৌ সম্ভব! পক্ষান্তরে কেবল বাংলাদেশের সঙ্গেই পূর্ব ভারতের সীমান্ত নেই। পূর্ব ভারত চীন এবং মায়ানমার-এর সঙ্গেও লাগোয়া। যেসব অস্ত্র পূর্ব ভারতের স্বাধীনতাকামীরা ব্যবহার করছেন, তা চালাবার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর তা প্রদান করতে পারবার মতো, করবার মতো বাস্তব সমর্থন বাংলাদেশ সরকারের আছে বলে মনে হয় না। এই সব স্বাধীনতা যোদ্ধারা নিশ্চয়ই প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন অন্য কোনোভাবে, অন্য কোনো দেশের কাছ থেকে। কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায়, এরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বাংলাদেশের কাছ থেকে, তবে সে কথা বলা কি কোনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য যুক্তিযুক্ত হয়েছে। সরকার আর রাষ্ট্র এক নয়। রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক কথা গোপন রাখতে হয়। কিন্তু বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এই অতিপরিচিত বিধি যেন মানতে চাইছে না। তারা চাচ্ছে ভারতের কাছে ভালো হতে। আর আগের সরকারসমূহকে চাচ্ছে ভারত সরকারের কাছে হেয় করতে। এই যে দেশের স্বার্থকে বিবেচনায় না নিয়ে ভারতকে খুশী করে ক্ষমতায় থাকতে চাওয়া, এটাকে দেশের একটা বিরাট জনসংখ্যাই সমর্থন দিতে পারে না। আজ আওয়ামী লীগের অনেকেই বলছেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র সত্য ছিল। কিন্তু ভারত এখনও তা স্বীকার করেনি। কারণ, ভারত সরকার চান না, কোনো গোপন রাষ্ট্রিক তথ্যকে ফাঁস করতে। অনেক দেশ, ৩০ বছর পর পর তার গোপন দলিলপত্র প্রকাশ করে ইতিহাস লেখকদের সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু আওয়ামী লীগ যা করছে তা ইতিহাস বুঝাবার সহায়ক না হয়ে করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষতি। সে চাচ্ছে ভারতের কাছে ভালো হতে, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষতি সাধন করেও। জানি না এ বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিমত কি। কারণ, বিষয়টি পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গেও জড়িত। আওয়ামী লীগ সরকার যেন ভারতকে বোঝাতে চাচ্ছে, "আমাদের ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য কর। নইলে বিএনপি অথবা জাপা ক্ষমতায় আসলে তোমাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। সমগ্র পূর্ব ভারত পড়বে স্বাধীন হয়ে।

www.pathagar.com

ভারতের অঙ্গরাজ্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে বলেছেন, ঢাকা হয়ে উলফা গেরিলারা যাচ্ছে পাকিস্তানে। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকা হয়ে পরে আবার ঢুকছে পূর্ব ভারতে। এ কাজে তারা সাহায্য পাচ্ছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা চক্র, ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স-এর কাছ থেকে। বাংলাদেশে আছে এই গোয়েন্দা সংস্থার শক্তিশালী ঘাঁটি। জানি না, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী মোহান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করছেন কিনা। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত তিনি কিছু বলেননি। হয়তো বা ভারতকে খুশী করবার জন্য অচিরেই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করে বসবেন। এর আগে শোনা গিয়েছিল রাজশাহী থেকে আসামের গোয়েন্দা সংস্থার লোক RDX উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। যা নাকি রাজশাহী থেকে পাচার হবার কথা ছিল আসামে। বাংলাদেশ সরকার এটাকে বলেছিল একটা আজগুবি খবর। বিরোধী দলসমূহ বর্তমান সরকারকে বলছে ভারতের দালাল। তাদের বক্তব্য, বর্তমান সরকারকে সরাতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, এদেশের মানুষের কাছে বিরোধী দলসমূহের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রতীয়মান করতে যাচ্ছে। কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলছেন, তাহলো ভারতের কথা। ভারত ইতিপূর্বে যে অভিযোগ তুলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য যাচ্ছে তারই অনুকূলে। সামনে নির্বাচন আসছে। বিরোধী দলসমূহের উচিত হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরে দেখান, আওয়ামী লীগ সরকার কতটা ভারত ঘেঁষা এবং কিভাবে ভারত তোষণ করে চাচ্ছে গদিতে চিরস্থায়ী হতে। ভারত এতকাল যেসর অভিযোগ করেছে, আওয়ামী লীগ সরকার এখন দিচ্ছে তারই অনুকূলে বক্তব্য। অথচ সমগ্র পূর্ব ভারতের মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলন হলো একটা শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। এটা বাইরে থেকে সৃষ্টি করা নয়। এই অঞ্চলের ইতিহাস হলো ভিন্ন। আসাম ও পূর্ব ভারতের আর ছয়টি অঙ্গরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজ এইসব অঞ্চল দখল করবার ফলে। এর আগে এরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এমনকি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে এখন পর্যন্ত আসামের নাম নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে আসামের নাম উল্লেখের প্রয়োজন দেখেননি। যেমন দেখেননি বর্মার। যদিও ১৯১১ সালে এই গান রচনার সময় বর্মা ছিল ভারতের একটি প্রদেশ মাত্র। যদিও সবচেয়ে বড় প্রদেশ। ১৯৩৭ সালে বর্মাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে পরিণত করা হয় একটি রাজ্যে। এরকম করা না হলে দিল্লী এখন তাকেও দাবি করতো ভারত মাতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। যেমন সে এখন দাবি করছে, পূর্ব ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্যের ক্ষেত্রে। আজকের ভারত ব্রিটিশ রাজের সৃষ্টি। ইংরেজরা নাগাল্যান্ড জয় করে তা ভারতের সঙ্গে যোগ করে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র। নাগাল্যান্ড এখন বিশেষভাবেই চাচ্ছে স্বাধীন হতে। ইংরেজরা বর্মার কাছ থেকে আসাম জয় করে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে। আসামসহ পূর্ব ভারতের ইতিহাস সারা ভারতের ইতিহাস থেকে বিশেষভাবেই ভিন্ন। আজ পূর্ব ভারত যে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছে, তার আছে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ভিত্তি। পূর্ব ভারতকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য দিল্লী সরকার চাচ্ছে, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ওই অঞ্চলে যাবার অবাধ সুযোগ-সুবিধা। যাকে সে বলছে 'ট্রানজিট'। আওয়ামী লীগ সরকার ভারতকে ট্রানজিট দিতে যেয়েও পারেনি দেশের জনমতের চাপে। কিন্তু আগামী নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ সরকার আবার ক্ষমতায় আসতে পারে তবে ভারত অবশ্যই

www.pathagar.com

পেতে পারবে তথাকথিত ট্রানজিট। আর এর ফলে বাংলাদেশ বিশেষভাবেই জড়িত হয়ে পড়বে পূর্ব ভারতে যে যোগাযোগ চলেছে তার সঙ্গে। যার ফলে তার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘটবে আরো ভয়ঙ্কর অবনতি। যে কথা বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে হয়, ভেবে দেখার অবকাশ পাচ্ছেন না। তিনি অত্যন্ত সরল করে দেখছেন পূর্ব ভারতের পরিস্থিতিকে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজ দেশে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কিন্তু তিনি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারেননি। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসের পরিমাণ কমেনি। বরং বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। অথচ তিনি সর্ব বিষয়েই করে চলেছেন নানা বিষয়ে মন্তব্য, যা তাঁর দফতরে পড়ে না। মনে হচ্ছে, তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী অথবা হবু প্রধানমন্ত্রী! আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে সমন্বয়ের অভাব। কর্ম বিভাগের অনুপস্থিতি। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন মন্ত্রীর। কেবল মাত্র প্রধানমন্ত্রীই পারেন সাধারণভাবে পারেন, যদি ইচ্ছা করেন সর্ব বিষয়ে বিবৃতি এবং সাক্ষাৎকার প্রদান করতে। অন্য মন্ত্রীরা নন। অন্য মন্ত্রীরা নানা বিষয়ে কথা বললে সৃষ্টি হয় বিশেষ বিভ্রান্তির।

দেশের মানুষ একটা সরকারের ভালোমন্দ বিচার করে কাজ দিয়ে, কেবল কথা দিয়ে নয়। বর্তমান সরকার সবচেয়ে বেশী ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেছে। কিন্তু করতে পারেনি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর সম্প্রসারণ অথবা জনকল্যাণ বৃদ্ধি। এই সরকারের পররাষ্ট্রনীতি হয়ে পড়েছে খুবই ভারত ঘেঁষা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বর্তমান বক্তব্যের মাধ্যমে যা এখন আরো স্পষ্ট হতে চলেছে। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য যতটা গোছাল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য তা নয়। তাঁর কথা থেকে মনে হচ্ছে, তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, আগের সব সরকার ছিল ভারতের শত্রু অথবা ভারত বিরোধী। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার তা নয়। তারা উলফাদের কোনো প্রকার সাহায্য করছে না। তাই ভারতের উচিত হবে, আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করা যা ভারত সরকার ইচ্ছা করলেই করতে পারে।

আমরা ছোট দেশ। তাতে ভৌগোলিকভাবে ভারত পরিবেষ্টিত। নিশ্চয়ই আমরা ভারতের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করে আমাদের অবস্থাকে বিপন্ন করতে পারি না। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা অবশ্যই হতে হবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু এই সুসম্পর্ক সৃষ্টি করতে যেয়ে আমরা আবার আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারি না। করে তুলতে পারি না, আমাদের পূর্ব সীমান্তের মানুষকে আমাদের ওপর বৈরী। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এখন যেসব দাবি তুলছে, তা কতকটা আমাদেরই স্বাধীন হবার আগের দাবিরই মতো। তারা স্বাধীন হতে চাচ্ছে, শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাবার যুক্তি দেখিয়ে। আমরা তাদের দাবিকে অযৌক্তিক বলতে পারি না। তাই আমাদের নৈতিক সমর্থন থাকতে চাচ্ছে তাদেরই পক্ষে। কাঠামো এবং প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা যায় না। কেন্দ্রিকতার দিকে এর ঝোঁক প্রবল। ভারতের সংবিধানে ক্ষমতা বণ্টন এমনভাবে করা হয়েছে যে, রাজ্যগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে। ভারতের সংবিধান যদি পরিবর্তিত

www.pathagar.com

না হয়, অঙ্গরাজ্যগুলোকে যদি বেশী ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তবে ভারতীয় রাজনীতি আরো জটিল হয়েই উঠবে। ভারত এগিয়ে চলবে ভাঙনেরই দিকে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে এর জন্য দোষ দেওয়া হবে বৃথা। একমাত্র একটা আলাদা ধরনের ফেডারেশনই ভারতের জাতিসত্তার সংঘাতকে অনেক কমিয়ে আনবে।

ভারতকে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে এক জাতি, এক প্রাণ করা যাবে না। এরকম করতে যেয়েই আজকের ভারত কম করে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তিনটি বলয়ে : হিন্দী, দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় মানব ধারা প্রধান পূর্ব ভারত। যাদের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই কথা বলে তিব্বতী-চীনা পরিবারের নানা ভাষায়। অহমীয়া ভাষাকে আর্য পরিবারে স্থাপন করা গেলেও হিন্দীর সঙ্গে তার পার্থক্য বিরাট বড়। জোর করে হিন্দী ভাষাকে সবার ওপর চাপাতে গিয়ে ভারতে ভাষা সমস্যা ধারণ করেছে প্রকট রূপ। ইতিহাসের পার্থক্যও ফুটে উঠতে আরম্ভ করে প্রবলভাবে যা ভারতকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ভাঙনের পথে। এই ভাঙন বাংলাদেশে এবং পাকিস্তান বন্ধ বললেও থেমে থাকবে না। কারণ, ভাঙনের কারণ ভেতর থেকেই হচ্ছে ক্রিয়াশীল। বাইরে থেকে তা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করবার চেষ্টার ফলে তৈরী হচ্ছে না। বাংলাদেশ সরকার ভারতে বিভেদ সৃষ্টির ক্ষমতাই রাখে না। পাকিস্তান বহু দূর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ষড়যন্ত্র করে চলেছে বলেই আসামে গোলযোগ হচ্ছে তা নয়। অবশ্য ভারতের অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রবণতাকে বাইরের শক্তি তাদের আপন স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইতেও পারে। কিন্তু একে রোধ করতে হলে দূর করতে হবে বিরোধ সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ।

আওয়ামী লীগ সরকার বলছে, তারা বাংলাদেশে উলফা গেরিলাদের প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এই বন্ধ করে দেবার ফলে উলফাদের কার্যকলাপ কতটা স্তিমিত হতে পেরেছে! আওয়ামী লীগ যতই ভারত ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করবে, ভারতের আশীর্বাদ পাবার জন্য, দেশের মানুষের সহানুভূতি থেকে সে সেই পরিমাণ নিজেকে বঞ্চিত করবে। কারণ, এদেশের জনমত সাধারণভাবে পূর্ব ভারতের মানুষের স্বাধীনতারই পক্ষে। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর আবেগকে মর্যাদা দিতে চাচ্ছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক কথাই সম্ভবত বলে চলেছেন যথেষ্ট না ভেবে। কিন্তু বেশী কথা একজন নেতার আকর্ষণ কমিয়ে দিতেই চায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ ভারত আর চাকমা গেরিলাদের আশ্রয় আর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে না। সন্তুলারর্মা ফিরতে বাধ্য হয়েছেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশের মানুষ জানতে চায় কি সেই বিশেষ চুক্তি। কি আছে সেই চুক্তিতে। সন্তুলারমা ইতিমধ্যেই অস্বীকার করেছেন এরকম কোনো চুক্তি হবার কথা। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল আবার অশান্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। ভারতের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো বিশেষ চুক্তি আর কাজে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং তার ভারত তোষণ দেশের স্বার্থকেই করে তুলছে বিপন্ন। আওয়ামী লীগ সরকারের সফলতা ও বিফলতাকে বিচার করতে হবে এই বিশেষ পটভূমিকে বিবেচনায় নিয়ে। বাংলাদেশ এখন একটা পৃথক স্বাধীন দেশ। তার ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র নীতি হতে হবে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সরকারের ভালোমন্দ বিচারে তা হতে হবে বিশেষ মাপকাঠি।

www.pathagar.com

ড. এস এম লুৎফর রহমান

ওরা এত সাহস পায় কোত্থেকে

ডেট লাইন ঃ ২২ এপ্রিল ২০০০

অবিভক্ত 'বাঙলা' বা ব্রিটিশ বেঙ্গল-এর 'বাঙালা' নামটি ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা দেয়। তার আগে দেশটির নাম ছিল গৌড় এবং তারও আগের নাম 'বঙ্গ'। ইংরেজ আমলের সূচনায় ভারত নামে কোনো দেশ ছিল না। ছিল 'হিন্দুস্তান'। 'বাঙালা', ১৩৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুস্তানেরই অংশ ছিল, আলাদা কোনো দেশ বা কান্ট্রি ছিল না। মুসলমানরাই দিল্লীর মুসলিম সুলতানদের কর্তৃত্বের বাইরে স্বাধীন রেখে, একে একটি আলাদা দেশরূপে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করে তোলেন। সেই স্বাধীনতা দিল্লীর মোগল সম্রাট আকবর আবার ধ্বংস করে এ দেশকে তার অধীনে নিয়ে নেন ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে। পরের ইতিহাস প্রায় সবারই জানা। কিন্তু ১৯৪৭ সালে সেই 'বাঙালা' দেশকে দু'ভাগে ভাগ করে দু'টি প্রদেশ মাত্র বানান হল, সেই (বর্তমান) দিল্লীপতিদের অপরাজনীতির কারণেই। ফলে প্রায় ছ'শ' বছরের (১৩৫১ থেকে ১৯৪৭) একটি 'দেশ' বিলীন হয়ে গেল। একটা জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল 'পাকিস্তানী' ও 'ভারতীয়' জাতি নামে। কিন্তু দিল্লীর নতুন অধিপতিদের মনে তাতেও শান্তি এল না। তারা আমাদের 'সাহায্য করল এবং 'স্বাধীন' বানিয়ে দিল। আমরা খর্বাকারে আবার একটি 'দেশ' বা রাষ্ট্র হলাম-স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে মূল বাঙালার দক্ষিণ-পশ্চিমের একাংশ উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা হারিয়ে 'বাঙলাদেশ' নাম নিয়ে আবার বিশ্ব মানচিত্রে জেগে উঠল এই দেশ। একটি নাম, একটি রাষ্ট্র, একটি জাতি। একটি পতাকা এবং একটি নির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিত রাষ্ট্র সংঘভুক্ত একটি জাতি (Nation)।

এই নতুন জাতির (Nation) সঙ্গে তেইশ বছর পূর্বে জন্মান ভারতীয় জাতি নামে আমাদের প্রতিবেশী 'বন্ধু' জাতির সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ না হবার কোনো কারণ ছিল না। ইরানের পাশে আফগানিস্তান, চীনের পাশে কোরিয়া, আলবেনিয়া ছিল ও আছে। চীন তো কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় মার্কিন বাহিনীর মোকাবিলা করেছে এবং আমেরিকার সর্বাত্মক ও আণবিক আঘাতের ঝুঁকি নিয়েও উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করেছে-নিজেদেরই স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ দিয়ে। ১৯৭১ সালে ভারত 'বাংলাদেশ' বাহিনী বা মুক্তিফৌজকে যতটা ঝুঁকি নিয়ে, যেটুকু 'সাহায্য' করেছে, চীন কোরিয়ানদের তার থেকে অনেক বেশী ঝুঁকি নিয়ে, অনেক বেশী সাহায্য দান করে। কিন্তু সেই সুবাদে চীন কি উত্তর কোরিয়াকে যুদ্ধান্তে লুটপাট করে নিয়ে আসে? চীনা বাহিনী কি যুদ্ধ শেষ

www.pathagar.com

হবার পর এক সপ্তাহও কোরিয়ায় ছিল? কোরিয়ানদের যুদ্ধে ব্যবহৃত একখানা ছোট ছুরিও কি চীনা বাহিনীর কেউ দেশে নিয়ে আসে? না, তা তারা করেনি। কারণ তারা কোরিয়ানদের সাহায্য দান করে নিঃস্বার্থভাবেই। তা ছিল-'সাহায্যের জন্য সাহায্য দান', কোনোরকম 'স্বার্থের জন্য সাহায্য দান' নয়।

কিন্তু ভারত আমাদের সাহায্য দেয়– প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারকে 'গোপন চুক্তির' শর্তে বেধে নিয়ে। সেই চুক্তি অনুসারে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব তারা ছিনিয়ে নেয়, মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক মরহুম জেনারেল এমএজি ওসমানীর হাত থেকে। তারপর মুক্তিফৌজের বিজয়ের পর লুট করে সারাদেশ। আমাদের সরকারি বাহিনীর ফেলে দেয়া বা জমা দেয়া সমস্ত অস্ত্র তো বটেই, সেই সঙ্গে প্রবাসী সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্যে ক্রয় করা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রও তারা নিয়ে যায় ভারতে। এ সময়কার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ৫৬টি রেল ওয়াগন ভরে ঐসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়। বিজয়ের পর দেশ দখল করে রাখে তিন মাস। এরপরও তারা নানা চক্রান্ত চালিয়ে চরমভাবে দুর্বল করে দেয় আমাদের সেনাবাহিনী। এতসব করার একটাই কারণ। আর তা হল—ভারতের পাশে বাংলাদেশ কেন একটা 'রাষ্ট্র' হিসেবে কাজ পরিচয়ে দাঁড়াবে। 'গোপন চুক্তি'তে ভারত বাংলাদেশের সীমানা রাখেনি বা মানেনি; বাংলাদেশের সেনাবাহিনীও নয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী (কাজেই ক্যান্টনমেন্ট, সামরিক সরঞ্জাম, সামরিক ফাঁড়ি সীমান্তরক্ষী বাহিনী ইত্যাদি) থাকতে পারবে না। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায়-দায়িত্ব থাকবে ভারতেরই হাতে। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রেমিক আজন্ম সংগ্রামী নির্ভীক শেখ মুজিবুর রহমান ঐসব শর্ত অস্বীকার করেন এবং বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন। তিনি সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার কোশেশ করেন। ভারত ছাড়া অন্য দেশ থেকেও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। তদুপরি, এখানকার সময়ের সব থেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন বাংলাদেশের সীমানা রক্ষার প্রশ্ন, সে বিষয়টিও চূড়ান্তভাবে ফয়সালার জন্য 'বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি' সম্পাদন করতে বাধ্য করেন ভারতকে। এরকম আরও যেসব পদক্ষেপ নিয়ে তিনি এ দেশকে ভারতের পাশে একটি বন্ধু ও সমমর্যাদাসম্পন্ন দেশরূপে দাঁড় করাতে চান, তা সন্দেহপ্রবণ, অবিশ্বাসী ও মুসলিমবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস নেতারা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি তার ফলেই শেখ সাহেবকে 'দুনিয়া থেকে বিদায়' নিতে হয়। একই কারণে বিদায় নিতে হয় জিয়াউর রহমানকেও। সে কথা ভারতীয়রা 'সানডে' (১৯৮৬) পত্রিকায় স্বীকার করেছে। কিন্তু জিয়া হত্যার কথা ভারত থেকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করা হলেও মুজিব হত্যার কথা এখনও স্বীকার করা হয়নি। তবে তার প্রমাণ পাবার কিছু বাকিও থাকেনি। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রাসাদ' পত্রিকায় অন্নদা শঙ্কর রায়ের রচনা তার নজির।

www.pathagar.com

কাজেই আমরা ভারতকে যত বড় 'বন্ধু' বলেই ভাবি না কেন; তাতে দিল্লীওয়ালা খুশীতে বাগবাগ হয়ে গলে পড়ে না-দয়ার সাগরে ভেসে যায় না। কিংবা বৈধ-অবৈধ কোনোরকম স্বার্থ চুলমাত্র সরে যেতে দেয় না। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিজস্ব পতাকা, পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের দাবিদার যে বাংলাদেশ সে বাংলাদেশকে দিল্লীওয়ালা তাই ভয় করে, ঘৃণা করে এবং 'নতুন আর এক পাকিস্তান' বলে ভাবে। এ জন্যই গত ২৭ বছরের ভারতের বাংলাদেশ-নীতি হল-তার প্রাক্তন পাকিস্তান-নীতিরই সম্প্রসারণ। 'নেহরু ডকট্রিন' আর 'গুজরাল ডকট্রিন' কিংবা 'বাজপেয়ী ডকট্রিনে'র মধ্যে তাই কোনো পার্থক্য নেই। তা একই দড়ির ওমাথা-এমাথা মাত্র।

কিন্তু 'নেহরু ডকট্রিন' বা 'ইন্দিরা ডকট্রিন' পাকিস্তানী আমলের তেইশ বছরে আমাদের এই দেশের সীমান্তের একচুল এলাকায়ও পা রাখতে পারেনি। ১৯৬২ সালে একবারই মাত্র আজকের তিনবিঘা এলাকা বিএসএফ অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইপিআরদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু ইপিআরদের প্রতি আক্রমণ তারা ঠেকাতে পারেনি। ফলে, দখল ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। তাই আজকের খবরের কাগজের পাঠকগণ যদি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ইংরেজি, বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা উল্টান, তাহলে ঐ ২৩ বছর বাংলাদেশ (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের একটি নজিরও খুঁজে পাবেন কি-না সন্দেহ। বিএসএফ এ দেশের মাটি দখল, বেসামরিক লোক হত্যা, বিডিআর (তখনকার ইপিআর) হত্যা, অপহরণ, গুম তো দূরের কথা, এদেশের সীমান্তের কোনো গাছের ডাল ভারতীয় এলাকায় লম্বা হয়ে গিয়ে থাকলে, সেই ডালের ওপর বসা একটা পাখীকেও তারা গুলি করার সাহস পায়নি। এ দেশীয় একটা পিঁপড়ার গায়ে নখের ছোঁয়া দেয়ার হিম্মতও তাদের হয়নি, সে সময় এদেশের সীমান্তে যা ছিল, এখনও তাই আছে। সে সময় সীমান্ত পাহারাও দিত এ দেশেরই সন্তানরা। ইপিআর-এর নাম বদলে বিডিআর হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের হাত দুর্বল হয়নি, চোখের জ্যোতি কমেনি কিংবা হিম্মতও হারায়নি। তার প্রমাণ, তারা বহু স্থানে দিয়ে চলেছেন।

তবু কেন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রায় সর্বত্রই নাজুক হাল, তা আলোচনা করা আবশ্যক। ভারত আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্তরেখা, তার মেইন পিলার, সাব-পিলার, নো-ম্যান্স ল্যান্ড, সীমান্ত প্রহরা ইত্যাদি কার্যত অস্বীকার করছে বা করতে সাহসী হচ্ছে কেবল আমাদের দেশেরই রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতায়। সরকার প্রধান হিসেবে যিনি যখন ক্ষমতায় বসেন তখন তার সবলতা-দুর্বলতার প্রভাব পড়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতির ওপর। সে জন্যই দেখা যায়, পাকিস্তানী আমলের তেইশ বছরের মতো ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরেও সীমান্ত আজকের ন্যায় এত দুর্বল হয়নি। ১৯৭৮ সালে বিডিআর সূত্রে প্রাপ্ত একটি প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, ১৯৭৭ সালে এক বছরে 'বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ হয় এক হাজার

www.pathagar.com

তিনশ' ষোল বার। কিন্তু সে সব সংঘর্ষে বিএসএফ একজন বিডিআর জওয়ান কিংবা কোনো বেসামরিক লোককে হতাহত করতে পারেনি। ভারত সম্পর্কে জিয়াউর রহমানের বাস্তববাদী ও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিই তখন সীমান্ত অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দান করে। তিনি 'ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি' অনুমোদন করার জন্য ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন (যে চুক্তি তারা আজও অনুমোদন করেনি)। তিনি ভারত ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত দু'শ' ছিটমহল সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেন এবং তালপট্টি থেকে ভারতীয় দখলদারিত্ব উঠিয়ে নেয়ার জন্যও মিসেস গান্ধীকে 'চরমপত্র' দেন। তাঁর এসব পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই মিসেস গান্ধী ১৯৮১ সালের গোড়ার দিকে কলিকাতায় এসে গড়ের মাঠের জনসভায় ক্রোধে বলেই ফেলেন, "এক পুঁচকে মেজর আউর এক অ্যাডমরাল মুঝকো আখু রাঙাতে হেয়।" কিন্তু সে চোখ নিভিয়ে দেয়ার পর এরশাদ সাহেবের সরকার সীমান্তের কোনো বিরোধীয় ব্যাপার নিয়েই একবারও ভারতীয় পক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করেনি। তবুও তার শাসনের নয় বছর দেশের সীমান্ত পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়েনি। তিনি সেনাবাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি করেছেন। তাদের ট্রেনিং অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদিও তিনি অব্যাহত রেখেছেন। তার এসব কর্মপ্রণালীর ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আন্তর্জাতিক সুনাম ও সম্মান যেমন বেড়েছে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমস্ত সীমান্ত এলাকাতেই শান্তি ও নিরাপত্তা মোটামুটি বজায় থেকেছে।

কিন্তু ১৯৯১ সালে বেগম জিয়ার সরকার মসনদে বসার পর দু'দেশের সম্পর্কের যে বরফ গলে সেই বরফ গলা পানির প্রেম তরঙ্গে উঠে যায়-সীমান্তের হাজার হাজার সীমানা পিলার। দু'এক জায়গায় কলাগাছ পুঁতে সীমানার খুঁটি বসানো হয়। তারপর একেবারে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় সীমান্ত। শুরু হয় অবাধ চলাচল, অবাধ চোরাচালান, অবাধ অস্ত্রশস্ত্র ও নেশার দ্রব্য আগমন। আর সেই সাথে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা, নাগরিকরা শুরু করে বাংলাদেশের ভূমি দখল, ফসল দখল, নদী দখল, চর দখল, ছিটমহল দখল, দ্বীপ দখল, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি দখল, ব্যবসা-বাণিজ্য দখল ইত্যাদি। ভারতকে ট্রানজিট দেয়া, ভারতীয় পরামর্শে সেনাবাহিনী থেকে বিরাশি জন সেনা অফিসারকে বিনা দোষে অপসারণ, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমস্যার তথাকথিত 'সমাধান'-এর ভারতীয় পরামর্শ গ্রহণ, ভারত থেকে সামরিক অস্ত্রাদি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ, ভারতীয়দের দিয়ে ভোটার আইডি কার্ড মুদ্রণ পরে পরিত্যক্ত ইত্যাদি অসংখ্যভাবে ঐ সরকার এদেশে ভারতীয় আধিপত্য আকর্ষণ, গ্রহণ ও বরণ করে নেয়। তার ফলে 'বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত' পরিস্থিতি এত নাজুক হয়ে পড়ে যে, বিএসএফ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সীমান্তে শত শত একর জমি দখল করে নেয়, ভূমিসীমা, পানিসীমা, আকাশসীমা বারবার লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও 'ভারত প্রেমে' অথবা ভারতের 'ভয়ে' উন্মাদ বিএনপি সরকার, সে সবের কোনো প্রতিবাদ করেনি। এমন কি, ভারতীয় হাইকমিশনারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে একটা প্রেমপত্রের মাধ্যমেও

www.pathagar.com

নিজেদের 'অখুশী'র কথাটা জানায়নি। দু'একটি ক্ষেত্রে শুধু বলেছে-এর প্রতিবাদ জানানো হবে। ভারতীয়রা লাই পেয়েছে এভাবে। এসব কারণেই তারা তথাকথিত বাংলাদেশ বলতে দ্বিধা করেনি। দ্বিধা করেনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী বলতে। পাকিস্তানী আমলের ইপিআরদের ভয়ে যারা ভিজে বেড়াল হয়ে থাকত, তারা আজ বিডিআরদের 'যম' হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল এসব ব্যাপারে আস্কারা এবং সহাস্য সম্মতি পেয়েই।

কারণ ভারতীয়রা ভালো করেই জানে, গ্রামের সেই মেয়েলী প্রবাদের কথা, যে প্রবাদে বলা হয়েছে- 'আগরতলা যে পথে যায়, আছরাও সেই পথেই ধায়।' তার অর্থ, অগ্রগামী ব্যক্তির পথ ধরেই হাঁটে পশ্চাতের ব্যক্তিও। বেগম জিয়ার আমলের-তার পথ ধরেই যদি এ আমলে শেখ হাসিনাও হাঁটেন, তবে তার জন্য তাকে বেশী দোষ দেয়া যায় না। তথাপি দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্ত রক্ষার দায়-দায়িত্ব কি এতই লঘু যে, তা যে কোন অজুহাতে উপেক্ষা করা যায়? এরকম প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন হত না। যদি ইতিমধ্যেই আমাদের সরকার ও বুদ্ধিজীবী, বিবৃতিজীবী, কলমজীবীদের টনক নড়ত। যথাসময়ে টনক নড়ত সরকার ও বিরোধীদলীয় সকল রাজনীতিক নেতা-নেত্রীর। আমাদের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় (যেমন- সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, যশোর ইত্যাদি) বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে ভারত যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সৈন্য সমাবেশ, রেকী, বাংকার খনন, কামান মোতায়েন, বিএসএফ-এর জনবল ও অস্ত্র-বল বৃদ্ধি গত কয়েক মাস যাবৎ বৃদ্ধি করে চলেছে। এক সপ্তাহে চারজন সামরিক ও অসামরিক লোক হত্যা করেছে। সাড়ে ছ'শ' একর জমি দখল করেছে। বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান হারে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির খবর আসছে। জনগণ সীমান্ত এলাকার জমি, ফসল, গবাদিপশু, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে রেখে পালাচ্ছে, অথচ এসব ব্যাপারে প্রশাসন নীরব। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সবাই নির্বিকার। এই নির্বিকার ভাবের অর্থ কি? আজ দেশের সর্বত্রই এক প্রশ্ন, দেশের প্রায় গোটা সীমান্তজুড়ে যখন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ভারতীয় রেগুলার আর্মির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে; তখন অসহায় বিডিআরদের সাহায্যে আজ পর্যন্ত কোনোরকম সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়া দেয়া হচ্ছে না কেন? তাদের টহল ইউনিটগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি, ভারী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ও ভারতীয় বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলার কোনোরকম ব্যবস্থা নেয়ার বদলে বরং ঘটনা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চলছে কেন? মার খেয়ে মার চুরি করার নীতিই যে আমাদের দুই নেত্রীর ভারতনীতি, তা জাতির অগোচরে নেই। কিন্তু এই নীতি সীমান্ত রক্ষায় সহায়ক হতে পারে না বলেই ইতপূর্বে গত এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখায় বলেছিলাম "সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা চাইলে বেগম জিয়ার সীমান্তনীতি পরিহার করুন।" সে পরামর্শ সরকার গ্রহণ না করলে দুই নেত্রীর বরফ গলা পানির তরঙ্গ-রক্ত তরঙ্গ হয়ে উঠবে এবং তাতে কেবল দেশই ভেসে যাবে না, সরকারও ভেসে যাবে তা সত্য।

www.pathagar.com

ডঃ মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার

আমাদের টিকে থাকার শানে নযুল

ডেটলাইন ঃ

ভারতকে এই উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তের একটি দেশকে এবং পূর্বপ্রান্তের আর একটি দেশের একটি দলকে সমীহ করে চলতে হয়। পাকিস্তান ভারতের জাতশত্রু, আর পূর্বপ্রান্তে বাংলাদেশে দল হিসেবে বিএনপির উত্থান ভারতের নীলনকশার একেবারেই পরিপন্থী, একটি ঘটনা যার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ক্লান্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তারপরও জাতীয়তাবাদীরা টিকে আছে, কারণ এই টিকে থাকার একটা শানে নযুলও আছে। ভারত, বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানকে চিনত, পাকিস্তানের দুর্বল দিকগুলো জানত। এটা জানত পশ্চিম অংশে ক্ষমতার কেন্দ্রকে কাঁপিয়ে দেয়ার মতো শক্তি রাখে পূর্বাংশের গণতন্ত্রপিপাসু জনগণই। কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ যেমন মেনে নিতে পারেনি, পাকিস্তান সৃষ্টিও মেনে নিতে পারেনি। তাই কংগ্রেসের হাতে তখন মজুদ ছিল স্পষ্টতই দুটি এজেন্ডা, দুই বঙ্গকে এক করা আর পাকিস্তান ভেঙে দেয়া। কংগ্রেসের হাত থেকে জ্যোতিবাবু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক শাসন চালু করে তা যুগ যুগ বহমান রাখলে পর, কংগ্রেস এর প্রথম কার্যসূচি অর্থাৎ দুই বাংলাকে এক করার নীলনক্শা তৈরি আপাতত ক্ষান্ত দেয়, কারণ তাতে জ্যোতিবাবু যে আরও জ্যোতিষ্মান হয়। দ্বিতীয় কাজটি তখন হয়ে গেল একমাত্র মোক্ষ।

জুলফিকার ভুট্টোর অতিলিপ্সা, ইয়াহিয়ার বাঙালি নিধনযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালি দমনের অতিসরলীকরণ এবং সমীকরণ ভারতকে এক যুৎসই মওকা এনে দিয়েছিল। বাংলাদেশে শেখ মুজিবের মহীরুহ সৃষ্টির প্রারম্ভিক কৃতিত্ব ছিল কিন্তু জেনারেল আইয়ুবের। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে ভুট্টোকে সৃষ্টির সমস্ত কৃতিত্বও সেই একই আইয়ুবের। অবশ্য মুজিবকে নিয়ে গেল সংগ্রামে। আর ভুট্টোকে নিয়ে গেল ক্ষমতায়, প্রথমে নওল কিশোর ইংরেজি কেতাদুরস্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এবং তাসখন্দ চুক্তির পরপর চুলপাকা বিরোধী শিবিরের নেতা হিসেবে।

সত্যিই, আইয়ুবের পতন এতটা ত্বরান্বিত হত না যদি না তিনি এক প্রতিপক্ষ ভুট্টোর সৃষ্টি না করতেন। তাসখন্দ চুক্তি ভুট্টোর মতে পাকিস্তানের স্বার্থপরিপন্থী। চুক্তি স্বাক্ষরের দিবাগত রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দেই মারা যান। তখন মদিরাবস্থায় ভুট্টোকে বলা হয়, খবরটি জানানো হয় ভুট্টো মদের গেলাসে আরেক চুমুক দিয়ে সচিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মরল কোন জনা', আইয়ুব না শাস্ত্রী? ক্ষিপ্ত আইয়ুব তাসখন্দ থেকে ফিরে গিয়েই ভুট্টোকে ডাকল। বরখাস্ত করল এবং এ বলে

www.pathagar.com

শাসিয়ে দিল যে, আমি তোমাকে তোমার কবর পর্যন্ত ধাওয়া করব। ভুট্টো কিছুই বললো না। এক চমৎকার কৌশল অবলম্বন করল, তার পিপলস পার্টি গড়ে তুলতে প্রতিটি জনসমাবেশের আগেই বলতে থাকল তাসখন্দ চুক্তির সকল অব্যক্ত কথা ফাঁস করে দিব। বারবার বলি বলি করে, কিন্তু বলে না। এ কথায় আইয়ুব বেকায়দায় পড়ল আর জনগণ হল মোহাবিষ্ট। এভাবে অতি দ্রুত পিপলস পার্টির ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল। ভুট্টো গ্রেফতার হলে তেহরিকে ইসতেকলাল পার্টির এয়ার মার্শাল আসগর খান পশ্চিম পাকিস্তানের গণজাগরণের হাল ধরল ভুট্টোর গড়ে তোলা সংগ্রামকে আরও বেগবান করতে।

এদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে ছাত্র-জনতাকে সংগ্রামের পথে ঠেলে দিল। মুজিবের দায়িত্ব ভাসানী নিলেন এবং আইয়ুব বিরোধী সংগ্রামকে বেগবান করল। স্পষ্টতই আমার এখনও মনে পড়ে সে দিনগুলোর কথা। যদি আইয়ুব পশ্চিম খণ্ডে দুর্বল না হত, পূর্বখণ্ডে এত তাড়াতাড়ি ফলপ্রসূ আন্দোলন গড়ে উঠত না। দেখতে দেখতে মুজিবের প্রাদেশিক ভাবমূর্তি পাকিস্তানের জাতীয় শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের রূপ পরিগ্রহ করল।

ভারতের সাথে মুজিবের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। যেমনটা আইয়ুব বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন আগরতলা মামলার মাধ্যমে। কমান্ডার মোয়াজ্জেম বা সার্জেন্ট জহরুল হকদের মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের মাথায় ভারতের সাহায্যে কিছু করা যায় কিনা সে চিন্তা হয়ত ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব অত্যন্তভাবেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতায় বাঙালিদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার কতটা বেশী আদায় করা যায় সেদিকে সচেষ্ট ছিলেন। পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় বলয়ে মুজিবের উত্থান ভুট্টো, দৌলতানা, হুক্কাপেয়ী, আওয়ামী লীগের নসরুল্লাহ খান, ন্যাপের ওয়ালী খান কেউই সহ্য করেনি। তারা সবই জানত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শেখ ছিলেন ইরানের শাহের কাছের মানুষ, আর শাহ ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত কাছের। শেখের পাকিস্তানী মেজাজ ও শাহী বন্ধুত্ব সবটাই ইন্দিরার জানা ছিল। ভারত তাই শেখের নামটিও উচ্চারণ করত না। অমৃত, আনন্দবাজার পত্রিকা, সাপ্তাহিক দেশ এবং বেতার বাংলার সংবাদ ভাষ্যকার চঞ্চল সরকার বা বেতার পাঠক দেবদুলালদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের সাথে এক অপূর্ব হৃদ্যতার বন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল ভারত যা অদ্যাবধি জাগরুক রয়েছে। মুজিবের ভারতপ্রীতি না থাকলেও তাকে বুদ্ধিজীবীরা যে ৬ দফা দাবিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন, তা পড়লেই বুঝা যেত মুজিবকে প্রকারান্তরে ভারতের সাথে আঞ্চলিক বাণিজ্য করার দিকেই ঠেলে দেয়া হয়েছিল খুব কৌশলে। শেখ সাহেব কি জানতেন না, ৬ দফার পরিণাম বাংলাদেশের অভ্যুদয়? না জানতেন না। কারণ শেখ সাহেব ৬ দফার মাধ্যমে এটাই বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানী শাসকদের-২৫ বছর তোমরা শাসন করেছ, সামনের ২৫ বছর আমরা বাঙালিরাই তোমাদের শাসন

www.pathagar.com

করব। তোমরা শত শত কোটি টাকা লুট করেছ, আমরা হাজার হাজার কোটি টাকা সুদে-মূলে ফেরত চাই—এই ছিল শেখ। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তার যেরকম ক্ষোভ ছিল, পাকিস্তানী ক্ষমতার দিকেও ছিল তার ঝোঁক। ভারতের সাথে বাণিজ্য করবে, অর্থনীতিকে ভারতের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে নয়, এই ছিল শেখ মুজিব।

শেখ সাহেবের সময়কার বিদ্বৎ ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞেস করুন, তারাই বলবেন, শেখ ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী। ভারত বাংলাদেশের মতো জাতীয়তাবাদী একটি দেশের উত্থান চাইতে পারে না। কংগ্রেস সরকার চেয়েছিল পাকিস্তানের ভাঙন, বাঙালি মুসলমানরা চেয়েছিল বাংলাদেশের পত্তন। উদ্দেশ্য ভিন্ন, কিন্তু কাজটা প্রায় এক। তাই এক সাথে পাকিস্তানীদের হঠাবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল আমাদের। শেখ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে চলে গেলেন পাকিস্তানী কারাগারে, তাজুদ্দীন সাহেবদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও স্বাধীনতার ঘোষণাও দিলেন না, যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করলেন না।

কারণ ভারতের সাহায্যে যুদ্ধ করতে হবে, এটা শেখ কল্পনাও করতে পারতেন না। পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষণা দিলেন, আমি যেদিন ভারতীয় বাহিনীকে বলব চলে যেতে, সেদিনই তারা চলে যেতে বাধ্য। তাই হল। তিন বছরের মধ্যেই তিনি আরও চলে গেলেন আলজিয়ার্সের ইসলামী সম্মেলনে, পাকিস্তানের ভুট্টোকে আনলেন ঢাকায়। ভারত কেন এত সহ্য করবে! ইন্দিরা গান্ধী মহাফাপড়ে পড়লেন শেখকে নিয়ে। সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই আওয়ামী সরকারের পতনের পিছনে ভারতের নীরব সমর্থন যে ছিল, সে কথা এখনো অনেকেই বলাবলি করে। তাজউদ্দিন সাহেব বলতেন, উদারনৈতিক মুসলমান হিসেবে আমাদের দুঃখের সময় দেয়া ইন্দিরার সাহায্য-সহযোগিতার কথা ভুলব না, কিন্তু তাই বলে আমি ভারতপ্রেমিক নই। রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের কথা স্পষ্ট করে পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক বলয় থেকে এদেশের বাঙালি-অবাঙালি জনগণকে আলাদা করে নিয়েছিলেন এবং সার্ক গঠন করে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকে ভারতের সমমর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। ভাসানী তো একলাই ভারতের সাথে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি বন্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন। মেজর জলিল তো সীমান্তে বুক চেতিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন আমাদের সম্পদ পাচারের বিরুদ্ধে। এ সব জাতীয়তাবাদী ভারত সহ্য করবে কেন? এই জাতীয়তাবাদী স্ফুলঙ্গ নিয়েই গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। বাংলাদেশের ক্ষমতায় এ দলটি আসুক—ভারত তাতো চাইবে না।

এর আগেও তা চাইত না। কিন্তু এই না চাওয়ার মধ্যে কিছুটা রাখঢাক ছিল। এখন সেটাও নেই। তারা প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী বলে সম্বোধন করে, ডিপি ধরের মতো সকল কিছুতেই নাক গলায়, গঙ্গার পানি দশ ঢোক গিলে এক ঢোক ছাড়ে, পার্বত্য চট্টগ্রাম লারমাদের কাছে ইজারা দিতে বাধ্য করে, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোকে দমন করতে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য নিতে চায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতীয় স্বার্থের আজ্ঞাবহ করতে চায়। এ সবকিছুর প্রশ্রয় দেয় বর্তমান সরকার, আর প্রতিবাদ করে জাতীয়তাবাদী দল। ভারত তাই এই দলটিকে সহ্য করে না।

বাংলাদেশের প্রাগ্রসর কবি মরহুম আহমদ ছফা বলেছেন, ভারত এখন কোনো জুজু নয়। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার মূর্তিমান উপস্থিতি। পুরোনো আওয়ামী সমর্থকরা এখন বলতে বাধ্য হচ্ছেন, এ সরকার শেখের আওয়ামী লীগের সরকার নয়, হাসিনার ও ভারতের। ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন বলছেন, পাকবাহিনী গণহত্যা করেছে, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতিকে হত্যা করছে। এই প্রেক্ষাপটেই বেগম খালেদা জিয়া আজ এক দফার আন্দোলনের সূচনা করেছেন। শেখ সাহেব বেঁচে থাকলে হাসিনার বিরুদ্ধে খালেদা আহূত দেশ ও জনগণকে বাঁচানোর এই সংগ্রামেই শরিক হতেন। ভারতের নেতৃবৃন্দ শেখকে বাঁচতে দেয়নি, হাসিনাকে দিয়ে তাদের ষোলআনা স্বার্থ উদ্ধার করবে, কিন্তু গণরোষ থেকে রক্ষা করবে না। তারপরও হাসিনা যেহেতু এ মাটির সন্ততি, তার সুমতি ও দীর্ঘায়ু কামনা করা আমাদের ফরজ, তাকে রক্ষা করবে বাংলাদেশেরই জনগণ—এই আশায় যে তার বর্তমান ভুল তিনি কোনো না কোনো দিন হয়ত শুধরে নিবেন। হাসিনার দল বিসমিল্লাহ বললেই সাম্প্রদায়িক বলে ঘৃণা প্রকাশ করতেন। এখন হাসিনা বিসমিল্লাহ ছাড়া কথাই বলেন না। হাসিনার পাসপোর্টে জাতীয়তার ঘরে নিশ্চয়ই বাংলাদেশী লেখা আছে, এম্বারকেশন কার্ডেও তিনি তাই লিখেন। জিন্দাবাদও কয়েকদিন পর লবজে তুলে নিবেন এবং ইতিমধ্যে একদফা আলোচনায়ও বসতে চান। সময় যতই এগোবে, তাকে খালেদার উপদেশ শুনতেই হবে, নয় তাকে বোঝাপড়া করতে হবে গণরোষের সাথে। যেমন করেছিলেন জেনারেল এরশাদ। এই সময়ানুগ একটি কাজের জন্য জনগণ তাকে আবার সম্মানের আসন পেতে দিয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন তার দুর্বলতা ছিল গণতন্ত্রের প্রতি এবং সেই সুবাদে আপনার প্রতি। ক্ষমতায় এসে যখন বিরোধী দলের প্রতি আপনার ঘৃণা এবং বেগম জিয়ার প্রতি আপনার ব্যক্তিগত আক্রোশ জনগণ দেখতে পায়, তারা তখন বুঝে নেয়, আপনি গণতন্ত্রের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাশীল নন। ভারতের অশান্তি বাংলাদেশের ঘাড়ে যখন তুলে নিতে চান, তখন জনগণ এইটুকু বুঝে নেয়, আপনার ক্ষমতায় আসার পিছনে তাদের কতটা বা কতপ্রকার সাহায্য আপনি নিয়েছিলেন। এই সাহায্য নেয়ার কারণেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ হয়ত আপনাকে ভয় করে না, কিন্তু বাংলাদেশের জনগণকে যথেষ্ট ভয় করে। বিশেষ করে বাঙালি বিচ্ছুগুলো কি ভয়ংকর হতে পারে তা এখনো ভুলে যায়নি তারা।

বাংলাদেশের জনগণ এতদিন যা নীরবে সহ্য করেছে, এখন তা সরবে প্রতিবাদ করবে। এ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কার বিরুদ্ধে যাবে-তাও সময়ই বলে দিবে অতিদ্রুত। জিয়ার জাতীয়তাবাদীদের এই পুনরুত্থানে শেখ সাহেবের আত্মাও আজ সন্তুষ্ট।

www.pathagar.com

আওয়ামী দু:শাসনের শ্বেতপত্র

সপ্তম অধ্যায়

গঙ্গা পানি চুক্তি

ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হাই: বাংলাদেশে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীসমূহ ও এদের প্রতিক্রিয়া

শাহাদাত হোসেন খান: কার স্বার্থে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি

লে: ক: (অব:) এম এ লতিফ খান: বাংলাদেশের বন্যা ও ফারাক্কা বাঁধ তৈরীর অসারতা

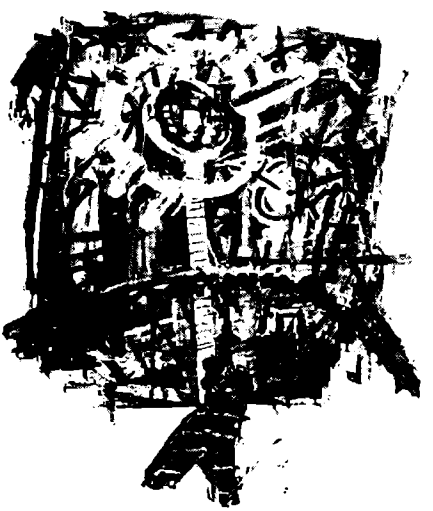

www.pathagar.com

ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হাই

বাংলাদেশে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীসমূহ ও তাদের প্রতিক্রিয়া

ডেটলাইন ঃ ১২ জুলাই ২০০১

ভূমিকা : ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলোই এদেশের বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের কোনো অংশকেই নদী ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। এ সমস্ত আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা প্রধান। এ সমস্ত নদী একাধিক পথে একটি অন্যটির সাথে যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশকে যদি একটি মানব শরীর হিসেবে কল্পনা করা যায় তবে এদেশের নদীগুলো তার শিরা-উপশিরা। ভুটান, চীনের তিব্বত, ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এ সমস্ত নদী প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই সংযুক্ত নদীগুলোর বিরাট অববাহিকা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদীর অববাহিকা আয়তনে বিশ্বে প্রথম। এই বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত বার্ষিক গড় পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ১২৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং এর নিষ্কাশন এলাকার পরিমাণ ১.৭৫ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা অববাহিকায় প্রায় ৫৬০ মিলিয়ন লোক বসবাস করে। এর মধ্যে গঙ্গা অববাহিকায়ই বাস করে ৪২৮ মিলিয়ন। ব্রহ্মপুত্র এলাকায় বাস করে ৮৩ মিলিয়ন এবং মেঘনা অববাহিকায় ৪৯ মিলিয়ন।

ফারাক্কা বাঁধ

গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পর হতে ভারত উত্তর প্রদেশ ও বিহারে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পে গঙ্গা নদীর পানি প্রত্যাহার করে আসছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে বাংলাদেশে। বিগত ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাথে গঙ্গার পানি চুক্তি করে। এই চুক্তির পর ফারাক্কার নিম্নে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীতে পানির তল কমে গেছে, ভূমির পানির তল নিচে নেমে গেছে (গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল), গাছপালা মরে যাচ্ছে। নলকূপে খাওয়ার পানি পাওয়া যাচ্ছে না। নদী ভাঙনে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে ও নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার দারুণ ক্ষতি হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়গুলোর তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হবে।

তথ্যভিত্তিক আলোচনার পূর্বে আসুন আমরা প্রথমে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক নদী সম্বন্ধে সম্যক অবগত হই।

গঙ্গা পানি

হিমালয় পর্বতে গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ ভাগীরথী নদীর উৎপত্তিস্থল। উল্লেখ্য, হিমালয়ে অলকানন্দা এবং ভাগীরথী এই দুইটি ধারার মিলিত স্রোতের নাম গঙ্গা। এই

www.pathagar.com

দুই ধারার মধ্যে অলকানন্দা ধারাই প্রধান। হিমালয়ে নন্দাদেবী শৃঙ্গের (উচ্চতা ৭৮১৭ মিটার) ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে তিব্বত সীমান্তের কাছে গুরওয়ালা নামক স্থানে অলকানন্দা উৎপত্তি হয়েছে। এই স্থলটি সিন্ধু নদ ও ব্রহ্মপুত্র (শান প্রো) নদের উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি। ভাগীরথী এবং অলকানন্দা ভারতের উত্তর প্রদেশের তেহরী গুরওয়াল জেলার গংগোত্রীর (উচ্চতা ৭০১০ মিটার) কাছে দেবপ্রয়ান নামক স্থানে গঙ্গা মিলিত হয়েছে এবং এই মিলিত স্রোত গঙ্গা নামে হরিদ্বারের কাছে ভারতের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে। এরপর গঙ্গা হরিদ্বারের এলাহাবাদ পর্যন্ত ৭২০ কিলোমিটার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের উত্তর কাশী হতে আরম্ভ করে পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত হিমালয়ের দক্ষিণে সমস্ত উত্তর ভারতের ওপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গার বাম এবং ডান তীরে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে কিছুসংখ্যক উপনদী যুক্ত হয়েছে। রামডাঙ্গা, গোমতী, ঘাগরা, গন্ধক, রামগতি ও কুশী বামতীরের প্রধান উপনদী। অন্যদিকে ইয়ামোনা ও সোনাডাঙ্গা তীরের প্রধান প্রধান উপনদী। মহানন্দা বাংলাদেশের গঙ্গার একমাত্র উপনদী। এটা রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী নামকস্থানে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নেপালে উৎপন্ন ঘাগড়া কর্নালী, গন্ধক এবং কুশী উপনদী, শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে আসছে। কুশী উপনদীর মোহনার পর গঙ্গা পূর্বদিকে ৪০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজমহল পাহাড়ে এবং রাজশাহী জেলায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। হরিদ্বার হতে রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গার অবস্থাকে সমভূমি অবস্থা এবং রাজমহল হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অবস্থাকে ব-দ্বীপ অবস্থা বলা হয়। ফারাক্কা হতে ১৬ কিলোমিটার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা ১৪০ কিঃমিঃ ভারত এবং বাংলাদেশের সীমারেখা হিসেবে প্রবাহিত হয়েছে। ফারাক্কা বাঁধের ভাটি থেকে গঙ্গা দু'টি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে একটি ধারা পূর্বদিকে পদ্মা নামে বাংলাদেশের রাজশাহীতে প্রবেশ করে আরও ২৪০ কিঃমিঃ প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দ নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে যুক্ত হয়েছে। গোয়ালন্দ থেকে আরও ১০৪ কিঃমিঃ প্রবাহিত হয়ে এটা পদ্মা নামে চাঁদপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। এই মেঘনা আরও ২১৮ কিঃমিঃ প্রবাহিত হয়ে ভোলার কাছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। বরাল, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব ইত্যাদি গঙ্গার শাখা নদী।

উৎস থেকে গঙ্গা নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫২৮ কিঃমিঃ। গঙ্গা নদীর নিষ্কাশন এলাকার আয়তন প্রায় ১০,৭০,০০০ বর্গ কিঃমিঃ। এর মধ্যে ৮,৬০,০০০ বর্গ কিঃমিঃ ভারতে, ১,৪০,০০০ বর্গ কিঃমিঃ নেপালে এবং ৪৬,০০০ বর্গ কিঃমিঃ বাংলাদেশে অবস্থিত। বাকি এলাকা তিব্বতে অবস্থিত। বাংলাদেশে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে গঙ্গা নদীর বার্ষিক গড় পানি প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ৩৮৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং ফারাক্কায় প্রতি সেকেন্ডে ৩৮০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। গঙ্গা অববাহিকায় চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬৬ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ভারতে এই ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬০ মিলিয়ন হেক্টর। গঙ্গা অববাহিকার নিম্নাঞ্চল তুলনামূলকভাবে খুব বেশী ঘনবসতিপূর্ণ। আনুমানিক ৪৩০ মিলিয়ন লোক গঙ্গা অববাহিকায় বাস করে।

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্র নদী

হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গে প্রায় ৫১৫০ মিটার উচ্চে তিব্বতের মানস সরোবরে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি। এটা চীনের তিব্বত অঞ্চলে অবস্থিত, যার স্থানীয় নাম শাংপো। উৎপত্তির পর ব্রহ্মপুত্র পূর্বদিকে ১৭০০ কিঃমিঃ হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গের সমান্তরাল এবং তিব্বতের দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের সাথে বেশ কয়েকটি উপনদী যুক্ত হয়েছে। এরপর ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের উত্তর-পূর্ব দিকে গায়ালা পাড়ি পর্বত এবং নামকি বারওয়া পর্বতের মধ্যদিয়ে (উচ্চতা ৭৭৫৬ মিঃ) প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরে প্রথমে সিয়াং এবং পরে দিহাং নামে ভারতের অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করেছে। সাফিয়া শহরের কাছে দিবাং ও লোহিট দুটি উপনদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে প্রবাহিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদী আসামের ভিতর দিয়ে ৭২৫ কিঃমিঃ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহের পথে উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে বেশ কয়েকটি উপনদী এর সাথে যুক্ত হয়েছে। উত্তর দিকের উপনদীর মধ্যে সোবানসিড়ি, কামেং, ধানসিঁড়ি, মানস, চম্পামতী এবং সঙ্কোশ প্রধান। দক্ষিণাংশে প্রধান উপনদীগুলো হচ্ছে নোয়া দিহিং, বুড়িদিহিং, দিসেং, ধানসিঁড়ি এবং কোপিলি। ভারতে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী প্রচুর পলিমাটি বহন করে এবং এ নদীর প্রশস্ত অনেক বেশী, সর্বাধিক ১৮ কিঃমিঃ। তবে স্থায়ী তীরের কাছে নদী বেশ সরু পথে প্রবাহিত হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদী আসামের গোয়ালপাড়ার কাছে গারো পাহাড়ের ওপর দিয়ে কুড়িগ্রামের মাজহিয়ালীতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গাইবান্ধা, বগুড়া, পাবনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল জেলায় ২৭০ কিঃমিঃ প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দ নামক স্থানে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের এই অংশে অনেক উপনদী যুক্ত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দুধকুমার, ধরলা এবং তিস্তা প্রধান। কুড়িগ্রাম হতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত এই নদীর নাম যমুনা। ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে প্রবেশের পর কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ১৮৮৭ সালে তিস্তা নদীতে এক প্রবল বন্যার ফলে ব্রহ্মপুত্র নদ তার গতিপথ বদলিয়ে যমুনার দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে উক্ত নদী ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নামে পরিচিতি লাভ করে। গোয়ালন্দের পর ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার মিলিত স্রোত ১০৫ কিঃমিঃ দক্ষিণ দিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বতের উৎপত্তিস্থল থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত প্রায় ২৮১৭ কিঃমিঃ লম্বা। এর মধ্যে ১৬২৫ কিঃমিঃ তিব্বতে, ৯১৮ কিঃমিঃ ভারতে এবং বাকি ২৭৪ কিঃ বাংলাদেশে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদীর মোট নিষ্কাশন এলাকার আয়তন ৫,৮০,০০০ বর্গ কিঃমিঃ। এর মধ্যে ২,৯৩,০০০ বর্গ কিঃমিঃ তিব্বতে, ১,৯৫,০০০ বর্গ কিঃমিঃ ভারতে, ৪৫,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ ভুটানে এবং ৪৭,০০০ বর্গ কিঃমিঃ বাংলাদেশে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের বার্ষিক গড় পানি প্রবাহ বাহাদুরাবাদে প্রতি সেকেন্ডে ৬২০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় ৯.৩ মিলিয়ন হেক্টর, যার অধিকাংশই ভারত এবং বাংলাদেশে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রায় ৮৬ মিলিয়ন লোক বাস করে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক বাস করে বাংলাদেশে। এই নদীতে পলি প্রবাহের পরিমাণ খুব বেশী। দৈনিক সর্বোচ্চ ৮.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রবাহের হিসাব করা হয়েছে। বার্ষিক স্বাভাবিক পলি প্রবাহের পরিমাণ প্রায় ৭৩৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

www.pathagar.com

মেঘনা নদী

মেঘনা বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী এবং পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলোর অন্যতম। বারাক নদী মেঘনার প্রধান স্রোত। আসামের মনিপুর পাহাড়ে ২৯০০ মিটার উঁচুতে উৎপন্ন হয়ে ২৫০ কিঃমিঃ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিলেট অমলসিদ সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এখানে বারাক, সুরমা এবং কুশিয়ারা নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উভয় স্রোত বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সুরমা সিলেটের উত্তরাংশে প্রবাহিত হয়েছে। এই অংশে পাহাড় থেকে অনেক উপনদী সুরমার সাথে যুক্ত হয়েছে। সুরমা সুনামগঞ্জ প্রবেশ করেছে এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মদনী পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। মারকুলিতে কুশিয়ারা সুরমা নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত কালনী নাম ধারণ করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। চলার পথে সুরমা নদী উত্তর দিক হতে বেশ কয়েকটি স্রোতধারা এসে মিশেছে। কুলিয়ারচরের কাছে গোড়া ও টিয়া নদী কালনী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং এখান থেকে মেঘনা নামে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। কুলিয়ারচর এবং চাঁদপুরের মধ্যে ডান তীরে তিতাস ও গোমতী এবং বাম তীরের লক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা মোহনার সাথে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মেঘনা নদী দুইটি অংশে বিভক্ত। কুলিয়ারচর হতে ষাটনল পর্যন্ত আপার মেঘনা এবং ষাটনল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত লোয়ার মেঘনা নামে পরিচিত। ষাটনলের কাছে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বদিক হতে আগত মেঘনা নদীর পানি স্বচ্ছ ও নীল এবং পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত ধলেশ্বরীর পানি ঘোলা। এই দুই নদীর ধারা কিঃমিঃ পর কিঃমিঃ স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে স্বতন্ত্র দুই রঙের পানি। একটার সাথে অন্যটি মিলছে না। ষাটনলের ১৬ কিঃমিঃ ভাটিতে চাঁদপুরের কাছে পদ্মা ও মেঘনার মিলিত স্রোত মেঘনা নামে মিলিত হয়েছে এবং চাঁদপুর থেকে লোয়ার মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। উৎস থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত মেঘনা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৯০০ কিঃমিঃ। আমলসিদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ৬৭০ কিঃমিঃ। ভারতে মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য ৫৬৪ কিঃমিঃ। কিন্তু এর বিস্তার ওপরের অংশ থেকে নিম্নাংশে অনেক বেশী। ভৈরব বাজারে এ নদীর বিস্তার ১ কিঃমিঃ, ষাটনলের কাছে ৫ কিঃমিঃ, চাঁদপুরের কাছে ১১ কিঃমিঃ এবং মোহনার কাছে ইলসা, তেঁতুলিয়া এবং শাহবাজপুরে ৪০ কিঃমিঃ।

মেঘনায় বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী এবং পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলোর অন্যতম। বারাক নদী মেঘনার প্রধান স্রোত। আসামের মনিপুর পাহাড়ে ২৯০০ মিটার উঁচুতে উৎপন্ন হয়ে ২৫০ কিঃমিঃ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিলেট অমলসিদ সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এখানে বারাক, সুরমা এবং কুশিয়ারা নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উভয় স্রোত বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সুরমা সিলেটের উত্তরাংশে প্রবাহিত হয়েছে। এই অংশে পাহাড় থেকে অনেক উপনদী সুরমার সাথে যুক্ত হয়েছে। সুরমা সুনামগঞ্জ প্রবেশ করেছে এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মদনী পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। মারকুলিতে কুশিয়ারা সুরমা নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত কালনী নাম ধারণ করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। চলার পথে সুরমা নদী উত্তর দিক হতে বেশ কয়েকটি স্রোতধারা এসে

www.pathagar.com

মিশেছে। কুলিয়ারচরের কাছে গোড়া ও টিয়া নদী কালনী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং এখান থেকে মেঘনা নামে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। কুলিয়ারচর এবং চাঁদপুরের মধ্যে ডান তীরে তিতাস ও গোমতী এবং বাম তীরের লক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা মোহনার সাথে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মেঘনা নদী দুইটি অংশে বিভক্ত। কুলিয়ারচর হতে ষাটনল পর্যন্ত আপার মেঘনা এবং ষাটনল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত লোয়ার মেঘনা নামে পরিচিত। ষাটনলের কাছে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বদিক হতে আগত মেঘনা নদীর পানি স্বচ্ছ ও নীল এবং পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত ধলেশ্বরীর পানি ঘোলা। এই দুই নদীর ধারা কিঃমিঃ পর কিঃমিঃ স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েচে স্বতন্ত্র দুই রঙের পানি। একটার সাথে অন্যটি মিলছে না। ষাটনলের ১৬ কিঃমিঃ ভাটিতে চাঁদপুরের কাছে পদ্মা ও মেঘনার মিলিত স্রোত মেঘনা নামে মিলিত হয়েছে এবং চাঁদপুর থেকে লোয়ার মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। উৎস থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত মেঘনা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৯০০ কিঃমিঃ। আমলসিদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ৬৭০ কিঃমিঃ। ভারতে মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য ৫৬৪ কিঃমিঃ। কিন্তু এর বিস্তার ওপরের অংশ থেকে নিম্নাংশে অনেক বেশী। ভৈরব বাজারে এ নদীর বিস্তার ১ কিঃমিঃ, ষাটনলের কাছে ৫ কিঃমিঃ, চাঁদপুরের কাছে ১১ কিঃমিঃ এবং মোহনার কাছে ইলসা, তেঁতুলিয়া এবং শাহবাজপুরে ৪০ কিঃমিঃ।

মেঘনায় মোট নিষ্কাশন এলাকার আয়তন ৮৫,০০০ বর্গ কিঃমিঃ। এর মধ্যে ৪৯,০০০ বর্গ কিঃমিঃ ভারতে এবং ৩৬,০০০ বর্গ কিঃমিঃ বাংলাদেশে অবস্থিত। ভৈরব বাজারে মেঘনা নদীর বার্ষিক গড় পানি প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। এর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৪ মিলিয়ন হেক্টর এবং লোকসংখ্যা ৪৯ মিলিয়ন। লোকসংখ্যার অধিকাংশ বাংলাদেশে বাস করে।

ভারতের সাথে গঙ্গার পানি চুক্তি

আন্তর্জাতিক গঙ্গা নদীর ওপর অবৈধভাবে ভারত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য এক বিরাট বাধাস্বরূপ। এমনকি এই বাঁধ নির্মাণের পূর্বে যে সমস্ত উন্নয়ন কাঠামো নির্মিত হয়েছিল সেগুলোর সুফল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফারাক্কা নির্মাণের পর প্রতিবছর নভেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত গঙ্গা নদীর পানির লেবেল নিচে নেমে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের ওপর ফারাক্কা বাঁধের কুফল নিয়ে ভারতের সাথে এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ আলাপ-আলোচনা করেছে। আন্তর্জাতিক মহলের চাপের ফলে ভারত ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের সাথে গঙ্গার পানি চুক্তি করেছিল। ১৯৭৭ সালে ৫ বছরের জন্য এই চুক্তি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ পানির গ্যারান্টি অর্থাৎ নিশ্চয়তাসহ ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরে ৩ বছর এই চুক্তি নবায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর এই চুক্তি ভারত নবায়ন না করার ফলে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বিপর্যয়ের কথা উপস্থাপন করেন। আন্তর্জাতিক গঙ্গা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে ভারতের একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের করুণ অবস্থার কথা তিনি ঐ অধিবেশনে তুলে ধরেন। শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রত্যাহার করে এবং বর্ষাকালে গঙ্গার অতিরিক্ত পর্যাপ্ত পানি বাংলাদেশে ছেড়ে দিয়ে ভারত কর্তৃক কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশ ধ্বংস করার কথাও জাতিসংঘের ঐ অধিবেশনে দেশনেত্রী জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আরও তুলে ধরেন যে, ফারাক্কা বাঁধ চালু করার সময় গঙ্গার পানি বণ্টনের যে অঙ্গীকার ভারত করেছিল, তা তারা বাস্তবায়ন করেনি। তিনি ঐ অধিবেশনে জাতিসংঘকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সুতরাং বাংলাদেশের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গঙ্গার পানি বণ্টনের একটা ফয়সালা করার জন্য জাতিসংঘ যেন ভারতকে চাপ প্রদান করে। ভারত তাদের নিজেদের সুবিধামত একটা ব্যবস্থা করার চিন্তা করে এবং ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে ভারত সরকার তাদের বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের জন্য ক্ষমতায় বসায়। বাংলাদেশের সাথে গঙ্গার পানি সমস্যার বিষয়ে জাতিসংঘের চাপ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভারত এদেশের বর্তমান সরকারের সাথে ১৯৯৬ সালে তড়িঘড়ি করে গঙ্গার পানি চুক্তি করে। এই চুক্তিতে পানির গ্যারান্টি ক্লজ নেই। অর্থাৎ গঙ্গা নদীতে পানির পরিমাণ সাপেক্ষে বাংলাদেশকে পানি দেয়া হবে। সুতরাং গঙ্গার পানি চুক্তি করে কৌশলে ভারত জাতিসংঘের সমালোচনা ও চাপ হতে অব্যাহতি পেল। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

ভারত সরকার কর্তৃক ফারাক্কার উপরের অংশে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করার ফলে ঃ

১। ফারাক্কার নিম্নাংশে বাংলাদেশে কোনো নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। পূর্বে নির্মিত অবকাঠামোগুলো অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

৩। গঙ্গা নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে খুলনা অঞ্চলের মিল-কারখানাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং মিঠা পানির অভাবে এগুলো চালানো ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়েছে।

৪। গঙ্গা নদী এবং গড়াই নদীতে মৎস্য চাষ কমে গিয়েছে এবং নৌ চলাচল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৫। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী গাছপালা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৬। প্রতিবছর গঙ্গাসহ সকল নদ-নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

৭। পানির অভাবে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পসহ কৃষি প্রকল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যাচ্ছে না এবং বর্ষকালে অতিরিক্ত পর্যাপ্ত পানির ফলে এদেশে বন্যার প্রকোপ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

তথ্যভিত্তিক আলোচনা

মেঘনার ওপর বাংলাদেশের প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি নির্ভরশীল। ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি চুক্তি মোতাবেক ফারাক্কায় পানি বণ্টনের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য ১৯টি জেলার ৫টি থানায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, পরীক্ষাধীন এলাকায় ১৯৯৮ সালে গঙ্গার পানি কমে যাওয়ার ফলে ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য কম উৎপন্ন হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ২১৭.০৩ মিলিয়ন টাকা।

১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ফারাক্কা বাঁধের উপরাংশে গঙ্গা নদীর পানি প্রত্যাহারের পূর্বে ফারাক্কার পানির লেবেল ছিল ৬.৭১ মিটার (পিডব্লিউডি) এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ঐ স্থানে পানির লেবেল পাওয়া গেছে ৫.১৭ মিটার অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানির লেবেল ফারাক্কার নিম্নে ৬.৭১-৫.১৭=১.৫৪ মিটার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার ফুটের অধিক নিচে নেমে গেছে। ফলে ঐ নদীর লবণাক্ততা বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবেশ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছে জনস্বাস্থ্য। ফলে পানি প্রত্যাহারের পূর্বে পশোর নদীতে লবণাক্ততা যেখানে খুলনার উজানে ১৪৭ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৫০০ মাইক্রোমৌস ছিল সেখানে এই লবণাক্ততা ২৯৭ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। খুলনা হাসপাতালের ঘাটে ১৯৯৮ সালের মে মাসে সর্বাধিক লবণাক্ততার পরিমাণ ছিল ১২,০০০ মাইক্রোমৌস এবং ফারাক্কার বাঁধ নির্মাণের পূর্বে লবণাক্ততার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮০০ মাইক্রোমৌস। লবণাক্ততার পরিমাণ এবং এর বিস্তৃতি লাভের একমাত্র কারণ হল গঙ্গার পানি প্রত্যাহার এবং ফারাক্কার নিম্নাংশে গঙ্গা নদীর পানির লেবেল কমে যাওয়ার ফল। ফলে খুলনার আশপাশের সকল শিল্প, কলকারখানাগুলো অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নদীতে পানি প্রবাহের তারতম্যের ওপর নদীর গঠন প্রণালী পরিবর্তন হয়ে যায়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় গঙ্গা নদীতে ফারাক্কার বাঁধ নির্মাণ এবং ফারাক্কার উপরাংশে পানি প্রত্যাহারের ফল হতে। ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থল হতে মাথাভাঙ্গা পর্যন্ত ১৮টি নির্দিষ্ট স্থানে ১৯৭৪ সাল হতে অদ্যাবধি গঙ্গা নদীতে প্রতি বছর ক্রসসেকশন নিয়ে এবং ঐ ক্রসসেকশনগুলো সুপার ইমপোজ করে অর্থাৎ একই স্থানে নেয়া প্রতি বছরের ক্রসসেকশনগুলো একটির ওপর অন্য অঙ্কন করে দেখা গেছে যে, গঙ্গা নদীর তলদেশ অনেক ভরাট হয়ে গেছে। সাথে সাথে একই স্থানে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে নদীর পানি প্রবাহ ১৯৭৪ সাল হতে মেপে দেখা গেছে যে, নদীর পানি প্রবাহ অনেক কমে গেছে। ফারাক্কার উপরাংশে পানি প্রবাহের ফলে ফারাক্কার নিম্নাংশে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে।

তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পাওয়া গেছে যে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে ফেব্রুয়ারি ১৫ তারিখ হতে ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ পানির প্রবাহ সর্বনিম্নে পৌঁছে। ১৯৯৮ সালে সেই পানির সর্বনিম্ন প্রবাহ হচ্ছে ১১৮৮ কিউসেক। ফারাক্কায় বাঁধ নির্মাণের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে একই সময়ে পানি প্রবাহের সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল ২২১৩

www.pathagar.com

কিউসেক। অর্থাৎ পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে কমে গেছে ২২১৩-১১৮৮=১০২৫ কিউবিক মিটার। ফারাক্কা বাঁধের উপরাংশে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের ফলে কেবল গঙ্গা নদীর সারফেস ওয়াটার এবং পানি প্রবাহের পরিমাণই কমেনি, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার লেবেলও কমে গেছে। গঙ্গা নদীর অববাহিকায় ১৯৭৮ সাল হতে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ১৪৮টি পরীক্ষাধীন পিজুমেট্রিক কূপ বসিয়ে এগুলোর পানির লেবেল মেপে দেখা গেছে যে, গঙ্গা নদীর পানি ফারাক্কা বাঁধের উপরাংশে একতরফাভাবে প্রত্যাহারের ফলে ফারাক্কার নিম্নাংশে গঙ্গা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ভূমির নিচের পানির লেবেল ১৯৭৮ সালের তুলনা ১৯৯৮ সালে অনেক কমে গেছে। উদাহরণস্বরূপ রাজশাহী জেলার নাকূলে কূপ নম্বর আর ১২২-এর কথা উল্লেখ করা হল। শুষ্ক মৌসুমে এই কূপের সর্বনিম্ন লেবেল ১৯৭৮ সালের তুলনায় ১৯৯৮ সালে ২১.৯৭ মিটার কমে গেছে (মাপ পেরাপেট হতে)। সমগ্র রাজশাহী জেলায় ১৯৭৮ সালের তুলনায় ১৯৯৮ সালে নলকূপগুলোর পানির লেবেল গড়ে সর্বাধিক ১০.৫৮ মিটার নিচে নেমে গেছে।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের রেকর্ড হতে দেখা গেছে যে, ফারাক্কা বাঁধের উপরাংশে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের ফলে ১৯৭৮ সালের তুলনায় ১৯৯৮ সালের শুষ্ক মওসুমে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে পানির লেবেল ৫.১৭ মিটার (পিডব্লিউ) কমে গেছে। ফলে এই প্রকল্পের বড় পাম্পগুলোর স্ট্রেটিক হেড বেড়ে যাওয়াতে প্রকল্পে পানি সেচ দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে প্রকল্পের ১৪১৭০০ হেক্টর জমির ফলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যেহেতু এদেশের গঙ্গা নদীর পানির লেবেল দারুণভাবে কমে গেছে, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে, সেহেতু নদীতে মাছের উৎপাদন কমে গেছে। তাছাড়া নদীর নাব্যতাও কমে যাচ্ছে এবং গঙ্গা অববাহিকায় গাছপালার চরম ক্ষতি হচ্ছে। উল্লেখ্য, শুষ্ক মৌসুমে পানি পান করার জন্য নলকূপগুলোতেও পানি থাকে না।

গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ, গঙ্গা নদীর অববাহিকার সারফেস ওয়াটার ও গ্রাউন্ড ওয়াটার লেবেল নিচে নেমে যাওয়ার ফলে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে। একই কারণে দেশের পরিবেশও দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে গঙ্গা নদীতে পানির লেবেল কমে যাওয়ার ফলে আমাদের দেশের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে গঙ্গার পানিচুক্তি বাতিল করে শুষ্ক মৌসুমে এ দেশের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি পাওয়ার ব্যবস্থা গ্যারান্টি ক্লজে উল্লেখ রেখে নতুনভাবে গঙ্গার পানি চুক্তি করা। কারণ নির্ধারিত পানির পরিমাণ গ্যারান্টি ক্লজে না থাকলে ফারাক্কা বাঁধের উপরাংশে অবৈধভাবে পানি প্রত্যাহার রোধ করা কোনো মতেই সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমাদের দেশের স্বার্থে অতিসত্বর গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

শাহাদত হোসেন খান

কার স্বার্থে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি?

ডেটলাইন ঃ ১৬ মে ২০০১

বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি করে খুশিতে হাততালি দিচ্ছে। আর বারংবার বলছে যে, এটি তাদের একটি বিরাট সাফল্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ঠিকই, তবে এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পানি প্রাপ্তির কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, গঙ্গায় পানিপ্রবাহ ৫০ হাজার কিউসেকের কম হলে দু'দেশের সরকার আলোচনায় বসে নিজ নিজ হিস্যা ঠিক করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ বছর মেয়াদি স্থায়ী চুক্তিতে বাংলাদেশের প্রাপ্য হিস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। প্রতিবছরই দুদেশকে আলোচনায় বসতে হবে এবং কোন দেশ কী পরিমাণ পানি পাবে তা ঠিক করতে হবে। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ না থাকায় ভারত বাংলাদেশকে তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করার একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে। ভারত প্রতিবছরই বলছে যে, গঙ্গায় পানিপ্রবাহ ৫০ হাজার কিউসেকের নিচে নেমে গেছে। তাই ফারাক্কা দিয়ে পানি ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না। ভারতের এ বক্তব্য প্রতারণাপূর্ণ জেনেও বাংলাদেশ কিছুই করতে পারছে না। কারণ বাংলাদেশ নিজেই নিজের ফাঁদে পড়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় হয়ত বাংলাদেশ এ বিষয়টি লক্ষ্য করেনি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এটি এড়িয়ে গেছে। তবে আমরা বলব যে, বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ সম্মতিতেই চুক্তিতে এ দুর্বল ধারাটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ধারাটি কেন সংযোজন করা হয়েছে তা বুঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাদামাটা দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে যে, ভারতের স্বার্থের জন্যই চুক্তিতে এরকম অস্পষ্টতা রাখা হয়েছে।

ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছে নিজের স্বার্থে এবং ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তিও করেছে তারই স্বার্থে। বাংলাদেশ গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করার পরিবর্তে ভারতের স্বার্থকেই নিশ্চিত করেছে। সর্বশেষ চুক্তির অস্পষ্টতার সুযোগে ভারত গঙ্গার পুরো পানি প্রত্যাহার করে নিলেও তাকে ঠেকানোর রাস্তা নেই। ঘটনা এখন সেদিকেই মোড় নিচ্ছে। বাংলাদেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। পদ্মায় পানি আসছে না। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচ দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে গরুর গাড়ি চলে, ছেলেমেয়েরা ফুটবল খেলে, এমনকি বাস-ট্রাকও চলে। ১৯৯৯ সালের ১১ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্ট দিয়ে মাত্র ৬৬৮ কিউসেক পানি প্রবাহিত হয়েছে। পানির অভাবে পদ্মা মরে যাচ্ছে। স্থানে স্থানে চর জাগছে। শুধু পদ্মার অববাহিকা নয়, গোটা দেশজুড়েই আজ হাহাকার রব উঠেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি সবচেয়ে শোচনীয়। পদ্মার পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় এর শাখা-প্রশাখা এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নদীর পানিপ্রবাহও হ্রাস পেয়েছে। এতে যে শুধু নাব্যতাই

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই নয়, এসব নদ-নদীতে মাছের আকালও দেখা দিয়েছে। উপকূলীয় নদীগুলোয় পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় এগুলোতে সমুদ্রের নোনা পানি প্রবেশ করছে। নোনা পানিতে বিস্তর ফসলের জমি বিনষ্ট হচ্ছে। যেসব জমি একদিন ছিল সুজলা-সুফলা আজ সেগুলোতে কোনো আবাদ নেই। অবস্থাপন্ন কৃষক ভিখারির পর্যায়ে নেমে এসেছে। ভোগান্তি এখানেই শেষ নয়। নোনা পানিতে পরিবেশে মারাত্মক দূষণ ঘটছে। নোনা পানিবাহিত বাতাসে মানুষের গায়ের চামড়াও কালো হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাভাবিক বর্ণের একজন মানুষের অবস্থা একদিন এমন ছিল না। এরা খুব সুখে দিন যাপন করত। নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। জমিতে ফসলও হত যথেষ্ট। কিন্তু আজ এসবই স্মৃতি। নদীতে লঞ্চ চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে আগুনমুখা নদীর কথা শুনলে মানুষের পিলে চমকে যেতো সে নদীতে আজ কোথাও হাঁটু অথবা কোমর পানি, লঞ্চ আটকে যায়। কেউ কেউ বলেন যে, আগামী ২০/৩০ বছরের মধ্যে আগুনমুখা, দাড়ছিড়া, ডিগ্রি প্রভৃতি নদীর ওপর দিয়ে বাস চলাচল করবে। বর্তমান পানি চুক্তি বহাল থাকলে তাদের আশংকা সত্যে পরিণত হবে। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ৩০ বছর মেয়াদি পানি বন্টন চুক্তি একটি শুভংকরের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার চুক্তি স্বাক্ষরের সাফল্যের জন্য যত ঢাকঢোলই পিটাক না কেন, আসলে এ চুক্তিতে বাংলাদেশের ভাগ্যকে ৩০ বছরের জন্য ভারতের কাছে জিম্মি করা হয়েছে। নয়াদিল্লীর করুণা হলে আমরা কিছু পানি পেলেও পেতে পারি। না পেলে 'আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে'-এর মতো নিষ্ফল আবেদন করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করণীয় থাকবে না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য পানি প্রাপ্তির গ্যারান্টি না থাকলেও ভারতের জন্য তাতে পানি প্রাপ্তির গ্যারান্টি রয়েছে। এ চুক্তিতে ভারতের জন্য শুষ্ক মৌসুমে অন্তত ৩৫ হাজার কিউসেক পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে ভারতের জন্য এরকম কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে ৫ বছর মেয়াদি যে চুক্তি হয় তাতে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির গ্যারান্টি ক্লজ সংযোজিত ছিল। ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকেও অনুরূপ গ্যারান্টি ক্লজ ছিল। কিন্তু '৯৬-এ গ্যারান্টি ক্লজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। তারপরও বলা হচ্ছে যে, এ চুক্তি বর্তমান সরকারের একটি বিরাট সাফল্য এবং এটি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি। আমরা যারা আওয়ামী লীগের ইতিহাস জানি তাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে, এ দলটির জন্মই হয়েছে ভারতের তাঁবেদারীর জন্য। ১৯৭১ সালে প্রবাসী মুজিবনগর সরকার ভারতের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদি একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিল। এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর তৎকালীন সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মূর্ছা গিয়েছিলেন। সৈয়দ নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি দিল্লীতে গিয়ে তার দেশের ভাগ্যকে বন্ধক রেখে এসেছেন। তাই তিনি মূর্ছা যান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে দিলেও তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভুল

www.pathagar.com

বুঝতে পারছেন না। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিতে দেশের বাঁচা-মরার প্রশ্নকে বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক ভুল করেও তিনি তা স্বীকার করছেন না। আর স্বীকার করবেনই বা কি করে? ভারতের আতিথ্যে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। আবার হয়ত ওরকম আতিথ্য গ্রহণের প্রয়োজন হতেও পারে, তাই তিনি ভাশুরের নাম মুখে আনছেন না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ভারতকে চেনে। এ কথা এদেশের একটি শিশুও বুঝে যে, বাংলাদেশকে মরার জন্য ভারত পদ্মার উজানে বাঁধ দিয়েছে। কিন্তু এ সহজ সত্যটি আওয়ামী লীগ বুঝতে চায় না। তারা ভারতের বন্ধুত্বে বিভোর। তবে তারা এ কথাটা একবারও ভেবে দেখে না যে, ভারত যে দেশকে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গলাটিপে হত্যা করতে চাইছে তারা সেই দেশেরই সন্তান এবং ফারাক্কার অভিশাপে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে গেলে তারাও বাদ যাবে না। ফারাক্কার প্রভাবে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের ৪ কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দিন দিনই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নামছে। এতে পানিতে আর্সেনিক দূষণ শুরু হয়েছে। ৮ কোটি মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। নৌপথ সীমিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর ফারাক্কার প্রভাবে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। যতই দিন যাবে এ ক্ষতির পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাবে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আমাদের পরিণতি যে কী হবে তা ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। তবে আমাদের পরিণতি যাই হোক আমরা কখনও ভারতের সম্প্রসারণবাদী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করব না। ভারত ভেবেছিল যে, ফারাক্কায় একতরফা পানি প্রত্যাহার করে নিতে পারলে এদেশের মানুষ বাঁচার জন্য'এক সময় তাদের সঙ্গে একীভূত হওয়ার খায়েশ প্রকাশ করবে। কিন্তু ভারতের এ অব্যক্ত ইচ্ছার মুখে ছাই দিয়ে ১৯৭৬ সালের ১৬ মে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী লক্ষাধিক মানুষের মিছিল নিয়ে ভারত সীমান্তের দোরগোড়ায় গিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে আমাদের মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে পারবে না। কারণ আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে মাথানত করি না।'

গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। কোনো আন্তর্জাতিক নদীতে কোনো একটি দেশ তার নিজের অংশে একতরফা পানি প্রত্যাহার অথবা বাঁধ নির্মাণ করতে পারে না। সমকালীন বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, আন্তর্জাতিক নদী আমাজান, মিসিসিপি, দানিয়ুব, রাইন, নীল নদ, জর্ডান নদী, তাইগ্রিস, ইউফেট্রিস, ভলগা, সিন্ধু, ইরাবতী প্রভৃতি নদ-নদীর পানি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। দু'একটি জায়গায় ছিটেফোঁটা বিরোধ দেখা দিতে না দিতেই সেগুলো মিটে গেছে। একমাত্র বিরোধ চলছে গঙ্গা নদীর পানি নিয়ে। গঙ্গা নদীর ওপর ভারত বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব মেনে নিতে পারছে না। উজানের দেশ বলে সে গঙ্গার পানিকে জিম্মি করছে। পাকিস্তান আমলে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ১১ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজমহল ও ভগবান গোলার মাঝ বরাবর ফারাক্কা নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে। তবে ভারত তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতার জন্য এ বাঁধ চালু করতে

www.pathagar.com

পারেনি। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি সমাঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারত ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সুযোগ পায়। তখন কথা ছিল যে, ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত মোট ৪১ দিন ফারাক্কা বাঁধ খোলা রাখা হবে এবং এ সময়ের মধ্যে ফিডার ক্যানেল দিয়ে হুগলী নদীতে ২০ হাজার কিউসেক পানি নেয়া হবে। আরও বলা হয়েছিল যে, কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষায় এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই যে পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালু করা হয় পরে আর তা বন্ধ করা হয়নি। ভারতের এ বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বিষয়টি জাতিসংঘে তোলা হয়। ভারত তখন বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় রাজি হয়। ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ভারতের সাথে ৫ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি হয়। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য গ্যারান্টি ক্লজ ছিল। এ ক্লজের আওতায় বাংলাদেশের জন্য ন্যূনতম ৩৪ হাজার কিউসেক পানি বরাদ্দ রাখা হয়। পক্ষান্তরে, ভারতের জন্য কোনো গ্যারান্টি ক্লজ ছিল না। এজন্য নয়াদিল্লী এ চুক্তি থেকে বারবার সরে যাবার চেষ্টা করেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত পরবর্তীতে একটি দু'বছর মেয়াদি এবং আরেকটি ৩ বছর মেয়াদি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এভাবে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ভারত গঙ্গার পানি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। পরে ভারত চুক্তি নবায়নে অস্বীকৃতি জানায়। বেগম খালেদা জিয়ার আমলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি নবায়ন করা হয়নি। চুক্তিহীন অবস্থায় কেটে যায় ৭/৮ বছর। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার ৬ মাসের মাথায় ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি হয়। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া। তদানীন্তন প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এ চুক্তির ঘোর বিরোধিতা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জীও বিরোধিতা করেছেন। তবে এখন এরা বিরোধিতা করছেন না। হয়ত ক্ষমতায় এসে এরা দেখতে পেয়েছেন যে, এ চুক্তি পুরোটাই ভারতের অনুকূলে। এমন না হলে উগ্রপন্থী বিজেপি সরকার ও তার দোসরদের চুপচাপ থাকার কথা নয়।

পদ্মার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি বাংলাদেশের রাজশাহীতে প্রবেশ করে দেশের ভেতর দিয়ে ৫শ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। রাজশাহী থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত পদ্মা নিজস্ব নামে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর এটি মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। পদ্মা খরস্রোতা বলে এ নদীতে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যায়। পদ্মা পাড়ের মানুষ এ ইলিশ মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশ যে ক'টি জিনিস নিয়ে গর্ব করে ইলিশ হচ্ছে তার একটি। ইলিশ আমাদের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। আমাদের পদ্মা নদীই ভারতের গঙ্গা। এটি হিমালয়ের মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। উত্তর প্রদেশের তেহরী গুরুওয়ান জেলার গঙ্গোত্রীর কাছে দেবপ্রয়াসে শিমু ও ব্রহ্মপুত্রের (শানপো) মিলিত স্রোত গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে পদ্মা নামে প্রবেশ করেছে। এ পদ্মার উজানে ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানাতে চাইছে। ভারত বর্ষা মৌসুমে পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদশকে ডুবিয়ে দেয়। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রত্যাহার করে

www.pathagar.com

আমাদের শুকিয়ে মারতে চায়। ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে আমাদের মারতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন এ বাঁধ তাদের নিজেদের জন্যই মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। গত বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য অঞ্চলে অকালবন্যা হয়। বন্যায় সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলেও বন্যার পানি নেমে আসে। এ বন্যার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, ফারাক্কার ৫৪টি স্প্যানের মধ্যে ৩২টি স্প্যানে পলি জমে যাওয়ায় এ বন্যা হয়। পলি পড়ে যাওয়ায় স্প্যানগুলো দিয়ে পানি সরতে না পারায় সামনের দিকে পানি উপচে ওঠে। তখন পশ্চিমবঙ্গে বন্যা হয়। অথচ এ বন্যার তোড়ে ভেসে যাবার কথা ছিল বাংলাদেশের শহর-বন্দর জনপদ। ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা ভাবতে পারেননি যে, ফারাক্কা তাদের নিজেদের জন্যও অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে। গত বছর তাই হয়েছে। এ অঘটন ঘটায় খোদ ভারতেই ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দেয়ার দাবি উঠেছে। তবে স্বীকার না করলেও ভারতীয়রা বুঝতে পেরেছে যে, বাংলাদেশের মানুষের জন্য পাতা ফাঁদে তারাও হাবুডুবু খাচ্ছে এবং আরও খাবে। উজানে থাকার সুবিধা পেয়ে ভারত যেভাবে আমাদের নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে, একইভাবে ইচ্ছে করলে নেপালও ভারতকে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে পারে। কারণ গঙ্গার উৎসগুলো হচ্ছে নেপালের ভূখণ্ডে। এজন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত প্রতিটি আলোচনা ও চুক্তিতে নেপালকে অন্তর্ভুক্ত রাখার দাবি জানানো হয়। কিন্তু ভারত এতে গো ধরেছে এবং নেপালকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে চেয়েছে। ভারত এ কথা জানে যে, নেপালের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের সাথে আলোচনায় সে ফেঁসে যাবে। চুক্তিতে নেপালের অন্তর্ভুক্তি ভারতের জন্য বুমেরাং হবে জেনেই নেপালকে রাখা হয়নি।

ভারত গঙ্গার পানিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এটা হচ্ছে একটা পানিযুদ্ধ। বাংলাদেশের পক্ষে পদ্মার পানি ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। এটা জেনেই ভারত মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছে। এককালের খরস্রোতা পদ্মা আজ প্রায় মৃত। পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় পানির স্তরও নিচে নেমে গেছে। ১৯৭০-৭৪ সালে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানির ন্যূনতম লেবেল ছিল ৬ দশমিক ৬৬ মিটার। '৯৮-'৯৩-এ তা নেমে আসে ৫ দশমিক শূন্য দুই মিটারে। ১৯৭০-৭৪ সালের জানুয়ারিতে পদ্মায় পানির গড় প্রবাহ ছিল ৩,১৯৩ কিউসেক। ১৯৮৪-'৮৮ সালের জানুয়ারিতে তা দাঁড়ায় ২০০০ কিউসেকে। ১৯৮৯-'৯৩ সালের জানুয়ারিতে তা আরও কমে ১,৩৪৪ কিউসেকে এসে পৌঁছে। এখন আরও কমে গেছে। সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলোতেও পদ্মায় ধু-ধু চর জেগে ওঠার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। তারপরেও কি সরকার বলবেন যে, ফারাক্কা দিয়ে পানি আসছে এবং গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সফল? তবে সরকার কী বললো, না বললো, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা ১২ কোটি মানুষ সাক্ষ্য দেব যে, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি নিষ্ফল এবং ফারাক্কা আমাদের জন্য অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় জনমত গঠনে মওলানা ভাসানী লংমার্চ করেছিলেন।

www.pathagar.com

লেঃ কর্নেল (অবঃ) এম এ লতিফ খান

বাংলাদেশের বন্যা ও ফারাক্কা বাঁধ তৈরীর অসারতা

ডেটলাইন ঃ ১৮ অক্টোবর ২০০১

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবারের ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ যতটা না প্রাকৃতিক, তার চেয়েও বেশী মনুষ্য সৃষ্ট। হিমালয়ের বরফ গলা পানি ভারতের ৫৪টি নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এ বরফগলা পানির সাথে যোগ হয় অতিমাত্রায় বৃষ্টির পানি। নদীর ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত দুই তীর উপচিয়ে সমভূমিতে পানি প্রবেশ করলে তাকে আমরা বন্যা বলি। আর এই ৫৪টি নদীর বাংলাদেশে প্রবেশমুখে বাঁধের সৃষ্টি করে ভারত ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করছে এই পানির প্রবাহ। '৫৪ '৭০ '৮৮ এবং '৯৮ সালের উল্লেখযোগ্য বন্যার কথা আমরা সকলেই জানি। তাছাড়া আছে মাঝারি বন্যা ও ছোট বন্যা। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চমাংশে এবারের বন্যা ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে ভূমিকম্পের মতো এসেছে কোনো প্রকার প্রস্তুতিতে সময় না দিয়ে। উপরোক্ত অঞ্চলে হঠাৎ বন্যা দেখা দিয়েছে সেপ্টম্বর মাসের শেষ দিকে। মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, মাগুরা, রাজশাহী, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি জেলাতে বন্যার তাণ্ডবলীলা দেখা দিয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাতে এ বন্যা বিস্তার লাভ করেছে। এ অকাল সময়ে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার পানিতে ভেসে যাবে তা একদিন আগেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, সরকার নাকি এবার নিশ্চিত হয়েছে ভারত থেকে আসা বন্যার পানিই বাংলাদেশে এ বন্যার কারণ এবং সরকার এ জন্য ভারত সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চাবে। সরকারি হিসাব মতে, বন্যাকবলিত ৪৪টি উপজেলার ৭ লাখ পরিবারের প্রায় ৩৬ লাখ মানুষ এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের এবারের অকালবন্যা, কোনো প্রাকৃতিক কারণে হয়নি। ভারত আন্তর্জাতিক নদীর আইন ভঙ্গ করে সীমান্তের ওপার থেকে নদীর ভেড়িবাঁধ কেটে এবং ফারাক্কার সব গেট এক সাথে খুলে দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জমাকৃত অথৈ পানি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে এ ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ বন্যার পানিতে ডুবে যায়। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া, মেদেনীপুর প্রভৃতি জেলায় অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে এ ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের উপরাংশ থেকে বরফ গলা পানি ও বৃষ্টির পানি মিলিত হয়ে এ বন্যাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে গঙ্গা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদীর প্রবাহ কমে গেছে। ফারাক্কা বাঁধ তৈরীর সময় সে দেশের বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, ফারাক্কা বাঁধ একদিন পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিপদ টেনে আনবে।

www.pathagar.com

ফারাক্কা ছাড়াও ভারত ভাগীরথী, মহানন্দা ও জলঙ্গী নদীর ভেড়িবাঁধ কেটে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জমাকৃত অস্বাভাবিক বন্যার পানি বাংলাদেশে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে রাতারাতি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা প্রভৃতি জেলা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে গেছে। এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে নদীর ভেড়িবাঁধ কেটে দেয়ার ফলে সাতক্ষীরার বিভিন্ন এলাকা পানিতে ডুবে গেছে। বলা নেই, কওয়া নেই, আকস্মিক পানি গ্রাস করেছে গ্রামের পর গ্রাম। অনেকটা জলোচ্ছ্বাসের মতো এ ঘটনা।

ফারাক্কা বাঁধের অসারতা

'৭৪ সালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পর থেকে দেখা গেছে যে, এই বাঁধ পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলের জন্য নির্মিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের উপকার হয়নি, অপরদিকে এ বাঁধ নির্মাণের পর এর ভাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশের চরম ক্ষতি হয়েছে, যেমন- বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানির তল কমে যাওয়ার ফলে নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মিল কল-কারখানার অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে খুলনা অঞ্চলে ধান উৎপাদন দারুণভাবে কমে গেছে। গঙ্গা ও এর শাখা-প্রশাখার পানির তল কমে যাওয়ার ফলে মৎস্য কমে গেছে, নৌ-চলাচল বন্ধ হয়েছে এবং গাছপালা মরে গেছে, মরে যাচ্ছে। গঙ্গা নদীর পানির তল শুষ্ক মৌসুমে মাত্রাতিরিক্ত কমে যাওয়ার ফলে এ অববাহিকার নলকূপগুলোতে আর্সেনিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধ এখন কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত কলিকাতা বন্দর বাঁচাতে বিকল্প পানির উৎস সন্ধান করছে। এ উৎস হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে অজয় নদীকে।

ফারাক্কা বাঁধ তৈরীর সময় এ দেশ এবং ভারতের বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, ভূ-প্রকৃতি, নদী প্রবাহ এবং অন্যান্য কারণে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষায় ফারাক্কা বাঁধ কোনো কাজে আসবে না। ফারাক্কা বাঁধের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা '৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তুলে ধরেছিলেন। জাতিসংঘে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের ৪ কোটিরও বেশী মানুষ আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানির ওপর ভারতের একতরফা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন।' তিনি এ সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের সহায়তা চেয়েছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ভারতের সে সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বলেছিলেন, এ বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত থাকবে। প্রণব মুখার্জী এ বক্তব্য দেয়ার আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তারা যেন অজয় নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে সে নদীর বাড়তি পানি ভাগীরথী নদীতে স্থানান্তরের বিষয়টি ভাবেন, তাতে কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে। ফারাক্কা বাঁধ তৈরীর শুরুতে পানি বিশেষজ্ঞদের সকল বাধা পরামর্শ উপেক্ষা করে ভারত যেভাবে এই বাঁধ তৈরী করেছে, এত বছর পর তার সুফল সম্পর্কে ভারতের উপলব্ধি সেসব বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যকেই সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। কিন্তু

www.pathagar.com

এর মাঝখানে ক্ষতি যা হওয়ার তা আমাদের হয়ে গেছে। একমাত্র ফারাক্কার কারণে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজ মরুময়তার দিকে চলে যাচ্ছে, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আজ বিপর্যস্ত।

বার বার ভারতের কাছে অনুরোধ করেও কোনো লাভ হয়নি, এমনকি নেপালে জলাধার নির্মাণ করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের দেয়া এ বাস্তবসম্মত প্রস্তাবও ভারত কানে তোলেনি, অথচ আজ ভারতের বিশেষজ্ঞরাই বলছে বাংলাদেশের এ প্রস্তাব বাস্তবসম্মত। তাই তাদের বাধ্য করতে হবে ক্ষতিপূরণ দানে। প্রয়োজনে তার প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে হবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। ১৯৫১ সালের তৈরীর কাজ শুরু করলেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। কিন্তু '৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত বাংলাদেশকে সহায়তা দেয়ার সুযোগে এই বাঁধ নির্মাণ শুরু করে এবং ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় তা শেষ করে।

বাংলাদেশ হল আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার নিম্ন অববাহিকার অঞ্চল। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৭ শতাংশ মানুষের বাস দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। দেশের প্রায় সব এলাকার মানুষই গঙ্গা থেকে নেমে আসা পানির ওপর নির্ভর করে। মৎস্য, বন, বন্যপ্রাণীদের জীবনযাপন ছাড়াও সেচ, নৌ-পথ, শিল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো শিল্পও অনেকটা এই প্রবাহিত পানির ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া ভূগর্ভস্থ পানি ছাড়াও জনসাধারণের জীবনযাত্রা, গোসল, রান্না-বান্না, খাওয়ার পানি, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জনসাধারণ ঐতিহাসিক গঙ্গার পানি প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ বাঁধ নির্মাণের সময় থেকে ভারতের মধ্যেই এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি এক বিতর্ক ছিল যে, বাংলাদেশকে দুর্ভোগের মধ্যে না ফেলে ভারত পারে কি-না। ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে যখন গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন ভারতের গোপন সংস্থা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে পূর্বাভাষ দেয় যে, এ বাঁধ নির্মিত হলে গঙ্গা নদীর নিম্ন অববাহিকার ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এর মধ্যে ভারত এবং তদানীন্তন পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বেশ কয়েকবার বৈঠক হলে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের ওপর কি প্রভাব ফেলবে- তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এ আলোচনা চলা অবস্থাতেই ভারত ১৯৬১ সালে গঙ্গা নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ শুরু করে এবং ১৯৭৫ সালে তা শেষ করে।

আন্তর্জাতিক আইন ও বর্তমান সরকারের সাথে চুক্তি

গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। বাংলাদেশ তার নিম্নঅববাহিকা অঞ্চল। দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাওয়া নদীর তীরে বাস করে অসংখ্য মানুষ। সে সব নদীর পানি গঙ্গা থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। ভারত হল গঙ্গার উজানে থাকা একটি দেশ। সে হিসেবে তার অবশ্যই দায়িত্ব আছে সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণের প্রতিশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পানির ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশকে প্রদান করা। সে

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক নিম্ন অববাহিকার কোনো অঞ্চলকে বঞ্চিত করে কোনোভাবেই এককভাবে পানি প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। এ সমস্যা নিয়ে গত ২৫ বছর দ্বিপাক্ষিক অনেক আলোচনাই চলে আসছে। সর্বশেষ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার মধ্যে একটি পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও অভিযোগ রয়েছে ভারত সে চুক্তি মোতাবেক ঠিকমত পানি বাংলাদেশকে দিচ্ছে না।

বাংলাদেশে ফারাক্কা প্রতিক্রিয়া

ক) গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে দেশের নদ-নদীগুলোর গভীরতা কমতে থাকে। ফারাক্কার কাছে গঙ্গার পানি প্রবাহ নজিরবিহীনভাবে কমতে থাকে। ফলে ফারাক্কাসহ পুরো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও আবহাওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নদীগুলোতে অতিরিক্ত পলি পড়ে নদীর প্রবাহ কমে যায়। নদীর উচ্চতা মাটি থেকে প্রায় ৫ ফুট বেড়ে যায়। খ) ফারাক্কার ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই প্রকল্পের সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফলে উৎপাদন কমে যায় আশঙ্কাজনক হারে। দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৮২ মাইল পর্যন্ত নদীর লবণাক্ততা বেড়ে যায়। এর ফলে সমগ্র খুলনার শিল্পাঞ্চল মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুপেয় পানির মারাত্মক সঙ্কট দেখা যায়। শুধু সুপেয় পানিই নয়, একই সাথে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পানিরও মারাত্মক সঙ্কট দেখা দেয়। পানির লবণাক্ততা বেড়ে যাবার ফলে জমির লবণাক্ততাও বেড়ে যায়। এই লবণাক্ততার জন্য উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে ডাল, শাকসবজি ও বীজের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। পানি স্বল্পতার কারণে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। লবণাক্ততার কারণে যশোর, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালীর বিস্তীর্ণ এলাকার গাছপালা মরে গেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ার ফলে গ্রাম এবং শহর এলাকার পানি সরবরাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখে গেছে, আক্রান্ত এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করতে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হবে। নিম্নমান সম্পন্ন পানি এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় এতদঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। পানি স্বল্পতার কারণে নৌ-চলাচলও মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। ইতিমধ্যে গোদাগাড়ি থেকে গোয়ালন্দ (১০৫ মাইল) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ নদী পথ নৌ-চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া দেশের ১৪৩ মাইল নদীপথ ইতিমধ্যে কমবেশী নৌ-চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বড় বড় নৌযানগুলো এখন স্বাধীনভাবে অনেক এলাকায়ই যাতায়াত করতে পারছে না। দুটো প্রধান বড় ফেরিঘাট ইতিমধ্যেই অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। নদীর নাব্যতা রাখতে গিয়ে সরকারকে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা খরচ করে নদী ড্রেজিং করতে হচ্ছে। সুন্দরবনের বিশাল এলাকার গাছের আগা মরে যাচ্ছে। ফলে সুন্দরবনের এই এলাকার বিস্তীর্ণ বনভূমি এখন হুমকির সম্মুখীন। বছরে প্রায় ৩ কোটি টাকার বনভূমি উজাড় হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে

www.pathagar.com

হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে ইলিশ মাছ, রুই, কাতলার উৎপাদন ৯৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি দেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে মারাত্মকভাবে। মোটকথা, ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় এ অঞ্চলের মানুষ ও পশুপাখীর জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

ভারতের সংযোগ খালের প্রস্তাব

গঙ্গার পানির প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ভারত ব্রহ্মপুত্রের পানি গঙ্গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের ওপর দিয়ে একটি সংযোগ খাল তৈরী করার জন্য বাংলাদেশের কাছে প্রস্তাব করে। ভারতের যুক্তি ছিল এই সংযোগ খাল তৈরী হলে ফারাক্কা সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এটি বাস্তবসম্মত নয় বলে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। এ ধরনের সংযোগ খাল তৈরী করতে গেলে দেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ধ্বংস হবে। উদ্বাস্তু হবে লাখ লাখ মানুষ। অন্যান্য নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে। সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটবে।

ভারতের এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে হলে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র এলাকায় এর পরিণতি হত ভয়াবহ। বিশেষ করে পরিবেশ ও আবহাওয়ার ওপর। এর মধ্যে আর যে সব ক্ষতি হত, সেগুলো হচ্ছে- (১) ফারাক্কা থেকে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহারের ফলে উপরে বর্ণিত যেসব ক্ষতি হচ্ছে, যদি ব্রহ্মপুত্র দিয়ে ১ লাখ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করা হয়, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? (২) প্রতি বছর দেশে ঘন ঘন বন্যা হবে এবং বন্যার পানি সরে যাওয়ার পথ থাকবে না। (৩) ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে সুপেয় পানির অভাব হবে প্রকট। (৪) এর ফলে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে মারাত্মকভাবে। মানবিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, এ সংযোগ সেতু নির্মিত হলে ৫ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হবে। তাদের মাথা গোঁজার কোনো জায়গা থাকবে না। একই সাথে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থারও মারাত্মক অবনতি ঘটবে। এসব বিপর্যয়ের ফলে দেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে মারাত্মকভাবে। ফারাক্কা বাঁধের ফলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের প্রধান দুটি নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ভারতের দ্বারা। ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খাল নির্মিত হলে ভারতের হাতে এই নদীর প্রবাহও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ভারত মনে করে, সংযোগ খাল দিয়ে ১ লাখ কিউসেক ও ফারাক্কা দিয়ে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাওয়া তার প্রাপ্য। এই সংযোগ খাল নির্মিত হলে রংপুর ও দিনাজপুর দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতি

প্রস্তাবিত এই ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খাল লম্বায় হবে প্রায় ২শ' মাইল, (৭টি সুয়েজ খালের সমান) আধামাইল চওড়া এবং ৩০ ফিট গভীর। এর ধারণক্ষমতা হবে প্রতি শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ১ লাখ কিউসেক পানি। এর জন্য প্রয়োজন হবে ২৫২ বর্গমাইল জমি

www.pathagar.com

অধিগ্রহণের যার মূল্য দাঁড়াবে কয়েক হাজার কোটি টাকা। প্রতিবছর দেশ প্রায় ১৭০ কোটি টাকা মূল্যের শস্য থেকে বঞ্চিত হবে এবং এই খাল তৈরীতে খরচ হবে সর্বমোট ১১ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশের প্রস্তাব

ভারতের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে বাংলাদেশ গঙ্গার উজানের দেশ নেপালে একটি জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিল। বর্ষা মৌসুমে এই জলাধারে পানি রাখা হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে তা গঙ্গায় ছাড়া হবে। নেপাল এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ রাজি ছিল এবং তার শর্ত হলো ভারতকে এ ব্যাপারে তাকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিতে হবে। নেপালের রাজা বীরেন্দ্র গঙ্গার পানি নিয়ে যে কোনো ধরনের চুক্তি করতে তার সদিচ্ছার কথা বার বার বলে আসছিলেন। ভারত এই জলাধার তৈরীর প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খালের কথাই বার বার বলে আসছে। যদি প্রস্তাবিত এই জলাধার তৈরী করা যায়, তাহলে গঙ্গা নদীতে বর্তমানে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হচ্ছে, তখন আরও প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার কিউসেক পানি অতিরিক্ত পাওয়া যাবে। প্রস্তাবিত এ জলাধার নির্মাণের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল এ রকম-ক. মোট ৮৩টি জলাধার নির্মিত হবে। এর মধ্যে ৫২টি থাকবে ভারতে বাকি ৩১টি থাকবে নেপালে। এর মধ্যে নেপালে অবস্থিত ১২টি জলাধারের সাথে প্রধান তিনটি নদীর সাথে সংযোগ থাকবে। খ. গঙ্গায় প্রবাহিত পানিতে প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত পানি জমা থাকবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ৩টি দেশ সে পানি ব্যবহার করতে পারবে। গ. বাংলাদেশ সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে গঙ্গা অববাহিকা ও তিন উপ-অঞ্চলে কতটুকু পানি প্রয়োজন- তার একটি হিসাব নিরূপণ করেছে।

১. ভারতের কৃষি বিভাগের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গঙ্গা অববাহিকায় সেচ কার্য ও অন্যান্য কাজে প্রতিবছর ভারতের পানির চাহিদা আনুমানিক ১৫০ এমএএফ (মিলিয়ন) একর ফিট)। ২. বাংলাদেশ ও নেপালের বার্ষিক প্রয়োজন যথাক্রমে ৩৩ এমএএফ ও ২৪ এমএএফ। ৩. সমগ্র এই অঞ্চলে বর্তমান সময় পর্যন্ত পানির প্রয়োজনীয়তা হবে বার্ষিক ২০৭ এমএএফ। কিন্তু জলাধার নির্মাণ করলে এ সময় প্রতিবছর পানির সরবরাহ থাকবে প্রায় ৩৭২ এমএএফ। ৪. সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর গঙ্গার পানি প্রয়োজন মিটিয়েও প্রায় ১২০ এমএএফ পানি উদ্বৃত্ত থাকবে যা জলাধারগুলোতে জমা রেখে শুষ্ক মৌসুমে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘ. পানির জলাধার পরিকল্পনা নির্মাণ করবে ভারত সরকার। শুকনো মৌসুমে ভারত তার দেশে নির্মিত জলাধার থেকে গঙ্গার সর্বোচ্চ ১ লাখ ৪০ হাজার কিউসেক পর্যন্ত পানি এককভাবে ব্যবহার করতে পারবে, তবে তাকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, ফারাক্কায় পানি স্বল্পতার কারণে এই জলাধার থেকে কোনো পানি ব্যবহার করা যাবে না। ঙ. বাংলাদেশের প্রস্তাবে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

নেপালের জলাধারে জমাকৃত পানি বাংলাদেশ ও কলিকাতা বন্দরের জন্য ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারত ও নেপালে জলাধার নির্মাণের বিষয়টি নেপালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। চ. বাংলাদেশ মনে করে যেহেতু গঙ্গায় প্রবাহিত পানির ৭১ শতাংশের উৎস নেপাল, সেহেতু যৌক্তিকভাবেই নেপালে জলাধার নির্মাণ করা যেতে পারে। কিন্তু ভারত নানা অজুহাতে নেপালে জলাধার নির্মাণের বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইন পর্যালোচনা করে আমরা পুনরায় নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলো উল্লেখ করতে চাই।

ক. গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী এবং নদীর পানি অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সবাই ব্যবহার করতে পারবে। খ. আন্তর্জাতিক নদীসমূহের বিদ্যমান আইন অনুসারে গঙ্গার পানি ভারত ও বাংলাদেশ সমানভাবে পাবে। গ. শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতার সময়ে বাংলাদেশ পানির সমান অংশ পাবে। মানবিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহের সময় পানির অংশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাবে। ঘ. বাংলাদেশ এখন যে পানি ব্যবহার করছে, তা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই করছে। কিন্তু ভারত অবৈধভাবে বাংলাদেশের জীবন রক্ষাকারী গঙ্গার পানি হুগলী নদীতে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এমনকি সর্বশেষ বর্তমান সরকারের সাথে পানি ভাগাভাগির প্রশ্নে যে চুক্তি হয়েছে, ভারত তাও মানছে না। সেখানকার সমস্যা ভারত সরকার অন্যভাবেও করতে পারে, যেমন ড্রেজিং-এর সাহায্যে নদীর নাব্যতা রক্ষা করতে পারে সেখানে তো পানি প্রয়োজন হয় না। ঙ. ভারত বাংলাদেশে পরিবেশগত সমস্যার জন্য দায়ী এবং এ ব্যাপারে বাংলাদেশে আর যেন কোনো ক্ষতি না হয়- সে জন্য যে কোনো কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য ভারতকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আওয়ামী দু:শাসনের শ্বেতপত্র

অষ্টম অধ্যায়

পার্বত্য চগ্রাম চুক্তি

সৈয়দ আলী আহসান: পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া: পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে

প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান: জনগণের সার্বভৌমত্বও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ : শান্তিচুক্তি না আত্মসমর্পন

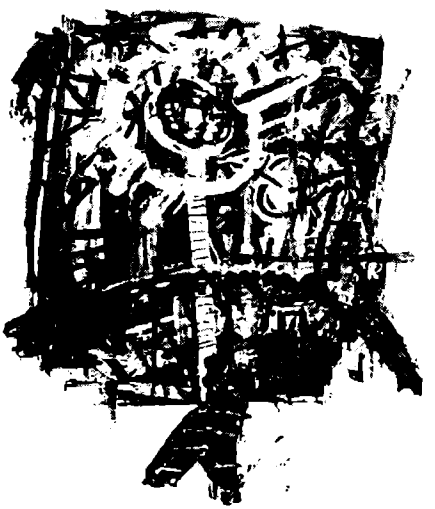

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসান

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

ডেটলাইন ঃ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

ইতিহাসের সাক্ষ্যে আমরা জানি যে, ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম পূর্ণভাবে মোগলদের অধিকারে আসে। এর আগে চট্টগ্রাম পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রায় অধীনেই ছিল বলা যেতে পারে। পর্তুগীজদের অধীনে থাকার সময় আরাকানের সঙ্গে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। ব্রহ্মদেশ ছিল ভিন্ন একটি দেশ। আরাকানের শাসনকর্তা একদিকে যেমন বর্মীদের ভয়ে ভীত থাকতো আবার অন্যদিকে, দিল্লী দূরে থাকলেও দিল্লীর প্রতাপে ভীত ছিল। আরাকানের রাজারা দিল্লীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুসলমানী নাম গ্রহণ করে তাদের রৌপ্য, তাম্র এবং স্বর্ণমুদ্রায় সে নামগুলো উৎকীর্ণ করতো। আরাকানে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম এবং ইউরোপের অনেক দেশ থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বহু লোক বসতি স্থাপন করেছিল। Ferdinand Mendez Pinto তাঁর একটি ভ্রমণ কাহিনীতে আরাকান রাজ্যের সৈন্যদলে যে সমস্ত জাতির লোকেরা ছিল তাদের একটা তালিকা দিয়েছেন : "Portugals, Grecians, Venetins, Turks, Janizaries, Jews, Armenians, Tartars, Mogores, Abyssins, Raizbutos, Nobins, Coracones, Persians, Tupaarac, Gizares, Tanucos, Malabares, Jaos, Achems, Moens, Sians, Lussons of the Islands Borneo, Chacomas, Arracons, Predin, Papuaas, Selebres, Mindancas, Pegus, Barmaas and many others whose names I know not."

কবি আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে আরাকানের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, আরাকান পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাণিজ্যব্যপদেশে অর্থলোভে, সম্মানের আশায় এবং সৈন্যদলভুক্ত হওয়ার জন্য বহু লোক এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আলাওলের বর্ণনায় পাই :

"নানা দেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী মিশরী শামী তুরকী হাবশী রূমী
খোরাসানী উজ্বেগী সকল।।
লাহুরী মুলতানী হিন্দী কাশ্মীরী দক্ষিণা সিন্ধী
কামরূপী আর বহুদেশী।
ভুপালী কুদংসরী কান্নাই মলআবারী
আচি কোচী কর্ণা টকবাসী।।
বহু শেখজাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা

www.pathagar.com

রাজপুত হিন্দু নানাজাতি।
আভাঙ্গি বরমা শাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু জাতি ভাঁতি।।
আবমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইঙ্গরাজ
কাস্টিলান আর ফবাসিস।
হিসপানী আলমানী চোলদার নাসরানী
নানা জাতি আর পর্তুগীস।।"

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আরাকান একটি স্বাধীন দেশ ছিল এবং প্রশাসন ও রাজনৈতিক সন্তান, স্বশাসিত ছিল। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আরাকানের নৈকট্য ছিল। কিন্তু আরাকান ব্রহ্মদেশের অধীনস্থ ছিল না- জাতিসত্তার দিক থেকে নয়, প্রশাসনের দিক থেকে নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও নয়। আরাকান নদীমাতৃক দেশ এবং ঘন বনে আকীর্ণ। বনে এবং পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অসুবিধা থাকায় অনেক লোক পরিবার-পরিজনসহ নৌকায় বসবাস করতো। নৌকাগুলো প্রধানত বাঁশ এবং কাঠের তৈরী। ছইগুলো ঘরের মতো করে বাঁকানো। নৌকাগুলো সাধারণ লোকদের প্রয়োজনীয় বসবাসের স্থান। আবার রাজপরিবারের লোকেরা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও নৌকা বিহারকে গৌরবজনক মনে করতেন। নৌকাতে রাজার উপযোগী সুসজ্জিত বড় বড় ঘর ছিল। এ সমস্ত নৌকা যখন নদী দিয়ে চলতো, তখন ভাসমান নগর মনে হতো। তৎকালীন বিদেশী পর্যটকগণ এ সমস্ত নৌকাকে আরাকানের ভাসমান নগর বলে বর্ণনা করেছেন।

পর্তুগীজ পরিব্রাজক সিবাস্তিয়েন মানরিক তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন যে, আরাকানের স্থানীয় অধিবাসীদের কথাবার্তায় আরবী-ফারসী শব্দ অনেক পাওয়া যেত। তিনি অনেকগুলো শব্দের উল্লেখ করেছেন, যেমন-বন্দখানা (ফা), তবীব (আ), কিতাব (আ), ইঞ্জিল (গ্রী), নমাজ (ফা), নসরানী (ফা), তৌবা (আ), নসীব (আ) ইত্যাদি। মানরিকের সময় আরাকানে হিন্দুস্থানী ভাষা যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হতো তার উল্লেখ করেছেন। Lt col. C. Eckford Liard : "A good deal of Hindustani seems to have been spoken at Arakan."

মানরিকের ভ্রমণ কাহিনীতে আরাকানের যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে সেই সীমানাটি বর্তমান চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের অংশ নিয়েই ছিল। যদিও দিয়াঙ্গা, পতেঙ্গা– এ সমস্ত সামুদ্রিক বন্দরে পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

আমরা ষোড়শ, সপ্তদশ এবং তারও কিছুটা পরবর্তী সময় পর্যন্ত আরাকান বা রোসাঙ্গের ভৌগোলিক প্রশাসনিক আলগ্নতা ছিল। মোগল আমলেই প্রথম রোসাঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রামের প্রশাসনিক সম্পর্ক রহিত এবং চট্টগ্রাম পুরোপুরি সুবেবাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, রোসাঙ্গ অঞ্চলটি মোগলদের প্রশাসনিক বলয়ের মধ্যেই

www.pathagar.com

ছিল। অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় আরাকানদের স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু রোসাঙ্গের শাসনকর্তারা মোগলদের আধিপত্যকে মান্য করতেন।

মোঘল আমলে মগদের মতো চাকমা নামক একটি জাতিও পার্বত্য অঞ্চলে ছিল। এই চাকমারা কখনই স্বাধীন ছিল না। তাদের গোষ্ঠীগত আঞ্চলিক প্রশাসন ছিল, কিন্তু তারা মোঘলদের মূল শাসনের অধীনস্ত ছিল। ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর তারা প্রথম আরাকানের স্বাধীন সত্তা বিনষ্ট করে এবং রোসাঙ্গকে বার্মার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত করে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলগুলো রাঙ্গামাটি জেলায় পরিণত করে। ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মুরং এবং এরকম কয়েকটি উপজাতিদের ব্রিটিশরা নিজ নিজ এলাকায় জমিদারী পরিচালনার অধিকার দেয়। প্রতিটি গোষ্ঠীর জমিদারগণ নিজেদেরকে রাজা বলে পরিচয় প্রদান করতো। ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন জমিদাররাও রাজা বা মহারাজা খেতাবে ভূষিত হতেন। পাকিস্তান আমলে এই প্রথাটা বিদ্যমান থাকে। আমার মনে আছে যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ চট্টগ্রামে প্রথম পদার্পণ করলেন তখন চাকমা রাজা এবং অন্যান্য রাজারা তার নিকট প্রথাগতভাবে আনুগত্য স্বীকার করে এবং কিছু উপঢৌকন প্রদান করে। সমগ্র পাকিস্তান সময়ে এদেরকে নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো অসদ্ভাব ঘটেনি। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার সূত্রপাতে চাকমারা পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্যটা ধরে রাখে এবং রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের একজন মন্ত্রী হন। পরে ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিদেশে অবস্থান করেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর প্রথম থেকেই চাকমারা বাংলাদেশের প্রতি বিরোধিতা পোষণ করতে থাকে। এবং বিদেশের মদদপুষ্ট হয়ে অরাজকতা এবং অসন্তোষ সৃষ্টি করতে থাকে। আমরা সবাই জানি যে, চাকমাদের বহু লোককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বাইরে বিতারিত করে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের স্থান দেয়া হয়। সেই পাকিস্তানের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এরা ত্রিপুরা রাজ্যেই বসবাস করছে। দেখা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই জনপদে অশান্তি সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ সরকার দায়ী নন। দায়ী কে তা আমরা জানি। এখানে শান্তি স্থাপিত হোক, এটা আমরা চাই। বিগত সরকারের আমলেই এই শান্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিলো এবং চাকমাদের অনেকেই দেশে ফিরতেও আরম্ভ করছিলো। কিন্তু এদের মধ্যে একদল সশস্ত্র বাহিনী তারা কোনোক্রমেই এই শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে দেয়নি। সব সময়ই তারা নতুন নতুন দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের সকল দাবিই ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনসত্তার বিরুদ্ধে। এই দাবির মুখে বাংলাদেশ সরকার অতীতে কখনই নতি স্বীকার করেনি। তারা কার সাহায্যে, কার উৎসাহে এই বিরোধটা জাগিয়ে রাখছে এবং প্রায় স্বাধীনতার দাবিকে সামনে তুলে ধরছে, তা আমরা বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের প্রয়োজন হচ্ছে কোনো প্রকারে শংকিত না হয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে না গিয়ে শান্তি প্রক্রিয়াকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে কোনো প্রকারেই হোক শান্তি

www.pathagar.com

আনতেই হবে। এ রকম সিদ্ধান্ত কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নিতে পারে। আমরা যদি শান্তির জন্য দাবিদারের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তাহলে সেটা কখনই আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে না।

আমরা এতদঞ্চলের শান্তি চাই কিন্তু সমগ্র এলাকার ওপর নিজেদের অধিকারের বিচ্যুতি ঘটিয়ে নয়। আরও একটি কথা এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত যেটা দরকার সরকারের সঙ্গে আলোচনায় যে ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠে সেটাই কাম্য। কিন্তু গোপনে এই চুক্তি সম্পাদন করে তারপরে আলোচনায় বসার প্রস্তাবটি হাস্যকর। আমরা এখনও চাই যে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হোক। বিরোধী দলকেও প্রমাণ করতে হবে যে তারা সরকারের সঙ্গে একটি বিরোধের সুযোগ খুঁজছেন না। কিন্তু আন্তরিকভাবে দেশের কল্যাণের জন্য আন্দোলন করছেন। উভয় তরফ থেকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমার বিচার মতে যেহেতু চুক্তিটি পার্লামেন্টের বাইরে এককভাবে একটি রাজনৈতিক দলের সরকার তৈরী করেছেন, সুতরাং বিরোধী পক্ষের সঙ্গে চুক্তির সবক'টি ধারা নিয়ে পার্লামেন্টের বাইরেই প্রথম আলোচনা করা উচিৎ। এ আলোচনায় যখন একটি সর্বসম্মতরূপ তৈরী হবে তখন সেটাকেই পার্লামেন্টে নিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি রাজনীতিবিদ নই। কিন্তু দীর্ঘকাল বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। সে কারণে আমার মত প্রকাশের একটি স্বাধীনতা আছে। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেও নই বিপক্ষেও নই। আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি সর্বসম্মতরূপ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে আমরা সরকারি পক্ষ বিপক্ষ সরকারের প্রতি বৈরীভাব না রেখে দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রিত হয়ে একটি সমন্বিত সাধনায় কাজ করে যেতে পারি।

www.pathagar.com

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে

ডেটলাইন ঃ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০

এ মাসের ২ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নামে একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় সমিতির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে ও পরে এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হয়েছে, যা এখনও চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমগুলোর যে অবস্থা তাতে খুব স্বাভাবিক কারণে আলোচনাটি প্রায় একপেশেভাবেই হয়েছে এবং বলাবাহুল্য সেখানে সরকার পক্ষীয় মতামতই প্রাধান্য পাচ্ছে। সরকারি বশংবদ টিভি-রেডিও সম্পূর্ণভাবে শান্তিচুক্তির পক্ষে চুটিয়ে একতরফা কথা বলা যাচ্ছে। এখানে অন্য কোনো মতের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এর পরে আছে সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল একগুচ্ছ পত্র-পত্রিকা। আরো আছেন দেশের প্রতিভাধর কিছু ব্যক্তি। এদের সকলের মতামত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে ঐসব ব্যক্তির মতামত, যারা বিশ্বাস করেন 'কিং ক্যান ডু নো রঙ'। অর্থাৎ সরকার যা করেছে বা করবে তা অভ্রান্ত এবং দেশের ভালোর জন্যই। এমন মত খাগড়াছড়ির একজন স্বল্পশিক্ষিত আওয়ামী লীগ কর্মীর মধ্যেও দেখেছি, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও বেশ দেখা যাচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক আলোচনা বা প্রবন্ধ পড়ে বুঝবার উপায় নেই যে, এগুলোর রচয়িতা আদৌ চুক্তিটি পড়েছেন কিনা। এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কেননা লক্ষ্য করা গেছে যে, চুক্তির আগেই কেউ কেউ চুক্তির পক্ষে মতপ্রকাশ করছিলেন। সরকারের প্রতি এমন অবিচল আস্থা বুঝি এ দেশেই সম্ভব। ইচ্ছে করেই হোক বা অনিচ্ছা করেই হোক– এ ধরনের মতগুলোতে 'শান্তি' এবং 'শান্তিচুক্তি' এ দুইকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ আলোচনাগুলো স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তিটির গুণাগুণ বিচার না করে সাধারণভাবে শান্তির পক্ষে কথা বলা হয়েছে। ভাবখানা এই যে, যাঁরা স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির বিপক্ষে বলছেন তাঁরা যেন শান্তি চান না। দ্বিতীয় আরেক শ্রেণীর মত, শান্তিচুক্তির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীলতা সম্পর্কে। এদের কাছে অর্থনীতি সবকিছুর নিয়ামক। চুক্তির রাজনৈতিক প্রভাব বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা দেশের সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি প্রশ্ন একেবারে গৌণ। অস্বীকার করা যাবে না যে, অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে সমাজে অশান্তি দেখা দেয়। কিন্তু রাজনীতি বিবর্জিত অর্থনীতি সব সমস্যার সমাধান করবে– এ ধারণা প্রকৃত অবস্থার অতিসরলীকরণ। লক্ষণীয় যে, এই শ্রেণীর মতামতদানকারী ব্যক্তিরা শান্তিচুক্তির অন্তর্গত সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়গুলো এবং পরিষদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ইত্যাদি সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে থাকতে পছন্দ করেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় আরেক শ্রেণীর মত আছে, যা একেবারেই বিরুদ্ধ মতের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত। এরা (আমাদের ধারণা ইচ্ছাকৃতভাবেই বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য এবং তত্ত্ব হাজির করছেন কোনো একটা বিষয়ের ব্যাখ্যায় সকলে যে ঐকমত্য পোষণ করবেন এমনটি হবে না এ কথা ঠিক। কিন্তু গোলাপীকে হয়ত ফিকে লাল বা লালচে কেউ কেউ বলতে পারেন, কিন্তু সাদাকে কালো বা কালোকে সাদা বলে চালিয়ে দেয়া কি যায়? দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ ধরনের বিভ্রান্তিও স্বজ্ঞানে ছড়ানো হচ্ছে এবং তা করছেন মহাজনরাই। বিরোধী দলের ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা অহরহ বলা হচ্ছে তার কয়েকটি প্রথমেই আলোচনা করে নেয়া যাক। বিএনপি আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃস্থাপনে শান্তিবাহিনীর সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তা ছিল একটি সর্বদলীয় কমিটি এবং যেসব আলাপ-আলোচনা চলছিল সে সম্পর্কে কমিটির সকল সদস্যই অবহিত ছিলেন। এখন অভিযোগ করা হচ্ছে যে, প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সদস্যরা এবারে আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এ অভিযোগ তো সঠিক নয়। কারণ বিএনপির কোন কোন সদস্য তার দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা নির্ধারণের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব একমাত্র ঐ দলেরই। অথচ সরকার পক্ষ নিজেই তা ঠিক করে দিলেন। এ অবস্থায় বিএনপি যদি আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে থাকে তাহলে কি তাদের দোষ দেয়া যাবে? কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দলই সরকারের এরূপ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে না। অপরপক্ষে সরকার যদি সত্যিই চাইতো যে, বিএনপি আলোচনায় অংশগ্রহণ করুক তাহলে সে পদক্ষেপ তারা নিতে পারতো, কিন্তু তা তারা নেয়নি। আরেকটি অভিযোগ, এই সেদিনও টিভিতে একজন মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে বিএনপি যে বলছিল 'চট্টগ্রাম তো বটেই, ফেনী পর্যন্ত চুক্তির ফলে হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু কই? তা কি হয়েছে?' এ কথাও বিরোধী দলের বক্তব্যের বিকৃত উপস্থাপন। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দল যা বলেছে তা এই যে, চুক্তির বিভিন্ন ধারা এমনই যে তা সংবিধান বিরোধী, দেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী এবং দেশের সরকারের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমান বা বেশি ক্ষমতা দিয়ে আরেকটি সমান্তরাল সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্ট করা হচ্ছে। এর ফলে একটি কেন্দ্রাতিক শক্তির জন্ম হতে পারে– যা রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। অর্থাৎ এ ধরনের একটি সম্ভাবনার কথাই বিরোধী দল বলেছে। চুক্তিতে এ কথা লেখা থাকবে– এমন কথা তারা বলেছেন বলে আমরা তো লক্ষ্য করিনি বা চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথেই তা ঘটবে, এ কথাও তারা বলেননি। আরেকটি অভিযোগও আনা হচ্ছে এই বলে যে, বিরোধী দলগুলো চুক্তির বিষয়ে সংসদে আলোচনা করতে রাজি নয়। এ অভিযোগ সঠিক বলেই পত্র-পত্রিকায় পরিবেশিত সংবাদ থেকে দেখা যাচ্ছে। আমরাও মনে করি, সংসদে আলোচনার নামে এ আরেক ভাঁওতা এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। যে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছে এবং যাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করে লেখা আছে যে, 'এই চুক্তি উভয় পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে' সে চুক্তি সংসদে আলোচনা করার অবকাশ কোথায়? অবশ্যই সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে চুক্তি যেভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে তার প্রতিটি ধারা

www.pathagar.com

সংসদের অভ্যন্তরে, সংসদের বাইরে, সভা-সমিতি-সেমিনারে এবং সারাদেশে আলোচনার মাধ্যমে একটি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হতে পারে। তাতে চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং বাস্তবায়নের জন্য তা সুবিধা হবে। কিন্তু চুক্তিটি যদি বলবৎ হয়ে গিয়েই থাকে এবং তা অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে সংসদের ভিতরে বা বাইরে এর কোনোরূপ আলোচনা নিরর্থক। এরূপ আলোচনার শিক্ষাগত মূল্য ছাড়া আর অন্য কোনো মূল্যই নেই। অপরপক্ষে বর্তমান অবস্থায় সংসদে চুক্তি সম্পর্কে যে কোনো আলোচনার পর সরকার এই অবস্থান গ্রহণ করবে যে, চুক্তিটি সংসদের বৈধতা পেয়েছে। বিরোধী দলগুলো যদি চুক্তিকে দেশের জন্য ক্ষতিকর মনে করে তাহলে সে ফাঁদে পা দেবে কেন?

কোনো কোনো সংবিধান বিশেষজ্ঞ বলছেন যে, চুক্তিতে সংবিধান বিরোধী কোনো ধারাই সন্নিবেশিত হয়নি। আজকের প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না, তবে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কথা উঠেছে পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ-এর গঠন ও ক্ষমতা নিয়ে। এগুলো কারো কারো মতে, আমাদের সংবিধানের এককেন্দ্রিক চরিত্রের এক নম্বর ধারার পরিপন্থী। অন্যদের মতে, এ ধরনের পরিষদ গঠন সংবিধানের স্থানীয় সরকার গঠনের বিধানের অনুরূপ। কিন্তু এ যদি কেবলমাত্র স্থানীয় সরকারের ব্যাপার হয় তাহলে চুক্তিতে 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ-এর নাম সংশোধন করিয়া তৎপরিবর্তে এই পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে অভিহিত হইবে'-এরূপ সংযোজনের প্রয়োজন কেন পড়ল? দ্বিতীয় স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর তো করবে দেশের সরকার। তাই যদি হয়, তাহলে কি স্থানীয় সরকার অর্থাৎ যে সরকার মূল সরকারের কাছে ক্ষমতা গ্রহণ করছে তার থেকেও বেশি ক্ষমতা ব্যবহার করবে? নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু আমরা দেখছি চুক্তিতে স্পষ্ট করে লেখা আছে, 'পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোনো প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না'-এটা কি সরকারের জন্য মর্যাদাপূর্ণ বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ বা স্থানীয় সরকারের ধারণা এবং সাংবিধানিক বিধির সাথে সংগতিপূর্ণ? আবার পরিষদগুলোর গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ (আসলে চেয়ারম্যানসহ দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী) সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ হবেন অ-উপজাতীয়দের মধ্য থেকে, কিন্তু আজ এই দুই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তো প্রায় সমান। তাই যদি হয়, তাহলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার সংখ্যায় জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব না থাকা কি আমাদের সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ?

এ ছাড়াও কথা উঠেছে, চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত বাঙালি (চুক্তির ভাষায় অ-উপজাতীয়)-দের অবস্থান সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে, কে অ-উপজাতীয় তা

www.pathagar.com

নির্ধারণের ভার দেয়া হয়েছে উপজাতীয় সার্কেল চীফের ওপর। এরূপ সনদপত্র পাওয়ার পরই কেবল একজন অ-উপজাতীয় তার কোটা থেকে নির্বাচন করতে পারবেন। শিয়ালের কাছে মুরগী সমর্পণ আর কি! একই সাথে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে অ-উপজাতীয়দের প্রতিনিধির সংখ্যা হবে এক-তৃতীয়াংশেরও কম যদিও তাদের জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক। আবার চাকরি, জমি ক্রয়ের ক্ষমতা, ক্রয় করা, জমি রক্ষার অধিকারসহ অনুরূপ আরো অনেক ক্ষেত্রে পাহাড়ী বাঙালিদের মধ্যে যেভাবে পার্থক্য করা হয়েছে, এটা যেভাবে পাহাড়ীদের অধিকার নিশ্চিত, কোটা নির্ধারণ ও আইনের মাধ্যমে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে – এটা একই সাথে বাঙালিদের অধিকার ক্রমশ হরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে ক্রমশ বাঙালিরা তাদের অধিকার হারাবেন। এরূপ সুপরিকল্পিতভাবে সে অঞ্চল থেকে বাঙালিদের ক্রমশ বিতাড়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে অথচ বলা হচ্ছে উল্টো। বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, এসবই আমাদের সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারার পরিপন্থী।

পরিশেষে বর্তমান সরকারের অগণতান্ত্রিক প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একদিকে সরকার নিজেদের ঐকমত্যের সরকার বলে দাবি করে, কিন্তু অপরদিকে এককভাবে এটা গোপনে সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এ সরকারের ভূষণ। আলোচ্য চুক্তিটিও একই পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। সমস্যার মূল উৎস সেখানেই। নিজেদের সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা নিয়ে আত্মতুষ্টি সরকারের চরিত্রে প্রকটভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু তা যখন ধোপে টেকে না, তখন প্রচারে গোয়েবলীয় কৌশল অবলম্বন ও পুলিশের যথেচ্ছ ব্যবহার-এর মাধ্যমে সরকার সকল বিরুদ্ধবাদীদের নির্জীব করে দিতে চাইছে। তা সরকারের জন্য; দেশের জন্য বা জাতির জন্য কখনই মঙ্গলকর হতে পারে না। বিগত দিনে এরূপ কৌশলের ফল ভয়াবহ হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান

জনগণের সার্বভৌমত্ব ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

ডেটলাইন ঃ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

কোনো দেশের জনগণ কি নির্বাচিত সরকারকে অপসারণ বা অমান্য করতে পারে? যুগ যুগ ধরে এ প্রশ্ন রাষ্ট্র দার্শনিকদের চিন্তাকে আলোড়িত করেছে এবং রাষ্ট্রনায়কদের কার্যাবলীকে প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে আসছে রুশো, লক, গ্রীন ও রাস্কীর সরকার অমান্য বা বিপ্লব ঘটানো তত্ত্ব Theory of Right to disobey and Right to revolt ফরাসী রাষ্ট্র দার্শনিক রুশোর মতে, জনগণের নিজেদের সার্বিক কল্যাণের চরম ইচ্ছাই (General will) হলো রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই General will ভঙ্গ করার অধিকার কোনো সরকারের নেই। আধুনিককালে সেই চরম ইচ্ছা বা General will-এর প্রতিফলন হলো জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র। যেমন-আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় লেখা আছে We, the people of the United States.... hereby enact the constitution' তেমনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরাও শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় লিখেছেন- "আমরা, বাংলাদেশের জনগণ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৪ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া.... আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।" এই শাসনতন্ত্রের ২ নং ধারায় বলা হয়েছে- "২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে- (ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল; এবং (খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।" শাসনতন্ত্রকে যদি General Will-এর (জনগণের জন-কল্যাণের সার্বিক ইচ্ছার) প্রতিচ্ছবি ধরে নেয়া হয়, তবে বলা যেতে পারে যে রুশোর মতে, শাসনতন্ত্র অমান্যকারী সরকার হতে জনগণ আনুগত্য প্রত্যাহার করতে পারবে।

রাষ্ট্রদার্শনিক লক এ ব্যাপারে আরও পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন। তার মতে জনগণের কল্যাণার্থে জনগণ নিজেদের মধ্যে একটি সাধারণ চুক্তি করে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রাথমিক চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার কোনো নাগরিকেরই নাই। No body can dis-honour the state. লকের মতে, আর একটি চুক্তি হয় জনগণ ও সরকারের মধ্যে "to save the life, liberty and property of the people." লকের মতে, যদি কোনো নির্বাচিত সরকার জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয় অথবা কোনো সরকার "lays the foundation of overturing the constitution" তাহলে সে সরকার উৎখাত করার অধিকার, জনগণ অর্জন করে। বৃটিশ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ Green-এর মতে, যদি কোনো আইন অবৈধ হয় অথবা কোনো আইনের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে সে আইনকে অমান্য করার অধিকার নাগরিকের আছে। রুশো, লক, গ্রীন সব দার্শনিকই এ অবস্থান নিয়েছেন যে, জনগণের প্রত্যক্ষ Mandate ছাড়া কোনো সরকার (government) রাষ্ট্রকে (State) ভাঙার বা Disintegrate করার ক্ষমতা রাখে না। এটা জনগণের সর্বোচ্চ ইচ্ছা বা General Will- এর পরিপন্থী।

www.pathagar.com

শুধু তাত্ত্বিকরাই নয়, প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়করাও মনে করেন যে, সংবিধানের বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ ম্যানডেট ছাড়া রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো কাজই সমর্থনযোগ্য নয়। তাইতো Abraham Linchon South American- দের Successionist movement-এর বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংরক্ষিত করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় বৃটেনের ক্ষতি হবে মনে করে Winston Chyrchil বলেছিলেন ঃ I have not been made the first minister of the king to preside over the liquidation of the British Empire. নেহেরু বলেছেন, "There will be not further partition of India even that means civil war." কোনো সরকারই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে জনসাধারণের Mandate ছাড়া বিসর্জন দিতে পারে না। যদি সংবিধানকে জনগণের সর্বোচ্চ ইচ্ছার (Soverign power) প্রতিচ্ছবি অথবা রুশোর General will-এর শাশ্বত রূপ বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম 'শান্তিচুক্তি' বাংলাদেশীদের general will-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সামগ্রিকভাবে এই শান্তিচুক্তির বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই চুক্তি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ভাগ করে মূলত দুইটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে দেশের সাতটি স্থানে হাইকোর্ট স্থাপন করে সাতটি অঞ্চলে দেশকে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলার (Consititution 8th Amendment case) ঐতিহাসিক রায়ে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী উল্লেখ করেন, "The amendment purports to create territional units which eventually way claim the status of federating units thereby destroying the very fabric of unitary Republic, in other words by sowing the seed of regionalism next step can be dismantling the fabric of the Republic."

শান্তিচুক্তির প্রথম ধারা ক১ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার কথা বলা হয়েছে। এই ধারাটি স্পষ্টত পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বতন্ত্র সত্তায় পরিগণিত করেছে অর্থাৎ এই চুক্তি সর্বপ্রথমেই বাংলাদেশ সংবিধানের এক নম্বর ধারাকে লংঘন করেছে। 'শান্তিচুক্তির' মাধ্যমে পার্বত্য জেলা- পরিষদের হাতে যে বিস্তৃত ক্ষমতার তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে বাংলাদেশ সরকারের এবং জাতীয় সংসদের ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে, যেমন– 'গ' খণ্ডের ১৩ ধারায় বলা হয়েছে 'সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শে আইন প্রণয়ন করিবেন'। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রায় বিলুপ্ত করা হয়েছে। 'শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে জনমত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠায় বিস্মিত হবার কিছুই নেই। Laski সত্যই বলেছেন ঃ "Violence comes when the facts persuade men to believe that the bonafides of their rules is no longer to be trusted."

আর আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্র চিন্তানায়ক মরহুম আবুল মনসুর আহমদের ভাষায়, 'শান্তিচুক্তি' আমাদের বাংলাদেশের 'আমিত্ব' বা 'আত্মাকে' দ্বিখণ্ডিত করার প্রচেষ্টা মাত্র।

www.pathagar.com

এবনে গোলাম সামাদ

শান্তিচুক্তি না আত্মসমর্পণ

ডেট লাইন ঃ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

দেশ একটা। দুটো নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে। যে সীমানা ভারতসহ বিশ্বের সব দেশ মেনে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যে চুক্তি করেছে তাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কার্যত হয়ে যাচ্ছে একটা পৃথক দেশ। বাংলাদেশের অংশ তা আর থাকছে না। কারণ এই চুক্তির মূল কথা হলো :

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে কাজ করতে হবে স্থানীয় পরিষদের নিয়ন্ত্রণে।

২। পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগের জনবল নিয়োগ করবে পার্বত্য পরিষদ।

৩। আঞ্চলিক ও পার্বত্য পরিষদ হবে উপজাতি নিয়ন্ত্রিত।

৪। ভূমির মালিকানা থাকবে উপজাতীয় পরিষদের হাতে।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামে মন্ত্রী হবেন উপজাতীয়।

৬। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদ উত্তোলন করতে হলেও কার্যত লাগবে পার্বত্য পরিষদের অনুমতি।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এক এবং অবিভাজ্য। কি করে তা একটা অঞ্চলে স্থানীয় পরিষদের হুকুম মেনে চলতে হতে পারে, তা ধারণা করা যায় না। সারাদেশের পুলিশ বাহিনী এক। কিন্তু এই চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে কার্যত গড়ে উঠবে পৃথক পুলিশ বাহিনী। আসলে এর ফলে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াবে, তা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে পৃথক হয়েই যাওয়া। চুক্তিটির নাম হলো 'শান্তিচুক্তি'। কিন্তু আসলে চুক্তিটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা পৃথক দেশ হিসেবে মেনে নেবার চুক্তি। সকলেই জানে শান্তিবাহিনীর শক্তির উৎস। পার্বত্য চট্টগ্রামের আসল নিয়ন্ত্রণ, এই চুক্তির ফলে আসলে চলে যেতে বসেছে সেই শক্তিরই কব্জায়। জানি না এই চুক্তি করে আওয়ামী লীগ দেশের সর্বনাশ করতে যাচ্ছে কেন। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ বলেছিল, সে ভারতের সঙ্গে পঁচিশ বছর মৈত্রী চুক্তি নবায়ন করবে না। দেশবাসী খুশী হয়েছিল। তার বেশি ভোট পাবার এটাও ছিল একটা বিশেষ কারণ। কিন্তু এখন সে যা করলো, তার চেয়ে পঁচিশ বছরের চুক্তি নবায়ন খারাপ হতো না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বাধীনতা দেওয়া হলো শান্তিচুক্তির নামে। জানি এর পরে গোটা চট্টগ্রামকেই ছেড়ে দিতে হবে কিনা আর কোনো 'শান্তির জন্যে'। শেখ মুজিব বেরুবাড়ী দিয়েছিলেন তাতে অখুশী হয়েছিলাম। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে বেরুবাড়ী প্রদানের কোনো সুদূর তুলনাও হতে

www.pathagar.com

পারে না। যদিও বেরুবাড়ী ছাড়বার আমরা ছিলাম বিপক্ষে। কারণ, তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা থেকে তা কাছে। চুম্বি উপত্যকার সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। কিন্তু শেখ মুজিব দেশের মানচিত্রের খবর রাখতেন না। তিনি কোনো মুক্তিযুদ্ধ করেননি। কিন্তু আমরা অনেকে সে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমরা খুশী হয়েছিলাম দেখে যে, শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ভারতে না এসে যাচ্ছেন বিলাতে। করছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা। বুঝতে চাচ্ছেন বাস্তব পরিস্থিতি। কিন্তু জানি না কেন তিনি পরে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকলেন। মনে হয় প্রথম দিকে তাঁকে যারা বুদ্ধি যুগিয়েছিল, পরে তিনি তাদের কোনো কথাই শোনেননি। আর তার ফলে ভুল করেছেন একের পর এক। কিন্তু তার তনয়ার সিদ্ধান্তে দেশ হারাতে যাচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ ভূখণ্ড। অনিশ্চিত হয়ে উঠতে যাচ্ছে সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই ভবিষ্যৎ। একে নিন্দা করবার ভাষা আমাদের নেই। সংবিধান বিশেষজ্ঞ নই। সংবিধান একটা দেশের সর্বপ্রকার রাজনীতির শেষ ভিত্তি হওয়া উচিৎ। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে কেউ দেশের মাটি ছেড়ে দিতে পারে না। সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করতে পারে না।

কিন্তু নানা কথার আড়ালে বাস্তবে তাই ঘটতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র আর সংবিধানের কথা বলে। কিন্তু এই কি তার সংবিধান মানবার নমুনা। চুক্তিটা হলো সম্পূর্ণ গোপনে। পার্লামেন্টে আলোচনা না করে। একমাত্র যুদ্ধের সময়েই পার্লামেন্টকে না জানিয়ে কোনো চুক্তি করা যেতে পারে জাতীয় স্বার্থে। কিন্তু এখন এই গোপন চুক্তি করা হলো, দেশবাসীকে ধোঁকা দেবারই জন্যে। যাতে চুক্তির আগে দেশবাসী কোনো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়ে। কিন্তু এখানেই কি সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এই চুক্তিতে আওয়ামী লীগের সব নেতা খুশী কিনা, জানি না। তবে খুব খুশী হয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর সেই সঙ্গে দেশের প্রেসিডেন্ট। বর্তমান প্রেসিডেন্ট কোনো দিন রাজনীতি করেননি। তার রাজনৈতিক অতীত শূন্য। সারাজীবন তিনি করেছেন চাকুরী। কিন্তু তিনি একদিন এদেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। জানি না, তিনি কিভাবে এই সংবিধান বিরোধী চুক্তিতে খুশী হতে পারছেন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান। তাকে চলতে হবে ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুসারে। কিন্তু দেশবাসী তাকে শ্রদ্ধা করে। এই চুক্তির আইনগত ভিত্তি কতটা, সেটা অবশ্যই তার বিচার্য হতে হতো। কিন্তু তা যেন হলো না।

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট লেঘারীকে পদত্যাগ করতে হলো। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পরোক্ষভাবে প্রেসিডেন্ট-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে হারালেন তার সম্ভ্রম। আমাদের দেশে এরকম কাণ্ড এখনও ঘটেনি। কিন্তু পাকিস্তান ও ভারত, উভয়েরই রাজনীতি প্রচণ্ড অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। যার ধাক্কা বাংলাদেশে এসে পৌঁছাতে পারে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সে দেশের রাজনীতিতে এখনও পালন করছে

www.pathagar.com

বিশেষ ভূমিকা। আমরা সেনাবাহিনীর এরকম ভূমিকা অবশ্যই চাই না। কিন্তু আমরা অবশ্যই চাই আমাদের দেশের সেনাবাহিনী অখণ্ড থাকুক। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে কখনই স্থানীয় পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। সেনাবাহিনী দেশরক্ষার শেষ আশ্রয়। এ কথা ভুলে গেলে দেশের প্রতিরক্ষাকেই ধ্বংস করা হয়। অতীতে এদেশের সেনাবাহিনী তাই মেনে নিতে চায়নি রক্ষীবাহিনীকে। তারা চেয়েছে সেনা এক এবং অবিভাজ্য থাকুক। থাকুক কেবল একটিমাত্র কমান্ড।

এই চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশ সরকারের হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। আর আওয়ামী লীগ নেত্রী বলছেন এর ফলে বাড়ছে ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের সম্ভাব্যতা! পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা সারা দেশের ট্যাক্সের টাকার অংশ পেতে যাচ্ছে। কিন্তু অন্য জায়গায় খরচ হতে পারবে না।

দেশের হাজার হাজার মানুষ বোকা নয়। তারা কি স্বীকৃতি দেবে এরকম চুক্তিকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ। কেন বাংলাদেশের সকল নাগরিক সেখানে পেতে পারবে না সমান অধিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ কোনো বিশেষ চুক্তি অনুসারে পায়নি। পেয়েছিল পাকিস্তান হবার জন্যে। আর পাকিস্তান হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ৭ই জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টের পাসকৃত বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সাবেক পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয় ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে। ভারত এই অংশ নিয়ে কখনও পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধে আসেনি। সাবেক পাকিস্তান ভেঙে উদ্ভব হয়েছে আজকের পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশের। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের স্বীকৃত সীমানা হতে পেরেছে বাংলাদেশেরও স্বীকৃত সীমানা। কিন্তু আজ সেই সীমানাই পরিবর্তিত হয়ে যেতে চাচ্ছে বর্তমান আওয়ামী লীগের আত্মঘাতি নীতির ফলে। আমাদের দেশের মধ্যে সৃষ্টি হতে যাচ্ছে আর এক দেশ। এর জন্যেই কি আমরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। জানি না এরপর শান্তির অন্বেষায় আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীন 'বঙ্গভূমির' দাবিকেও মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করবে কিনা?

ভারতে বিরাট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসের ওপর মানুষ আর আস্থা রাখে না। যুক্তফ্রন্ট ব্যর্থ। প্রমাণিত হচ্ছে, কোনো যুক্তফ্রন্ট দিয়ে ভারত পরিচালিত হতে পারে না। বাকি থাকছে এখন কেবলমাত্র সর্বভারতীয় দল বিজেপি। বিজেপি নেতা মানে উগ্র হিন্দুবাদীরা ক্ষমতায় আসা। তারা নিশ্চয়ই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে আরো কুটিল নীতি গ্রহণ করবে। জাগিয়ে তুলতে চাইবে চাকমাদের মধ্যে 'হিন্দুত্ব বোধ'। জানি না আওয়ামী লীগের ভারত তোষণ নীতি আমাদের কোন ভয়াবহ বিপদের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

পঞ্চাশ বছর আগে পাকিস্তান হবার ফলে এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরাট গৃহযুদ্ধ এড়ান গিয়েছিল। কিন্তু এই উপমহাদেশে হিন্দুত্বের যে ঢেউ আবার নতুন করে

www.pathagar.com

উঠছে, তার পাকে যদি ভারত ঘেরা বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়ে, তবে এদেশে ১৯৪৭ সালের পাঞ্জাবের চাইতেও ঘটতে পারে এক ভয়াবহ রক্তপাত। দেশবাসীকে এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত শান্তিচুক্তি সমগ্রভাবে বাংলাদেশকেই একটা ভয়াবহ অশান্তির মধ্যে ঠেলে দিতে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কি এত অশান্তি হচ্ছিল, যে কারণে এরকম একটা চুক্তি সম্পাদন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের জন্যে অতীব জরুরি হয়ে উঠল? প্রশ্নটা জাগছে আমাদের মনে। শ্রীলঙ্কায় তামিল বিদ্রোহের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর লোকদের কোনো সুদূর তুলনা হয় না। কিন্তু কুমারাতুঙ্গা তো শান্তির জন্যে হাসিনার মতো ব্যস্ত হচ্ছেন না। কেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এত শান্তির আকুতি? ভারত কাশ্মীরে শান্তি চাচ্ছে না। কিন্তু আমরা চাচ্ছি সবস্বার্থ বলি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি করতে। নিশ্চয়ই এর পিছনে আরও কোনো গভীর কারণ আছে। সেই কারণটাই হলো আমাদের সবার জন্যে আরো ভয়ের ব্যাপার। চাপ আসছে অন্য কোনো স্থান থেকে রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকবেই। গণতন্ত্রে একটা দেশে একাধিক দল থাকবেই। কিন্তু প্রতিটি জাতির থাকে কতগুলো মৌলিক জাতীয় স্বার্থ। সে সম্বন্ধে একটা দেশের সব দলকেই সজাগ থাকতে হয়। আজকের বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিমান গণতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে দুটি দল। ক্ষমতার রদবদল হয়েছে এই দুটি জাতীয় দলের মধ্যে। এই উভয় দলই রাজনীতি করে চলে মূল মার্কিন স্বার্থের কথা মনে রেখে। সে ব্যাপারে এই দুই দলের মধ্যে কোনো বিরাট পার্থক্য নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগ যে রাজনীতি করছে, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে সমগ্র দেশ। বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে যাচ্ছে দেশের দশভাগের একভাগ ভূখণ্ড। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে আওয়ামী লীগ প্রকৃত প্রস্তাবেই এখন হুমকি হয়ে উঠেছে। দেশের এই দুর্দিনে কি কোনো প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটবে না?

রাজনীতি শাস্ত্র বলে, দেশের দুর্দিনে জনসাধারণের মধ্যে থেকে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে। আশা করবো এরকম নেতৃত্ব আমাদের মধ্য থেকেও সৃষ্টি হতে পারবে।

বাংলাদেশের একটা দৈনিক পত্রিকায় আওয়ামী লীগ সরকারের ফারাক্কা চুক্তির পর ছবি ছাপা হয়েছিল, মেয়েরা সারিবেঁধে 'ঘাগরী পরণে চলেছে'। কিন্তু পরে দেশবাসী দেখতে পেল কত ফাঁকা ঐ চুক্তি। সেই একই পত্রিকায় এখন করা হচ্ছে বিরাট প্রশস্তি। বলা হচ্ছে, আর কোনো মার কোল খালি হবে না। কিন্তু যে চুক্তি আওয়ামী লীগ সরকার করলো, তাতে কোল খালির সম্ভাবনা আরো উন্মুক্তই হলো। বন্ধ হলো না। আমরা গুলি ছুড়তে জানলে, অন্যরাও যে একেবারে জানে না, তা নয়। তারা চুপ করে বসে থাকবে, এরকম ভাববার কারণ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই অযৌক্তিক চুক্তি তারা কখনই মানতে পারে না। চাকমাদের যে অধিকার এখন দেওয়া হলো, কদিন পরে সাঁওতাল, রাজবংশী, গারোরাও দাবি করবে সেই অধিকার।

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

নবম অধ্যায়

জননিরাপত্তা আইন ও বিশেষ নিরাপত্তা আইন

আবদুল গফুর: ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না লাগলে এখন লাগছে কেন?

হারুনর রশীদ: মৃত্যু, পরাজয় ও নিয়তির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার লড়াই

ব্যারিস্টার সলিমুল হক খান মিল্কী : নির্বাচন ও জননিরাপত্তা আইনের বিরামহীন ব্যবহার

মুরশাদ সুবহানী : জননিরাপত্তা আইন মৌলিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী

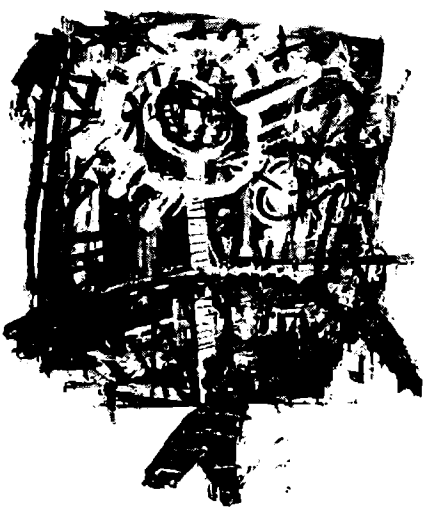

www.pathagar.com

আবদুল গফুর

১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না লাগলে এখন লাগছে কেন?

ডেটলাইন ঃ ৩১ মে ২০০১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ-পরবর্তীকালের নিরাপত্তার জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থক মহলে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্ট তাঁর পদত্যাগ-পরবর্তীকালের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবিতে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তার আগেই দলীয় নেতৃবৃন্দ পার্লামেন্টে এ সম্পর্কে আইন পাসের ঘোষণা দিয়েছেন। এ অভিনব নজিরবিহীন উদ্যোগে দেশের গণতন্ত্রী মহলে স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময় ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী দলসমূহ এ উদ্যোগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূলনীতি ও মূল মর্মবাণীর সঙ্গে সঙ্গতিহীন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রধান বিরোধী সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল এ নিয়ে মাননীয় প্রেসিডেন্টের কাছে স্মারকলিপিও পেশ করেছেন। অনুরোধ জানিয়েছেন, তিনি যেন এই অগণতান্ত্রিক উদ্যোগ থেকে শাসক দলকে বিরত রাখতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটান এবং যদি তারপরও শাসক দল এ ধরনের কোনো বিল পাস করে, তাতে তিনি যেন স্বাক্ষর না দেন।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট বিএনপি প্রতিনিধিদলের বক্তব্যের সঙ্গে কতটা একমত হয়েছেন বা না হয়েছেন তা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারা থেকেই বোঝা যাবে। তবে দেখা যাচ্ছে; আওয়ামী লীগের এ নজিরবিহীন উদ্যোগে শুধু চারদলীয় জোটই ক্ষোভ প্রকাশ করেনি, 'স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি' বলে যারা বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন, সেই গণফোরাম, বাম জোট ও বাম দলসমূহও শাসক দলের এ উদ্যোগকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিপন্থী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, খোদ আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকেও এ ধরনের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে শাসক দলকে 'সাধু সাবধান' করে দিয়ে এই নজিরবিহীন উদ্যোগ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। তাদের মতে, এ ধরনের আইন শাসক দলের জন্য আত্মঘাতী হবে।

আওয়ামী লীগের থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের একাংশ যারা শাসক দলের এ উদ্যোগকে সুনজরে দেখছেন না, তাদের চিন্তাধারাটা কি? তারা সম্ভবত অনুধাবন করছেন, এ ধরনের নজিরবিহীন আইন প্রমাণ করবে যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর পাঁচ বছরের শাসনকালে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত থেকে যেভাবে সরকার পরিচালনা করেছেন, তাতে তিনি জনগণের মধ্যে প্রচুর ক্ষোভ সৃষ্টি করেছেন। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর তাঁকে বিক্ষুব্ধ জনতার রোষানলে যাতে পড়তে না হয়, সে জন্যই তাঁর জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ ধারণা মেনে নিলে আরেকটি কথাও কবুল করে নিতে হয়। তা হলো,

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তায় ধস্ নেমেছে। অথচ আওয়ামী লীগ দাবি করতে চাইছে গত পাঁচ বছরে তারা জাতি ও জনগণকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং সারাদেশে তাদের নেত্রীর জনপ্রিয়তা নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সবাই জানেন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক উভয় মিডিয়াতে বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ হাসিনার শাসনামলে সরকারি সাফল্যের যত ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হয়েছে, তার একাংশও অতীতের কোনো সরকারের আমলে হয়নি। ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকারের প্রভাবাধীন থাকলেও একমাত্র বাকশালী আমল ছাড়া আর সব সময় দেশে প্রচুর সরকারবিরোধী সংবাদপত্র ছিল। বিশেষ করে দেশে নতুন করে ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হওয়ার পর খালেদা সরকারের আমলেও ঐ সরকারের বিরোধী পত্র-পত্রিকার সংখ্যাই ছিল অধিক। শেখ হাসিনার আমলে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সিংহভাগই সরকারি দলের সমর্থক। তারপরও কেন শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তায় ধস্ নামতে পারল, এটাই প্রশ্ন। গোটা মিডিয়া জগতে সরকারের প্রায় একচেটিয়া প্রভাবের পরও যদি প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তায় ধস্ নামার ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তো ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতেই হয়। তবে আসলেই যদি প্রধানমন্ত্রী জনগণের কাছে এখনও নিদারুণ জনপ্রিয়ই থেকে থাকেন, তাহলে পদত্যাগ-পরবর্তীকালে তার নিরাপত্তা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হতে হবে কেন?

প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলে থাকেন, তাঁর পূর্বসূরি খালেদা জিয়ার সরকারকে জনগণ আন্দোলন করে ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়েছেন। যদিও প্রকৃত সত্য এই যে, খালেদা সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন জনগণের আন্দোলনের কারণে নয়, সেক্রেটারিয়েল কু'র কারণে। সচিবরা যখন তাঁর সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করে প্রশাসনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে বসেন, তখনই খালেদা সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু শেখ হাসিনার বক্তব্যকেই যদি আমরা সত্য বলে ধরে নেই যে, খালেদা সরকার জনগণের কাছে ধিক্কৃত হয়ে জনগণের আন্দোলনের কারণে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাহলে পদত্যাগের পর 'গণধিক্কৃত' (!) খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত বিশেষ কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ল না, প্রয়োজন হচ্ছে এখন বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী, 'দেশরত্ন' হাসিনার জন্য এ কেমন কথা! নাকি, 'বুরবাক' জনগণ হাসিনা সরকারের সাফল্যগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে বলেই এমনটা আশঙ্কা হচ্ছে?

যে কোনো জননেতা বা জননেত্রী তো জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পেয়েই জননেতা বা জননেত্রী হয়ে থাকেন। তারা যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তারা রাষ্ট্রীয় বিধি মোতাবেকেই বিশেস নিরাপত্তা ব্যবস্থা পেয়ে থাকেন। আবার গণতান্ত্রিক ধারায় তারা যখন ক্ষমতার বাইরে চলে যান, তখন বৃহত্তর জনগণ এবং সংগঠনই তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত এভাবেই শেখ হাসিনারও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে জনগণ এবং তার দল।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে সরে গেলেও তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত হবেন এবং সেই হিসেবে তাঁরও নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা করবে পরবর্তী সরকার। খালেদা জিয়ার পদত্যাগের পরও তাঁর নিরাপত্তার এরকম ব্যবস্থা হয় তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে। এসবের ঊর্ধ্বে একজন জনপ্রিয় নেতা-নেত্রীর নিরাপত্তার জন্য জনগণ ও নিজস্ব সংগঠনের পক্ষ থেকে তো বিশেষ ববস্থা থাকেই। সরকার, জনগণ ও নিজ দলের এসব ব্যবস্থার পরও যদি কেউ নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সংশয়ে থাকেন, তাহলে স্বভাবতই লোকে বলবে, বাংলাদেশ সরকার, নিজস্ব দল এবং দেশের জনগণ কাউকেই তিনি নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে আস্থায় আনতে পারছেন না। এ অবস্থাটা কোনো নেতা-নেত্রীর পক্ষে যেমন আনন্দদায়ক নয়, তেমনি মর্যাদাজনকও নয়। কোনো নেতা বা নেত্রী যখন দেশের সরকার, দেশের জনগণ এমনকি নিজের দলের ওপরও আস্থা রাখতে সক্ষম হন না, তখন বুঝতে হয়, তিনি এদের প্রতি এমন কোনো গুরুতর অন্যায় করেছেন, যার কারণে এদের সকলের প্রতি তার একটা অপরাধবোধ তাকে তাড়া করে ফিরছে। এ অবস্থায় কোনো নেতা-নেত্রীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে আর একটা মাত্র চ্যানেলই বাকি থাকে। তা হল, সংশ্লিষ্ট নেতা বা নেত্রীর পছন্দের দেশী-বিদেশী এমন কোনো শক্তি, যার ওপর দেশের সরকার, দেশের জনগণ, এমনকি তাঁর নিজের দলেরও হাত থাকবে না। আমরা জানি না, সে রকম চিন্তাই এ পর্যায়ে করা হচ্ছে কিনা।

আমাদের মনে পড়ে, আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে শেখ হাসিনা যখন ভারতে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বর্তমানে যেমনটি দাবি করা হচ্ছে, তেমন কোনো রাষ্ট্রীয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাঁর জন্য ছিল না। একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে তাঁর নিরাপত্তার দিকে রাষ্ট্রের নিশ্চয়ই দৃষ্টি ছিল। তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাই ছিল না। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তাঁর জন্য ছিল না। তাতে তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। ১৯৯৬ সালের জুন মাস থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, যা এ বছরের জুলাই পর্যন্ত তিনি ভোগ করবেন। জুলাইয়ে তাঁর পদত্যাগের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধিকারী হবেন। তবে এরপরও দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভোগ করবেন, যেমন ভোগ করবেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও। প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য নিরাপত্তা তখন পাবেন একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান।

এ নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবি শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী নয়, এ দাবি প্রমাণ করে, ১৯৯৬ সালের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার তুলনায়

www.pathagar.com

২০০১ সালের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ত্যাগের পর জনগণকে মোকাবিলায় অনেক বেশি ভীত ও আতঙ্কিতবোধ করছেন। নইলে ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যতিরেকেও যার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন ছিল, আজ তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে এত ভীতি বা আতঙ্কের কারণ কি? ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াও যদি শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে থাকে, তাহলে ২০০১ সালে ক্ষমতা ত্যাগের পর তাঁর প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে কেন?

১৯৯৬ সালের পর এমনকি ঘটেছে, যে জন্য তাঁর নিরাপত্তার জন্য এখন নজিরবিহীন ব্যবস্থার দরকার পড়ল? ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত যিনি দেশে উন্নতির জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন, তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো এখন করবে জনগণ, যাদের প্রতিনিধি স্থানীয়দের মুখ থেকে উন্নতির জোয়ারের এ 'খোশ-খবর' প্রতিদিন একাধিক টিভি চ্যানেল মারফৎ আমরা জানতে পারি। তবে কি দেশের উন্নতির জোয়ারের এসব খবর আসলেই অন্তঃসারশূন্য বাক-বাকোয়াজ! শাসক দলের এবং তাদের 'সোনার ছেলে'দের কর্মসূচি থেকে তাই কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে।

১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ের সাথে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত কালের পার্থক্য একটাই। আগের ঐ সময়টা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি কি ক্ষমতার অতিরিক্ত দাপট দেখিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন, যে কারণে তিনি ক্ষমতার আসন থেকে নিরাপদ অবতরণের জন্য এখন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পরও প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রাখার দাবি করছেন? তাহলে, তিনি কি স্বীকার করে নেবেন যে, তিনি ক্ষমতায় গিয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে জনমনে রোষ ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছেন? আর তিনি যদি তা অস্বীকার করেন এবং তিনি যদি দাবি করেন যে, তিনি জাতি ও জনগণের জীবনে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন, তাহলে ১৯৯৬ সালের খালেদা জিয়ার যা প্রয়োজন হলো না, আজ তাঁর জন্য তার প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

শেখ হাসিনা প্রায়ই বলেন, দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার তিনিই উদ্ভাবক, গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করতেই তিনি এটা করেছেন। তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্বের মর্মবাণীর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ দাবি তিনি কেন করছেন? আওয়ামী লীগের কেউ কেউ আবার বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে আরও জুড়ে দিতে চান 'জাতির জনকের আত্মজা'দের জন্য রাষ্ট্রের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এই নিরিখে তারা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা শেখ মুজিবের উভয় কন্যার জন্যই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা চান। আমাদের জাতির ইতিহাসে শেখ মুজিবের অবশ্যই একটি মর্যাদাজনক স্থান রয়েছে। সে মর্যাদা তাঁকে কেউ দিতে অস্বীকার করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, তাঁর বংশের বা গোত্রের সকলেই একই রূপ মর্যাদার দাবিদার।

www.pathagar.com

একটি পরিবার বা গোত্রের বিশেষ অধিকারের ধারণার সাথে গণতন্ত্রের ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সে ধরনের বিশেষ অধিকার মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্র (মনার্কি) ও শেখতন্ত্র (শেখডম)-এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর সাথে গণতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই।

শোনা যায়, মুজিব কন্যাদ্বয়ের বিশেষ অধিকারের আইন প্রবর্তনের প্রাক্কালে ভারত ও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের সন্তান-সন্ততিদের অনুরূপ অধিকার সম্পর্কিত আইনও আমাদের আইন প্রণেতারা পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এ সম্পর্কে আমাদের বিনীত নিবেদন, উপমহাদেশের এ দু'টি দেশের সাথে বাংলাদেশের পার্থক্যটাও আমাদের স্মরণে রাখা দরকার। শত সমস্যার মধ্যেও ঐ দু'টি দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারা কখনও ক্ষুণ্ন হয়নি। আমাদের দেশে আমরা শুধু একদলীয় শাসনের মতো কলঙ্কজনক ব্যবস্থাই কায়েম করিনি, প্রশাসনে দলীয়করণ এবং রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে চরম দলীয় প্রচারণা চালানোর লজ্জাকর রেওয়াজও অবলীলায় চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দেশে বহুদিন পর ১৯৯১ সাল থেকে গণতন্ত্র অনুসরণের একটা চেষ্টা নতুন করে চালানো হচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ১৯৯৬ সাল থেকে ক্ষমতা অপব্যবহারের ক্ষেত্রে এতটাই বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছেন না। আমাদের নিজেদের এ পাপকে আমরা ঢাকা দেব কি করে?

আসলে, গণতন্ত্রে যে জনগণের কাছে জবাবদিহিতাই বড় কথা, এ সত্যটা আমরা ক্ষমতায় গিয়ে প্রায়শই ভুলে যাই। আমরা একবার ক্ষমতায় যেতে পারলে এমনটা ভাবতে শুরু করি যে, আমরা যেন অনন্তকাল এ ক্ষমতা ভোগ করতে পারব, কখনই যেন আমাদের ক্ষমতার আসন থেকে সরে যেতে হবে না। কেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রীর প্রায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রাখতে চাইছেন? কারণ অন্যরা না জানলেও তিনি জানেন, তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, দেশের জনগণ এমনকি তার নিজ দলের বহু সম্মানিত ও ত্যাগী নেতা-কর্মীদের সাথেও এমন আচরণ করেছেন, যা তাদের ব্যথিত, ক্ষুব্ধ করে থাকবে। তাই ক্ষমতার সুউচ্চ আসন থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রশাসন, দল, জনগণ কাউকেই আস্থায় আনতে পারছেন না। নইলে ১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়া যদি অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার তাগিদ অনুভব করে না থাকেন, আজ শেখ হাসিনার পক্ষে তার প্রয়োজন কেন হবে? মুজিবকন্যা হিসেবে হাসিনা-রেহানার বিশেষ নিরাপত্তার যে দাবি, সে সম্পর্কেও বলা চলে, ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্তও তারা কিন্তু মুজিবকন্যাই ছিলেন। তখন যদি তাদের নিরাপত্তা বিপন্ন না হয়ে থাকে, এখন হবে কেন?

পরিশেষে আমরা বলব, শুধু হাসিনা-রেহানা নয়, দেশের সকল নাগরিকেরই নিরাপত্তা বিধান প্রশাসনের দায়িত্ব। দেশের সকল বিশিষ্ট নাগরিকদের জন্যও সে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন। তবে কেউ যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার সময় নিজেদের পরিচালিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অপরাধবোধ থেকে অন্যদেরও একইরূপ অপরাধী ভেবে কল্পিত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে ভালোবাসেন, এ রোগের ওষুধ কে দেবে?

www.pathagar.com

হারুনুর রশীদ

মৃত্যু পরাজয় ও নিয়তির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার লড়াই

ডেটলাইন ঃ ৪ জুন ২০০১

মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, নাইজেরিয়া আবু বকর তাফাওয়া বেলওয়া, পাকিস্তানের লিয়াকত আলী খান বা জেনারেল জিয়াউল হক, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক চুং হী, শ্রীলংকার সলোমন বন্দর নায়ক বা প্রেমাদাসা, সউদী আরবের বাদশাহ খালেদ, বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান বা জিয়াউর রহমান কারোরই নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনোই ঘাটতি ছিল না। কিন্তু ঘাতকের গুলি ঠিকই এদের সবারই বক্ষ বিদীর্ণ করে গেছে। কড়া সিকিউরিটি ও সার্ভেইলেন্স সিস্টেম কোনো কিছুই কারোরই প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়নি। ইন্দিরা গান্ধীকে তো প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁর সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে। আর গত পয়লা জুন (২০০১) রাজা বীরেন্দ্র ও রাণী ঐশ্বর্যসহ নেপালের রাজপরিবারের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত সকল সদস্যকে ঘটনাস্থলেই প্রাণ দিতে হয়েছে ঘাতকের হাতে। এ যেন ঠিক সপরিবারে শেখ মুজিব হত্যারই পুনরাবৃত্তি। শুধু এক্ষেত্রে ঘাতক হয়তো যুবরাজ স্বয়ং।

লক্ষণীয়, এদের সকলেই প্রাণ হারিয়েছেন ক্ষমতার শীর্ষে থাকা অবস্থায়। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর ঘাতকের বুলেটের লক্ষ্য হওয়ার নজির রাজীব গান্ধী ব্যতীত খুব বেশি একটা আছে বলে মনে হয় না। শেখ মুজিবের ব্যাপারটাই দেখুন না। তিনি সারাজীবন কি প্রচণ্ড আন্দোলনটাই না করেছেন বিভিন্ন শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু কেউ কি কখনো তখন তাঁকে গোপনে হত্যা করতে চেয়েছিল? খোদ ইয়াহিয়া-টিক্কারাও তো তাঁকে বা তাঁর পরিবারের কাউকে হত্যার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেননি। বরং তাঁর হত্যার ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক তখনই যখন তিনি দেশের সমস্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করে নিয়েছেন।

১৯৮১ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর থেকেই তো শেখ হাসিনা তাঁর ভাষায় 'স্বৈরাচার' বিরোধী প্রবল আন্দোলন করে এসেছেন? কিন্তু কে কখন তাঁকে হত্যা করেছে? এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বেগম জিয়াও রাজপথে ছিলেন। ১৯৯৬-র পর আবার তিনি আন্দোলনে নেমেছেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেউ তো তাঁকে হত্যা করেনি।

কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দলের মন্ত্রী-এমপি ভক্তরা কেন মনে করছেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্তঘাতকরা শেখ হাসিনাকে ও তাঁর বোন শেখ রেহানাকে হত্যা করে ফেলবে? তাঁদের এমন ভীতির উৎস বা কারণ কি? তাঁরা কি ভয় করছেন যে, গত ৫ বছরে তাঁরা এমনই ভয়াবহ স্বৈরাচারিতা, দলবাজি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, অন্যায়, অবিচার, নিপীড়ন, বৈষম্য, অপব্যয়, ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ-আত্মসাৎ ইত্যাদির তাণ্ডব ঘটিয়েছেন যে, তাঁরা ক্ষমতা ছাড়ার পর পরই

www.pathagar.com

নিপীড়িত-অতিষ্ঠ জনগণের কেউ না কেউ একটা চরম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবেই? তীব্র অপরাধবোধই কি তাঁদের এমন ভয়ের উৎস?

শেখ রেহানা তো সরকারেও নেই, রাজনীতিতেও সরাসরি নেই। তাঁর কড়া নিরাপত্তার প্রশ্নই উঠছে কেন? কেন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, তাঁর জীবনের ওপরও হামলা হতে পারে? আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা কি তাহলে মনে করছেন যে, তাঁরা বাংলাদেশটাকে আবার ১৯৭৫-এর পর্যায়ে এনে ফেলেছেন?

যাই-ই হোক, বর্তমান সরকারের সুযোগ্য আইনমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ উচ্চ পর্যায়ের নেতা-মন্ত্রীরাতো বদ্ধপরিকর হয়েছেন, দুনিয়া উল্টে গেলেও তাঁরা দু'টি আইন পাস করিয়ে যাবেনই। এর একটি হলো জাতির জনকের জীবিত সন্তানদের নিরাপত্তা আইন ২০০১। অন্যটি হচ্ছে শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা ছাড়ার পরও ৯০ দিন পর্যন্ত গণভবনে অবস্থানসহ বর্তমান সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও প্রোটকল ভোগ করে যাওয়ার আইন। যদিও এরূপ আইনের বিশদ বিবরণ এখনো জনসমক্ষে বেরিয়ে আসেনি, তবু সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এসব আইনের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ : ১. জাতির জনকের জীবিত সন্তানদেরকে (অর্থাৎ শেখ হাসিনা ও শেখা রেহানাকে) ভিভিআইপি হিসেবে গণ্য করে আজীবন কঠোর নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাঁদের উপযুক্ত সুরক্ষিত বাসভবন তৈরি করে দেয়া হবে। যখন যে সরকারই থাকুক না কেন, তাঁদেরকে তাদেরই দাবি মোতাবেক দিতে হবে সামরিক-আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীর প্রোটেকশন, তাঁরা চাইলে হয়তোবা প্রাইভেট নিরাপত্তা বাহিনী রাখার সুযোগও। ২. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন থেকে পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত গণভবনে বসবাসসহ তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যেসব সুযোগ-সুবিধা ও প্রোটকল ভোগ করতেন, তা তিনি ভোগ করেই যাবেন (অর্থাৎ পরবর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করা পর্যন্ত শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেই যেতে থাকবেন, নির্বাচনের সময়তো বটেই)।

এই আইনে এই বিধানও রাখা হবে যে, এই আইনের বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। কিন্তু কথা হলো এই অগণতান্ত্রিক বিধানটি তাঁরা রাখছেন কেন? তাহলে, তাঁরা কি সুনিশ্চিত যে, তাঁরা যখন ক্ষমতায় থাকবেন না, তখন কেউ আদালতে চ্যালেঞ্জ করলে এইসব আইন অবৈধ ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত ও খারিজ হয়ে যাবে? সেই ভয়েই কি এই বিধান? এই আইনদ্বয় কার্যকর হলে ব্যাপারটা ঘটবে এরকম :

১. শেখ হসিনা ও শেখ রেহানাকে অত্যন্ত সুরক্ষিত, সুসজ্জিত ও অত্যাধুনিক অন্তত দু'টি বাড়ি বানিয়ে দেয়া হবে রাষ্ট্রীয় খরচে।

২. তাঁদের দু'জনের জন্য আজীবন কড়া স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) মোতায়েন করতে হবে সকল সরকারকে। প্রয়োজনে প্রাইভেট বাহিনী রাখার সুযোগ দিতে হবে।

www.pathagar.com

৩. ১৩ জুলাই বা ২৮ জুলাই কেয়ারটেকার সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন থেকে পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত শেখ হাসিনা গণভবন, গণভবনের অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সকল স্টাফ ও প্রোটকল সুবিধা, বিপুল গাড়ির বহর, সামরিক-বেসামরিক সিকিউরিটি সিস্টেম ইত্যাদি অব্যাহতভাবে ভোগ করতে থাকবেন, এগুলোকে ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারবেন নিজের ও দলের নির্বাচনের স্বার্থে।

৪. এমতাবস্থায় ক্ষমতাত্যাগী শেখ হাসিনার জাঁকজমক হবে কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের চেয়ে অনেক বেশি। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই আবহই বজায় থাকবে যে, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়েও প্রধানমন্ত্রীই আছেন। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনার অবস্থান হবে কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের সমান্তরাল, এমনকি কেয়ারটেকার সরকারের কনসেপ্ট ও মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও।

৫. নির্বাচনের ওপর শেখ হাসিনার এ ধরনের অবস্থানের দারুণ প্রভাব পড়বে। সর্বস্তরের প্রশাসন তাঁর ভয়ে তটস্থ থাকবে। তিনি যাই- করুন না কেন, প্রশাসনের কেউ তাঁর কঠোর ও বিশাল নিরাপত্তা বেষ্টনী ও প্রোটকল ভেদ করে তাঁর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। এমতাবস্থায় নির্বাচনের ফলাফলকেও তিনি হয়তো প্রভাবিত করতে পারবেন। বস্তুত শেখ হাসিনার এরূপ অবস্থান হবে নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের ধারণারও সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এরূপ আইনের উদ্যোক্তারা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ জাতীয় আইন আছে। যেমন, ভারতে Special Protection Group Act, 1988-এর মাধ্যমে সাবেক রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁদের পরিবারবর্গকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। শ্রীলংকায় President's Entitlement Act, 1986-এর মাধ্যমে বিধান করা হয় সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তাঁদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রেসিডেন্টও নিরাপত্তা প্রোটেকশন পেয়ে থাকেন।

কিন্তু এরা সম্ভবত লক্ষ্য করেননি অথবা লক্ষ্য করলেও চেপে যেতে চাইছেন যে, প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় বিল ক্লিনটন যখন ভারত সফরে আসেন তখন তাঁর ছিল অত্যন্ত কড়া ও সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র বিশাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম। কিন্তু প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষে তিনি যখন পুনরায় ভারত সফরে আসেন তখন তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের তুলনায় একশ' ভাগের এক ভাগও ছিল না। অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা অবস্থায় প্রোটেকশনের রূপ এবং ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর প্রোটেকশনের রূপের মধ্যে থাকে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেবে গৌড়া বা নরসীমা রাও কিংবা শ্রীলংকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর যে সিকিউরিটি প্রোটেকশন পেয়েছেন, তা কি ক্ষমতায় থাকতে তাঁরা যে প্রোটেকশন পেতেন তার সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয়?

গণতন্ত্রের মূলনীতি ও চেতনা অনুযায়ী একটা দেশের সকল নাগরিকই সমান। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদেও এ কথাই বলা আছে। নির্বাচনেও দুই

www.pathagar.com

প্রতিযোগী প্রার্থীরই একই অবস্থান বা সমান্তরাল থেকেই প্রতিযোগিতা করার কথা। শেখ হাসিনা যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না এবং রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তিনি যদি রাজনীতিতে বহাল থাকেন এবং আগামী নির্বাচনে যথারীতি অংশ নেন, তাহলে তার তো জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশার কথা, জনগণের মধ্যে গিয়ে অবস্থান নেয়ার কথা। অথচ তিনি যদি প্রধানমন্ত্রীর সকল জাঁকজমক, সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়েই নির্বাচনে অবতীর্ণ হন, তাহলে গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত চেতনাটাই কি সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়ে যাবে না? তদুপরি, শেখ হাসিনা কি জনগণের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না? বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, তিনি বাস্তবিকই জনপ্রিয় হলে জনগণই তাঁকে নিরাপত্তা দেবে? তাহলে ব্যাপক জনমত কি এখন তাঁর পক্ষে নেই? তিনি কি তাঁর দলীয় প্রোটেকশন ও ক্যাডারদের ওপরও আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন? শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার প্রোটেকশনের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের প্রোটেকশনের কি কোনোই প্রয়োজন নেই? বাংলাদেশে এখন প্রতিদিন যে গড়ে ১১/১২ জন মানুষ খুন হচ্ছে, শত নারী ধর্ষিত হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ ছিনতাইকারী, অস্ত্রবাজ, চাঁদাবাজ, ডাকাতদের হাতে জর্জরিত হচ্ছে, তাদের প্রোটেকশনের কি কোনোই দরকার নেই? থাকলে, তারা কি ধরনের প্রোটেকশন পাচ্ছে বা পাবে? যদি বলা হয় যে, সাধারণ মানুষ প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই তাদের প্রোকেটশন পেতে পারে, তাহলে প্রশ্ন আসে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানারাও কি একই প্রচলিত আইনের মাধ্যমে প্রোটেকশন পেতে পারেন না? এটা অন্ধ বা বদমাশ ব্যতীত সকলেই স্বীকার করবেন যে, বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানেরই নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু তাই বলে ব্যক্তিবিশেষের জন্য আলাদা আইনের কি আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে? এটা কি গণতন্ত্রসম্মত? শোভনীয়? বৈধ? সাধারণ মানুষকে তো সরকার স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স দেয় না। কিন্তু, প্রয়োজনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী কি তা প্রচলিত আইনেই অনায়াসে পেতে পারেন না?

আচ্ছা ভালো কথা, বেগম খালেদা জিয়ার স্বামীও তো এদেশের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায়ই নিহত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তাহলে, শেখ হাসিনা আজীবন যে রকম প্রোটেকশন পাবেন, হুবহু সে রকম প্রোটেকশনই কেন পাবেন না বেগম খালেদা জিয়া? কেন হবে দু'জনের জন্য দুরকম আইন ও ব্যবস্থা? এ প্রসঙ্গে অবশ্য আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেছেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সন্তানদের নিরাপত্তা প্রদান করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আইনমন্ত্রী মহোদয়ের কথা শুনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সন্তানদের নিরাপত্তা প্রদানের কথা সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ বা ধারাতেই পেলাম না। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে এই কথা বলা হয়েছে, তা আইনমন্ত্রী মহোদয় জাতির জ্ঞাতার্থে অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি?

www.pathagar.com

আর যদি তিনি সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের কথা বলেন, যেখানে বলা হয়েছে, "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না", তাহলে সেটা তো সকলের জন্যই প্রযোজ্য। শেখ হাসিনা-শেখ রেহানার জন্যও প্রযোজ্য, রাম-রহিমের জন্যও প্রযোজ্য। আলাদা আইনের সুযাগ কোথায়?

বেগম খালেদা জিয়া অবশ্য এ ধরনের আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপির সাইফুর রহমান, অলি আহমদ, আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, ডঃ খোন্দকার মোশাররফ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ প্রমুখ ১১ জন নেতা গত ২৮ মে দেখা করেছেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এবং তাঁকে অনুরোধ করেছেন। তিনি যেন এ ধরনের কোনো আইনে স্বাক্ষর না করেন। এর জবাবে গত ৩০ মে আওয়ামী লীগের খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, বন ও পরিবেশমন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী, বাণিজ্যমন্ত্রী আবদুল জলিল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমও প্রেসিডন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে বুঝান যে, বিএনপি প্রদত্ত স্মারকলিপিতে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ মিথ্যা। তাঁরা আরো বলেন, "জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর দুই পুত্রকে ২.৭২ একর জমির ওপর ক্যান্টনমেন্টস্থ তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন, গুলশান মডেল টাউনে ১ বিঘা ১০ কাঠা ১১ ছটাক জমির ওপর নির্মিত আরেকটি বাড়ি ইজারা দেয়া হয়। এ ছাড়া ১০ লক্ষ টাকার অনুদান ও গাড়ি বাবদ ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। একজন গাড়ি চালক ও ৬ জন কর্মচারী, একটি টেলিফোন, পুত্রদ্বয়ের দেশে-বিদেশে পড়াশুনার ব্যয় এবং বিনামূল্যে গ্যাস-বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যা প্রেসিডেন্টের পেনশন অধ্যাদেশের আওতায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধাই পাননি।" বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগ কি সত্য? এ ব্যাপারে কি বক্তব্য বেগম খালেদা জিয়ার? কি বক্তব্য বিএনপির? তাঁরা কি দিতে পারবেন আওয়ামী লীগ নেতাদের এই অভিযোগের দাঁতভাঙ্গা কোনো জবাব? নাকি এই অভিযোগ তাঁরা নীরবে মেনে নেবেন?

তবে, এটা প্রায় অবধারিত যে, বিএনপি নেতারা প্রেসিডেন্টকে যাই-ই বুঝান না কেন, প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ অম্লান বদনে সেই বিল বা আইনেই স্বাক্ষর করে দেবেন, যাই-ই আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে দস্তখত করতে বলবে। এক সময় অনেকেই ধারণা করতেন যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীন। কিন্তু গত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, বঙ্গভবনের সীমাহীন আরাম-আয়েশ তাঁকে কমবেশি আপসপ্রবণ হতে বাধ্য করে ফেলেছে।

আচ্ছা, ভালো কথা, যদি আগামী টার্মে বা তার পরবর্তী টার্মে আওয়ামী লীগের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের জানি-দুশমন বিএনপি ক্ষমতায় চলে যায়, তাহলে এসব আইন কি

www.pathagar.com

বাস্তবিকই শেখ হাসিনাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে? তখন যদি বেগম জিয়ারা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে শেখ হাসিনার স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের মধ্যে শেখ হাসিনার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদেরই নিয়োগ দিয়ে দেন? তাহলে, ওই সিকিউরিটি ফোর্সই কি সবচেয়ে আনসিকিউরিটির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না?

আসলে জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থনই কি একজন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রোটেকশন নয়? অন্য কোনো প্রোটেকশন কি আসলেই কোনো প্রোটেকশন? আর আল্লাহ কি একথা সুষ্ঠু ভাষায় বলেননি যে, মৃত্যু তোমাদের ঘাড়ের মোটা রগের চেয়েও নিকটবর্তী। মৃত্যু যখন আসবার তখন আসবেই। তই পালাও না কেন, সময় হলে মৃত্যু তোমাদের ঠিকই ধরে ফেলবে। সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর অবস্থান নিলেও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না ইত্যাদি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা অবশ্যই আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কথাকে মৌলবাদী বলে পরম ঘৃণাভরে উড়িয়ে দেবেন জানি। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষরা যাই-ই বলুন, প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে এটাই কি ঘটছে না? লৌহবাসরে আশ্রয় নিয়েও অমোঘ মৃত্যুর ছোবল থেকে কি রক্ষা পেয়েছিলেন লক্ষ্মীন্দর?

শেখ হাসিনা তো প্রায়ই বলেন, মরতে তিনি ভয় পান না। তিনি তো আরো বলেন, ২১ বছরের স্বৈরাচারের পর তিনিই বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে এখন যে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা স্বার্থে দু'টি আইন বা বিধান করা হচ্ছে, তা কোন গণতন্ত্রসম্মত? তাঁর পিতা ও স্বামী উভয়েরই ঢাকায় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি রাষ্ট্রের কাছ থেকে নতুন বাড়ি নিতে যাচ্ছেন? খালেদা জিয়া বাড়ি পেয়েছেন, সেজন্য কি? খালেদা জিয়াকে যা দেয়া হয়েছে, তাঁকে আরো বেশি কেন দেয়া হবে না, এই যুক্তিতেই কি? নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রীসুলভ দাপট ও প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগানোর জন্যইবা তিনি এমন উতলা হয়ে উঠেছেন কেন? তাঁর ভগ্নীরও তো দেশে বিদেশে বাসস্থানের কোনো অসুবিধা আছে বলে মনে হয় না।

বিএনপি নেতা-নেত্রী বা অন্যরা যাই-ই বলুন না কেন, পত্র-পত্রিকায় কলামিস্টরা যাই- লিখুন না কেন, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের মাথায় যখন একবার এসেছে তখন এ আইন তাঁরা বলবৎ করে যাবেনই যাবেন। এমতাবস্থায় কি করবেন বিরোধীদলীয়রা? কি করবেন বেগম খালেদা জিয়া? প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের কাছ থেকে বাড়ি-গাড়ি ও অন্যান্য সুবিধাদি নিজে নিয়েছেন বলে, বেগম খালেদা জিয়াও কি শেখ হাসিনার বাড়ি-নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রাপ্তির ব্যাপারে তেমন একটি উচ্চবাচ্য না করাকেই শ্রেয় ও সুবিধাজনক বলে বিবেচনা করবেন? ঠিক যেমন সরকারি দল পার্লামেন্টে এমপিদের বেতন-ভাতা সুবিধাদি বৃদ্ধির বিল আনলে সমর্থনযুক্ত ও সহাস্য মৌনতা অবলম্বন করেন বিরোধীদলীয় এমপি মহোদয়গণ?

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার সলিমুল হক খান মিল্কী

নির্বাচন ও জননিরাপত্তা আইনের বিরামহীন ব্যবহার

ডেটলাইন ঃ ২০ মে ২০০১

বর্তমান বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার সরকারের সময় একটা আইন করেছিলেন, যার নাম ছিল 'সন্ত্রাস দমন আইন'। এই আইনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ গরম হতে চেয়েছিল। তখনকার দিনে এমন কোন বক্তৃতা হয়নি, যেখানে সন্ত্রাস দমন আইনের নিন্দা হয়নি।

আওয়ামীলীগাররা সর্বদাই বলতেন যে, ঐ আইন ব্যবহার হয় কেবল তখনকার বিরোধী দলকে দমনের জন্য। কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, তখনকার দিনে বিরোধী দলের এত নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়নি। যত দেয়া হচ্ছে এখন। এরপরও বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের অনেক আগেই সন্ত্রাস দমন আইনটাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে জননিরাপত্তা আইন বাতিলের কোন কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, জননিরাপত্তা আইন ততদিন থাকবে। আমি জানি না, বর্তমান সরকার যেদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দেবে, সেদিনও জননিরাপত্তা আইন থাকবে কিনা?

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে বলেছিলেন, তিনি রাজনীতির খাতিরে জননিরাপত্তা আইন ব্যবহার করবেন না। কিন্তু এখন যে হিসেবে আমরা দেখছি তাতে দেখা যাচ্ছে, জননিপরাত্তা আইনের শতকরা নব্বইজন আসামী বিরোধী দলের। সরকারী দলের নেতারা রাস্তায় সর্বসমক্ষে রিভলবার-বন্দুক দিয়ে গোলাগুলি করলে তাদের বিরুদ্ধে জননিরপাত্তা আইনে মামলা হয় না। মামলা হয় বিরোধীদলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে, যাদের হাতে বন্দুক দেখা যায়নি। এই জন্যই শেখ হাসিনা আক্ষেপ করে বলেন যে, ছবি উঠেছে মাত্র এক দিকের। অন্যদিকের ছবি কেন নেই? এ কথাটা শেখ হাসিনার বলা উচিত ছিল তার দলীয় সমর্থক পত্রিকা ও পক্ষদের– কেন তারা বিরোধীদলীয় লোকদের হাতেও বন্দুকের এমন ছবি ছাপাতে পারল না।

আমি ভীত হচ্ছি জননিরাপত্তা আইনের মামলার সংখ্যা দেখে এবং প্রতি মামলায় আসামীদের নাম এবং সংখ্যা দেখে। কয়েকজনের নাম দিয়ে প্রতি মামলায় লেখা থেকে– আরো দুই-তিনশ'। এরা কারা বোঝা যাবে, নির্বাচন যতই কাছে আসতে থাকবে। আমার মনে হয়, শেখ হাসিনা খুবই চালাক মহিলা। তিনি নির্বাচন কখন করবেন এ নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিবৃতি দিয়ে বিরোধী দলকে উত্তেজিত করে চলেছেন। বিরোধী দলও বারবার তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার কথা বলছে। শেখ হাসিনা

www.pathagar.com

ক্ষমতা কখন ছাড়বেন– এই নিয়ে যখন বিরোধী দল ব্যস্ত, তখন কিন্তু শেখ হাসিনার আসল কাজ ঠিকই চলছে।

জননিরাপত্তা আইনের মামলা এবং আসামীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমন একটা অবস্থাও হতে পারে যে, বেশিরভাগ কেন্দ্রেই বিরোধীদলীয় প্রার্থীকে জেলে রেখেই শেখ হাসিনা নির্বাচনে নামবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা সীমিত। তারা জননিরাপত্তা আইনকে বাতিল করতে পারবে না। তারা এমন ঘোষণাও দিতে পারবে না যে, জননিরাপত্তা আইনে আটক সমস্ত বন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে এবং এটাও ধারনা করা যায় যে, সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগেই একটি ঝাপটা দেবেন যাতে বিরোধী দলের বেশিরভাগ নেতাই জেলখানায় আটক হয়ে পড়েন।

এর ওপর আবার আরম্ভ হয়েছে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যবহার। জননিরাপত্তা আইনেও যদি আদালত জামিন দিয়ে দেন, বিশেষ ক্ষমতা আইনে আর তা পারবেন না। জামিনের আবেদন দিনে দিনে বোঝা যায়, কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক ব্যক্তিদের ছাড়াতে হলে সময় লাগেই। তাই বিরোধী দলের এখন বোঝা উচিত যে, এখনকার আন্দোলন হতে হবে হাসিনা ক্ষমতা ছাড়বেন কিনা তা নিয়ে নয়, আজকের আন্দোলন হওয়া উচিত কবে জননিরাপত্তা আইন বাতিল করা হবে এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যবহার কখন বন্ধ হবে তা নিয়ে।

অনেকে ভাবছেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ হবে কিনা– আমারও মনে হচ্ছে, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নির্বাচনে গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য লোক থাকবে না। একান্ন জেলার জেলা প্রশাসক বদলি করা হয়েছে। যেসব জেলা প্রশাসকের ওপর সরকার বিশ্বাস রাখতে পারছে না, তাদের বদলি করা হয়েছে। থানায় থানায় বদল করা হয়েছে টিএনওদের। পুলিশের বদলির কোন সীমাসংখ্যা নেই। সরকারের ডিজিএফআই, ডিআইবি এবং সিআইডি অনবরত কাজ করে যাচ্ছে এবং সরকারকে জানাচ্ছে, কাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে কাকে যাচ্ছে না। তাই বদলির এই মহাধুমধাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শেখ হাসিনা যখনই মনে করবেন তার কাঠামো প্রস্তুত তখনই তিনি নির্বাচনের ঘোষণা দেবেন। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘোষণা আগে না দিয়ে যে ভুল ১৯৯৬ সালে বেগম খালেদা জিয়া করেছিলেন, সে ভুল শেখ হাসিনা করবেন না।

এখন নির্বাচন করে ক্ষমতা দখলের যে চেষ্টা চলছে, সে খেলায় জয়ী হতে হলে খালেদা জিয়াকে ঠিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। সময়মতো ঠিকই কথিত দায় থেকে এরশাদকে মুক্তি দিয়ে শেখ হাসিনা এরশাদের সমর্থন নিয়ে নেবেন এবং এর সঙ্গে থাকবে এরশাদের সমর্থকরা।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে যোগ দিলে সে হবে জাতীয় বেঈমান– এমন ঘোষণা দিয়ে শেখ হাসিনা ক'দিন পরই আগ বাড়িয়ে নির্বাচনে যোগ দিয়েছিলেন। মানুষের স্মরণশক্তি এত কম নয় যে, এসব তারা ভুলে যেতে পারেন। ১৯৯৬ থেকে বিরোধী দলের ওপর হামলা, মামলা আর নির্যাতনের কথাও মানুষ ভুলতে পারে না। এ কথা শেখ হাসিনা খুব ভাল করেই জানেন, আর এজন্যই আগামী নির্বাচনে তিনি কি করবেন তারও ঠিক করে রেখেছেন। আমার সন্দেহ, বিরোধী দল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ নয়। বিরোধী দলের মনে রাখা উচিত, আগামী নির্বাচনে ১৯৯১-এর নির্বাচন হবে না। এ নির্বাচন হবে গোয়েবলস-এর বিরুদ্ধে চার্সিলের নির্বাচন। তাই আগে থেকেই বুঝতে হবে এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, আওয়ামী লীগের সংগঠন মজবুত। তার ওপর তাদের সঙ্গে থাকবে বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী। আমার মনে পড়ে, মহিউদ্দিন সাহেবের এক নির্বাচনী ইস্তেহারে লেখা ছিল ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার-মালিক তুই আল্লাহ।" আমার এক হিন্দু বন্ধুকে সেটা দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এটাকে দেখে বলেছিলেন, এটা দেয়া হয়েছে মুসলমানদের খুশি করার জন্য। এটা তার আসল কথা নয়। তিনি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, নৌকার আসল মালিক তো আমরা। আসলে কি তাই? হিন্দুদের একটা দীর্ঘদিনের দাবি শত্রু সম্পত্তি আইন উচ্ছেদ করা। আশা করা যায়, নির্বাচনের আগেই সেটা হয়ে যাবে এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীকে খুশি করার সব ব্যবস্থা করেই শেখ হাসিনা নির্বাচনে নামবেন।

www.pathagar.com

মুরশাদ সুবহানী

জননিরাপত্তা আইন মৌলিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী

ডেটলাইন ঃ জানুয়ারি ২০০০

দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী সংগঠন, সচেতন মহল এবং আইন বিশেষজ্ঞদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নিবর্তনমূলক জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন জাতীয় সংসদে পাস করিয়েছে। এ আইনটি শুধু আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী নয়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী হবে। সাম্প্রতিককালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পুনরায় জননিরাপত্তা নামে আইনটি পাস করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আলোচ্য আইনটি প্রবর্তনের প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু সকল মহলের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদের মুখে সরকার এ নিয়ে আর অগ্রসর হয়নি। সাম্প্রতিককালে এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সরকার হঠাৎ করে আইনটি পাস করিয়েছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়ন করার জন্য আইনটি কার্যকর করা হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। এই মনে করাটাও একেবারে যে অমূলক তাও নয়।

এ কথা ঠিক যে, সাম্প্রতিক সময়ে আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি হচ্ছে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে এবং একজন অপরাধীকে আইন-আদালতে বিচারের জন্য হাজির করানোর মতো যথেষ্ট আইন দেশের প্রচলিত ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে থাকা সত্ত্বেও আবার জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইনের প্রয়োজনে নেই বলে আইন বিশেষজ্ঞগণ ইতিমধ্যেই মত প্রকাশ করেছেন। এই অভিমত উপেক্ষা করে বর্তমান সরকার জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এদিকে স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রবর্তিত ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনটিও বহাল রয়েছে। এরপরও আরও একটি নিবর্তনমূলক আইনের প্রয়োজন আছে বলে আইন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন না। বরং তাদের অনেকের মতে, প্রচলিত ফৌজদারি আইনের সংশোধন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী করা দরকার এবং নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন (১৯৭৪) বাতিল করা প্রয়োজন। কারণ এই আইনেও মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এটি না করে উপরন্তু আরো একটি কালাকানুন পাস করিয়েছে।

কিন্তু আমাদের দেশের সংবিধানের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের আলোকে আইন প্রবর্তনের কোনো চেষ্টা নেয়া হচ্ছে না। ভিন্নভাবে জননিরাপত্তা নামক আইন (বিশেষ

www.pathagar.com

বিধান) দেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী হবে মনে করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। যে কারণে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন প্রস্তাবিত হওয়ার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। যুক্তিসঙ্গত কারণের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হলো– এর প্রয়োগের ক্ষেত্রের ব্যাপকতা, শাস্তির মেয়াদ, বিচার প্রক্রিয়ার কঠোরতা এবং জামিন পাওয়ার বিষয়কে কঠোর করা। জননিরাপত্তা আইনে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, গাড়ি ভাঙচুর এবং যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টির মতো আটটি অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন বা বিশ বছর পর্যন্ত কারাদাণ্ডের বিধান রয়েছে। কঠোর শাস্তির পাশাপাশি প্রস্তাবিত জননিরাপত্তা আইনে ব্যক্তির জামিন প্রাপ্তি অনেক কঠোর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের জামিনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইনে বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রচলিত ফৌজদারি এবং দেওয়ানি আইনে রুজু করা মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হোক এ দাবি দীর্ঘদিনের। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার প্রচলিত আইনে চলমান মামলাগুলোর বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করার পদক্ষেপ না নিয়ে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইনের বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করার বিধান করেছে।

এছাড়াও উপরোক্ত আটটি কারণের অপরাধ দমনে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইনে যা বলা হচ্ছে, এই ধরনের অপরাধের বিচারের জন্য দেশের চলমান ফৌজদারি আইনে যথেষ্ট বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে। সে সব দণ্ডবিধির আওতায় যে কোনো অভিযুক্তকে আইন-আদালতে বিচারের জন্য হাজির করানো সম্ভব। এর জন্য জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না। এখানে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন দেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের পরিপন্থী কেন হবে সে বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো সুবিচার নিশ্চিত করা। যে কারণে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের মৌলিক অধিকারসমূহকে অগ্রাধিকার দেবার কথা বলা হয়। আমাদের দেশের সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে বলা আছে, মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। এজন্যই আইন-আদালতের বিচারে একজন দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ হিসাবে দেখা ন্যায় এবং সুবিচারের নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেজন্য সুবিচার ও ন্যায়বিচারের জন্য জাতিসংঘের সার্বজনীন ঘোষণা রয়েছে, যা মানবাধিকার আইনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই ঘোষণার ১১ (১)

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কেউ কোনো দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে প্রকাশ্য বিচারে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তার নির্দোষ বলে বিবেচিত হবার অধিকার রয়েছে। আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৪.৩ ধারায় বলা আছে, আইন অনুসারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ফৌজদারি অপরাধের দায়ে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ বলে বিবেচিত হবার অধিকার থাকবে। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যদি কোনো আইন মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে কিংবা জামিনের বিষয়টি কঠোর করে তবে তা অবশ্যই মানিবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। কোনো ব্যক্তি জামিন লাভ করলেই আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হবে এবং সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এহেন কথাবার্তা সঠিক নয়। আর জামিন পাওয়ার অর্থ এটাও নয় যে, জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তি মামলা থেকে একেবারে রেহাই পেয়ে গেল। অথচ বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এবং পুলিশের বক্তব্য প্রায় একই রকম। দেশে যখনই আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, তখনই পুলিশের কোনো কোনো মহল হতে বলা হয়, 'তারা অনেক কষ্ট করে ক্রিমিন্যাল ধরে দেয়, কিন্তু তারা জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়।' দেশের ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় জামিন দেয়ার এখতিয়ার সম্পূর্ণভাবে বিচারকের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। একজন বিচারক আইনের খুঁটিনাটি বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই কোনো অভিযুক্তকে জামিন দেন। আইন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের স্বেচ্ছাধীন অথবা এখতিয়ারভুক্ত ক্ষমতা নিয়ে কথা বলার মানে হল বিচারকের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা যা সুবিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করার শামিল। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির ক্ষেত্রে পুলিশের জামিন বিষয়ক কথা আসলে পুলিশের দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দেয়ার একটি কৌশলমাত্র। পুলিশ সত্যিকারভাবেই যদি কোনো প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেফতার করে আইন-আদালতে হাজির করে আর সেই আসামি যদি জামিন লাভ করে কিংবা মামলা থেকে রেহাই পায়, তবে খোঁজ-খবর নিলে এ সত্য উদ্ভাসিত হবে যে, মামলা থেকে মুক্তি কিংবা জামিন পাওয়া চিহ্নিত অপরাধীকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ যে কাগজপত্র আদালতে পেশ করেছে তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল সুতরাং এক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারকের তেমন কিছুই করার থাকে না, অভিযুক্তকে মামলা থেকে নিষ্কৃতি কিংবা জামিন দেয়া ছাড়া। ইতপূর্বে জামিনের বিষয় নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উচ্চ আদালতে কটাক্ষ করে কথা বলায় শেষ পর্যন্ত তাকে উচ্চ আদালতের নিকট লিখিত ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল। দেশের প্রধানমন্ত্রী আর পুলিশের বক্তব্য এক হওয়া উচিত নয়। কারণ, প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাধর। আর পুলিশ প্রজাতন্ত্রের সেবক, সরকার প্রধান নয়। পুলিশের বক্তব্য আইনে পরিণত হতে পারে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কথা আইন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মার্জিত এবং শালীন হওয়া দরকার। এদেশের প্রধানমন্ত্রী লাগামহীন কথা বলবেন এটা জনগণ আশা করে না।

www.pathagar.com

ফিরে আসা যাক জামিন এবং জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইনের মৌলিক অধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিপন্থী বিষয়ে। আইন-আদালত থেকে জামিন পেলে কারও মামলা শেষ হয়ে যায় না। জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঠিকই বিচার মোকাবিলা করতে হয়। তবুও আদালতের যেন শেষ নেই। অথচ জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করে সরকার কিংবা পুলিশকে জামিন পাওয়া ব্যক্তিকে শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে ব্যস্ত হতে খুব কমই দেখা যায়। বরং অনেক সময় এই অভিযোগই বেশী শোনা যায়, চিহ্নিত অপরাধীর সাথে যোগাযোগ করে পুলিশই তার তদন্ত রিপোর্টে কলমের আঁচড় এদিক-সেদিক করে দিয়ে চিহ্নিত অপরাধীকে বিচারকার্য থেকে মুক্তির পথ করে দেয়। এ-ও শোনা যায় যে, কোনো বাদী কাউকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করলে পুলিশের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি বাদীর বিরুদ্ধে আসামিকে কাউন্টার মামলা রুজু করার পরামর্শ দিয়ে থাকে। এতে পুলিশের উভয় দিক থেকে লাভ হলেও প্রকৃত ফরিয়াদি সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়। কোনো কোনো সময় ফরিয়াদিকে এ কারণে এক পর্যায়ে মামলা উঠিয়ে নিতে হয়। এমন অভিযোগও শোনা যায়, হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ফৌজদারি আদালত থেকে জামিন লাভ করেছে। নিম্ন আদালতের এই ক্ষমতা সীমিত। হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন দেয়ার বিষয়টি তো দূরের কথা ৩০২ ধারার এই মামলার শুনানি গ্রহণ করার এখতিয়ারও নিম্ন ফৌজদারি আদালতের অনেক সময় থাকে না। এক্ষেত্রে সরকার অধিকাংশ সময় নীরব থাকে। কোনো কোনো সময় বিজ্ঞ দায়রা এবং জেলা জজ বিষয়টি অবহিত হলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে এ ব্যাপারে শোকজ করেন। কারণ প্রচলিত ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় উল্লিখিত ধারায় জামিন বা বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতা উচ্চ আদালতের ওপর ন্যস্ত। ফৌজদারি আদালত নিয়মানুসারে এ ধরনের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির শুধু হাজিরা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। এই আদালতের দায়িত্ব হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এহেন দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরণ করা। এ রকম ক্ষেত্রে জামিন দিয়ে উচ্চ আদালত কর্তৃক শোকজ পাওয়া দু'একজন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তারা নিরুপায় হয়ে অনেক ক্ষেত্রে এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করতে বাধ্য হন। ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসকের হুকুম পালন করতে গিয়ে তারা এহেন শোকজের সম্মুখীন হচ্ছেন। যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে জেলা প্রশাসকগণ সরকারি দলের চাপের মুখে ম্যাজিস্ট্রেটদের এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ বুঝেও সে কাজ করাতে অনেক সময় বাধ্য হন। আর জেলা প্রশাসকের কলমের এক খোঁচায় একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মূলত এই ভয়ে ফৌজদারি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট তার এখতিয়ার বহির্ভূত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে বাধ্য হন। আবার অনেক সময় নিজেরাও স্বজনপ্রীতি কিংবা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এহেন কাজ করতে পারে। নিজ দলের চিহ্নিত অপরাধী এভাবে জামিন বা মুক্তি পেলে সরকার সাধারণত নীরব থাকে। কিন্তু ভিন্ন

www.pathagar.com

দলের লোক হলেই সরকার বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এ রকম নজির আমাদের দেশে কম নয়। বিনাবিচারে আটক রাখার ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন আমাদের দেশে এখনও বলবৎ রয়েছে। এটিও একটি নিবর্তনমূলক আইন, যা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এ আইন দিয়ে জনজীবনের নিরাপত্তার পরিবর্তে আইনের নামে নিরাপত্তাহীনতাই জনজীবনে বাড়ছে। এই আইন বহাল রেখেই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন নামে আর একটি নিবর্তনমূলক আইন বিরোধী দলহীন জাতীয় সংসদে পাস করিয়েছে। দেশের প্রচলিত ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় জামিন পাওয়ার বিষয়টি সহজ করে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালনে সবাইকে বাধ্য করানোর পরিবর্তে জামিন পাওয়ার বিষয়টি কঠোর করে শাস্তির সর্বোচ্চ মাত্রা বৃদ্ধির জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন কার্যকর করা হলে এটি ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো কিংবা এর চাইতেও মারাত্মক একটি কালাকানুন হবে যা সুবিচার বা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার পরিবর্তে তা ব্যাহত করবে। জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন ২০০০ দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারই শুধু খর্ব করবে না; এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদেরও পরিপন্থী হবে যা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বিরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। এ আইন কার্যকর হলে পুলিশের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পুলিশ যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপে এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহলে জনজীবনে দুর্বিষহ অবস্থা নেমে আসা বিচিত্র নয়। আমরা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জেল-জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দেশে আইনের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তিকে জামিন না দিয়ে দীর্ঘকাল জেলে আবদ্ধ রাখা সুবিচারের নীতি হতে পারে না। আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে জামিন প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসাবে যে বিষয়টি দেখানো হয়, তাকে আটক না রাখলে জনজীবনের নিরপত্তা থাকবে না। এসব ক্ষেত্র ছাড়া জামিন থেকে কাউকে বঞ্চিত করার মানে হল সেই ব্যক্তির মানবিক ও মৌলিক অধিকার খর্ব করা। মূলত এটাই সুবিচারের নীতি।

www.pathagar.com

আওয়ামী দু:শাসনের শ্বেতপত্র

দশম অধ্যায়

সুশাসন-প্রশাসন ও দলীয়করণ

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ: সুশাসন ও স্বশাসনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা

ড: খলিলুর রহমান: আওয়ামী আমলে দখলের রকমফের

হারুনুর রশীদ: ২১ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার

সোহেল মাহমুদ : শেখ হাসিনার এই ভয়াবহ 'সুখ' থেকে জাতি মুক্তি চায়

নোমান ইরফান: প্রশাসনের শীর্ষপদে ভগ্নিপতির পর ভাগ্নিজামাই

কবির মুরাদ: পাবলিক সার্ভিস কমিশন দলীয়করণ

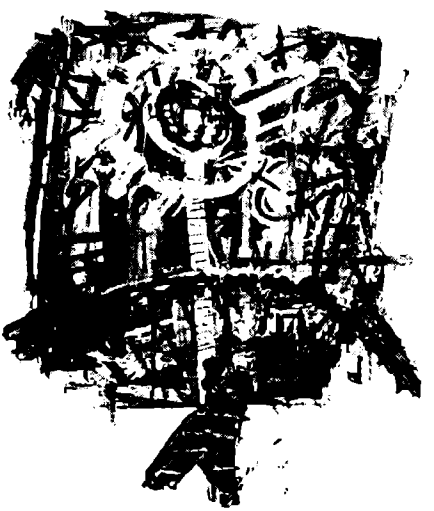

www.pathagar.com

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

সুশাসন ও স্বশাসনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা

ডেটলাইন ঃ ২৩ জুন ২০০১

সুশাসনের তীর ঘেঁষেই স্বশাসনের প্রত্যয়। সুশাসনের মূল উপাদান হল সমাজে ব্যক্তির অধিপত্যের পরিবর্তে আইনের শাসন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং সমাজব্যাপী নিরপেক্ষতার এক আবহ সৃষ্টি। গত পাঁচ বছরে দেশে সুশাসন এবং স্বশাসনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা সীমাহীন। এই ব্যর্থতা মারাত্মক। এই ব্যর্থতা লজ্জাকর। সুশাসনের অন্যতম প্রধান উপাদান হল দলীয় কার্যক্রম প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে স্বতন্ত্র রাখা। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনামলে রাজনৈতিক দলকে প্রশাসন থেকে স্বতন্ত্র রাখার গণতান্ত্রিক নর্মকে দুমড়ে-মুচড়ে সরকার এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে সকল ব্যবধান মুছে ফেলা হয়েছে। প্রশাসনের দলীয়করণের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দলীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। কেন্দ্র থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আনা হয়েছে দলের নিয়ন্ত্রণে। দলের পছন্দ-অপছন্দকে প্রশাসনে মুখ্য করে তোলা হয়েছে। দলীয় নেতা নেত্রীর খেয়াল-খুশিমত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ বদলি স্থির করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনেও দলীয় আনুগত্যের নিরিখে নির্ধারিত হয়েছে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলি। মন্ত্রণালয়ের সচিবরা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে কোন সময় সমগ্র জাতির প্রধানমন্ত্রী না হয়ে সব সময় থেকেছেন আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্য বজায় থাকলে কোন বিভাগীয় মন্ত্রীকে 'মিথ্যুক' অথবা 'অপদার্থ' বললেও কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা কোন অসুবিধায় পড়েননি। এভাবে আইনের শাসনের করুণ রোদন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে দলীয় শাসন, কোথাও বা ব্যক্তি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের বজ্রমুষ্টির নিগড়ে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘ পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল শূন্যহস্ত, নিঃস্ব এবং রিক্ত। ব্যক্তিগত কর্তৃত্ববাদের গণ্ডিতে বন্দী ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। ফলে সুশাসনের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে।

আইন-শৃঙ্খলার সীমাহীন অবনতির ফলে দেশে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-চাঁদাবাজি, ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডে নির্মমতায় সমাজ জীবন ক্লিষ্ট হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন। শিশু ও নারী নির্যাতনের ভয়াবহতায় সকলে হয়েছে স্তম্ভিত। বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীর ওপর অমানবিক নির্যাতন সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতার পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রধারীদের সমন্বয়ে গঠিত অপরাধ সিন্ডিকেটের নৃশংসতায় জাতীয় জীবন হয়েছে

www.pathagar.com

কলঙ্কিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সন্ত্রাসী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরাও জনসমক্ষে আবির্ভূত হয়েছে বিভৎস মূর্তিতে। বাংলাদেশে এখন ক্ষমতাসীন সরকারের চেহারা, চতুর্থ শতকের দার্শনিক সেন্ট অগাষ্টিনের কথায় একটি দস্যু দলের চেহারা থেকে কি স্বতন্ত্র?

গত পাঁচ বছরে আওয়ামী শাসনামলে দেশে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা দেখা গেছে, তা সকল মহলকে করেছে শঙ্কিত। ২০০০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৯ সালের কান্ট্রি রিপোর্টে ভূমিকায় লিখিত হয়েছে ঃ (বাংলাদেশের) রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল সন্ত্রাস। রাজনীতির প্রক্রিয়ায় দেশে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। এ দেশের 'অধিকার', আইন ও সালিস কেন্দ্র' প্রভৃতি মানবাধিকার সংস্থা এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকা এবং জুরিখ কেন্দ্রিক South Asian Plititics and Human Rights Research Center (SAPAHRRC) সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গত পাঁচ বছরে এ দেশে হত্যাকাণ্ডের যে হিসাব পাওয়া যায় তা সত্যিই ভীতিপ্রদ। ১৯৯৬ সালে নিহত হয়েছেন ২২৩২ জন। ১৯৯৭ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৬০১ জন। ১৯৯৮ সালে হিনত হন ৩৯০৫জন, ১৯৯৯ সালে এই সংখ্যা হয় ৪৯০৭ জন এবং ২০০০ সালে ৪৮৫০ জন। ২০০১ সালের প্রথম চার মাসে নিহত হয়েছে ২৫২৩ জন। আহতদের সংখ্যা নিহত ব্যক্তিদের অন্তত চারগুণ। নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গ-রাজনীতিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক এমনকি পথচারীও। এসব খুন-জখমের ঘটনা ঘটেছে রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মসজিদে-গির্জায় এমনকি নিজস্ব বাড়িতে। এসব হত্যাকাণ্ডের কোন কোনটিতে যে নৃশংসতা প্রদর্শিত হয়েছে তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। জনৈক আওয়ামী লীগ নেত্রীর নির্দেশে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ রুবেলকে হত্যা করে। জনৈক সংসদ সদস্যের নির্দেশে প্রত্যক্ষ রাজপথে ছাত্রনেতা সজলকে হত্যা করা হয়। ফেনীতে আশফাকুর রহমানকে হত্যা করা হয় ড্রিল মেশিনে তার সারাদেহ ছিন্নভিন্ন করে। লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা নূরুল ইসলামকে হত্যা করে তার লাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের ত্রিশ বছরের ইতিহাসে শেখ হাসিনার শাসনামলে যে নারকীয় হত্যকাণ্ড সংঘটিত হয় তার একমাত্র তুলনা চলে প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের দুঃশাসনের হত্যাকাণ্ডের সাথে। তখন মাত্র সাড়ে তিন বছরে এ দেশে ত্রিশ হাজারের অধিক কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছিলেন সন্ত্রাসী, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর হাতে। শিশু ও নারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনার শাসনামল এ দেশের জাতীয় ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। জাতীয় পত্র-পত্রিকা, দেশী ও বিদেশী মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক সংগ্রহীত তথ্য অনুযায়ী শেখ হাসিনার শাসনামলে ধর্ষিত হয়েছেন ১৩

www.pathagar.com

হাজারের বেশী মা ও বোন। ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ধর্ষিত হয়েছেন ১২ জনের মত নারী ও শিশু। জাতীয় পত্র-পত্রিকা, দেশী এবং বিদশী মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসনামলের প্রথম বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫২৫টি। ১৯৯৭ সালে এই সংখ্যা হয় ১৩৭৩ জনে। ১৯৯৮ সালে ধর্ষিতা হয়েছেন ২৯৬০ জন। ১৯৯৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৫০৪ জন। ২০০০ সালে ৩৯১৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং ২০০১ সালের প্রথম চার মাসে ঘটে ১১২২টি। এই নারকীয় ঘটনার অনেকগুলোই ঘটেছে পিতার সামনে কন্যার, ভাইয়ের সামনে বোনের এবং স্বামীর সামনে স্ত্রীর। ধর্ষিতাদের মধ্যে রয়েছে ৪ বছরের শিশু থেকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত। ধর্ষণ ছাড়াও এই আমলে শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২৮১৬টি এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৩০২৬৩টি। এসব ঘটনা ঘটেছে লঞ্চে, বাসে, ট্রেনে, রাস্তা-ঘাটে, অফিসে, আদালত প্রাঙ্গণে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি জাতীয় শহীদ মিনার ও শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের অঙ্গনে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে টুঙ্গিপাড়া কলেজের আওয়ামী লীগের সোনার ছেলেদের দ্বারা দুজন হিন্দু রমণীকে ধর্ষণ থেকে যার সূচনা আজও তা অব্যাহত রয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই এই কলঙ্কময় অধ্যায়ের শীর্ষস্থানীয় ঘটনার নায়ক হল জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সম্পাদক জসিমউদ্দিন। একশ জন ছাত্রী ধর্ষণের পরে সে শততম ধর্ষণের উৎসব পালন করে এবং তাও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। তার বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি। শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে ধর্ষণের এই নারকীয়তা শুধু এ দেশের বিবেকবান মানুষকে আহত করেনি, বিদেশেও বাংলাদেশের পরিচিতি লাভ করেছে এক অসভ্য ও বর্বর দেশ হিসেবে। ঢাকা এক থানায় যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক কূটনীতিকের স্ত্রী পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত হলে ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতসহ বিদেশী মিশনসমূহে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয় যে, পুরুষ সঙ্গী ছাড়া কোন মহিলা বাংলাদেশের কোন থানায় যাবেন না। এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ১৯৯৯ সালের ৪ মার্চ।

হত্যা ও ধর্ষণের এই সব নারকীয় ঘটনার মূলে রয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসিবাদী নীতি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশের কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার সাথে পোশাক আশ্রিত সম্পর্কের এক ঐক্যসূত্র। তা ছাড়া রয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আইনের উর্ধ্বে এক অবস্থান। এ সময়ে দেশের রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়। জনস্বার্থ অথবা জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার পরিবর্তে এই আমলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে কোন প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণে রাখার নীতি গৃহীত হয়। ফলে একদিকে শুরু হয় বিরোধী দল নির্মূলকরণের অভিযান, তা সম্ভব না হলে মিথ্যা মামলা ও হামলার ভয় দেখিয়ে বিরোধী দলকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রাখা এবং অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের অপরাধ সম্পর্কে উদাসীন থাকার নীতি। সরকার পুলিশকে ব্যবহার করেছে বিরোধী দলকে দলনের সকল প্রক্রিয়ায় এবং পুলিশের অনেকে সেই অশুভ

www.pathagar.com

আদান-প্রদানের ফলে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়কে ব্যবহারে করেছে নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে। ২০০০ সালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কান্ট্রি রিপোর্টে লেখা হয় 'পুলিশের উপর সিভিলিয়ান নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুর্বল এবং পুলিশের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ভিত্তিক দুর্নীতি ও শৃঙ্খলার অভাব'। শুধু কান্ট্রি রিপোর্টে কেন, বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ অধ্যায়ের মুখপাত্র ২০০১ সালের ১৩ এপ্রিলে ঘোষণা দিয়েছেন, 'বাংলাদশে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষেত্র হল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ হল দেশের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ।

এই দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রীয় কৃত্যকগণ দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় শুধু যে ব্যর্থ অথবা উদাসীন তাই নয়, তাদের অনেকেই লিপ্ত হয়েছেন বেআইনী কর্মকাণ্ডে। গত দু' বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে, বিশেষ করে যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, খুলনার এক মসজিদে, ঢাকার পল্টন ময়দানে কম্যুনিস্ট পার্টির মহাসম্মেলনে, রমনার বটমূলে বৈশাখী অনুষ্ঠানে, বানিয়ারচরে এক গির্জায় এবং সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জে যে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় তার কোন একটি প্রতিরোধ দূরে থাক, তদন্ত করে কারণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও পুলিশের ব্যর্থতা আকাশচুম্বী। এসব জীবননাশকারী দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮০ জনেরও বেশী ব্যক্তি এবং আহত হয়েছে কয়েকশ' নিরীহ মানুষ। ক্ষমতাসীনরা কিন্তু এসব দুর্ঘটনাকে যেভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিরোধী দলসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে লাভবান হতে চেয়েছেন, কিছু পুলিশ কর্মকর্তাও তেমনিভাবে এসব ক্ষেত্রে মামলা সাজিয়েছেন। বাক্যবাগীশ ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচ্চারণ, উচ্চপদস্থ পুলিশ কমকর্তার কথাবার্তা একাকার হয়ে গেছে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, বিগত পাঁচ বছরে ফ্যাসিবাদী সরকার বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ১০ হাজারেরও বেশী মামলা সাজিয়েছে। এসব মামলায় জড়ানো হয়েছে বিরোধী দলসমূহের লক্ষাধিক নেতা-কর্মীকে। এর মধ্যে রয়েছে বিএনপির প্রায় ৮০ হাজার নেতা-কর্মী। কারও কারও বিরুদ্ধে রয়েছে শতাধিক মামলা। বিএনপির সর্বোচ্চ সংস্থা স্থায়ী কমিটির অধিকাংশের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। হিংস্র সরকারের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে বিরোধী দলের আয়োজিত জনসভা, মিছিল এবং বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের হাতে নিগৃহীত ও আহত হয়েছেন বিরোধী দলের জাতীয় সংসদের অন্ততঃপক্ষে ৩৬ জন সদস্য। গত পাঁচ বছরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন বিরোধী দলরে প্রায় ৫০ হাজার নেতা-কর্মী।

এভাবে পুলিশের একাংশ দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন না করে বরং নিজেরাই পরিস্থিতিকে জটিল রেখে এবং দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, স্টেট ডিপার্টমেন্টের কান্ট্রি রিপোর্ট, অধিকার, আইন

www.pathagar.com

ও সালিস কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে পুলিশ কাস্টডি এবং কারাগারে পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন ৫০০'র অধিক ব্যক্তি। পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছেন শতাধিক মহিলা। কান্ট্রি রিপোর্টে বলা হয়েছে 'কারাগারে মহিলা ওয়ার্ডে পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ একটা সাধারণ ব্যাপার'। ১৯৯৮ সালের ২৬ মার্চ একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২২ হাজার অভিযোগ উত্থাপিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যে কত মারাত্মক নিম্নের সূচকগুলো তারই প্রমাণ ঃ

১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে শুধু ঢাকা নগরীতেই রেকর্ডকৃত ডাকাতির সংখ্যা ১ হাজার ৫৯০। সারাদেশে এই সংখ্যা ৫০ হাজারের মত। পাঁচ বছরে সারাদেশে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে প্রায় দেড় লাখের মত। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে শুধু রাজধানী ঢাকাতেই রেকর্ডকৃত চুরির ঘটনা ঘটেছে ২ হাজারের মত। সারাদেশে এই সংখ্যা ৫০ হাজারের কম নয়। গত পাঁচ বছরে এই সংখ্যা হবে লক্ষাধিক। একমাত্র ঢাকা মহানগরীতেই ১০ হাজারের মত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সারাদেশে এই সংখ্যা হবে ৫০ হাজারেরও বেশী।

গত পাঁচ বছরে দেশে আইনের প্রতি আনুগত্য নিশ্চয়ই হ্রাস পায়নি। পুলিশ বিভাগও রাতারাতি অসৎ এবং অদক্ষ হয়ে যায়নি। তারপরেও বাংলাদেশে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ নিহিত রয়েছে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে, ক্ষমতাসীন দলটির ফ্যাসিবাদী চরিত্রে এবং এই প্রক্রিয়ায় শাসন-প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রকে দলীয় নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াস এবং দলের নেতা-কর্মীদের আইনের উর্ধ্বে এক ধরনের দায়মুক্তি প্রদানের মধ্যে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী হাসিনা নিজেই বহুলাংশে দায়ী। চট্টগামে ছাত্রলীগের ৬জন কর্মী নিহত হলে হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার পরিবর্তে তিনিই একটি লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলায় প্ররোচিত করেন তার দলের কর্মীদের। লক্ষ্মীপুরে এডভোকেট নুরুল ইসলামের হত্যাকাণ্ডের কোন তদন্তের নির্দেশ না দিয়ে তিনি নিজেই বলেছিলেন, আবু তাহেরের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, তিনি এমনি করতেই পারেন। ফেনীতে জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে তাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পত্র-পত্রিকার খবরে প্রকাশ, দেশে যে অর্ধশতেরও অধিক অপরাধচক্র দেশব্যাপী অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তাদের বেশ কয়েকটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নেতা-কর্মী এবং নেতাদের আত্মীয়-স্বজন। ফেনীর সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের আওয়ামী লীগের নেতা আবু তাহের, নারায়ণগঞ্জের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, ঢাকার সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, কামাল মজুমদার, ডাঃ ইকবাল, হাজী সেলিম, জাতীয় সংসদের সরকারি দলের চীফ হুইপ হাসানাত আবদুল্লাহ, মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন

www.pathagar.com

চৌধুরী মায়া এরই মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে সবিশেষ পরিচিত হয়েছেন তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য। জাতীয় পত্র-পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে তাদের এবং তাদের সন্তান-সন্ততির কর্মকাণ্ডের বিবরণ ছাপা হয়ে থাকে।

বিগত পাঁচ বছরে দেশে আইন-শৃঙ্খলার সীমাহীন অবনতির মূলে রয়েছে ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতাশ্রয়ী এবং দলকেন্দ্রিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। আওয়ামী নেতা-কর্মীদের প্রচলিত আইনের ঊর্ধ্বে রেখে, শত অপরাধ সত্ত্বেও তদের পুলিশী তৎপরতার বাইরে রেখে দেশব্যাপী এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তাদের দেখাদেখি পেশাদারী সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত এবং ছিনতাইকারীরাও উৎসাহিত হয়ে ওঠে সকল দুষ্কর্মের উদ্যোগে। আওয়ামী লীগের এক অঙ্গ সংগঠনের নেতা তাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের শতক উদযাপন করেও আইনের আওতায় আসেনি। আইন-শৃঙ্খলার দায়মুক্ত হয়ে, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের নিপীড়নে নিয়োজিত থেকেছেন এবং সুযোগ বুঝে তাদের কেউ কেউ অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়েছে। ফলে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার রাজনীতির এই কালে আইন-শৃঙ্খলার এই বেহাল অবস্থাই তো স্বাভাবিক। তাই দীর্ঘ পাঁচ বছরে বাংলাদেশে সুশাসনের প্রত্যয়টি নির্বাসিত হয়েছে, ক্ষমতার রাজনীতির পুতিগন্ধময় আবেশে শত আবর্জনার মধ্যে ঢাকা পড়েছে অনায়াসে। নিরাপত্তাহীনতা চারদিকে এতই গভীর হয় যে, দীর্ঘ পাঁচ বছরের শাসনামলের শেষলগ্নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও বিশেষ নিরাপত্তা বেষ্টনীর আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

ডঃ খলিলুর রহমান

আওয়ামী আমলে দখলের রকম-ফের

ডেটলাইন ঃ ৯ অক্টোবর ১৯৯৯

ক্ষমতা দখল: জনগণ যে কথা কোনোদিনই ভুলবে না তা হল- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী ঢাকার নিরীহ জনগণের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, কুখ্যাত জেনারেল ইয়াহিয়া খান তৎকালীন আওয়ামী নেতাদের সাথে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে হত্যাযজ্ঞের প্রস্তুতি নেয়। আর আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ তাদের সে পরিকল্পনা ২৫ মার্চ সময় পর্যন্ত ধরতে পারেনি। ২৭শে মার্চ, ১৯৭১ কার্ফ্যু শিথিল হওয়ার সাথে সাথে লাখ লাখ নগরবাসী হেঁটে শহরের বাইরে যাওয়ায় ব্রতী হন। কি যে করুণ সে চিত্র। কে তাদের আশা দেবেন, কে তাদের ভরসা দেবেন, কোন পরিণতি হচ্ছে দেশের? ঠিক সে সময়েই দিশেহারা তরুণ, তরুণীসহ জনগণ একটি আহবানে আবেগে আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েন। কি করতে হবে বুঝে ফেলেন, সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও হতাশা দূর করে দেখতে পান মুক্তির আলোকোচ্ছটা, মুক্তির আহবান- সে সময়ের মেজর জিয়ার উদাত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা। জীবন বাজি রেখে জনগণ শুরু করে স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে আওয়ামী লীগের অবদানের চেয়ে পুরো অবদানের দাবিদার এ দেশের জনগণ-রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল স্তরের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু দলীয় দখলের জন্য জনগণ স্বাধীনতার সুখ লাভ থেকে বঞ্চিত হলেন। এখানেও কাজ করেছে রাষ্ট্রনীতির অভাব ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, দলবাজি ও দলীয়করণ। জনগণকে পেটানোর জন্য রক্ষীবাহিনীসহ নানা পেটোয়াবাহিনী গঠন করা হয়। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র-জনতা, জাসদ কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নির্যাতন করা হয় লাখ লাখ জনতাকে। চারটি মাত্র দৈনিক খবরের কাগজ জীবিত রেখে বাকিগুলোকে কণ্ঠরোধ করে মেরে ফেলা হয়। চাপিয়ে দেয়া হয় বাকশালী শাসন। দেশে দেখা দেয় সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ। আওয়ামী লীগের ১ম সংস্করণের বিলুপ্তির পর দেশে শান্তি ফিরে আসে। দেশ সমৃদ্ধির দিকে ধাবিত হয় তখন দেশের নেতা ছিলেন স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। পরবর্তীতে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দীর্ঘ অপশাসনের পর বিএনপি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬-এর প্রথম ৩ মাস পর্যন্ত দেশ চালায়। ১৯৯১-এর নির্বাচনে পরাজয়ের পর আওয়ামী লীগ প্রধানের উক্তি ছিল "একদিনের জন্যও বিএনপিকে শান্তিতে থাকতে দিবো না"। বাস্তবেও তাই করেছিলেন ১৭৩ দিনের জ্বালাও-পোড়াও এবং হরতাল, বিদেশী দাতাদেরকে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য না করার আহবান জানানোসহ আরো কত কি করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দল

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ। তা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত ছিল, সকল ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। বাণিজ্য, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্যের ক্ষেত্র হিসেবে রূপ লাভ করেছিল। এসবের রূপকার ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

জাতীয় সংসদের ১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচনের সময় বিগত কৃতকর্মের জন্য করজোড়ে মাফ চেয়ে, তসবীহ জপে, ইসলামের লেবাস পরে, নানা মুখরোচক ওয়াদা করে বিতর্কিত নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে আওয়ামী লীগ ২য় বার দেশের ক্ষমতা দখল করে। তখনকার প্রধানমন্ত্রীর ওয়াদা ছিল সমাজ থেকে সন্ত্রাস দূর করবেন, সরকারি কর্মচারীদের পুনঃনিয়োগ বন্ধ করবেন, নিবর্তনমূলক কালো আইন বাতিল করবেন, বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন দেবেন, টেলিভিশনে মুখ দেখাবেন না, নারী নির্যাতন বন্ধ করবেন-আরও কত কি? কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর জনগণ অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন সেই পুরনো স্বভাবেরই পুনরাবৃত্তি। সেই ধিক্কৃত বাকশাল পুনঃ প্রতিষ্ঠারই প্রাণান্তকর অপচেষ্টা। এ সরকার দেশ ও জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, জনরায় উপেক্ষা করে বিদেশী প্রভূদের খুশী করে ক্ষমতা দখলে রাখার যে অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন-এতে জনগণ ভীত, সন্ত্রস্ত, দিশেহারা ক্ষুব্ধ ও হতাশ।

হল দখল: আওয়ামী সরকার ক্ষমতা দখলের পর পরই শুরু হয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল দখল ও বিরোধীদলীয় ছাত্রদের বিতাড়ণের পালা। এসব কর্মকাণ্ড বহুল প্রচারিত ও আলোচিত বিধায় সকলেই তা অবগত আছে। ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে সরকারি ছাত্র সংগঠন কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখলের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ, মহসিন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জামাল উদ্দিন আহমেদ ও প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম পদত্যাগ করেন। ক্রমাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবকটি হল সরকারি সমর্থক ছাত্রগণ দখল করে নেয়। তা ঘটে প্রশাসন ও পুলিশের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ও ইঙ্গিতেই।

নাম দখল ও পদ দখল: আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পরই নজর দেয় দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, নামকরণের দিকে। সকল প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদগুলো, বিশেষ করে প্রতিরক্ষাবাহিনী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পদগুলো যেমন-ভিসি, প্রো-ভিসি, ব্যাংকপ্রধান, দূতাবাস ও কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদে বেছে বেছে একনিষ্ঠ দলীয় কর্মী উপদেষ্টাদের যেভাবে নিয়োগ দেয়া হয়, তা নজিরবিহীন । শুরু হয় আত্মীয়করণের পালা। উপযুক্ত অনুপযুক্ত, অবসরপ্রাপ্ত-যে কেউ প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় হলেই হলো- নির্লজ্জভাবে তাদেরকে বড় বড় পদ দান করা হয়েছে - জনগণ ও দেশের স্বার্থ চিন্তা করা হয়নি সে ক্ষেত্রে কখনও। এরপরই নজর পড়ে নামকরণ করে প্রতিষ্ঠান দখলের দিকে। কোন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে নয়, পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত ও নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম, ব্রীজ,

www.pathagar.com

কালভার্ট ও রাস্তার নাম পাল্টিয়ে নিজের পিতা-মাতা, ভাই-ভাবী, ফুফা-ফুপুর নাম লাগিয়ে দেয়া হয়। উদাহরণ আছে ভুরি ভুরি। আইপিজিএমআর হল- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ইপসা হল-বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা স্টেডিয়াম হল- বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, যমুনা ব্রীজের নাম হল- বঙ্গবন্ধু সেতু। কিন্তু এখনো একটি বড় স্থাপনার নাম পূর্বের নামই রয়েছে।

প্রশাসন ও পুলিশ দখল: সরকারি অফিস ও সচিবালয়ে এবং পুলিশ প্রশাসনে বেছে বেছে দলীয় লোক বসিয়ে, আত্মীয়করণ করে, আঞ্চলিকতার পরাকাষ্ঠা অনুসরণ করে, পুলিশকে অবৈধ কাজ করার ফাঁক ও সুযোগ দান করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ লোকের জীবন ধনমান এ সরকারের সময় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ, সবখানেই সরকারি দখল, ঘুষ, অন্যায় ও সন্ত্রাসের থাবা মহাসমারোহে বিস্তারলাভ করেছে। ফলে এ দেশের প্রশাসন-কর্মকর্তা ও পুলিশের দৌরাত্ম্য বেড়েছে অপরিসীম। তারা বেপরোয়াভাবে যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। তারাই ছত্রদান করেছে সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের। এ দেশ এ জন্য ঘুষ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির এক স্বর্গরাজ্য। জীবন আজ অতিষ্ঠ। রাস্তায় মেয়েদের চলাফেরা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীরা পুলিশ ও সরকারি মাস্তান-কর্মকর্তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। আজ সন্ত্রাসীদের হাতে থাকে পুলিশেরই অস্ত্র। এই পুলিশের অন্যায় ও অমানুষিক নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কত মায়ের সন্তান। এই ১৯৯৯ সালের শুধু ফেব্রুয়ারিতেই খুন হয়েছে ১৯০জন, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪৮টি এবং অপরাধ, ডাকাতি, রাহাজানি সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য-ছয় মাসে এর পরিমাণ খুন ১১৭৩, ধর্ষণ ৩৮০। এদের কীর্তি ও কাহিনী লিপিবদ্ধ করার দরকার পড়ে না। কারণ, জনগণ আজ ভুক্তভোগী, তাদের কার্যকলাপ ও অকীর্তি জনসাধারণের মুখে মুখে।

জাতীয় সংসদ দখল: আজ জাতীয় সংসদ অশ্লীল অশ্রাব্য বাক্যবর্ষণকারীদের দখলে। যে সকল সংসদ সদস্য পরিবারিক সূত্রেই ভদ্রঘরের, মর্যাদাবান-তাঁদের জাতীয় সংসদে বসে দেশের জনগণের কথা চিন্তা ও বাস্তবায়নের কর্মপন্থা তৈরীর সুযোগ তিরোহিত। কারণ, সংসদে ভালো কাজের পরিবর্তে কোনো সদস্য কত বেশী জঘন্য ভাষায় কথা বলতে পারেন, তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছে। রেডিও-টিভিতে সংসদ কার্যক্রম প্রচারের সময় তা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এ সংসদে পুতিদুর্গন্ধময় অত্যন্ত নিচু স্তরের বাক্য বিনিময় শুরু হয়েছে এ সরকারের আমলেই। অথচ দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, গঙ্গার পানি চুক্তিসহ আরো অনেক কাজ করা হচ্ছে জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে। সংসদ সদস্যগণ আজ আর সংসদ অধিবেশনে যেতে উৎসাহবোধ করেন না এসব কারণেই।

www.pathagar.com

হরতালের সময় রাস্তা দখল: বর্তমান সরকারি দল ১৭৩ দিন হরতাল করেছিলেন, যখন তারা বিরোধী দলে ছিলেন। শুধু তাই নয়, জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুরের মাত্রাও ছিল বর্ণনাতীত। অফিসগামীদের দিগম্বর করে ছাড়া হয়েছে হরতালের সময়। আজ তাদের উল্টো কাজ। হরতালের সময় সরকারি বাহিনী, সন্ত্রাসী ও পুলিশ রাস্তা দখল করে থাকে। বিরোধীদলীয় ছাত্র, কর্মী ও নেতাদের রাস্তায় নামতে দেয়া হয় না। রাস্তায় নামলেই গুলি, নির্যাতন ও লাঠিপেটা করা হয়। ঝানু পলিটিশয়ান, নেতা-নেত্রী-কাউকে রেহাই দেয়া হয় না, বিএনপি অফিস ঘেরাও করে রাখা হয়। জোর করে বাস চালনা ও দোকান খোলা রাখার প্রয়াস নেয়া হয়। ১১ মে, ১৯৯৯ হরতাল চলাকালে মিছিলে যোগদানকারী বিএনপি-র এক নেত্রীর ওপর পুলিশ যেভাবে ঝাঁপিয় পড়ে তার সচিত্র বিবরণ দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পড়ে ও চোখে দেখে সমগ্র জাতি স্তম্ভিত, মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাংলাদেশের মতো জায়গায় এও কি সম্ভব যে, একজন মিছিলকারী মহিলার পরনের শাড়ি কয়েকজন পুলিশ সজোরে খুলে নেয়ার চেষ্টায় রত হবে। আরও দেখা গেছে, হরতাল প্রতিরোধে পুলিশের অস্ত্র হাতে তুলে নেয় সরকারি সন্ত্রাসী। নিজেরা যা করবেন, অন্যদের তা করিতে দেয়া হবে না- এই হল বর্তমানের সরকারি নীতি।

খেলাধুলার সাফল্য দখল: বাংলাদেশের খেলাধুলার সাফল্যকেও দলীয় সাফল্য দেখিয়ে তা দখল করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। বাংলাদেশ আইসিসিতে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করলে সারাদেশে এক অভূতপূর্ব আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। সে জয়ের সুবাদে ক্রিকেটপ্রেমীদের সংখ্যা দেশে বেড়ে যায়। আইসিসি ট্রফি জিতে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এটা দেশের সকলের জন্য গৌরবের। তারপর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ। বাংলাদেশ দল সত্যিকার অর্থেই অতি চমৎকার ও চমকপ্রদ খেলে স্কটল্যান্ডকে ২২ রানে এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল পাকিস্তানকে অতি দাপটের সাথে ৬২ রানে পরাজিত করে বিরল সফলতা লাভ করে। এ আনন্দ ছিল পুরো দেশবাসীর। কিন্তু না, আওয়ামী সরকার এ নিয়ে করেছেন অতিরিক্ত দলীয় সফলতা। সরকারি কোটি কোটি টাকা খরচ করে খেলাধুলার এ সাফল্যকে দলীয় দখল প্রদান করা হয়েছে। দলীয়ভাবেই যেন তাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। টাকা খরচ হয়েছে সরকারি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দখলদার: আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের দখলদারের দাবি করে থাকেন কথায় কথায়। যারাই সরকারি দল করবেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি আর এই সরকারের বিরোধিতা করলেই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি। এ থিওরির ফলে আওয়ামী লীগ না করায় অসংখ্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কথিত হচ্ছেন রাজাকার রূপে আর প্রকৃত রাজাকার ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীগণ সরকার সমর্থন করে হয়ে যাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দখলদার। এ বড় অন্যায় ও নির্মম। অনেকেই ১৯৭১ সালে রাজাকার ছিলেন। বর্তমান সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী।

www.pathagar.com

বস্তি দখল: এ সরকারের আমলে ঘটেছে ঐতিহাসিক বস্তি উচ্ছেদ ও বস্তি দখলের রাজনীতি। এ সরকারের এক প্রতিমন্ত্রী জনাব আফসারউদ্দিন আহমেদ- এর মন্ত্রিত্ব যায় ভাসানটেক বস্তি উচ্ছেদের জন্য। আবার অতি উৎসাহী হয়ে বস্তি উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে এ সরকারের সাম্প্রতিক রাজনীতি। তাও সব বস্তি নয়, বেছে বেছে বস্তি উচ্ছেদ করা হয়েছে। অনেকেই বস্তি উচ্ছেদ সমর্থন করেন তবে সাথে সাথে আশা পোষণ করেন যে, বস্তি উচ্ছেদ করে প্রাপ্ত খালি জায়গাগুলো আওয়ামী নেতা-কর্মীরা-মাস্তানরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবেন না তো। হাইকোর্ট ও ডঃ কামাল হোসেন বস্তি উচ্ছেদ অভিযানের সাথে জড়িয়ে পড়লে হাইকোর্ট চত্বরে ও ডঃ কামাল হোসেনের বাড়ির সামনে বস্তিঘর তুলে রাজনীতি করা হয়। এ এক অভাবনীয় রাজনীতি ছিল।

নদী দখল: দিন দিন বুড়িগঙ্গা নদী এ সরকারের সময় সংকুচিত হয়ে পড়েছে। নদীর ওপর ঘরবাড়ি করে, বিল্ডিং গড়ে অত্যন্ত অভাবনীয়ভাবে আওয়ামী নেতা-মাস্তানরা নদী দখল করে নিচ্ছে। আর দখল করা হচ্ছে গুলশান-বনানীর লেকসহ অনেক লেক। সবই করেছে সরকারি এমপি-মন্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজন ও তারা নিজেরা। এ নিয়ে ভুরি ভূরি সচিত্র প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং সকলেই তা অবহিত। কামরাঙ্গীরচর ও অন্যান্য এলাকার প্রচুর খাস জমি সরকারি ক্যাডাররা এমপির হুকুমে দখল করে নিচ্ছে। ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অফিসও নিশ্চয়ই জড়িত অথবা অসহায়।

ডগ-স্কোয়াড দিয়ে দখল: গরীবের কোটি কোটি টাকা খরচ করে গঠন করা হয়েছে ডগ স্কোয়াড। আপাতদৃষ্টিতে তাদের কাজ দুষ্কৃতকারী পাকড়াও করা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা, গোলা-বারুদ, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, বিমানবন্দর তল্লাশি, ভিআইপিদের নিরাপত্তা বিধান। প্রকৃতপক্ষে এ সরকার ডগ-স্কোয়াডকে ব্যবহার করেছে জনগণের বিরুদ্ধেই এবং আন্দোলনরত ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে। বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের কাজ ও সরকারি প্রতিপক্ষকে নির্যাতন করার কাজেই ডগ-স্কোয়াডের ব্যবহার হচ্ছে বা আরও হবে বলেই সবাই ধারণা পোষণ করে থাকেন। অতি সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা ও সেক্রেটারিয়েটে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন দমনে ও দখলে যেভাবে ডগ স্কোয়াড ব্যবহার করা হয় তা সকলেরই জানা।

রাজউকের প্লট দখল: নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে বেছে বেছে দলীয় ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও লোকদের মধ্যে। আর রাজধানীর সবচেয়ে দামী এলাকা গুলশান-বনানী-উত্তরায় ৩০১টি আবাসিক প্লট সরকার নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন। এ ভাগ বাঁটোয়ারা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী পরিবারের ৩৮ জনসহ দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে-এতে কোনো নিয়মনীতি পালন করা হয়নি। এটা ছিল এক চরম দলীয় ভাগ-বাঁটোয়ারা। রাজউক এর ইতিহাসে এ এক কলংকময় অধ্যায়।

www.pathagar.com

মাত্র ৪টি প্লট দেয়া হয় বিরোধীদলীয় এমপি ও বিচারপতিদের। জনগণ ফুঁসে উঠেন। ফলে সরকার সে প্লট বরাদ্দ বাতিল করতে বাধ্য হয়। এখনও অনেকেরই ধারণা যে, অগোচরে এসব প্লট সরকারি দলের লোকদের দখলেই যাবে।

ভারত কর্তৃক বাজার ও এলাকা দখল: এ সরকারের আমলেই বাংলাদেশ ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে একতরফাভাবে। বাংলাদেশে ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রবেশ করছে দেধারসে। দখল করে নিচ্ছে গার্মেন্টস, রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধ, যন্ত্রপাতি, মাছের বাজারসহ সব বাজার। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কল-কারখানা। ভারতের আগ্রাসী ভূমিকা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় অহরহ তারা ঢুকে পড়ছে, বাংলাদেশীদের হত্যা করছে। ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। সীমান্ত এলাকার লোকজন সরে ভেতরে বাংলাদেশের গভীর এলাকায় বসবাস করছে। এভাবে হাজার হাজার একর জমি, ঘরবাড়ি , বাজার বিরান ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। ভারতীয়রা স্বচ্ছন্দে সেখানে দখল নিচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম নতজানু পররাষ্ট্রনীতির জন্যই তা ভারত করে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশের ওপর দিয়ে করিডোর আদায়ের কূটকৌশলে ভারত মেতে উঠেছে তাদের অনুগত বাংলাদেশী সরকারকে ব্যবহার করে।

এই দখলের রাজনীতিতে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সবচেয়ে সুখের ও আশার খবর হল যে, সরকার বিচার বিভাগকে দখল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বারবার ফেল করছেন। বরং তাদের কাছ থেকে সরকার তার বেফাঁস কথাবার্তা, কার্যকলাপের ফলে একাধিকবার তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয়েছেন। ভবিষ্যতেও দেশের বিচার বিভাগ কোনোরূপ চাপের মুখে নতিস্বীকার না করে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন বলে তাদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা।

ব্যাংক দখল: এ সরকারের সময়ে ব্যাংক দখলের মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে যা সভ্য সমাজে চিন্তার খোরাক হিসেবেও অনেকেই ভাবতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। গত ২৬ আগস্ট মতিঝিলস্থ ফেডারেশন ভবনের পঞ্চম তলায় অবস্থিত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সভায় সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে বৈধ পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বোর্ড সদস্যদের কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে জনাব আখতারুজ্জামান বাবু নিজেকে চেয়ারম্যান ও স্ত্রী, পুত্রদের পরিচালক করে একটি বোর্ড গঠন করেন। এ ব্যাপারে মতিঝিল থানায় কয়েকটি মামলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও হাইকোর্ট পর্যন্ত ঘটনা গড়ায়। পরবর্তীতে ব্যাংকের পূর্বের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বেই ব্যাংকের বোর্ড মিটিং হয়েছে। ব্যাংকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের এমন নজির আর দ্বিতীয়বার ঘটেছে বলে মনে হয় না। তবে ব্যাংক ডাকাতি ও ১৯৯৬-পূর্ব হরতালের সময় ব্যাংক পুড়িয়ে দেয়া ও লুটপাটের ঘটনা জনগণ প্রত্যক্ষ করেছেন।

www.pathagar.com

হারুনর রশীদ

২১ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার শেখ হাসিনা স্টাইল

ডেটলাইন ঃ ১৪ জুন ২০০০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগীদের মতে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার অবসানের ফলে গণতন্ত্রেরও অবসান ঘটে এবং স্বৈরাচারের উদ্ভব ঘটে, যা ১৯৯৬ সালে তাঁর সরকার ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। মনে হয়, তাঁদের মতে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাটাই হলো গণতন্ত্র।

যা-ই হোক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪ বছর ধরে বিরামহীনভাবে বলে যাচ্ছেন যে, যে একুশ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলো না, সেই একুশ বছরে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়ংকর জঞ্জাল জমে গেছে। তিনি অবশ্য এটাও বলেছেন যে, একুশ বছরের জঞ্জাল রাতারাতি তা সাফ করা যাবে না, এজন্য সময় লাগবে। তবে তাঁদের ভাবসাব থেকে এটা বুঝা যায় যে, ২১ বছরের জঞ্জাল সাফ করার জন্য পরিশ্রম করতে করতে বেচারা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা একেবারে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছেন।

২১ বছরের জমে থাকা জঞ্জাল সাফ করার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

অর্থনীতি

১. চার বছরে ১৮ বার টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

২. শেয়ার বাজারের ইনডেক্সকে সেই যে ৩৭০০ থেকে ৫০০-এ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেটাকে উঠতে দেওয়া হয়নি।

৩. বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে।

৪. শিল্পোৎপাদনকেও সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, অনেক চালু মিল-কারখানাই গত চার বছরে বন্ধ হয়ে গেছে।

৫. বিদ্যুৎ বিভ্রাট, লালফিতার দৌরাত্ম্য, যানজট ইত্যাদিকে এমনভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে বিদেশী বিনিয়োগ তো দূরের কথা, দেশী কোন উদ্যোক্তাও আর বিনিয়োগে আগ্রহী না হয়। গত চার বছরের ভিয়েতনাম ও মায়ানমারের মতো দেশেও যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে, বাংলাদেশে তার বিশ ভাগের এক ভাগও হয়নি।

www.pathagar.com

৬. এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনসমূহেও ট্রেড ইউনিয়বাজি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৭. রাজস্ব বাজেটের সীমাহীন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সরকার সর্বকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ (প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা) নিয়েছেন। ২০০০-২০০১ সালের বাজেট দৃষ্টে মনে হয়, এ বছর সরকারকে ব্যাংক থেকে অন্ততঃ ৫০০০ কোটি টাকা ঋণ নিতে হবে। ব্যাংক লিকুইডিটির সিংহভাগ সরকার নিয়ে নেওয়ায় উৎপাদনমূলক খাতে বিনিয়োগ আর কোন ব্যাংকের পক্ষেই বলতে গেলে সম্ভবপর হচ্ছে না।

৮. সীমান্ত প্রায় উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সর্বপ্রকারের ভারতীয় পণ্য বন্যার মতো ঢুকে বাংলাদেশের বাজারকে একদম সয়লাব করে দিতে পারে।

৯. ঘুষ-চাঁদাবাজি ইত্যাদিকে কার্যতঃ ওপেন জেনারেল লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. মন্ত্রী-এমপি-নেতারা যাতে নিশ্চিন্ত-নির্ভয়ে আমেরিকায়-ইউরোপে বাড়ী, প্যালেস ইত্যাদি ক্রয় করতে পারেন তার জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

১১. চার বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য গড়ে প্রায় ২৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর গুণমুগ্ধরা নিশ্চয়ই সুনিশ্চিত যে, তাঁদের সরকার যদি আরো এক টার্ম ক্ষমতায় থেকে উপরোক্ত প্রক্রিয়াসমূহ আরো জোরেশোরে চালিয়ে যেতে সক্ষম হন তাহলে ২১ বছরের জঞ্জাল পুরোপুরি সাফ করে ফেলাই তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হবে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

১. খুন, হত্যা, নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদিকে সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

২. হাইজ্যাক, চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদিকে কার্যতঃ সম্পূর্ণ অবাধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন খোদ রাজধানীতেই ডাকাতরা ডাকাতি করে দিন-দুপুরে, সকলের চোখের সামনে দিয়ে। খুনও হয় একদম প্রকাশ্যে। হাইজ্যাক, চাঁদাবাজি ইত্যাদির তো কথাই নেই।

৩. পুলিশ যাতে একদম খোলাখুলি ঘুষ খেতে পারে, চাঁদা উঠাতে পারে, মানুষ খুন করতে পারে, ধর্ষণ করতে পারে, এমনকি রাস্তায় ছিনতাইও করতে পারে, তার সুযোগ-সুবিধাও কার্যতঃ সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের ১০০% জনগণের মধ্যেই এখন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের পুলিশের

www.pathagar.com

কাছে কোন মানুষ কোন অবস্থাতেই কোন সাহায্য বা প্রতিকার পাবে না, বরং পুলিশের কাছে গেলে শারীরিক, অর্থনৈতিক সকল দিক থেকে আরো বেশী নিপীড়ত ও নিগৃহীত হবে।

৪. অস্ত্রবাজিও এখন প্রায় ওপেন করে দেওয়া হয়েছে। সরকার দলীয় অস্ত্রবাজরা যে কোন উপলক্ষে পুলিশের পাশাপাশি দাঁড়িয়েও অস্ত্রবাজি করতে পারছে এবং তার ছবি জাতীয় পত্র-পত্রিকায়ও ছাপা হচ্ছে।

৫. ক্রাইমের প্রেরণা স্বরূপ ফেনসিডিল ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য আমদানী ও ব্যবহার এখন প্রায় অবারিত হয়ে গেছে। গত ৪ বছরে যে পরিমাণ ফেনসিডিল এসেছে, এর আগের ২১ বছরেও অতো ফেনসিডিল আসেনি।

৬. দলীয় নেতাকর্মী পর্যন্ত সকলে নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন, তা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

৭. পুলিশের সাথে পেশাদার ক্রিমিন্যালদের যোগসাজশের গোপনীয়তার অবসান ঘটানো হয়েছে।

৮. খোদ মন্ত্রীরাই এখন লাঠিমিছিল করে উচ্চ আদালতকে শাসিয়ে দিচ্ছেন এবং লাঠি কোথায় মারতে হয় তা শিখিয়ে দেওয়ার সুদৃঢ় অংগীকারও ঘোষণা করতে পারছেন। আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ২১ বছরের জঞ্জাল সাফ করার ব্যাপারে অবশ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পাচ্ছেন আমাদের নির্ভীক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম-এর কাছ থেকে। সরকার ও সরকার সমর্থকরা নিশ্চয়ই আশা করছেন যে, আদালতের লাঠি মারার হুমকি অব্যাহত রাখলে এবং প্রয়োজনমতো লাঠি কোথায় মারতে হয় তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলে আইন-আদালতের জঞ্জাল পালিয়ে বাঁচারই কোন পথ পাবে না।

প্রশাসন

১. ওসি, টিএনও, ডিসি, এসপি, পুলিশ কমিশনারসহ সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদেই যাতে বর্তমান সরকারি দলের সমর্থক ব্যতীত অন্য কোন অফিসারের অস্তিত্ব না থাকে, সেই পরিকল্পনার জোর বাস্তবায়ন চলছে।

২. শোনা যায়, অর্থ আহরণ ও ক্ষমতার ব্যবহার-অপব্যবহারের পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে, বিশেষতঃ পুলিশকে। প্রশাসনকে যদি সম্পূর্ণরূপে দলীয়কৃত করে ফেলা যায়, তাহলে সেখানেও যে আর কোন প্রকার জঞ্জালই জমতে পারবে না এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর গুণমুগ্ধরা মনে হয় খুবই সুনিশ্চিত।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

১. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বিধায় এই ক্ষেত্রে জঞ্জাল অপসারণের ওপর খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ১০০% ছাত্র-ছাত্রীই যাতে নির্ভয়ে নকলবাজি করতে পারে, তা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

২. দলীয় ক্যাডারদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও যাতে মুখ্য নকল সাপ্লাইয়ার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন, তাও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

৩. সরকার দলীয় ক্যাডাররা যাতে যে কোন উপায়ে বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও হল দখল করে নিয়ে নিতে পারে, তার সুযোগও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

৪. নিউ ইয়ার ডে, পয়লা বৈশাখ ইত্যাদি উপলক্ষে গভীর রাতেও যাতে বাঁধনরা প্রকাশ্যে রাজপথে বাঁধনহারা হতে পারে, তার পরিবেশও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

৫. ভারতীয় যৌনাবেদনময়ী নায়িকা-প্রতিনায়িকাদের অধিকতর হারে বাংলাদেশে আনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যাতে বাংলাদেশের নায়িকারাও বস্ত্র উন্মোচনের সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত হতে পারে।

৬. লেডী রংবাজ, চিটার নাম্বার ওয়ান, খাইছি তোরে, রানী কেন ডাকাত, যাবি কই, সন্ত্রাসী মাস্তান, গুন্ডা নাম্বার ওয়ান, লেডী র‍্যাম্বো জাতীয় চলচ্চিত্রই যাতে শুধু বাংলাদেশে তৈরী হয় ও ছাড়পত্র পায়, তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার সম্ভবতঃ আশাবাদী যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপরোক্ত ট্রেন্ডকে যদি ধরে রাখা যায়, তাহেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও নিস্কন্টক হবে এবং সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করাও খুবই সহজসাধ্য হবে।

গণতন্ত্র

১. বিরোধীদলীয়দের আর পারতপক্ষে রাস্তায় নামতেই দেয়া হচ্ছে না। বিরোধী দলের অফিসের ভেতরে ঢুকেই এখন পুলিশ গুলী, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে পারছে। পুলিশের পাশাপাশি দলীয় ক্যাডাররাও অবৈধ অস্ত্র নিয়ে বিরোধীদলীয়দের মিছিলে প্রকাশ্যে হামলা চালাচ্ছে।

২. পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয়দের বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন পার্লামেন্টের সুযোগ্য স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। যিনি এক সময় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সুযোগ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

www.pathagar.com

৩. বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেই পৌরসভা নির্বাচন ও চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশন নির্বাচন সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. একইভাবে বিরোধী দলহীন উপজেলা ও জেলা পরিষদ নির্বাচনের জোর তোড়জোড় চলছে।

৫. আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রী ও প্রার্থীরা যাতে মাঠেই নামতে না পারেন, তা সুনিশ্চিত করারও নাকি জোর আয়োজন চলছে।

৬. যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের নিরঙ্কুশ স্তুতি গুণগান ও মাহাত্ম্য ছাড়া আর কোন কিছুই প্রচার করতে না পারে, তাও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

৭. সরকারের সমালোচনাকারী পত্র-পত্রিকা যাতে কোন সরকারি বিজ্ঞাপন ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট পেতে না পারে, তাও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

৮. পবিত্র পার্লামেন্টের মধ্যেই দেশের প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেত্রীর চরিত্র নিয়ে অশ্লীল কটাক্ষ করে পরম আনন্দ লাভ করেছেন এবং তাঁর দলীয় সংসদ সদস্যরাও তা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেছেন। এমনকি খোদ স্পীকার মহোদয়ও হাস্যমুখে এ ধরনের বক্তব্যকে উৎসাহ দিচ্ছেন। সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের অনেকে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণকে অভিনন্দিত করেছেন।

৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা আগামী পার্লামেন্টে জিতবেন বলে আগাম ঘোষণা দিয়েই রেখেছেন। তাঁরা আরো ঘোষণা দিয়েছেন যে, আগামী বাজেটও তাঁরাই তৈরী করবেন, অন্য কেউ নয়। গত ২১ বছর ধরে গণতন্ত্রের ওপর যে জঞ্জাল জমা হয়েছিল, উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের ফলে তা ইতিমধ্যেই অনেকটা অপসারিত হয়ে গেছে। এখন যদি উপজেলা ও জেলা পরিষদ নির্বাচনটা একতরফাভাবে সেরে নেয়া যায় এবং আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিরোধীদলীয়দের মাঠে নামতে না দেয়াটা সুনিশ্চিত করা যায়, তাহলে বাকি জঞ্জালটুকুও অনায়াসে সাফ করে ফেলা সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়। যে রকম নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক না কেন, কোনক্রমে একবার পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ বানিয়ে নিয়ে বর্তমান সংবিধানটাকে সংশোধন করে, যদি আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য কোন দলের ক্ষমতায় যাওয়ার পথটা রুদ্ধ করে দেয়া যায়, তাহলে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভবের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না এবং বংশানুক্রমিকভাবে চমৎকার একদলীয় গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভবপর হয়।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনা

১. খবরে প্রকাশ, এ পর্যন্ত ছোট-বড়-মাঝারি মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম বঙ্গবন্ধু বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে রাখা হয়েছে। আরো কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম রাখা হয়েছে দলীয় নেতা-নেত্রীদের নামে। যেমন- যমুনা সেতুর সিরাজগঞ্জ অংশের রেল স্টেশনের নাম শহীদ মনসুর আলী রেল স্টেশন। ২০০০-২০০১ সালের বাজেটেও প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান-স্থাপনা ইত্যাদি বাবদ।

২. মুক্তিযুদ্ধের নতুন ইতিহাস লেখানো হচ্ছে যাতে জাতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এটাই জানতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল ব্যতীত ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে আর কারো কোনরূপ অবদান ছিল না।

৩. 'মুক্তিযোদ্ধা'র নতুন সংজ্ঞা আবিষ্কার করা হয়েছে ঃ যাঁরা আওয়ামী লীগ করবেন শুধু তাঁরাই মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭১-এ তাঁদের ভূমিকা যাই-ই হোক না কেন, যেমন শামসুল হুদা চৌধুরী, কবির চৌধুরী কবি শামসুর রাহমান প্রমুখ। অপরদিকে যাঁরা আওয়ামী লীগ করবেন না তাঁরা অবশ্যই রাজাকার-আলবদর, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হলেও, যেমন জেনারেল জিয়াউর রহমান বীরোত্তম, মেজর এম এ জলিল, জেনারেল মীর শওকত আলী বীরোত্তম প্রমুখ।

৪. পার্বত্য শান্তিচুক্তি সুসম্পন্ন হয়েছে, যাতে যে কোন সময় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সমস্ত বাঙালিকে উৎখাত করে দেয়া সম্ভবপর হয় এবং 'জুম্মল্যান্ড' কায়েমের মিশনকে নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন করা যায়।

৫. ভারতে গ্যাস রফতানীর আয়োজনও প্রায় সুসম্পন্ন হয়েছে। ভারত নেপাল ও ভুটানকে কখনই নিঃশর্ত ট্রানজিট দিতে রাজি না হলেও, ভারতকে কার্যতঃ একতরফা ট্রানজিটই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৬. বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছে ফেনসিডিলসহ যাবতীয় ভারতীয় বৈধ-অবৈধ পণ্যের একচেটিয়া বাজারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সমর্থকরা নিশ্চয়ই আশা করছেন যে, বাংলাদেশের ছোট-বড় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা, রাস্তাঘাটের দোকানপাট ও বাড়ীঘরের নাম যদি বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ ও দলীয় লোকদের নামে করে ফেলা যায়, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলীয় লোক ব্যতীত অন্য কারো অবদানের কথাও উল্লেখ আছে, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত এরূপ সমস্ত ইতিহাস যদি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে যদি 'জুম্মল্যান্ড' কায়েমের কাজ সুসম্পন্ন করা যায় এবং বাংলাদেশের গ্যাস যদি নির্বিবাদে ভারতে রফতানী করে দেওয়া যায় তাহলে বাংলার মাটিতে মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চিরস্থায়ীভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বিবিধ

১. চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে লোডশেডিংকে অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়েছে। এখন ঢাকা শহরেই ২৪ ঘন্টায় ১৭/১৮ বার পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে।

২. যানজট, পরিবেশ দূষণকেও নিয়ে আসা হয়েছে দুঃসহ পর্যায়ে। বছর দুয়েক পর ঢাকা শহরের এক মাইল পথ অতিক্রম করতে দু'ঘন্টারও বেশী সময় লাগতে পারে বলে আশা করা যায়।

৩. রাজধানী ঢাকায় ময়লা, জলাবদ্ধতা, স্যুয়ারেজ নিষ্কাশনহীনতা, ফুটপাত বেদখল, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, রাস্তায় রাস্তায় নোংরা আবর্জনার স্তূপ, যানজট, বিদ্যুৎহীনতা, পরিবেশ দূষণ, ক্রাইম, বস্তির প্রাদুর্ভাব ইত্যাদিকে এমন বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, রাজধানী ঢাকা থেকে ২৪ বছরের জঞ্জাল প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের অবদান আকাশচুম্বী ও অবিস্মরণীয়। অন্যান্য শহরের অবস্থাও নাকি তথৈবচ।

৪. দাতা ও সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের স্বার্থ ও পরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশের দারিদ্র্য লালন ও বৃদ্ধিকল্পে এনজিওদেরকে দেশটা প্রায় ইজারাই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা প্রাণপণ পরিশ্রমের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্র্য।

৫. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM) এখন কার্যতঃ এক মৃত ও তাৎপর্যহীন আন্দোলন। ফলে ন্যাম সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পৃথিবীর কোন সদস্য দেশই নাকি কোন উৎসাহ দেখায়নি। অথচ বর্তমান সরকারের বিশাল রাজনৈতিক কৃতিত্ব হিসেবে জনগণকে বুঝানো যাবে, দেশে জয়জয়কার পড়ে যাবে এবং এ 'বিশাল কৃতিত্ব' আগামী নির্বাচনে বিরোধী দলকে নাকানিচুবানি খাইয়ে দেবে-এই আশায় পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশের সরকার এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে এসেছেন এবং এর পেছনে ব্যয় করতে যাচ্ছেন জাতির হাজার হাজার কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সরকারের কার্যকাল আর মাত্র এক বছর। এই এক বছরের উপরে উল্লিখিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক-সাংস্কৃতিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের চরম উৎকর্ষতা সাধনপূর্বক ২১ বছরের সমস্ত জঞ্জাল সাফ করা একটু কষ্টসাধ্য হবে বলেই প্রতীয়মান হয়। অতএব, ২১ বছরের জঞ্জাল সাফ করতে হলে যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, আগামী টার্মতো অতি অবশ্যই '১৩ কোটি মানুষের মানসকন্যা' শেখ হাসিনা ও তাঁর দলকে ক্ষমতায় থাকতেই হবে। আর যদি আগামী টার্ম ক্ষমতায় গিয়ে বাকশাল ব্যবস্থাটা

www.pathagar.com

পুনঃপ্রবর্তন করা যায় কিংবা এমন কোন সাংবিধানিক পরিবর্তন করে ফেলা যায়, যাতে চিরকাল বাংলাদেশের গদিতে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগই উপবিষ্ট থাকতে পারে এবং শেখ হাসিনাই আমৃত্যু প্রধানমন্ত্রী থেকে যেতে সক্ষম হন, তাহলেই একদিকে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন নিস্কন্টক হয়, অন্যদিকে তেমনি স্বৈরাচারের উত্থান বা জঞ্জাল জমা হওয়ারও আর কোন আশংকা থাকে না। 'এক নেত্রী এক দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' সুপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনীতি ও গণতন্ত্রে সকল জঞ্জালকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়। চট্টগ্রাম ইপিজেডে যে কোন গাড়ী ইচ্ছে করলেই ঢুকে যেতে বা বেড়িয়ে আসতে পারে না। প্রত্যেক গাড়ীকেই গেইটে ভালোভাবে চেক করা হয়। অথচ এমন টাইট সিকিউরিটিসম্পন্ন ইপিজেডেই গত ৭ জুন বেলা ২-৪৫ মিনিটে একদল লুটেরা (যাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র) অনায়াসে ইপিজেড-এ ঢুকে পড়লো, লিমস লিমিটেড নামক কোরিয়ান প্রতিষ্ঠানটির ১৬ লক্ষ টাকা লুট করে নিল এবং নির্বিবাদে বের হয়ে চলে গেল। এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে কখনো ইপিজেড-এ ঘটেনি। এ রকম হাজারো ঘটনাই বহন করে জঞ্জাল পরিস্কারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বাক্ষর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার যে কি প্রচণ্ড গতিতে ২১ বছরের জঞ্জাল সাফ করে চলেছেন, তা যে কোন দিনের যে কোন সরকার-সমর্থক পত্রিকার পাতা ওল্টালেও একদম জাজ্বল্যমান হয়ে যায়। আশা করা যায়, যতোই দিন যাবে ততোই এই গতি প্রচণ্ড থেকে আরো প্রচণ্ডতর হবে। অবশ্য কিছু লোক সন্দেহ করে যে, এভাবে চলতে থাকলে, জঞ্জাল নয়, অদূর ভবিষ্যতে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশটাই হয়তো বা সাফ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, এ রকম যারা মনে করে, তারা নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী অপশক্তি, স্বৈরাচারের এজেন্ট। কি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রন্ত্রী ও তাঁদের গুণমুগ্ধরা? বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদও কি জঞ্জাল পরিষ্কারের এই প্রচণ্ড গতি দেখে খুবই মুগ্ধ ও আনন্দিত? নইলে তিনি ওই সুউচ্চ আসনটায় এমন নিশ্চিন্তে বসে আছেন কি করে?

www.pathagar.com

সোহেল মাহমুদ

শেখ হাসিনার এই ভয়াবহ 'সুখ' থেকে জাতি মুক্তি চায়

ডেটলাইন ঃ আগস্ট ২০০০

"বাংলাদেশের মানুষ একটু সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছে। এটা বিরোধী দলের সহ্য হয় না। তাই তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। তারা মানুষের ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার কেড়ে নিতে চায়।" এ কথাগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তিনি এমন আরো অনেক কথা বলেন যেগুলো সম্পর্কে প্রচুর কথা বলা যায়। তাঁর প্রতিদিনের কোনো না কোনো উক্তিতে এমন সব উপাদান থাকে যার ওপর কথা না বলে পারা যায় না।

শেখ হাসিনার উপর্যুক্ত মন্তব্যের সারবত্তা কতটুকু আছে তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত তিনি অহরহ দাবি করে থাকেন যে, তার সরকারই সবচেয়ে দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এখন তিনি মনে করেন, দেশের মানুষ তার সুশাসনে সুখের বাতাসে অবগাহন করতে শুরু করেছে। তাঁর সরকার কতটুকু দক্ষতা ও সততার পরিচয় দিয়েছে তার সার্টিফিকেট অন্য কেউ আজ পর্যন্ত দেয়নি। কোনো দেশী বা বিদেশী সংস্থা কেউই আওয়ামী লীগ সরকারের দক্ষতা ও সততার প্রশংসা করেনি। সাধারণত বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, ইসি, ইউএসএআইডি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি সংস্থার মন্তব্য গুরুত্বের সাথে সকলেই বিবেচনা করে থাকে। এসব সংস্থা তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন বা দলিলে সরকারের বিভিন্ন দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার ওপর আলোকপাত করেছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিনিয়োগে হতাশা, শেয়ার মার্কেটের ধ্বস্, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, দুর্নীতির ব্যাপকতা, আত্মীয়করণ ও দলীয়করণ ইত্যাদি সম্পর্কে হতাশাব্যঞ্জক বক্তব্য ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে ঐসব সংস্থার বিভিন্ন প্রকাশনায়।

দেশের অভ্যন্তরে কোনো নিরপেক্ষ সংস্থাও আওয়ামী সরকারের সততা ও দক্ষতার জন্য কোনো প্রশংসাসূচক বাক্য রচনা করেনি। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায়শই দুর্নীতির ফিরিস্তি ছাপা হয় যাতে সরকার সমর্থিত লোকদেরই জড়িত থাকার কথা বলা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সংবাদ সম্মেলন করে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির বিবরণ প্রকাশ করেছে। সরকার তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নিজের ঢাক নিজে পিটালেই তো সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কী বর্তমান সরকারকে দুর্নীতমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার মনে করে? শেখ হাসিনা নিজেও বুকে হাত দিয়ে এমন দাবি করতে পারবেন না। দুর্নীতির

www.pathagar.com

উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি নিজেই সংসদে বলেছেন যে, তার টেলিফোনে একজন পিয়নের চাকরিও হয় না। দেশের মানুষ যে অফিস-আদালতে, থানায়, কলে-কারখানায়, এক কথায় সর্বত্র দুর্নীতির আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে আছে তা কে না জানে। একদিকে দেশের সাধারণ মানুষটি পর্যন্ত জানে যে পুলিশ, প্রশাসন, সর্বত্রই যেখানে দুর্নীতির ছড়াছড়ি সেখানে শেখ হাসিনা যখন দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও দক্ষতার জন্য নিজেই নিজের সরকারের বন্দনা করেন তখন পরিহাসের হাসি না হেসে পারা যায় না।

শেখ হাসিনার সরকারের আমলে মানুষ নাকি সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছে। তিনি বোধ হয় প্রধানত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কৃতিত্ব দাবি করছেন। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তাঁকে পুরস্কারও দিয়েছে। এ জন্য তিনি আরো বেশি উচ্ছ্বসিত। প্রকৃতপক্ষে এর পূর্বেও বাংলাদেশ ২/১ বছর খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছিল। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। বস্তুত দেশের খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতি নির্ভর করে প্রধানত আবহাওয়ার ওপর। যে বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না সে বছর উৎপাদন ভালোই হয়। সরকারের সৌভাগ্য যে, পর পর তিন বছর বাংলাদেশ বন্যা, খরা বা সাইক্লোনে তেমনি আক্রান্ত হয়নি। আবার খাদ্য সাহায্যও এসেছে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৭ লাখ মেঃ টন করে। ফলে খাদ্য সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

শেখ হাসিনা দাবি করে থাকেন যে, তাঁর সরকার ৪২ লক্ষ মেঃ টন খাদ্য ঘাটতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। এটা আদৌ সত্য নয়। তখন খাদ্য ঘাটতি ছিল ২০ লক্ষ মেঃ টনের মতো। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার কারণে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৪২ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। সরকার নগদ অর্থে আমদানি করেছে ৮ লক্ষ টন। খাদ্য সাহায্য এসেছে ১৬ লক্ষ টন এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীরা আমদানি করেছে ৩০ লক্ষ মেঃ টন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় সরকারি খাতের চেয়ে বেসরকারি খাতই বেশি অবদান রেখেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খাদ্যশস্য আমদানির জন্য শূন্য ডিউটিসহ বেসরকারি খাতকে অনুমিত দিয়েছিল বিএনপি সরকার ১৯৯৫ সালে।

আরেকটি কথা, খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট হওয়ার অর্থ কী এটা যে, সকল মানুষ পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিতভাবে পাচ্ছে? মোটেই না। এখনও দেশের ৪৪% ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনার অর্থ নেই। এ তথ্য জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচির। খাদ্য প্রাপ্তির জন্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতা থাকা দরকার। শেখ হাসিনার আমলে যেখানে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি, সেখানে মানুষ সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছে, এমন দাবি মিথ্যা, আত্মতৃপ্তি আর আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রসঙ্গত আরো একটি কথা বলা দরকার। শেখ হাসিনা দাবি করে থাকেন যে, কৃষি উৎপাদনে তার সরকার কৃষকদের ঋণদান, সার বিতরণ ও সেচ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে অবদান রেখেছে। শেখ হাসিনার সরকার যে কৃষকদের প্রতি কতটা দরদী (?)

www.pathagar.com

তার উদাহরণ দেখা যায় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এর এক প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, "ডিজেল ও লুব্রিকেটিং অয়েলের দাম বেড়ে যাওয়ায় এ বছর উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার কৃষকদের জমিতে সেচের জন্য জ্বালানি বাবদ অন্তত ১১শত কোটি টাকা বেশি ব্যয় করতে হবে বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) সূত্রে জানা গেছে।" কৃষকদের প্রতি সরকারের দরদের আরো কী উদাহরণ দরকার। মানুষর পেটে দু'মুঠো অন্ন পড়লেই কী সে সুখে আছে বলা যাবে? তাহলে কারাগারের বন্দীদের তো সুখে থাকার কথা। মানুষ চায় শান্তিতে ঘুমাতে, স্বস্তিতে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে এবং ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে এমন পরিবেশে থাকতে। শেখ হাসিনা দেশের মানুষকে যে কী শান্তিতে রেখেছেন তার নমুনা ফুটে উঠেছে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর এক সেমিনারে উপস্থাপিত তথ্য থেকে। দেশী-বিদেশী আলোচকদের উপস্থাপিত তথ্যে বলা হয়, "সারাদেশে ৮০টি সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট রয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি রাজধানী ঢাকা শহরে। এছাড়া ঢাকা শহরে ৯০ হাজারসহ সারাদেশে প্রায় ২ লক্ষ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। এই অস্ত্র ব্যবহারের কারণে দেশে প্রতিদিন ৪ জন লোক নিহত ও ১০ জন আহত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার ঘটেছে।"

বস্তুতঃপক্ষে সারাটি দেশই আওয়ামী সশস্ত্র মাস্তানদের দখলে এক বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ৮০টি সিন্ডিকেটের অন্যতম প্রভাবশালীদের মধ্যে চট্টগ্রামের মহিউদ্দিন, ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের আবু তাহের, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, ঢাকার মীরপুরের কামাল মজুমদার, ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুরের মকবুল আহমেদ, লালবাগের হাজী সেলিম, বরিশালের আবুল হাসনাত এবং তেজগাঁও-এর ডাঃ ইকবাল যে রয়েছে এ নিয়ে কারো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। এসব 'সোনার ছেলেরা' স্ব স্ব এলাকায় যে চরম নৈরাজ্য ও ভীতিকর জাহেলিয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা নিত্যদিনের পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায়। ফেনীর সাংবাদিক টিপু কেন আজ হাসপাতালের শয্যায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, লক্ষ্মীপুরের এডভোকেট নূরুল ইসলাম কোন্ অপরাধে অকালে নির্মমভাবে ঘাতকের হাতে জীবন দিল, নারায়ণগঞ্জে কেন বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের স্থানীয় এমপি'র সাঁড়াশি বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়, মীরপুরের এমপির পুত্রের হাতে মানুষ খুন হয়েছে, এক প্রতিমন্ত্রীর পুত্র খুনের আসামি, ধানমন্ডির এমপির ইশারায় বিরোধী দলের মিছিলে খুন হয়েছে এক টগবগে ছাত্র-তরুণ, হাজী সেলিমের ভয়ে লালবাগের জনগণ সন্ত্রস্ত, বরিশালের হাসনাত বাহিনী সেখান থেকে বিরোধী দলের চিহ্ন মুছে ফেলার প্রায় সব কাজ শেষ করে এনেছে।

আর সর্বশেষ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো ডাঃ ইকবালের প্রকাশ্যে মানুষ খুন করার নির্লজ্জ মহড়া। এরা হচ্ছে আজ শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং দলের প্রাণশক্তি। এ রকম

www.pathagar.com

হাজারো সিন্ডিকেট সারাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এদের অত্যাচার আর জুলুমে সারাদেশে মাতম উঠেছে-আওয়ামী জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি চাই। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস-প্রধানমন্ত্রী এরপরও বলছেন, দেশবাসী সুখের একটু মুখ দেখছে। বলতে ইচ্ছে হয়–এ যদি হয় সুখের নমুনা, তাহলে সে ভয়াবহ সুখ থেকে জাতি মুক্তি চায়। মানব জমিন পত্রিকায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ লিখেছে, 'ফেনীতে বিকল্প শাসন' জয়নাল হাজারীর "নির্মম, বেপরোয়া ক্লাস কমিটির অব্যাহত সন্ত্রাস, উদ্যত ফনার নিচে চাপা পড়েছে হাজারো নির্যাতনের আহাজারি।" সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যে নাটকীয় অভিনয় এবং কৃত্রিম সংলাপ এতে আর সন্দেহ থাকার কথা নয়। মানবজমিন একজন অধ্যাপকের বরাতে ফেনীকে আখ্যায়িত করেছে 'ডেডম্যান সিটি' হিসেবে, যেখানে 'মৃতপ্রতীম' মানুষ ছাড়া কারো প্রবেশ নিষেধ। ফেনীর গডফাদারকে নাকি শেখ হাসিনাও সমঝে চলেন। চট্টগ্রামের মেয়রকেও কিছু বলার সাহস রাখেন না শেখ হাসিনা।

এই যেখানে শেখ হাসিনার সুশাসনের নমুনা সেখানে তিনি বিরোধী দলকে কটাক্ষ করে বলেন, তারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। আওয়ামী বাহিনীর দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরোধী দল যেখানে রাস্তায় নামতে পারে না, এলাকা থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়, মামলা-হামলার ভয়ে তাদের জীবন যেখানে ওষ্ঠাগত সেখানে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, তাদের অস্তিত্ব রক্ষাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। আওয়ামী সন্ত্রাসী ও সশস্ত্র রাজনীতিক ও তাদের দোসর মাস্তান বাহিনী এবং তাদের স্যাঙ্গাত ঠ্যাঙ্গারে পুলিশ বাহিনী যেখানে ফ্যাসিস্ট স্টাইলে একের পর এক মানুষ খুন করে চলেছে সেখানে বিরোধী দলকে বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী করা একটি বড় অনৈতিক কাজ। চট্টগ্রাম, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, ফেনী, লক্ষ্মীপুরসহ বহুস্থানে আওয়ামী খুনিদের হাতে একের পর এক রক্ত ঝরছে। শেখ হাসিনা নিজেই এসব খুনের উস্কানিদাতা। একটি লাশের পরিবর্তে ১০টি লাশ ফেলার নির্দেশ তো তিনিই দিয়েছেন। হিংসার বিষবাষ্প যিনি প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে যাচ্ছেন তিনিই কিনা নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য অন্যকে অভিযুক্ত করছেন। হাসিনা দাবি করছেন তিনি ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর বিরোধী দল তা নস্যাৎ করতে চায়। তার এ দাবি যে কতটা ভিত্তিহীন ইতিহাস তার সাক্ষী।

১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ মানুষের ভোটের অধিকারকে সন্ত্রাসের মুখে বিপন্ন করে তুলেছিল। সে সময়ের জাসদ নেতা-কর্মীসহ দেশবাসী তা ভালোভাবে জানে। ১৯৭৫ সালে শেখ হাসিনার পিতা একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক বাকশাল কায়েম করে মানুষের শুধু ভোটের অধিকারই নয়– সকল মৌলিক মানবাধিকারও কেড়ে নিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা জিয়াউর রহমান ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সে কারণেই বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ আবার নতুন করে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শেখ হাসিনা মূলধারার

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দেননি। তিনি বরং এরশাদের সাথে আপস করেছিলেন। এর বহু প্রমাণও রয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৯১ সালের নির্বাচনকে দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকরা সবচেয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে বিবেচনা করে থাকেন। সেখানে সকলে অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল। অথচ সেদিন হাসিনা সূক্ষ্ম কারচুপির ফালতু অভিযোগ তুলেছিলেন যা তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন স্থানে যে কারচুপি করেছে তা ছিল 'ওপেন সিক্রেট' ব্যাপার যা সবাই জানে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি একটি অর্থহীন নির্বাচন করে এবং মাগুরার উপনির্বাচনে কারচুপি করে তার অতীতের সুনামকে কলংকিত করে। কিন্তু বিএনপির কলঙ্ক মানে তো আর আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব নয়। গত সাড়ে ৪ বছরে যতগুলো উপনির্বাচন হয়েছে আওয়ামী লীগ তার প্রায় সবটাতেই একতরফা সীল পিটিয়েছে। বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে শূন্য মাঠে গোল দিয়েছে তারা। ভোটারবিহীন নির্বাচন হয়েছে। বর্তমান সিইসি কুমিল্লা ও পাবনার নির্বাচনে যে ভয়াবহ কারচুপির দৃশ্য দেখেছেন তারপর আর বলার প্রয়োজন নেই যে, আওয়ামী সরকার নির্বাচনে কারচুপিতে কত সিদ্ধহস্ত। এরপরও শেখ হাসিনা মিথ্যা দাবি করছেন যে, তিনি ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমন কি কেয়ারটেকার সরকারের ধারণাও তার নয়। জামায়াতে ইসলামী থেকে ধার করা তত্ত্ব নিয়ে আন্দোলন করে তিনি মিথ্যা বড়াই করে চলেছেন।

শেখ হাসিনা 'ভাতের অধিকার' প্রতিষ্ঠার আরেকটি কৃতিত্ব দাবি করে থাকেন। তার পিতার শাসনামলে ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবার কথা দেশবাসী এখনো ভুলে যায়নি। ইতিহাস থেকে তা কেউ মুছে ফেলতেও পারবে না। বোধহয় এ জন্য শেখ হাসিনা তার বাবার শাসনে সৃষ্ট মানব বিপর্যয়ের কথা মনে করেই ভাতের অধিকারের কথা বারবার বলে থাকেন। এ জন্য তাকে ধন্যবাদ। কিন্তু ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এমন কী অবদান তিনি রেখেছেন তা আমরা জানি না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একজন মানুষের প্রতিদিন ২২০০ কিলো ক্যালরি খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ পাচ্ছে মাত্র ১৬০০ কিলো ক্যালরি। পক্ষান্তরে, চীনের লোকেরা পাচ্ছে ২৬০০ কিলো ক্যালরি। শতকরা ৪৭% ভাগ লোক বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে (যা আগেই বলেছি)। শতকরা ৫০% ভাগ লোক ভূমিহীন। অর্ধেকের বেশি লোকের ঘরবাড়ি নেই। মাত্র ২/৩ হাজার লোককে আশ্রয়ন প্রকল্পে একটি রুম বরাদ্দ করে লক্ষ-কোটি মানুষকে গৃহহারা, বস্ত্রহীন, চিকিৎসাবিহীন রেখে মানুষের মুখে সুখের ছোয়া লাগানোর কৃতিত্বের দাবি করা চরম আত্মপ্রবঞ্চনা আর ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। সবশেষে আরেকটি কথা। যে দেশে প্রতি মুহূর্তে মানুষ নিহত হচ্ছে, মানবাধিকার যেখানে ভূলুণ্ঠিত, নারী যেখানে তার সম্ভ্রম হারাচ্ছে, সে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যে সকল বিদেশী সংস্থা ডিগ্রির পর ডিগ্রি খেতাবের পর খেতাব দিচ্ছে তারা বাংলাদেশের মানুষকে উপহাস করছে। তাদের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই।

www.pathagar.com

নোমান ইরফান

প্রশাসনের শীর্ষ পদে ভগ্নিপতির পর ভাগ্নিজামাই

ডেটলাইন : ৮ মে ২০০১

বাংলাদেশ এক দলীয় শাসন দেখেছে '৭০-এর দশকের মধ্যভাগে। খুবই স্বল্পস্থায়ী এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে। রাজনৈতিক মতাদর্শ বিশ্বাস ও নীতির ক্ষেত্রেই শুধু ভোল পাল্টে ফেলা নয়, দলের নামও বদলে ফেলা হয়েছিল আওয়ামী লীগ থেকে বাকশাল। কেবল রাজনীতিকরাই হবেন দলের সদস্য ও হোমরাচোমরা প্রচলিত এ ধারণাটিও বদলে ফেলা হয়েছিল। বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষমতাসীন দলের সদস্য করা হয়েছিল সামরিক আমলা ও সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের। বাকশাল ছিল একমাত্র বৈধ ও প্রকাশ্য রাজনৈতিক পার্টি।

সেই সময় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সবচেয়ে প্রভাবশালী কর্মকর্তা হিসেবে যে ব্যক্তির উত্থান ঘটে তার নাম ছিল সৈয়দ হোসেন। মান ও গুণের বিবেচনায় মিডিওকার বা মাঝারিগোছের এই অফিসার রাতারাতি সেকশন অফিসার থেকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্ণধার হয়ে ওঠেন। তিনি তখন রাতকে দিন করেছেন এবং দিন হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। সেই সময় যারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ছিলেন তারা ওই রাজতন্ত্রের বিভীষিকা আজও ভুলতে পারেননি। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করতো কারো চাকরি থাকবে কি থাকবে না, কে পদোন্নতি পাবেন, কারা পাবেন না এবং কে, কোথায়, কোন পদে বসবেন আর কারা দাঁড়িয়ে থাকবেন সব কিছু। এই সৈয়দ হোসেন প্রাচীন বাংলার কোনো নবাবের নাম নয়, তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলার প্রথম শাসক শেখ মুজিবুর রহমানের ভগ্নিপতি। পরমাত্মীয় বটে।

পরবর্তী প্রজন্মে আরেক পরমাত্মীয়ের উদ্ভব ঘটেছে ২১ বছর পর। রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে দীর্ঘ সময় থাকার পরও আওয়ামী লীগের চরিত্রের মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কন্যার শাসনে শেখ মুজিবের অন্য আরেক বোনের মেয়ের জামাই প্রশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত হয়েছেন। পিতার শাসনামলে যিনি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করতেন সেই অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ হোসেন ছিলেন শেখ হাসিনার ফুপা। আর আজ যিনি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর আরেক ফুপাতো বোনের স্বামী মি. রশিদুল আলম। শেখ মুজিবের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে এটা হচ্ছে তার কন্যার আরেক পদক্ষেপ। ভগ্নিপতির পর ভাগ্নিজামাই।

প্রশাসনে নিশ্চয় আওয়ামী লীগের অনুগত ও বিশ্বস্ত অনেক কর্মকর্তাই আছেন। যদি এদের মধ্য থেকে যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার বিচারে অগ্রবর্তী ব্যক্তির পদে নিয়োগ

www.pathagar.com

করা হতো তাহলেও তাতে প্রজাতন্ত্রের কিছু কাজ হতো। কিন্তু তা না করে শেখ হাসিনা সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে শুরু থেকে যে নীতি অনুসরণ করেছেন তাতে প্রথমত দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দ্বিতীয়ত ব্যাপক ব্যর্থতার দায় নিয়ে তার শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটছে। সুযোগ-সুবিধা ও ফেবার বিলি-বণ্টনের ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকারের তালিকায় এক নাম্বারে ছিলেন শেখ পরিবারের আত্মীয়স্বজনরা। দুই নাম্বারে হিন্দু সম্প্রদায়ের কর্মকর্তারা। তিন নাম্বারে সেই সকল অফিসার যাদের বাড়ি গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর জেলায়। অত্যন্ত সংকীর্ণ জেলাবাদী মানসিকতা দিয়ে সরকারের শীর্ষব্যক্তি পরিচালিত হয়েছেন। এই ক্ষেত্রে ফরিদপুর জেলার লোকজন তার আস্থা উপভোগ করেননি। চার নাম্বারে দলের অনুগত অসৎ অযোগ্য, অদক্ষরা এবং পাঁচ নাম্বারে সেই সকল আমলা যারা নিজেদের উন্নতমান রক্ষার পাশাপাশি অতীতে দুর্দিনে দলকে সাহায্য করেছেন।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এখনকার ভারপ্রাপ্ত সচিব রশিদুল আলম জাতীয় সংসদের চিপ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর ছোট বোনের স্বামী। এই আব্দুল্লাহ তার ছেলেদের অপকর্ম সন্ত্রাসের অল্প কিছু তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় এই পরিবারের আসল চেহারা কিছুটা দেখা গেছে। সৌভাগ্যবান এই ভারপ্রাপ্ত সচিব সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় সবেমাত্র নানান খবর প্রকাশিত হতে শুরু করলেও তার দুর্নীতি অনিয়ম ও যথেচ্ছতার সম্পর্কে অফিসারদের মুখে মুখে যা শোনা যায় তা এখনো ছাপার অক্ষরে প্রচারিত হয়নি।

তোফায়েল ক্যাডার হিসেবে পরিচিত ১৯৭৩ সালের বিশেষ ব্যাচের কর্মকর্তা রশিদুল আলম তার সতীর্থদের অনেক পেছনে ফেলে ভারপ্রাপ্ত সচিব পদই তিনি অর্জন করেছেন। তার ব্যাচের বেশির ভাগ অফিসার এখনো যুগ্মসচিবই হতে পারেননি। পদোন্নতির প্রচলিত নীতিমালায় ব্যাচভিত্তিক সমতার বিষয়টি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর এই পরমাত্মীয়ের জন্য সব কিছু তিতাস গ্যাসের চুলায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ব্যাচের চেয়ে সিনিয়র সিএসপি, সিএসএস,ইপিসিএস কর্মকর্তারা যখন অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতির অপেক্ষায় দিন গুনছেন তখন সংস্থাপন সচিব হিসেবে রশিদুল আলম তার রাজনৈতিক পছন্দ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী এদের ফাইল সাজাচ্ছেন।

সরকার প্রধানের আত্মীয় হিসেবে শুধু রশিদুল আলমই নন, আরো কয়েকজন উচ্চপদ, পদোন্নতি ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাগিয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় বসেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৫ বছরের সকল নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা ভেঙে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে চলে যাওয়া তার ফুপা মেজর জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমানকে এলপিআর বাতিল করে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার

www.pathagar.com

মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেন। সেখান থেকে বদলি করে এই ব্যক্তিকে বসানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পিএসও পদে। তারপর তাকে বানানো হয় সেনাবাহিনী প্রধান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল। চার বছরের পূর্ণ মেয়াদ এই পদে থাকার পর তিনি জেনারেল পদে পদোন্নতি নিয়ে অবসরে যেতে বাধ্য হন।

সৈয়দ ইউসুফ হোসেন ছিলেন অতিরিক্ত সচিব। শেখ হাসিনা ক্ষমতা লাভের পর তার এই ভগ্নিপতিকে ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং সচিব পদে পদ্রোন্নতি দেয়া হয়। এরপর তিনি প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবেও এক বছরের এক্সটেনশন উপভোগ করেন। তারপর টানা চার বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন সিঅ্যান্ডএজি পদে।

প্রধানমন্ত্রীর আরেক ভগ্নিপতি এম এ ওয়াদুদ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি এই পদে এক বছরের এক্সটেনশনের পর অবসরে যান। বিনা কাজে বেশিদিন থাকতে হয়নি। অতিরিক্ত সচিব হিসেবে ৩ বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে। উক্ত পদ দখল করেছেন এমন কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হলো। কিন্তু গত ৫ বছরে শেখ হাসিনার আত্মীয় পরিচয়ে প্রশাসনের রীতি নীতি ভঙ্গ করে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকারীদের সংখ্যা কয়েক ডজন। সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত বিভিন্ন পদে এই সকল অনিয়ম ঘটেছে। শেখ মুজিবের শাসনের পর শেখ হাসিনার শাসনামলে আত্মীয় তোষণের ঘটনা ঘটেছে সর্বোচ্চ সংখ্যায়। প্রশাসনে আত্মীয়করণের এমন সংগঠিত উদ্যোগ আওয়ামী শাসনহীন একুশ বছরে তেমন একটা দেখা যায়নি। সামরিক শাসক এরশাদ তার শ্যালককে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি পদে বসিয়েছিলেন। এই নিয়োগটি ছাড়া প্রশাসনে আত্মীয়দের অন্যায় সুযোগ দেয়ার কাহিনী তার আমলে ঘটেছে বলে শোনা যায় না। তবে এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে একটিও অভিযোগ নেই। স্বজনপ্রীতি দূরে থাক, তার স্বজনভীতি নিয়ে অনেক কাহিনী চালু আছে। খালেদা জিয়াও তার শাসনামলে এমন দুর্বলতা দেখাননি কোনো আত্মীয়স্বজনের প্রতি।

সাধারণভাবে মনে হচ্ছে দু'টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য শেখ হাসিনা তার ভগ্নিপতিকে সংস্থাপন সচিবের পদে বসিয়েছেন। প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে, আওয়ামী লীগের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগত ১৯৭৩ সালের ব্যাচের অফিসারদের এখনই ভারপ্রাপ্ত ও অতিরিক্ত পদে পদোন্নতি দেয়ার ঝঞ্ঝাটপূর্ণ কাজটি রশিদুল আলমকে দিয়ে সম্পন্ন করা। কারণ নিজের স্বার্থেই তিনি চারপাশে জড়ো করতে চাইবেন ১৯৭৩ সালের ব্যাচের অফিসারদের যাতে ভবিষ্যৎ তার পদাবনতি না ঘটে। দ্বিতীয় টার্গেট হচ্ছে, আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে আওয়ামী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রভাবিত করতে সক্ষম এমন কর্মকর্তাদের ডিসি, এডিসি ও ইউএনও পদে নিয়োগ প্রদান। রেলওয়ে ক্যাডার থেকে আসা এই ভারপ্রাপ্ত সচিব অ্যাডমিন ক্যাডারের মধ্যম স্তর ও মাঠ পর্যায়ের ৯০ শতাংশ কর্মকর্তাদের না চিনলেও

www.pathagar.com

দলীয় রিকমেন্ডেশনের ভিত্তিতে সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজস্ব লোক বসানোর কাজ চালাচ্ছেন। রশিদুল আলমকে এই কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছেন মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী নামের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালক। একটি বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনীর পক্ষে কাজ করেন বলে এই কর্মকর্তাকে ব্যাপকভাবে সন্দেহ করা হয়। তবে মি. পাটোয়ারী ও তার সতীর্থ ব্যাচের উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তাদের আরেকটি গোপন এজেন্ডা আছে। তারা শুধু তাদের চেয়ে সিনিয়র সিএসপি, সিএসএস, ইপিসিএস অফিসারদের প্রমোশন ঠেকিয়ে খুশি নন। তারা শেখ হাসিনার শাসনের অবশিষ্ট দুই মাসের মধ্যেই অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি চান এবং সেই ক্ষেত্রেও নিয়োগ পেতে চান তেমন মন্ত্রণালয়ে যেখানে সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব নেই। যাতে পদটা পেলেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা যায়, পুরো মন্ত্রণালয়ই যেনো চলে আসে হাতের মুঠোয়।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৮টি সচিবের ও ১০টি অতিরিক্ত সচিবের পদ খালি রাখা হয়েছে। মামুনুর রহমান, শহিদুল আলমের মতো কর্মবীর হিসেবে খ্যাত বেশ কয়েকজন সিনিয়র সিএসপি অফিসারকে গুরুত্বহীন পদ এবং ওএসডি করে কৃত্রিম শূন্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে উচ্চ পদ দখলের অভিলাষে। ১৯৭৩ ব্যাচের নিম্নমানের এই অফিসার গোষ্ঠী তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য সকল সিএসপিদের বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের জন্য সরকারের শীর্ষ রাজনৈতিক মহলে চাপ সৃষ্টি করছে। নির্বাচন আয়োজনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও যাতে এই সকল দুর্নীতিগ্রস্ত অযোগ্য ও অদক্ষ কর্মকর্তারা গুরুত্বপুর্ণ পদে বহাল থাকতে পারেন তার জন্য নাকি এমন ভয়াবহ অন্যায় ও রুথলেস বা নির্মম পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

আরো কিছু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত ভাড়াটে সচিবদের কাহিনী। দলীয় স্বার্থে ভাড়া থাকা এই সকল সচিব, ভারপ্রাপ্ত সচিব ও অতিরিক্ত সচিবকে দিয়ে সব ধরনের অন্যায্য অন্যায় কাজ এবং দুর্নীতি করিয়ে নেয়া যায়। পলিটিক্যাল অথরিটি যা চায় গৃহপালিত ভৃত্যের মতো তার সব কিছুই এরা করতে সক্ষম। ছয় মাস মেয়াদি পিসমিল বেসিসে দীর্ঘ দিন যাবৎ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ধরে রেখেছেন দেশের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি শামসুল আলম। তার মাত্র একটি কাজের নমুনা দিলে বোঝা যাবে চরিত্রটি কি। রশিদুল আলমকে ভারপ্রাপ্ত সচিব করার প্রস্তাব এলে প্রথমবার এসএসবি আপত্তি করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রীর গভীর মনোবাসনার কথা জানতে পেরে তারা এই লোকটিকে পদোন্নতি দেয়ার জন্য সুপারিশ করেন। রশিদুল আলম যখন রেলওয়ে চিফ কমার্শিয়াল অফিসার এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন তখনো তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এই সকল অভিযোগ তদন্ত করেছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো, যে সংস্থাকে দিয়ে দুর্নীতিমুক্ত ভালো কাজ করানো সম্ভব নয় বলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত সংস্থাপন

www.pathagar.com

সচিবের মতো মহাপরাক্রমশালী হোমরা-চোমরাদের কার্যকলাপ নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে তখন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন দিয়ে সব কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত। সম্প্রতি দেয়া গণপদোন্নতিতে যে ৩০০ ব্যক্তি উপসচিব হয়েছেন তাদের মধ্যে এখনো প্রায় ১০০ অফিসার নতুন নিয়োগ পাননি। কেউ কেউ আগের নিম্নতর পদেই বহাল আছেন এবং অনেককে ফেলে রাখা হয়েছে ওএসডি করে। ডিসি পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য ফিট লিস্টের তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। ফিট লিস্টের জন্য ডাকা হয়নি এবং আনফিট হয়েছেন এমন কয়েকজন অফিসারকেও জেলা প্রশাসক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ফিট লিস্টে যাদের নাম উপর দিকে আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে তালিকার নিচে পড়ে থাকা অফিসাররাও পোস্টিং পেয়েছেন। শুধু রাজনৈতিক স্বার্থই নয়, বড় অংকের টাকার বিনিময়ে ডিসি পদে নিয়োগ দেয়ার অভিযোগও উঠেছে। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেআইনী ও অন্যায়ভাবে এসএসবি থেকে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা উপসচিবের তালিকা হতে ভিত্তিহীন রাজনৈতিক সন্দেহে নাম কেটে বাদ দেন, ডিসিদের ফিট লিস্ট থেকে ইচ্ছামত নাম বাদ দিয়ে অনুমোদন করেন সে দেশে অনেক কিছু সম্ভব।

শুধু কি মন্ত্রিপরিষদ সুখী? পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাসে অতীতে কোনো সরকারের আমলে একসঙ্গে এত বেশি সংখ্যক পূর্ণ, ভারপ্রাপ্ত, অতিরিক্ত সচিব চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন না। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় একটি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রস্তাব তৈরি হলে প্রশাসনে অসন্তোষের আজগুবি খবর প্রচারিত হতো সংবাদপত্রে। এই নিয়ে দফায় দফায় সম্পাদকীয় লেখা হতো। শেখ হাসিনার শাসনামলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে পত্রিকাগুলোতে কোনো খবর নেই। কিন্তু চুক্তিতে চাকুরিধারীদের বিশাল সংখ্যার কারণে বর্তমান আওয়ামী যুগ চুক্তিভিত্তিক আমলার সরকার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে বসে আছেন চুক্তিধারী পূর্ণ ও অপূর্ণ সচিবরা। এই সব বিতর্কিত আমলারা হচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব ডঃ সৈয়দ আব্দুস সামাদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ডঃ এ,কে,এম মশিউর রহমান, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডঃ শাহ, এম, ফরিদ, সংসদ সচিবালয়ের সচিব কাজী রকিবুদ্দিন আহমেদ, স্বরাষ্ট্রসচিব এম,এম, রেজা, এনএসআই-এর মহাপরিচালক কাজী গোলাম রহমান, টার্ণওভার ট্যাক্সেস কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এ,কে, মুবিন, গ্রেটার ঢাকা ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান ও কোর্ডিনেশন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওমর হাদি, নির্বাচন কমিশনের সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন, বিসিআইসি-র চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ারুল হক, সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব এম,এ ওয়াদুদ ও আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ডিজি মোঃ বদিউজ্জমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সি এম মহসিন, মৎস্য ও পশুপালন সচিব ডঃ জহুরুল করিমসহ আরো অনেকে। এ অফিসারদেরকে উল্লিখিত পদগুলোতে বহাল রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেও অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব। এমন সব

www.pathagar.com

আমলারা ক্ষমতায় থাকলে কেয়ারটেকার সরকার কেন জাতিসংঘের পিসকিপিং ফোর্স এনেও ভালো মানের একটি নির্বাচন করা যাবে না।

সচিবের পদ শূন্য ১৮টি, চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা বসে আছেন আরো ১২টিতে। তার মানে, কার্যত ৩০টি সচিবের পদ খালি আছে। আরেকভাবে বললে বলা যায় প্রায় ৫০ শতাংশের সচিবের পদ শূন্য বা অপদখলকৃত। উপরে উঠে পড়া ব্যাচের অফিসাররা চাইছেন অতিরিক্ত সচিব পদের প্রমোশন বাগিয়ে এই ৩০টি পদের কর্তৃত্ব দখলে নিতে। নিচের দিকের পদগুলো যে কি দুরবস্থা তা বর্ণনা করলে মনে হবে দেশে সরকার নেই, সর্বগ্রাসী দলের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে সব। শেখ মুজিবের কন্যার শাসনামলে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। এদের কাছে মেধার দক্ষতা, যোগ্যতা, সততা অতি তুচ্ছ বিষয়। সবচেয়ে বড় বিবেচনা হচ্ছে আত্মীয়, ধর্ম ও জেলা পরিচয়। একুশ বছরের ব্যবধানে ভগ্নিপতির পর ভাগ্নিজামাই ছাড়া দুই প্রজন্মের যে সরকার প্রধানরা সংস্থাপন সচিব পদে নিয়োগ করার জন্য বিশ্বস্ত অফিসার খুঁজে পান না তাদের রাজত্বে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভেঙে পড়ারই কথা; এটাই অনিবার্য।

www.pathagar.com

কবির মুরাদ

পিএসসির মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানেও দলীয়করণ

ডেটলাইন ৬ নভেম্বর ২০০০

মনে করেছিলাম ২০তম বিসিএস-এর ব্যাপারে কিছু লিখব না, কারণ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অবধি ব্যাপারটা গড়িয়েছে। সারা দেশের মানুষ বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ ধিক্কার দিয়েছে এই বিসিএস আওয়ামী দলীয়করণের কারণে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সরকারের এ ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। নির্লজ্জভাবে ২০তম বিসিএস দলীয়করণ করা হয়েছে যা ইতিহাসে বিরল। যদি এই ২০তম বিসিএস-এ আওয়ামী ক্যাডারদের বহাল রাখা হয়, তাহলে আগামী দিনের প্রশাসন ভেঙে চুরমার হতে বাধ্য। দেশ হয়ে যাবে অচল। কোনো অবস্থাতেই দেশ চলতে পারে না। কারণ প্রশাসনে যদি মেধার বিকাশের সমন্বয় না হয়, তাহলে প্রশাসন অচল হতে বাধ্য। তাই সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করার জন্যই সরকারকে অবিলম্বে ২০তম বিসিএস বাতিল করতে অনুরোধ করছি এবং ২১তম বিসিএস সম্বন্ধে ইতিমেধ্য পত্রিকায় যে খবরাখবর এসেছে তা যদি সত্য হয় তাহলেও সেটা হবে জাতির জন্য কলঙ্কজনক। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি সরকারকে ইতিমধ্যে সরকারের সমস্ত প্রশাসনযন্ত্রকে দলীয়করণ করেছেন, তাই অন্তত বিসিএস ক্যাডারে দলীয়করণ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। তাহলে নিজেরাই ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। তার বড় প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী নিজেই বক্তব্যে বলেছেন, 'তোফায়েল ক্যাডার'এর কথা। তাই অতিসত্ত্বর ২০তম বিসিএস বাতিল করুন। মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করছি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে সুষ্ঠু সমাধান করতে। বিসিএস-এ দলীয়করণের ফলে মেধাবী তরুণরা যখন উপেক্ষিত হন তখন হতাশার কোনো শেষ থাকে না। ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মেধাবী তরুণ-তরুণীরা শরণাপন্ন হয়েছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্টের দরবারে। জানিয়েছেন তাদের বঞ্চনা ও বেদনার কথা। এখানেই তারা থেমে নেই— করেছেন প্রতীক অনশন। এবার আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, এবারে পদসংখ্যা বৃদ্ধিতে নিয়মনীতি মানা হয়নি। একদিকে কিছু ক্যাডার পদের সংখ্যা যেমন বাড়ানো হয়েছে, অন্যদিকে প্রফেশনাল ক্যাডার টেকনিক্যাল পদের সংখ্যা কমানো হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, ফলাফল প্রকাশের মাত্র দু'দিন আগেও মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য সার্টিফিকেট জমা নেয়া হয়েছে এবং চাকরির জন্য মনোনীত করা হয়েছে। অথচ আবেদনপত্রের সাথে মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট জমা দেয়ার কথা ছিল। ২০তম বিসিএস পরীক্ষার বিতর্কিত ফলাফল

www.pathagar.com

প্রকাশের পর ফেয়ার বিসিএস মুভমেন্ট ও বিসিএস মেধা সংরক্ষণ কমিটি নামে ৩টি কমিটি অনিয়মের প্রতিবাদে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পাশাপাশি দেশের বুদ্ধিজীবী মহল থেকেও ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় দলীয়করণে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন শত নাগরিক কমিটি, জিয়া পরিষদসহ অন্যান্য সংগঠন সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছে, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান, পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে যেভাবে অযোগ্য, মেধাহীন, দলীয় কর্মী নিয়োগের মাধ্যম হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়েছে তা নজিরবিহীন। ক্ষমতাসীন দলের অন্যতম অঙ্গ সংগঠনের ৪ শতাধিক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা ও অন্যান্য বিভাগে যেভাবে নিয়োগ করা হয়েছে তা শুধু যে জাতীয় স্বার্থবিরোধী তা-ই নয়, তিল তিল করে গড়ে ওঠা পিএসসির বিশ্বাসযোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা হয়েছে।

মেধাবী তরুণদের প্রশ্ন, চাকরির জন্য আমরা এখন যাব কোথায়? বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক গত ২৯ অক্টোবর ২০০০, ২০তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর দেশব্যাপী হাজার হাজার তরুণ-তরুণী এই ফলাফল দলীয়করণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বিসিএস পরীক্ষার ফলফলে অনিয়ম-দলীয়করণ জাতির জন্য একটি দুঃখজনক ঘটনা। দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, দুর্নীতি, খুন, বাড়ি দখল—এসব দেশ ও সমাজকে জিম্মি করে রেখেছে, সরকারি কর্মকমিশনও আর অনিয়মের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকল না। বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলে অনিয়মের অভিযোগ জাতীয় বিপর্যয়ের আশঙ্কাকেই যেন স্পষ্ট করে তুলেছে। বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলে অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ও এ অভিযোগে সারাদেশে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এই অনিয়মের প্রতিবাদে ২০তম বিসিএস ফলাফল বাতিল আন্দোলন কমিটি গঠন করেছে। প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও আন্দোলনে ফুঁসে উঠেছে তরুণসমাজ। বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল কেলেঙ্কারির পর পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী তরুণদের মুখোমুখি হলে তারা এ অনিয়মকে সরকারের দলীয়করণের হিংস্র নীতি বলে উল্লেখ করেন। ২০তম বিসিএস-এ বিভিন্ন কোটা পদ্ধতিতে যেসব লোক নিয়োগ করা হয়েছে তা আসলে ছাত্রলীগের ক্যাডার ও দলীয় সন্ত্রাসী। এই কোটা পদ্ধতিতে যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্বিশেষে দলীয় লোক নিয়োগ দেয়ায় প্রকৃত মেধাবী ছাত্ররা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি মনে করি, এই কোটা পদ্ধতির ফলে যেভাবে অযোগ্য লোকদের নিয়োগ করা হয়েছে তাতে প্রশাসনের কার্যক্রমের স্থবিরতা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ সরকার একটি

www.pathagar.com

অদক্ষ প্রশাসনের হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে। তাদের অদক্ষতায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুষ্ঠু সরকার পরিচালনা ব্যাহত হবে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। এতে করে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। সচিবালয় হয়ে পড়বে আওয়ামী কার্যালয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আওয়ামী লীগ তার বিগত শাসানমলে তোফায়েল ক্যাডার নামে এমনি এক অদক্ষ ক্যাডারদের নিয়োগ করে। যাদের "তোফায়েল ক্যাডার" নামে অভিহিত করা হয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সরকার যে অদক্ষ দলীয় লোক নিয়োগ করেছে, তাতে ভবিষ্যতে এদের অদক্ষতার জন্য যদি এদের 'মুক্তিযোদ্ধা ক্যাডার' নামে অভিহিত করা হয় তবে বিষয়টি জাতির জন্য বিব্রতকর হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে সরকার সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

২০তম বিসিএস-এ মুক্তিযোদ্ধা কোটার নামে প্রকৃত মেধাবীদের বঞ্চিত করা হয়েছে এবং সাথে সাথে দলীয়করণও করা হয়েছে। যার ফলে প্রশাসন ও পুলিশে যোগ্য ছেলেরা না আসার ফলে সার্বিকভাবে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। বিসিএস-এর মতো অন্যান্য উচ্চতর ক্ষেত্রগুলোতে এই কোটা প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে মেধাবীদের সুযোগ দিতে হবে। তাহলেই জাতি সঠিক পথে পরিচালিত হবে, তবে সর্বোচ্চ ৫% কোটা রাখা যেতে পারে। পিএসসি অনিয়ম বলতে যা করেছে, এতে এ দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হতাশ করেছে। পিএসসি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরও দলীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগ করেছে যা গর্হিত কাজ। পিএসসি সরকার নির্দেশিত মুক্তিযোদ্ধা কোটা নামে বিশেষ কোটায় দলীয় কর্মীদের নিয়োগ দিয়েছে তথাকথিত যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক। তাদের পিতামাতারা সরকারি চাকরির জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা কোটা বা পোষ্য কোটায় যে নিয়োগ দিয়েছে, সে মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্রও অনেকেই ভুয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইতিমধ্যে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়ও একটি মামলা হয়েছে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র দেয়াতে। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য কোটা নামে যা চলেছে তা মূলত দলীয় সন্ত্রাসী ক্যাডারদের নিয়োগের অপচেষ্টামাত্র।

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন

আবু জাফর: ইসলামী শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি: ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির প্রহেলিকা

প্রফেসর আফতাব আহমাদ: শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি ও দলীয়করণ

এস এম আরেফীন: সোনার ছেলেদের দখলে শিক্ষাঙ্গন

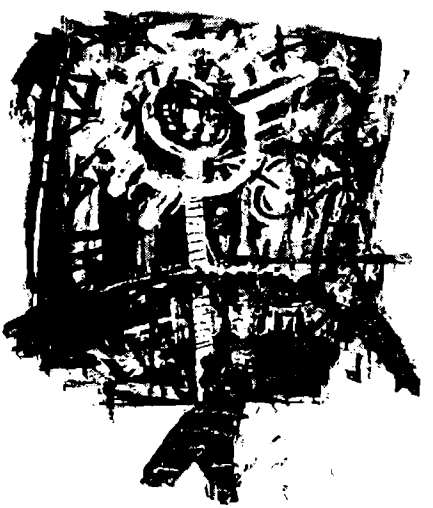

www.pathagar.com

আবু জাফর

ইসলামী শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি : ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির প্রহেলিকা

ডেটলাইন ঃ নভেম্বর ২০০০

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক নেই, এই ধরনের কোনো বই এখন আর আমি পড়ি না। আগে পড়েছি; চর্যাপদ থেকে একেবারে অতি সাম্প্রতিক জয় গোস্বামী, বুঝি না-বুঝি অনেক বিদেশী সাহিত্য, অনেক ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই, অনেক মনীষীর অনেক জীবন কথা ইত্যাদি অনেক কিছুই আমার স্বল্প মেধা ও অপ্রখর স্মৃতিশক্তি নিয়ে আগে পাঠ করেছি। এমনকি খুব যত্ন করে বুদ্ধদেবের অনুবাদে রিল্‌কে পড়েছি, বোদলেয়ার পড়েছি, পাস্তারনাকের ডঃ জিভাগো পড়েছি; এবং বিস্ময়কর যে রুশ কবিতাও এমনভাবে পড়লাম, যে অধীত বিদ্যার প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে দীর্ঘ ভূমিকাসহ অনেকগুলো কবিতার অনুবাদ নিয়ে একটি বই-ই লিখে ফেললাম (বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত কবিতা)। আরো বিস্ময়কর যে, আমার পাঠ্যতালিকা থেকে এমনকি অর্ধশিক্ষিত আরজ আলি মাতুব্বরও বহির্ভূত ছিল না এবং সঙ্কোচেই বলি, এই পাঠ গ্রহণ থেকে আমার মধ্যে এক ধরনের স্থূল, নির্বোধ ও নিরর্থক অহমিকাও জন্মেছিল। যাই হোক, বহু যত্নে, বহু কষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে সংগৃহীত এসব বই আর এখন নেই। অসাবধানতাবশত অধিকাংশই উঁই পোকার হাতে নিঃশব্দে ধ্বংস হয়ে গেছে। সামান্য কিছু কিছু এখন যদিও অক্ষত আছে, আমার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। উল্লেখ করা আবশ্যক, উঁই পোকা যা করেছে তা তো করেছেই এতদসঙ্গে আমার স্মৃতিগৃহ থেকেও আমার সমস্ত বিদ্যা প্রায় সবই অজ্ঞাতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। অবস্থা এত করুণ যে, আমার নিজের গান, যা সহস্রবার গেয়েছি তাও সঠিকভাবে মনে আসে না এবং জীবনে অসংখ্যবার উদ্ধৃতি দিয়েছি, এ রকম লেখক ও গ্রন্থের নামও স্মৃতিপট থেকে প্রায় পুরোপুরিই অপসৃত হয়েছে। জাগতিক বিবেচনায় এটা একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ই বটে! কিন্তু এরকম হলো কেন? বইতো গেলই, যেটুকু যা মস্তিষ্কে সঞ্চয় করেছিলাম, তাও গেল।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যার হৃদয়ে কোরআন শরীফের কোনো অংশই নেই, সে একটি পরিত্যক্ত গৃহসদৃশ'। পরিত্যক্ত গৃহ অর্থ জনমানবহীন পোড়ো বাড়ি। যেহেতু মানুষ বাস করে না, স্বাভাবিক নিয়মেই এই ধরনের গৃহ হয়ে ওঠে নোংরা আবর্জনাপূর্ণ, আগাছা ও জঙ্গলাকীর্ণ, হয়ে ওঠে মূষিক-সরীসৃপ-শৃগাল ইত্যাদি বন্যজন্তুর নিরাপদ লীলাক্ষেত্র। কিন্তু একটি মানুষও যদি কখনো এই পোড়ো বাড়িতে অবস্থানের নিমিত্ত ফিরে আসে, ওই সব জন্তু জঞ্জাল ও উপদ্রব এমনিতেই পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসূল

www.pathagar.com

(সাঃ) এই কথাটাই বড় সুন্দর করে বলেছেন, অন্তরে যদি কুরআনুল কারীমের একটি-দু'টি পংক্তিও প্রবেশ করে, অন্যসব কুফরি কালাম, নিরর্থক ও বিভ্রান্তিকর বিদ্যাবত্তা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও এই কথাই বলে। যেদিন থেকে আমি কোরআন-হাদীস, রাসূল (সাঃ)-এর জীবন ও জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, ইসলামকে আল্লাহ্পাকের একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসেবে মেনে নিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করেছি, মার্কস, মাও সেতুংয়ের 'মানবকল্যাণের' ব্যবস্থাপত্র, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পূজা, সার্ভে কি রাসেলের বহু মূল্যবান দার্শনিক তত্ত্ব, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, সাবা মুআল্লাকা, রাধাকৃষ্ণের বিরহগীতি, লতা মুঙ্গেশকরের গান, রবিশঙ্করের সেতার বাদন, সাগরিকার সুচিত্রা সেন সবকিছু দিনের চাঁদের মতো ফিকে ও নিষ্প্রভ হয়ে গেল। হতেই হবে, কারণ অন্ধকারই হলো এদের উজ্জ্বলতার মূল অবলম্বন, অন্তঃসারহীন নিরর্থকতাই হলো এদের অর্থ ও তাৎপর্য, ক্রমাগত অধঃপাতই হলো এদের গগনচুম্বী সাফল্যের কলরব। কিন্তু আল-কোরআন ও রাসূল (সাঃ) যেহেতু আল্লাহ্পাক প্রেরিত নূর ও রহমতের এক অপার মহাসমুদ্র, এই আলো ও কল্যাণের স্পর্শমাত্র সকল কুহক, সকল ইবলিসী বিদ্যার মৃত্যু ও বিদায় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য শয়তানের প্রথম আক্রমণই হলো আল-কোরআনের বিরুদ্ধে, রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এবং ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে।

এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল এই জন্য যে, সমগ্র মানব বংশের জন্য আল-কোরআন এমন একটা অখণ্ড নূর, যা সকল ইবলিসী জঞ্জালকে পুরোপুরি বিতাড়িত করে দেয়। এই জন্য ইবলিস ও তার অনুগত সহচরদের কাছে কোরআন শরীফের চেয়ে অধিক বিপজ্জনক আর কিছু নেই। অতএব, এই 'বিপজ্জনক' বস্তুটিকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখা ও তার চর্চাকে প্রতিরুদ্ধ করা শয়তানের একটি 'পবিত্র' ও সার্বক্ষণিক কর্ম। আর এই কাজে যদি শয়তান আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারে, সেটাই হবে তার সর্বোচ্চ সাফল্য; কারণ ইবলিসের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও তৎপরতায় এখন বিশেষ আর কোনো বাধা থাকে না এবং এই হেতুই শয়তানের কাছে আপাদমস্তক বিক্রয় হয়ে যাওয়া কিছু কুখ্যাত বুদ্ধিজীবী ইসলামের শাশ্বত অবিনশ্বর চেতনাকে 'মৌলবাদ' বলুক আর যাই বলুক, লক্ষ্য একটাই– দেশ থেকে সম্ভব হলে পুরো পৃথিবী থেকে কোরআন-হাদীসকে নিঃশেষে অদৃশ্য করে দেয়া এবং এই জন্যই আজ যখন এতকিছু থাকতে মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, আমি অন্তত বিস্মিত হই না। হই-না এইজন্য যে, ইবলিসের তো এটাই কাজ। কিন্তু কোরআন পাকের ঘোষণা অনুযায়ী ইবলিস ও তার অনুগত কিংকরদের বুদ্ধি যেহেতু খুব বেশি নয় এবং তাদের চক্রান্তও দুর্বল, তাদের চালাকি ও সুপরামর্শের অন্তঃসারশূন্যতা বেশি সময় গোপন থাকে না। অনেক মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা আশানুরূপ নয়, পাঠাগার দরিদ্র, মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ-যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, 'মৌলবাদী' শিক্ষা আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একেবারেই শুধু নিষ্ফল সময়, অর্থ ও শ্রমক্ষয় মাত্র– এই

www.pathagar.com

ধরনের কিছু 'অকাট্য কল্যাণকর' যুক্তি মাদ্রাসা বন্ধের জন্য 'খুবই উপকারী' পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। মূল চক্রান্তের এটাই আপাতমধুর সারাংশ। অবশ্য আলেম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রবল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে 'মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা বন্ধের কোনো দূরভিসন্ধি নাই' বলে সংশ্লিষ্ট পরাক্রমশালী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন বটে কিন্তু কুযুক্তিগুলো প্রত্যাহৃত হয়নি। আল্লাহপাক আলিমূল গায়িব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অন্তরের খবর আল্লাহপাকই জানেন। আমি শুধু বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান এই 'অখণ্ডনীয় নির্মল' যুক্তিসমূহের যে কী–ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপ ও কী ধরনের ছেলেমানুষী দ্বারা এই যুক্তিগুলো রচিত, সে বিষয়ে কিছু আরজ করতে চাই। অনেক মাদ্রাসায় যেহেতু ছাত্রসংখ্যা আশানুরূপ নয়, অতএব সেই সকল প্রতিষ্ঠান সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বহির্ভূত থাকাই বাঞ্ছনীয়। যুক্তিই বটে! কিন্তু এই মনোরম যুক্তির যাঁরা প্রণেতা ও উপস্থাপক তাঁদের কাছে সবিনয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি– সহায়তা, আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার, তা-কি প্রয়োজন ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিরূপিত হবে, নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা? সংখ্যাই যদি হয় সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ড, তাহলে কবি কি, বিজ্ঞানী কি মানবপ্রেমী চিন্তাবিদদের তুলনায় শুধু এই ঢাকা শহরেই পকেটমারের সংখ্যা অনেক বেশি, অতএব তারাই সর্বোচ্চ আনুকূল্য লাভের ন্যায় দাবিদার। আসলে সংখ্যাগত গরিষ্ঠতা গণতন্ত্রের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হলেও সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদা এই শর্ত মান্যযোগ্য নয়। ইসলামী শিক্ষা যদি গর্হিত ও অনাবশ্যক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে কোনো কথা নেই; কিন্তু দেশ ও সমাজ, জাতি ও জনগণের জন্য এই শিক্ষা যদি উপকারী ও প্রয়োজনীয় হয় তাহলে শুধু ছাত্রসংখ্যার অপ্রতুলতার অজুহাতে মাদ্রাসার ওপর থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে নেয়া খুবই অসমীচীন ও অযৌক্তিক। এতদসঙ্গে দরিদ্র-পাঠাগার ও পুস্তকাদির সংখ্যাল্পতা যদি কোনো গুরুতর কারণ হয়, সে বিষয়টিও আমাদের ভেবে দেখা কর্তব্য। সত্য যে, অধিকাংশ মাদ্রাসাতেই উপযুক্ত মানের লাইব্রেরী নেই; কিন্তু থাকবে না কেন? বছরে এই দরিদ্র দেশেও শত রকমের জন্মমৃত্যুর মহোৎসব, গীত ও নৃত্যবাদের বিশাল বিশাল জলসা, কোটি কোটি টাকার খেলাধুলা, নানা নামে নানা অছিলায় প্রায়শই নিরর্থক বিদেশ ভ্রমণে লক্ষ লক্ষ ডলারের 'সদ্ব্যবহার', মিলে কলে-কারখানায় হাজার হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি, ব্যাংকে হাজার হাজার কোটি টাকার অনাদায়ী খেলাপি ঋণ–এসব কোনো কিছুই যদি সরকারকে বিচলিত না করে এবং তা পূর্বাপর সরল ও সম্মানজনকভাবে অব্যাহত থাকে, তাহলে ন্যূনতম সদিচ্ছা থাকলে এসব খরচের (অপব্যয় বলাই যুক্তিযুক্ত) এক লক্ষাংশ দিয়ে সকল মাদ্রাসাকে উপযুক্তভাবে পাঠাগার-সজ্জিত করা আদৌ দুরূহ নয়। বস্তুত, কর্তৃপক্ষ আরোপিত মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যা বলা হয় তা হলো, এ ধরনের মৌলবাদী শিক্ষা দিয়ে কোনো কাজ-তো হয়ই না, বরং শুধু এক অকর্মণ্য বেকারের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে। আমরা যাই বলি, এ

www.pathagar.com

বক্তব্যটি কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যই-তো মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রি গ্রহীতাদের চাকরি কোথায়? তাদেরকে কাজে লাগানোর মতো জায়গা কোথায়? অতএব এই দুঃসহ দুর্বহ বেকারত্বের কথা মনে রেখে কোনো দায়িত্বশীল সরকার ইসলামী শিক্ষা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এটাই তো 'সময়ের যৌক্তিক দাবি'। কর্তৃপক্ষের এই সদিচ্ছা ও সদ্বিবেচনা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবো না, করা সঙ্গতও নয়; বরং বলব, এই জাতীয় আন্তরিক দায়িত্ববোধ খুবই প্রশংসনীয়।

কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু মেনে নিয়ে খুব ক্ষীণকণ্ঠে হলেও একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি; অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কী অবস্থা? বেকারত্বের প্রশ্নে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বহির্গত হচ্ছে, তাদের প্রকৃত অবস্থা কেমন? দুর্বিষহ বেকারত্বের চাপে তাদের একটি বিরাট অংশ বাধ্য হয়ে মস্তান, চাঁদা ও টেন্ডারবাজ, ফেনসিডিল-হেরোইনসেবীতে কি পরিণত হচ্ছে না? আর অতি নগণ্যসংখ্যক ভাগ্যবান, যারা প্রতিভা কি, তদবির কি বিশাল অঙ্কের উৎকোচ প্রদানের বিনিময়ে চাকরি লাভ করছে, তারা কি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আদৌ সচেতন? যতদূর জানি, অতি নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, চাকরিতে যোগদানের প্রথম পূর্ণদিবস থেকেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য উৎকোচ, উৎকোচ এবং উৎকোচ। এদের দ্বারা মানুষের ও দেশের কোনো উপকার তো হয়ই না, বরং দুর্ভোগ বাড়ে, জুলুম প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব চাকরি আপাতদৃষ্টিতে চাকরি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব হলো অর্থ আত্মসাতের এক একটি গভীর গহ্বর, অপ্রতিবাদযোগ্য লুণ্ঠন ও দস্যুতা। অনেকে ভালো আছেন, অনেকের মধ্যে আল্লাহ ভয় ও হালাল-হারামের বিবেচনা আছে, মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার অনুভূতি আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কত? নির্ভুল পরিসংখ্যান জানা নেই, তবে আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা ও নানা নির্ভরযোগ্য খবরাখবরের ভিত্তিতে বলতে পারি, এই ধরনের ঘুষ না খাওয়া, সরকারি-বেসরকারি অর্থ তছরুপ না করা, রাষ্ট্র ও জনগণের হক বিনষ্ট না করা, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্বনিষ্ঠ 'বদ্ধ উন্মাদের' সংখ্যা তিন শতাংশের অধিক হবে না। অতএব, সাতানব্বই শতাংশের যা কাজ, সে তো বেকারত্বের চেয়েও বহুগুণ ভয়ঙ্কর। আসলে মাসান্তে মাইনে পাওয়াটাই যদি বেকারত্বের সমাধান হয়, তাহলে আমাদের একজন বিদগ্ধ সাংবাদিক বন্ধু 'কলকাতা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী জ্যোতির্ময় দত্ত একদা যা লিখেছিলেন, সেটাই একটি মোক্ষম পন্থা?। তিনি বলেছিলেন, সারাদেশে শহরে শহরে লক্ষ লক্ষ মূত্রাগার স্থাপনকরত, সেখানে পাহারাদার হিসেবে দু'জন করে ব্যক্তিকে চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান করলে বেকার সমস্যা বহুলাংশে লাঘব হতে পারে। কথাটি এভাবে বললাম এ কারণে যে, বাস্তবত আমরা যাদেরকে চাকরিজীবী বলি, তাদের দ্বারা রাষ্ট্র আদৌ উপকৃত হচ্ছে না, তারা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ভাগ্যবান পোষ্যমাত্র। শুধু পোষ্য নয়, সরকারি ক্ষমতা, অর্থ ও সম্পদের তাঁরা এমনই 'হেফাজতকারী' যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও জনগণের সকল আমানত তাদের কাছে এখন বিশুদ্ধ গনিমতের মাল।

www.pathagar.com

অতএব এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা একটা বেকারত্বের 'কারখানাই' বটে এবং এ কারখানায় যত দ্রুত সম্ভব তালা ঝুলিয়ে লক আউট ঘোষণার চেয়ে 'উত্তম ও সমীচীন' পদক্ষেপ আর কী হতে পারে। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতেও বর্তমান এ না-লায়েক আলোচকের দু'টি কথা আছে। প্রথমত চসার কি মার্লো কি শেক্সপিয়র বঙ্কিম কি টেকচাঁদ ঠাকুর পড়লে যদি বেকার থাকতে না হয় উমর ফারুক (রাঃ), শেখ সাদী (রহঃ), মওলানা রুমি কি মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহঃ) পড়লে বেকার থাকতে হবে কেন? 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' পড়লে চাকরি পাওয়া যাবে অথচ পবিত্র বোখারি শরীফ পাঠের কোনো মূল্য হবে না, এটা কি ধরনের বিবেচনা? প্লেটো ট্রটস্কির রাষ্ট্রদর্শন পাঠ করলে তিনি পণ্ডিত, আর মহানবী (সাঃ) বা খলীফা উমরের নিখুঁত রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি হলো অপাংতেয় মোল্লাতন্ত্র। বদনসীব! ইবলিস আসলে এভাবেই মানুষকে আত্মহননে প্রলুব্ধ করে, আত্মভ্রষ্টতা ও আত্মবিস্মৃতির প্ররোচনা জোগায়। দ্বিতীয়ত এই একটি কথা নিশ্চয়ই উপেক্ষার যোগ্য নয় যে, আমাদের প্রণীত সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচি যত জ্ঞানগর্ভ ও মহামূল্যবানই হোক, যত মনীষীপ্রতিম শিক্ষকই শিক্ষাদান করুন, যত সুসজ্জিতই হোক পাঠকক্ষ ও পাঠাগার, সকল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক একটি ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র। শুধু রণক্ষেত্র নয়, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও চাঁদাবাজির এক একটি অতি নিরাপদ অভয়ারণ্য। অথচ এ তুলনায় মাদ্রাসায় যারা শিক্ষাগ্রহণ করছে, যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁদের আচার আখলাক নীতি ও মনুষ্যত্বনিষ্ঠা কত বেশি উঁচু ও উজ্জ্বল! সত্যই বড় আফসোসের কথা, নৈতিক বিপর্যয়ের কারণে আজ যখন সারা পৃথিবীতেই হাহাকার, আজ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বল্গাহীন অশ্বটিও ধর্মের কাছে 'ঈশ্বরের' কাছে ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুল, তখন আমাদের এই পঁচাশি শতাংশ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দেশে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর পথনির্দেশকে তুলে ধরার জন্য ছোট ছোট জোনাকির মতো যে মাদ্রাসাগুলো এখনো জ্বলছে, তাকে নিভিয়ে দেয়ার এই 'মহৎ অভিলাষ আসলেই বড় রহস্যময় ও বিস্ময়কর।

অথচ এরকম তো হওয়ার কথা নয়। নেপথ্যে কোনো দূরাগত দুরভিসন্ধি নেইতো? সম্ভবত আছে। আল্লাহপাক ভালো জানেন, না থাকতেও পারে। তবে এটা সত্য যে, আমরা ভুলে যাই কিন্তু আমাদের শত্রুরা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাদের চোখে বারবার ভেসে ওঠে বক্ষবিদারক বহু স্মৃতি। তারা ভালো করেই জানেন, শুধু এই কোরআন হাদীসের শিক্ষা শক্তির কাছেই একদিন ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল প্রবল প্রতাপান্বিত কিসরা ও কাইজারের মণিমাণিক্যখচিত মুকুট; আবির্ভূত হয়েছিলেন এক একজন অপ্রতিরোধ্য খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক বিন জিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং এটা তো ভুলে যাওয়ার মতো বেশি দূরের কথা নয় যে, এই কোরআন হাদীসের বিধান ও সংবিধানের আলোকেই অর্ধেক বিশ্ব শাসিত ও পরিচালিত হয়েছে সহস্র বৎসর ধরে একাদিক্রমে। ডব্লিউ হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে মুসলমানকে

www.pathagar.com

আক্রোশবশত 'সন্ত্রাসী' বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু বারবার এ কথাও ব্যক্ত করেছেন যে, শুধু কোরআন-হাদীস পড়া মুসলমানের জন্যই ব্রিটিশদের রাজ্য শাসন সুখময় ও নির্বিঘ্ন হতে পারেনি। আমরা ভুলে যাই, কিন্তু আবার উল্লেখ করি, আমাদের শত্রু-দুশমনদের স্মৃতিশক্তি বড় প্রখর; তারা এক বর্ণও বিস্তৃত হয়নি অধীত ইতিহাস। অতএব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলি আর ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের কথাই বলি, সকলের সকল আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হলো কোরআন এবং হাদীস। আসলে যে যাই বলুক, এটাই বাস্তব যে, কুসীদজীবী ইহুদীদের বিশ্বব্যাপী তৎপরতা, অশ্লীল সংস্কৃতির প্রসার, রাখী বন্ধন, উলুধ্বনি, যৌনতা, শোষণ ও ত্রাস– এসব যদি অব্যাহত রাখতে হয়, কোরআন-হাদীসের চর্চাকেন্দ্রগুলো উৎখাত করা অতীব জরুরি। কারণ এখান থেকে যে ইলম ছড়িয়ে পড়ে, ইসলামের একান্ত অনুগত যে আলেম তৈরি হয়, সে ইলম ও আলেমের পার্থিব মূল্য কম-বেশি যাই হোক, তাদেরকে ভয় কিংবা লোভের খাঁচায় আবদ্ধ করা কঠিন। তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাদের পথ নির্দেশক কম্পাস হলো আল-কোরআন এবং আল-হাদীস। আল্লাহর ভয় ছাড়া তাদের অন্তরে দ্বিতীয় কোনো ভয় নেই, তারা অকুতোভয় এবং ইতিহাসও এই কথাই বলে। ইসলামের সেই একেবারে প্রথমকাল থেকে অদ্যাবধি, আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যারা নিজেদের জীবন দিয়ে অব্যাহত রেখেছেন, শয়তানী শক্তির সকল ভ্রূকুটি ও চক্রান্তকে জীবন দিয়ে যাঁরা প্রতিহত করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন কোরআন-হাদীসের আলেম, ছিলেন আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর মুহাব্বতে ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এক-একজন মর্দে মুজাহিদ। অতএব এ ধরনের আলেম-উলামা তৈরির 'কারখানা', এ মাদ্রাসাসমূহ যদি ইসলাম বৈরী তাগুতি শক্তির কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং মাদ্রাসা বন্ধের সকল ব্যবস্থা তারা পরিপক্ব করে তোলে, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই এবং এটাও আশ্চর্যের নয় যে, পীর-দরবেশদের নিয়ে, সুফী আবেদ আরেফ আউলিয়াকে নিয়ে অথবা কোনো মাযার খানকাহ দোয়া-দরুদের মাহফিল নিয়ে কারো মধ্যে কোন উৎকণ্ঠা নেই; সকল আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হলো আলেম ও আলেমদের জন্মস্থান মাদ্রাসা।

অবশ্য এটা স্বাভাবিকও বটে। পীর-আউলিয়াদের নিয়ে সমস্যা খুবই কম। তাঁদের যা কিছু সবক সবই অপার্থিব, সেখানে জীবন ও জগতের কোনো কথা নেই; তাঁদের সব সবকই মৃত্তিকার নিম্নভাগ কবর ও মৃত্যু পরবর্তী ঊর্ধ্বাকাশ নিয়ে আবর্তিত। অথচ আলেমদের কথাবার্তাই অন্যরকম; এঁদের উৎখাত করা না গেলে ইবলিসের পক্ষে কোনো চক্রান্তই সফল করে তোলা সম্ভব নয়! আসলে এ জন্যই ইসলামে আলেমদের এত মর্যাদা! রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের একজন সাধারণ মানুষ এবং আমার মধ্যে যে পার্থক্য, একজন আবেদ ও আলেমের মধ্যে ততখানি পার্থক্য। ধর্মজ্ঞানে সুপণ্ডিত কোনো ব্যক্তি শয়তানের কাছে হাজারজন আবেদের চেয়েও কঠিন ও ভয়াবহ

www.pathagar.com

বলে বিবেচিত হয়" (তিরমিযী শরীফ)। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এই এরশাদও করেছেন, "সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক কল্যাণময় বিধান হচ্ছে তাই, যা মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত" (বোখারী শরীফ)। অতএব এই সর্বোত্তম কালাম ও সর্বোত্তম বিধান থেকেই যদি মুসলমানকে মাহরুম করা না গেল, তাহলে ইবলিস ও তার অনুসারীদের সবই তো পণ্ডশ্রম। কিন্তু সমূহ 'দুঃখের' কথা, কাফেরদের কিংকর সদৃশ কিছু মুসলমান যতই আত্মঘাতী প্রবণতায় প্রবৃত্ত হোক, যতই তুমুল হয়ে উঠুক মুশরিক মুনাফিকদের চত্বর চক্রান্ত, মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু এদেশে কেন, কোনোকালে কোনো দেশেই বন্ধ হবে না। এমনকি বৃটেন আমেরিকাতেও নয়, এমনকি ভারত বর্ষেও নয়। অনুমান করি, আমাদের অনেক মানব হিতৈষী বুদ্ধিজীবী মনে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন, কিন্তু কথাটা আমার নয়। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং এরশাদ করেছেন, "ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় অক্ষত থাকবে; দ্বীনের সুরক্ষা ও বিজয়ের লক্ষ্যে উম্মতের একটি অংশ নিয়োজিত থাকবে জিহাদে"। আল্লাহপাকও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন– কাফেররা আল্লাহর নূরকে ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু তা অসম্ভব; কাফেরদের জন্য বেদনাদায়ক, আল্লাহপাক তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (সূরা ছফ)। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ বা সংকোচনের নেপথ্যে কার কী ভূমিকা জানি না, জানার কোনো কৌতূহলও নেই, শুধু এটুকু উল্লেখ করতে চাই– আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, দেশের শতকরা পঁচাশি শতাংশ মানুষের ধর্মপ্রীতির বিরুদ্ধে, কোনো যুদ্ধ ঘোষণা খুবই অবিমৃশ্য হঠকাররিতার পরিচয় বহন করে। আর এর সঙ্গে যদি জুলুমের কোনোরূপ সংশ্রব থাকে, তাহলে তো মনে রাখা খুবই জরুরি, মজলুমের ফরিয়াদ আল্লাহ কখনো অগ্রাহ্য করেন না এবং এ কথাও সর্বদা স্মরণ রাখা কল্যাণকর যে, আল্লাহর রহমতের মতো আল্লাহর গযবও অত্যন্ত নিকটবর্তী। 'ইন্না বাতশা রাব্বিকা লা শাদীদ'– তোমার প্রতিপালকের প্রহার বড়ই কঠিন (সূরা বুরুজ)। আর এ বিষয়ে আমাদের কারো অসতর্ক হবার কোন অবকাশ নেই, কারণ 'ইন্না রাব্বাকা লাবিল মির সাদ'– তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (সূরা ফাজর)।

অতএব, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ কি সংকোচনের এই নীতি, এই আত্মঘাতী পদক্ষেপ, এই বালোচিত হঠকারিতা পরিহার করা, জাতির জন্য তো বটেই, আমাদের নিজের জন্যও উপকারী। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

www.pathagar.com

আফতাব আহমাদ

শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও দলীয়করণ

ডেটলাইন ঃ ৫ এপ্রিল ২০০১

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মেধা, মনন ও সৃজনক্ষমতা বিকাশের কর্মসূচি চাওয়া সোনার পাথরবাটি পাওয়ার সমতুল্য। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এমনই দীন ও ক্লব, যে কোনো নীতিগত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে কিংবা আলোচনার সূত্রপাত ঘটালে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর বহুল উচ্চারিত একটি হাবুগান রয়েছে– অমুকটা করা হবে, তমুকটা মানি না, তমুকটা গণবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ইত্যাদি। আসলে যে কোনো ক্ষেত্রে– কি কৃষি সংস্কার, কি শিল্পোন্নয়ন, কি বাজেট বরাদ্দ, কি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন, কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সুস্পষ্ট সামাজিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি জনগণের সামনে উপস্থান করতে আজ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। বিশেষ করে, শিক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার হয়েছে। আমাদের রাজনীতিকরা জনতুষ্টিবাদী (Populist) বুলি কপচাতে সিদ্ধহস্ত। শিক্ষার প্রসঙ্গ এলেই উৎপাদনমুখী, গণমুখী, বৈজ্ঞানিক আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে– এ ধরনের মুখরোচক অথচ বিমূর্ত ও বিভ্রান্তিমূলক বেশ কিছু আপ্তবাক্য উচ্চারিত হতে আমরা দেখি। এর প্রকৃত কোনো ব্যাখ্যা কিংবা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর স্বরূপ নির্ণয় করে কোনো কার্যক্রম জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত হতে এ পর্যন্ত আমরা দেখিনি। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষাখাতকে এড়িয়ে গিয়ে অন্যান্য খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াবার প্রবণতা বেশী করে কাজ করছিল; কারণ, শিক্ষাখাতে অর্থ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও আমলাগণ আর্থিকভাবে খুব বেশী লাভবান হওয়ার কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে 'ফ্যাসিলিটিজ' বিভাগ নামে একটি বিভাগ গঠিত হওয়ার পর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাজের এক বিরাট অংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হয়ে পড়েছে। ফলে, শিক্ষা–ভৌত অবকাঠামো-দালানকোঠা ও ইমারত নির্মাণের নামে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বহু লোক আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে এবং দুর্নীতির পাহাড় ক্রমান্বয়ে আকাশচুম্বী হচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্যাজুয়ালটি হচ্ছে– শিক্ষা, শিক্ষার মান, শিক্ষার মূল্যবোধ, শিক্ষার গুণ, নীতিবোধ ও শ্রেয়বোধ।

সমাজের সর্বত্র পেশিশক্তি ও সহিংসতার প্রতাপের ফলে শিক্ষায়তন একটি ছাপানো সার্টিফিকেট প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে। পরীক্ষা এখন একটি প্রহসন– একটি জাতীয় উৎসব– নকলের উৎসবে পরিগণিত হয়েছে। শিক্ষকতা এখন অনেকটা

www.pathagar.com

ঠিকাদারি এবং কলাটা, মুলাটা যোগাড় করার পেশায় পরিণত হয়েছে। সম্মানজনক দু' একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে স্থূল বস্তুবাদ আমাদের সকলকেই প্ররোচিত করছে অর্থপিচাশ ও অর্থ গৃধ্নুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া না শিখিয়ে সরকারি দলের কিংবা এলাকার প্রতাপশালীদের তল্পীবাহক হয়ে কিভাবে গুণকীর্তন করা যায়, শিক্ষায়তনগুলো আজ মূলত তারই এক একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আর শিক্ষকতার নামে অর্থলোলুপ অযোগ্য জ্ঞান-মজুররা ছাত্রছাত্রীদের কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনির নামে গৎবাঁধা ও ছকবাঁধা কিছু প্রশ্ন ও উত্তর তোতাপাখির মতো শিখিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ আয়-উপার্জন করে বিত্তশালী হওয়ার এক অন্ধ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। রাস্তায় বেরুলেই অলিতে-গলিতে, বাঁকে ও মোড়ে ফলক ও ফেস্টুনে ফলাও করে এইসব কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনির সুসমাচারের বার্তা অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। এমনকি এককালের নামকরা সরকারি স্কুল-কলেজের মাস্টাররাও এই পথটিই বেছে নিয়েছেন। শিক্ষা এখন এক নিম্নমানের পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড নামের এক কিম্ভূতকিমাকার প্রতিষ্ঠানের। কোমলমতি বালক-বালিকাদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিবছর প্রত্যেক বিষয়ে নতুন করে বই লেখানো হয় এবং প্রত্যেকবারই এসব বই নতুন করে ভিন্ন ভিন্ন ছাপাখানায় ছাপার ব্যবস্থা করতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অযোগ্য অক্ষম অনেক লোককে দিয়েই আবার এসব বই লেখানো হয়। অনেক সময়ে যাদের নাম বইয়ের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় তারা আসলে আদৌ বইগুলোর লেখকই নন। নামটা শুধু অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নেয়া হয়ে থাকে। গোটা ব্যাপারটিই মহাসাগরসম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের মতো এমন দুর্নীতিগ্রস্ত খুব কম প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশে আছে। আর সব কিছুকে বাদ দিয়ে শিক্ষাকে নিয়ে এবং শিক্ষার উপকরণাদি নিয়ে যারা এই ধরনের ছেলেখেলা ও ছিনিমিনি খেলায় লিপ্ত তারা যে জাতির কতবড় সর্বনাশ করছে, তা অন্ধ অর্থকাঙালরা না বুঝলেও ইতিমধ্যেই আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অবস্থাও তথৈবচ। এখানে এখন যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগদানের পরিবর্তে এখন প্রধানত মাসলম্যান ও ভোটার রিক্রুট করা হয়। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পান্ডার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফল যা হবার তাই হয়েছে। নিজ গুণে যেসব ছাত্রছাত্রী জ্ঞানার্জন করে মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে, এই স্বল্প সংখ্যকই আগামী দিনের আমাদের একমাত্র সম্বল। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এক কলস মূর্খতা নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি পাস করে বাসার চাকরবাকরদের নিয়ন্ত্রণাধীন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে সরকারি প্রশাসনে নিয়োগ লাভের যে সুযোগ পাচ্ছে, তাতে অচিরেই রাষ্ট্র যে রসাতলে যাবে, তা আমাদের দাতা

www.pathagar.com

গোষ্ঠীরা ইতিমধ্যেই বেশ বুঝতে পেরেছে। আর সে কারণেই বিভিন্ন প্রজেক্ট ও অনুদান প্রকল্পে বাইরের কনসালট্যান্ট নিয়োগ একটি বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে আরোপিত হচ্ছে। আগামীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, সেচ নির্বিশেষে প্রত্যেক খাতে বৈদেশিক সাহায্য বা দাতাগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়কারী হিসেবে একজন বিদেশী টেকনোক্র্যাটকে সচিব বা সমন্বয়কারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান বাধ্যতামূলক শর্ত করা হয়, তাতে অবাক হবার কিছুই থাকবে না। কারণ মাস্টার্স ডিগ্রিধারী বিসিএস পাস বহু গুণধরেরই 'ক' অক্ষর জ্ঞান নেই, এর অসংখ্য নজির বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভিজ্ঞজনেরা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য অর্জন করেছেন। এ থেকেই সহজে অনুমেয়, আগামী প্রজন্মের স্বরূপ কেমন, জাতি গঠন ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে আগামী প্রজন্ম কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারবে। আমরা এক বিশাল ধসের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে তীব্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আমাদের উপলব্ধিগুলোকে সংহত করে সকল সংকীর্ণতাকে পরিহার করে একযোগে এই অবক্ষয় ও অধঃপাতের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। রাজনীতিটাকে রাজনৈতিক দলগুলো এখন আর দেশসেবা ও আদর্শ হিসেবে দেখে না। এটি এখন একটি রমরমা ব্যবসা। জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে, আশা ও স্বপ্নকে জিম্মি করে রাজনীতিকরা রাতারাতি টাকার কুমির হওয়ার অতি সহজ পথটি খুঁজে পেয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কালো টাকার দৌরাত্ম্য এবং পেশি ও অস্ত্রের অভিনব ভিয়েন। তাই শিক্ষা কিংবা জাতির মনন গঠনের প্রশ্নে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের কাছ থেকে তেমন কিছু প্রত্যাশা করা উচিৎ নয়। আসুন দুর্বৃত্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন আমরা গড়ে তুলি, যাতে দেশ এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

এস এম আরেফিন

আওয়ামী আমলে শিক্ষাঙ্গন ছিল হাসিনার সোনার ছেলেদের দখলে

ডেটলাইন ঃ ১৪ জুলাই ২০০১

আওয়ামী দুঃশাসনে দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিস্তার করেছে অস্থিরতা আর স্থবিরতা, নগ্ন দলীয়করণ, ওপেন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, হরিলুট আর অদক্ষ প্রশাসনের কারণে দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কোনো সুষ্ঠু পরিবেশ ছিলো না।

'৯৬-এর ২৩শে জুন আওয়ামী লীগের ক্ষমতা দখলের পরই মুজিববাদী ছাত্রলীগ চর দখলের ন্যায় হল দখল শুরু করে। বিরোধী নেতা-কর্মীদের পিটিয়ে অস্ত্রের মুখে হল থেকে বের করে দেয়। প্রশাসনের টপ টু বটম দলীয় আশীর্বাদপুষ্ট লোক নিয়োগ দেয়া হয়। সন্ত্রাসী আর চরমপন্থীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয় শিক্ষাঙ্গন।

আওয়ামী দুঃশাসনের ৫ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ, খুন, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, চাঁদাবাজি, অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়সহ হেন কুকর্ম নেই যা ঘটেনি।

বিএনপির শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ শুধুমাত্র জগন্নাথ হল নিয়ন্ত্রণ করতো। '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার ঠিক অগেই ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল ও জহুরুল হক হল দখল করে নেয়। ক্ষমতায় আসার পর প্রথমে এফ রহমান, কদিন পরেই মুহসীন হল দখল করে নেয়। এরপর ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে দখলে নেয় সূর্যসেন হল। একই সময়ে দখল করে নেয় এফ এইচ হল ও শহীদুল্লাহ হল। '৯৮ সালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা পার্থ প্রতীম আচার্যের লাশের বিনিময়ে একই দিনে দখল করে নেয় জসিমউদ্দিন, জিয়া ও বঙ্গবন্ধু হল। ছাত্রলীগ নেতারাই গুলি করে রক্তের সিঁড়ি বেয়ে হল দখলের ইস্যু সৃষ্টি করেছিলো বলে এখনো কানাঘুষা চলে।

এ সময় ক্যাম্পাসে এক নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সব সময় আতঙ্কে বসবাস করতো। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৯৯৬ সালের ২৪শে আগস্ট ভিসি এমাজউদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করেন। এ সময় জিয়া হলের প্রভোস্ট ডঃ এরশাদুল বারী, ফজলুল হক হলের আহমদ ইসমাইল মোস্তফা ও কবি জসিমউদ্দিন হলের শেখ শহীদুল্লাহ পদত্যাগ করেন। এ ছাড়া প্রক্টরসহ অপরাপর প্রভোস্টরাও একে একে পদত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

খুন, ডাকাতি, অপহরণ ও ছিনতাইয়ের ক্রাইম জোনে পরিণত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। গত ৫ বছরে খুন হয়েছে ১২ জন, ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ১৫টি, মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৩৭টি, ছিনতাই হয়েছে অসংখ্য। একক আধিপত্য বিরাজকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, হল দখল পাল্টা দখল ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলায় কয়েক হাজারের অধিক বোমা ও গুলি বর্ষিত হয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ৩ মাসের মাথায় '৯৬ সালের অক্টোবর মাসে ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগের দু' গ্রুপের সংঘর্ষে তনাই নামে একজন বহিরাগত সন্ত্রাসী নিহত হয়। একই বছর ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে ১জন ঠিকাদার নিহত হয় এবং '৯৭ সালের মার্চে মুজিব হলের সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্রদল নেতা আরিফ হোসেন তাজ খুন হয়। '৯৮ সালের এপ্রিলে খুন হয় পার্থ প্রতীম আচার্য। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে জগন্নাথ হলের সামনে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে যুগ্মসচিব নিকুঞ্জ বিহারী দেবনাথ শহীদ মিনারের কাছে খুন হয়। একই বছর জুলাই মাসে ক্যাম্পাসের মল চত্বরে জাহিদ হাসান ও আবুল হোসেন নামে ২জন বহিরাগত খুন হয়। ওই বছর অক্টোবর মাসে ছিনতাইকৃত টাকা ভাগাভাগি নিয়ে আইবিএ ভবনের পাশে ছাত্রলীগের বহিরাগত ক্যাডারদের হাতে কাশেম নামে এক ছিনতাইকারী নিহত হয়। গত ১৪ই ডিসেম্বর ছাত্রলীগ ক্যাডার হেমায়েতের গুলিতে নীলক্ষেতে লিটন নামে একজন নিহত হয়। এ বছর ২৭শে মার্চ রাতে জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগ ক্যাডার খায়রুল আলম ওরফে কুত্তা লিটন খুন হয়। গত মাসের শেষদিকে শহীদ আহমদ পিন্টু ও ছাত্রলীগ ক্যাডার খুন হয়। কয়েকদিন আগে সাবেক সংসদ সদস্য সুজন খুন হন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। প্রায় প্রত্যেকটি খুনের পিছনেই কোনো না কোনোভাবে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা জড়িত। এর মধ্যে শুধুমাত্র যুগ্ম-সচিব নিকুঞ্জ বিহারীর হত্যাকারীদের বিচারের রায় হয়েছে। অপর কোনো হত্যা মামলায় অপরাধীদের শাস্তি হয়নি। ছাত্রলীগ ক্যাডার কর্তৃক ধর্ষণ এমনকি শিক্ষক কর্তৃক স্বীয় ছাত্রীকে যৌন হয়রানির মতো ন্যক্কারজনক লজ্জাকর ঘটনাও ঘটে গেল ৫ বছরে। মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক কামালউদ্দিন, আন্তর্জাতিক বিভাগের শিক্ষক শাহীদুজ্জামান ও একই বিভাগের রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে শুধুমাত্র শহীদুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি তিনি যোগদান করেন। ছাত্রলীগ ক্যাডার কর্তৃক বেশ কয়েকবার তরুণী ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এমনকি জহুরল হক হলে একটি রুমে এক ছাত্রলীগ ক্যাডারকে তরুণীসহ আপত্তিকর অবস্থায় ঘিরে ফেলেছিলা। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ ক্যাডারকে শেল্টার দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়া আই.ই.আর ভবনে ইডেন কলেজের ছাত্রীসহ এক ছাত্রলীগ ক্যাডারকে পাওয়া যায়। গত ৫ বছরে প্রশাসনের পদে পদে দলীয়করণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। প্রতিটি হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক দলীয় লোক ছাড়া নিয়োগ দেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ অন্যান্য দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কোনো তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পরপর ভর্তি পরীক্ষায় কলা অনুষদের ডীন আবদুল মালেক অবৈধভাবে ৩৪ জন ছাত্রলীগ ক্যাডারকে ভর্তি করান। পরে অবশ্য তাদের ভর্তি বাতিল করতে হয়েছিল।

গত ২৫শে জুলাই ২০০০ হিন্দুয়ানী কায়দায় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে এ অনুষ্ঠান করা হয়। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গ্রামবাসীর মধ্যে স্মরণকালের ভয়াভয় সংঘর্ষ হয়। এতে বহুসংখ্যক আহত হয়। কিন্তু প্রশাসন উল্টো শিবিরকে জড়িয়ে মামলা দেয়।

একই কায়দায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয়করণের ষড়যন্ত্র '৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের শুরু থেকেই শুরু করে। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সাবেক ভাইস চ্যাঞ্চেলর প্রফেসর এনামুল হককে অপসারণ করে রাবি-র শিক্ষক ও রাজশাহী মহানগরী আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মুহাম্মদ কায়েস উদ্দিনকে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়। এর পর থেকেই শুরু হয় দলীয়করণের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। সাম্প্রতিককালে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ভিসি কায়েস উদ্দিন দুর্নীতির রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এমনকি প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত প্রার্থীর পরিবর্তে ৩য় বিভাগ প্রাপ্ত প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। বিবিএ ফ্যাকাল্টির ফার্স্ট মোঃ শহীদুল ইসলাম আওয়ামী লীগ পরিপন্থী না হওয়ায় শিক্ষক হিসেবে তাকে না নিয়ে ৩য় বিভাগ প্রাপ্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ সাহাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। শূন্য পদের তুলনায় বহুসংখ্যাক শিক্ষক কর্মচারী নেয়ারও অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক পদে ১২টি-র বিপরীতে ৫২ জন, কর্মকর্তা পদে ৪টির বিপরীতে ১২ জন, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী পদে ৮টির বিপরীতে ২৩ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে ১৩টি পদের বিপরীতে ২০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়।

ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা হল দখলের জন্য বারবার হামলা চালিয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। '৯৬-এর ২৫ শে সেপ্টেম্বর মাগরিব নামায আদায়কালে তৎকালীন শিবির সভাপতিসহ ১০/১২ জনের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় ছাত্রলীগ। এর পরের দিন চরমপন্থী আর্মস ক্যাডারদের ৫ লাখ টাকা দিয়ে ভাড়া করে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টাব্যাপী হামলা ও হাজার হাজার রাউন্ড গুলীবর্ষণে দেড় শতাধিক শিবির কর্মী ও সাধারণ ছাত্র গুলিবিদ্ধ ও ছাত্রশিবিরের এক মেধাবী নেতা শহীদ হয়। '৯৭-এর ৮ই জানুয়ারি ক্যাম্পাসে এক শিবির কর্মীকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়।

www.pathagar.com

'৯৭-এর ২৬শে জুন ছাত্রলীগ পুলিশের উপস্থিতিতে প্রশাসন ভবনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। ৩১শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে ১০ জনকে আহত করা হয়। '৯৮-এর ৮ই মার্চ শিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা ও পরদিন প্রতিবাদ মিছিলে হামলায় ৩০ জনেরও অধিক শিবির কর্মী আহত হয়। ৩০শে অক্টোবর ছাত্রলীগ শিবিরের ওপর গুলিবর্ষণ করলে মোহসিন ও আল মামুন নামে শিবিরের ২জন শহীদ ও ৩০ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এ ছাড়াও বহুবার শিবিরের মিছিলে হামলা করে ছাত্রলীগ।

গত ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয়েছে ৮জন, আহত সহস্রাধিক। বিভিন্ন সংঘাত সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিলো প্রায় ২ বছর। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গন দখলের ধারায় সর্বপ্রথম টার্গেট হয় চট্টগ্রাম ভার্সিটি। প্রশাসনে বসানো হয় দলীয় লোক প্রথমে ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যাক পুলিশের সহায়তায় ২টি হল দখলে নেয়। ১৯৯৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরে আমিনুল ইসলাম বকুল নামে একজন সাধারণ ছাত্রকে খুন করা হয়, হল দখলের পরিবেশ তৈরির জন্য। ২য় হত্যাকাণ্ড ঘটে '৯৮-এর ৬ মে। হল দখলের প্রতিযোগিতায় বন্দুকযুদ্ধে আমানত হলে মারা যায় ভর্তিচ্ছু আইয়ুব আলী। ১৮ই মে ক্যাম্পাস থেকে শহরে যাওয়ার পথে বাসে ব্রাশ ফায়ারে নিহত হয় মেধাবী ছাত্র মুশফিক। একই বছর আগস্ট মাসে দাড়ি থাকায় শিবির সন্দেহে সঞ্জয় নামে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী খুন হয়।

শিবির নেতা ও অর্থনীতির শেষ বর্ষের ছাত্র জোবায়েরকে অপহরণ করে খুন করা হয়"৯৯ সালের ১০ মে। সর্বশেষ শিবির নেতা রহীম ও মাহমুদকে একই সাথে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয় '৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর রমযান মাসে। এসব হত্যাকাণ্ডে গঠিত কোনো তদন্ত কমিটির রিপোর্টই প্রকাশ পায়নি। গ্রেফতার হয়নি খুনিরা।

এ ছাড়া '৯৯ সালের ১০ অক্টোবর মাসে সাংবাদিকতা বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের রাখিবন্ধন ও তিলক পড়ানো হয়। এনিয়ে সারাদেশে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে হল ও ভবনসমূহের নাম পরিবর্তনের আন্দোলন ও ইসলাম প্রিয়দের বিজয় ছিল আলোচিত ঘটনা। সিনেটের এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ও জাহানারা ইমামের নামে হল, হাচন রাজার নামে অডিটোরিয়াম এবং জোবেদা রহিম চৌধুরী, ডঃ জিসি দেব, ডঃ কুদরাতই খুদা ও মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ সত্যেন বোসের নাম বিভিন্ন ভবনের নামকরণের সিদ্ধান্ত হয়। এ নিয়ে '৯৯-এর সেপ্টেম্বর শিবির প্রথম আন্দোলন শুরু করে। এ নিয়ে বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও সংঘর্ষ হয়। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ অনশনের নামে সুপার ফ্লপের অনুষ্ঠান করেন। পরে দীর্ঘ ৭ মাস আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষ নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

এসব নিয়োগে যোগ্যতার চাইতে দলের প্রতি কমিটমেন্টই ছিল লক্ষণীয় বিষয়। এ সময় প্রায় শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। মার্কেটিং বিভাগে ছাত্রলীগ নেতা সমীর কুমার শীলকে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ৪টি ১ম শ্রেণী প্রাপ্ত প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্রলীগ নেতা জামাল উদ্দিনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান চানকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ ছাড়া আইন বিভাগসহ যে কয়টি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা সবাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের পুনর্বাসন ও শিক্ষক রাজনীতিতে শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১১টি নতুন বিভাগ খোলা হয়। এসব বিভাগেও সব দলীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়।

ছিনতাইকারী, ডাকাত, সন্ত্রাসী আর চরমপন্থীদের অভয়ারণ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৯ বছরের ইতিহাসে নজিরবিহীন ডাকাতির ঘটনা ঘটে। '৯৯ সালের ৫ই জুলাই প্রফেসর এরশাদুল বারীর বাসায়। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের একজন নেতা ওই ডাকাতিতে নেতৃত্ব দেয় বলে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল। '৯৬ সালেত নভেম্বর মাসে সাবেক ভিসি এমাজ উদ্দিনের জামাতা এস এম আতিকুর রহমানের সদ্যপ্রাপ্ত বাসভবনে একটি ডাকাতি সংঘটিত হয়। একই মাসে সূর্যসেন হলের একজন হাউস টিউটরের বাসায়ও ডাকাতি হয়। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল জিম্মি। তাদের ইচ্ছামত রুম পরিদর্শন করতে হতো। হলে সীট নেয়ার জন্য ছাত্রলীগ ক্যাডারদের " আশীর্বাদপুষ্ট" হতে হতো। মিছিল মিটিং এ যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক। মিছিলে যোগদান না করলে হল থেকে বের করে দেয়া, সিগারেট দিয়ে শরীর পুড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে অনেকবার।

'৯৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট দেয়ার জন্য সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো এর প্রতিবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি, ৭টি অনুষদের মধ্যে ৩টি অনুষদের ডীনসহ অসংখ্য শিক্ষক এ অনুষ্ঠান বর্জন করেন। এর প্রতিবাদে আগেরদিন ছাত্রদল ও শিবিরের মিছিলে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশ শতাধিক ছাত্রজনতাকে গ্রেফতার করে। সংঘাতমুখর ও থমথমে পরিস্থিতির মধ্যে শেখ হাসিনা ডক্টর অব ল ডিগ্রি গ্রহণ করেন। এ সময় নোবেল বিজয়ী আর্মত্য সেনকে ডক্টর অব সাইন্স ডিগ্রি দেয়া হয়। এ সময় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে বন্দী ছিল।

হলে হলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা গড়ে তুলেছিল টর্চার রুম। নগরীর বিভন্ন স্থান হতে অপহরণ করে টর্চার করা হতো এসব রুমে। অভিযোগে জহুরুল হক হলের পাশে এনআই কম্পিউটার নমে একটি প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলা হয়।

www.pathagar.com

বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় ভিসি আজাদ চৌধুরী বহিষ্কার বহিষ্কার খেলা খেলেছেন। কথায় কথায় বহিষ্কার করেছেন। দেখা যেতো সময়মতো বহিষ্কারকৃতরা ঠিকই পাস করে বের হয়ে গেছে। দিব্যি হলে অবস্থান করছে। সম্প্রতি ভিসি তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছেন।

'৯৯ সালের থার্টি ফাস্ট নাইটের বাধন লাঞ্ছনার ঘটনার সময় দেশে তোলপাড় হয়। ছাত্রলীগ ক্যাডার রাসেল, টুটুলসহ কয়েকজন তাকে টিএসসিতে প্রায় নগ্ন করে ফেলে। কিন্তু কোনোই শাস্তি হয়নি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম দলীয়করণ, অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা করার ফলে স্মরণকালের ভয়াবহ অর্থ সংকট ও শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা দেয়ার প্রশাসন শক্তি প্রয়োগ করে মূলত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকেই অচলাবস্থায় ঠেলে দিয়েছে বারবার। ১৯৯৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত ভিসি প্রফেসর ইউসুফ আলীকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরিয়ে দেয়া হয়। ক্ষমতায় বসানো হয় আওয়ামী লীগের শীর্ষ বুদ্ধিজীবী বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা প্রফেসর আবদুল খালেককে। এরপর শুরু হয় ভিন্ন রাজনীতির লোকদের দমনপীড়নের প্রক্রিয়া। দলীয় লোকদের বসানো হয় বিভিন্ন স্তরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শূন্যপদের বিপরীতে দ্বিগুণ তিনগুণেরও বেশী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। জানা যায়, বিভিন্ন বিভাগের ২৭টি স্থায়ী পদের বিপরীতে ৯৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। ৭০ জনকে দেয়া হয় অস্থায়ী নিয়োগ। দলীয় ছাত্রদের ভর্তির জন্য পরীক্ষায় আমূল পরিবর্তন করা হয়। অনুষদভিত্তিক পদ্ধতির বদলে চালু করা হয় বিভাগভিত্তিক প্রক্রিয়া। তাতে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ছাত্রশিবির এর বিরোধিতা করে।

'৯৭ সালের ২৬ শে এপ্রিল ছাত্রশিবিরের মিছিলে সরাসরি ভিসির নির্দেশে পুলিশ হামলা চালায়। এতে বহু নেতাকর্মী আহত ও গ্রেফতার হয়। ২২ জুন শিবিরের ডাকে হরতাল চলাকালে সাহেব বাজার এলাকায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। শত শত নিরীহ ছাত্র জনতা এতে আহত হয়। মাগরিবের নামাযের সময় পুলিশ হেতেম খা বড় মসজিদে বুট পায়ে মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লীদের মারধর করে। এ ছাড়া বারবার ছাত্রলীগ ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে হামলা চালায় পুলিশের ছত্রছায়ায়।

'৯৯ সালের ১লা অক্টোবর সৈয়দ আমীর আলী হলে সানজিদা রহমান চাদনী ছাত্রলীগ ক্যাডার মোজাম্মেল হক পলিনের রুমে নোট আনতে যায়। এ সময় পলিন চাদনীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। চাদনী কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করে। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হুককি ধমকিতে পরে তাকে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হয়েছিল। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে এক বছরের জন্য বহিষ্কারাদেশ দেয়।

www.pathagar.com

এদশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ক্যাডার কর্তৃক ধর্ষণের সেঞ্চুরী ও যৌন হয়রানি ছিল আলোচিত ঘটনা। এ ছাড়া ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই ছাত্রদলকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়। '৯৮ সালের ১৭ আগস্ট প্রথম ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জোর আন্দোলনের ফলে সিন্ডিকেট ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। প্রতিবেদনে ৭ জনকে ধর্ষণকারী, ৬ নকে ধর্ষণের সহযোগী, ৩ নকে অশ্লীল শ্লোগানদাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সিন্ডিকেট ১৩ জনকে শোকজ করে। এ ছাড়া বেতনভাতা বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনের মুখে '৯৯-এর অক্টোবরে প্রায় ২৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয় অচল ছিল। পরে ভিসির নির্দেশে পুলিশ লাঠিচার্জ করে আন্দোলন স্থগিত করতে চায়। উপায়ন্তর না দেখে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। '৯৯-এর অক্টোবরে ১০ জন শিক্ষককে এডহক ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে ৩য় বিভাগ প্রাপ্ত শিক্ষকও আছেন। দলীয় পরিচয় ছাড়া কোনো শিক্ষকই নিয়োগ দেয়া হয় নি। আওয়ামী দুঃশাসনে হরিলুটের জায়গা ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। দুর্নীতি, স্বজনপ্রিয়তা, দলীয়করণ হেন কাজ নেই যা এখানে হয়নি।

৮২টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে প্রায় ২ জাহাজ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এর সবাই দলীয় পরিচয়ে চাকরি পায়। মেধাহীন অযোগ্য এসব শিক্ষকের কারণে শিক্ষাকার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যলয়ে রেজিস্ট্রেশন ও ফলাফলে বারবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ (পাস) কোর্স, অনার্স, এমএ পরীক্ষায় ফলাফল সীমাহীন দুর্নীতি হচ্ছে। মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে অনেক অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা পাসের সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়েছে। এ পর্যন্ত ৮০ হাজারের অধিক ভূয়া রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। এ নিয়ে '৯৮ সালে প্রোভিসি লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি হয়। '৯৯ ফেব্রুয়ারিতে রিপোর্ট জমা দেয়া হয়। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ৩য় বিভাগ প্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন হিন্দু শিক্ষককে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়। বিভিন্ন ইনস্টিটিউট করার নামে আওয়ামী লীগ শিক্ষকরা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আওয়ামী পুনর্বাসন সেন্টার নামে অখ্যায়িত করেছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যলয়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে ৪০ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ও নগ্ন দলীয়করণের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছিল আওয়ামী ছাত্রলীগের শ্বেত সন্ত্রাসের শিকার। দলীয়করণ আর দুর্নীতি থেকে জাতি গড়ার এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আওয়ামী বাকশালী হাত থেকে রেহাই পায়নি। প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হলে

www.pathagar.com

অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে। সংঘাত সংঘর্ষের কারণে বার বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। এটা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্ম ও সংস্কৃতি

ওবেইদ জায়গীরদার: ইসলামপন্থীদের উপর সরকারের নির্যাতন এবং আমাদের গণতন্ত্র

আরিফুল হক: ওরা বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করতে চায়

ড: হাসানুজ্জামান চৌধুরী: যন্ত্রণায় জাহেলিয়াতের জীবন

ইউসুফ শরীফ: সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভয়াল মহামারী

সোহেল মাহমুদ: ধর্মপ্রীতি ও ধর্মভীতির আওয়ামী স্টাইল

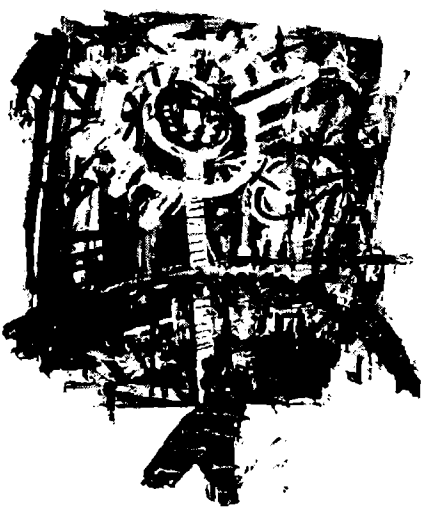

www.pathagar.com

ওবেইদ জাগীরদার

ইসলামপন্থীদের ওপর সরকারের নির্যাতন এবং আমাদের গণতন্ত্র

ডেটলাইন ঃ ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০১

ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে দৈনিক পত্রিকাগুলোর দিকে চোখ বুলাতে গিয়ে একটা শিরশিরে অনুভূতি নেমে গিয়েছিল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। একটা ভয় আর পাহাড় সমান রাগ আমাকে আপাদমস্তক দখল করে নিয়েছিল। প্রথমে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসে প্রকাশিত ছবিটা আমার চোখে পড়ে। একজন মাঝবয়সী মানুষকে কয়েকটি ছোকরা মিলে পেটাচ্ছে। আর তাদের ঘিরে পাহারা দিচ্ছে একদল পুলিশ। লোকটির মুখে লম্বা দাড়ি। ডেইলী স্টারের আরেকটি ছবিতে দেখা গেল, একজন লোককে উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলেছে একদল পুলিশ। মারের চোটে অর্ধমৃত প্রায় লোকটি নিঃসার হয়ে আছে। যেন একটি লাশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একদল শকুন। দি ইন্ডিপেন্ডেন্টের ছবিটি আরও ভয়াবহ। তিনজন পুলিশ পেছন থেকে ধরে রেখেছে একজন মানুষকে, সামনে থেকে এক পুলিশ তার বুকের ওপর লাথি মারছে। বুট আর খাকি প্যান্ট পরা যে পা-টি লাথি মারছে তার সাথে ১৯৭১ সালের একজন মিলিটারীর পা কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্যাতনকারী জার্মান সৈন্যের পায়ের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। চারজন পুলিশ একটি মানুষকে ঘিরে ধরে নির্যাতন চালাচ্ছে। এই পুলিশদের চোখে-মুখেও পাশব হাসি– সেই পৈশাচিক উল্লাস। এ কোন দেশে, কোথায় বাস করছি আমরা! গত এক সপ্তাহ ধরে দেশে যা ঘটে চলেছে তা আমাদের প্রচলিত ন্যায়-অন্যায় বোধ, গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি ধারণাগুলো নড়বড়ে করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এক সপ্তাহ ধরে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে যেন এক যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। একদিকে সরকারের সমর্থনে সরকারি বাহিনী অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-পুলিশ-বিডিআর, অন্যদিকে ইসলামের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী মুসলিম জনতা যার মধ্যে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং মৌলানারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। হাইকোর্ট ফতোয়া অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস অনুসারে ধর্মীয় অনুশাসন প্রচার ও কার্যকর করার চেষ্টাকে বিচারযোগ্য অপরাধ হিসেবে রায় দেয়ার পরপর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিভিন্ন শহরে মাদ্রাসার ছাত্ররা হাইকোর্টের রায় বাতিলের জন্য আন্দোলনে নামে। তাদের দমন করার জন্য সরকার পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করার ফলেই সংঘাত দেখা দেয়। এ সংঘাতই গত এক সপ্তাহে এরকম তিনটি ঘটনার মতো অসংখ্য ঘটনার জন্ম দিয়েছে। দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই পেটানো হচ্ছে। নির্যাতন করে মেরে ফেলা হচ্ছে কমবয়সী মাদ্রাসা ছাত্রকে। মসজিদে মসজিদে বুটপরা পা হানা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

ইসলামী অনুশাসন এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই সংঘর্ষে এরই মধ্যে বেশ কিছু লোক প্রাণ হারিয়েছে, যার মধ্যে একজন পুলিশও আছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সরকার ও ইসলামীদের সংঘাত আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদীসহ অনেক শহরে পুলিশ-জনতার মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে গেছে।

ইসলামী অনুশাসন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে। কোথাও কোথাও তা আইনের মর্যাদাও লাভ করেছে, যেমন– আফগানিস্তান, ইরান, সউদী আরব প্রভৃতি দেশে। শুধু ইসলামই বা কেন হিন্দু, ইহুদীসহ বেশ কিছু ধর্মেরই নিজস্ব অনুশাসন আছে। সেসব ধর্মের গুরুরা বিশ্বাসী ও অনুগতদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন প্রচার করেন, প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর দেশে দেশে এ প্রথা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত।

ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে পৃথিবীর কোথাও এমন গণআন্দোলনে বা গণনির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বলে শুনিনি। ধর্মীয় অনুশাসন মানা বা না মানা ব্যক্তিগত বিষয়। যদি কেউ জোর করে আমার ওপর ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দেয় এবং সে অনুশাসন দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সংঘাতপূর্ণ হয়, তবে আমি আদালতের আশ্রয় নিতে পারি এবং আদালতে আমার আশ্রয় বা বিচার প্রার্থনার বিষয়টিও একজন আসামি এবং একজন ফরিয়াদীর বিষয় বলে গণ্য হবে। প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে। কিন্তু এজন্য গোটা একটা ধর্মের অনুশাসন প্রদান ও প্রচারের অধিকার বাতিলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

এনজিওসমূহ ও সরকারের দাবি হল, ইসলামী অনুশাসন জারি করা অর্থাৎ প্রচার করা যাবে না। কিন্তু দেশে হিন্দু অনুশাসন প্রচলিত আছে। হিন্দু অনুশাসন অনুযায়ী কোনো হিন্দু মেয়ে বা ছেলে মুসলমান সঙ্গীকে বিয়ে করলে জাতিচ্যুত হবে এবং সমাজচ্যুত হবে। জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় ততটা প্রভাবশালী না হলেও সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে হিন্দুরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে। সরকার কি কোনো আইন করেছে যে, হিন্দু সমাজপতিরা বলতে পারবে না যে তিন জাতির স্ত্রী/পুরুষকে বিয়ে করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে না? বরং বাস্তবে দেখছি এ বিষয়টিও ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। শিক্ষিত হিন্দুর ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে পছন্দমত ভিন্ন জাতের ছেলেমেয়েদের বিয়ে করছে। আবার বিশ্বাসী হিন্দু নারী-পুরুষ অনুশাসন মেনে নিয়ে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকছে। কারণ তার বা তাদের বিশ্বাস এ কাজটি করলে তার ঈশ্বর তাকে পরকালে শাস্তি দেবেন। এই ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে সরকারের কি করার আছে? ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সরকার তা করছেও না। অন্য ধর্মের ব্যাপারে সরকারের মাথাব্যথা নেই। আমরা মনে করি, কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারেই সরকারের মাথাব্যথা থাকা উচিত নয় এবং কোন ব্যক্তি যদি

www.pathagar.com

প্রমাণ করতে পারে কোনো ধর্মীয় অনুশাসন তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে তাহলে প্রচলিত আইন তাকে নিরাপত্তা দেবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে তার বিচার করবে। পুরো বিষয়টিকে যদি আমরা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখি তাহলে একটি সত্য ভয়াবহ হয়ে ধরা দেবে। রাজনৈতিক দলসমূহ এবং এনজিওগুলোর কার্যক্রমের কথা ধরা যাক। বহু এনজিও গ্রামের অশিক্ষিত সরল মানুষদের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে, দারিদ্র্য মোচন প্রভৃতির কথা বলে ঋণ গছিয়ে দেয়। অতঃপর ঋণের ওপর চড়া সুদ আরোপ করে প্রয়োজনে প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে ঐ দরিদ্র লোকটির ওপর চাপ প্রয়োগ করে তার সবকিছু নিংড়ে নিয়ে ঋণ আদায় করে নেয়। প্রচলিত ব্যাংক লোনে ১০% থেকে ১৮% পর্যন্ত সুদ আরোপ করলেও এনজিওগুলো এর চেয়ে অনেক বেশি সুদ আদায় করে। অথচ তাদের ঋণের সুদ ব্যাংক ঋণের চেয়ে কম হারে ধার্য হওয়া উচিত। কারণ তারা 'দারিদ্র্য মোচনের' জন্য দরিদ্রের মধ্যে কাজ করছে। যাই হোক, বাস্তবে দেখা যায় ঋণগ্রহীতার কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না বরং ঋণের টাকা যত্রতত্র খরচ করে তার অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু ঋণগ্রহীতা স্বজ্ঞানে ঋণ গ্রহণ করেছে, ঋণদাতা এনজিওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা যাচ্ছে না।

তেমনি রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলছে, তার দলকে ভোট দিলে দেশে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসবে। ১৯৭১ সালের আগে আওয়ামী লীগসহ আমরা অনেকে বলেছি, 'পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হও। দারিদ্র্য দূর হবে, পুলিশ-সেনাবাহিনীর নির্যাতন হবে না, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন হবে।' ১৯৭৫ সালে বাকশাল করার সময়ই আওয়ামী লীগ জনগণকে স্বপ্নে পোলাও খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এদেশে শুধু আওয়ামী লীগ নয়, গত তিরিশ বছর ধরে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাই করছে এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ক্ষমতায় গিয়ে তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে যাচ্ছে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক বিশ্বাস মতে আমরা বলছি এ হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা বলতে পারি, আমার দলকে ভোট দাও তোমাদের সবাইকে রাজা বানিয়ে দেব। তাই আওয়ামী লীগ বা বিএনপি মিটিং-মিছিল করতে পারে, প্রচারণা চালাতে পারে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইতে পারে।

ফতোয়া বা ইসলামী অনুশাসনের বিষয়টিকে আমরা যদি এই আলোকে দেখি, তাহলে বুঝতে পারব মৌলানারা তাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করছে মাত্র। অন্য যেসব রাজনৈতিক দল যেমন বলছে, তাকে ভোট দিলেই সমস্ত মানুষকে রাতারাতি বাদশাহ বানিয়ে দেবে, ইসলামপন্থীরাও তেমনি বলছে, ইসলামী আইন মেনে চললে মানুষের শান্তি আসবে, উন্নতি হবে, অভাব ঘুচবে। তাদের বক্তব্য গর্হিত অন্যায় বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে কেন? তারা তাদের কথা বলার অধিকার প্রয়োগ করছে। তারাও মানুষকে একটি বিশেষ মতবাদে আহ্বান জানাচ্ছে, যা করেছে করছে পৃথিবীর সমস্ত

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলগুলো তাহলে তাদেরকে পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে নিযাতন করে, হত্যা করে থামাতে হবে কেন? এবং সরকার তা করবে কোন অধিকারে? যদি তাদের কথা বলতে দেয়া না হয় তাহলে তা কি নাগরিক অধিকার হরণ নয়?

গত কয়েকদিন এই-ই ঘটেছে... ইসলামী আইন ও প্রথায় বিশ্বাসী সমস্ত মানুষের বাকস্বাধীনতার অধিকার হরণের জন্য সরকার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগী কিছু গ্রুপ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কেন? তার একটা কারণ হতে পারে ইসলামীদের সাথে তাদের মতের ঐক্য নেই, হয়তো সংঘাতও আছে। যদি আমি বা আমার মতো অনেকের সাথে সরকারি দলের মতের মিল না হয়, তাহলে কি আমার কথা বলার অধিকারও হরণ করে নেয়া হবে? আমার নাগরিক অধিকার বলে কিছুই কি থাকবে না? আমাকেও কি পুলিশের বুটের আঘাতে বা গুলিতে প্রাণ হারাতে হবে? ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীদের হাতে নির্বিচারে প্রাণ দিতে হবে?

সবাই বলেন, এটি গ্লোবালাইজেশনের যুগ। আমরা যদি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অন্যান্য ধর্মের দিকে তাকাই তাহলে ভিন্ন অভিজ্ঞতা হবে আমাদের। ইহুদী ধর্মে ফতোয়া একটি বৈধ ব্যাপার। ইসরাইলে তাদের প্রার্থনার দিনে সারাদেশে সব ধরনের কাজ-কর্ম বন্ধ থাকে। এ অবস্থার জন্যও ফতোয়ার প্রয়োজন পড়েছে। হয়তো এর প্রচলন হয়েছে বহু আগে এবং তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ হয়নি বলে আমরা টের পাইনি। এ সময়ে খ্রিস্টানরা আমাদের অনেকের কাছে খাঁটি গণতন্ত্রের প্রতীক, মানবতার অবতার, পরোপকারের পরাকাষ্ঠা। তাদেরও সমাজে ধর্মীয় গুরুদের অবস্থান অত্যন্ত সম্মানজনক। তাদের ধর্মগুরুগণ অনেক সময়ই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ান। কয়েকটি খ্রিস্টান দেশে গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত বিতর্কে চার্চের লোকজন সরকারের বিরুদ্ধে বড় একটি ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমাদের দেশে অনেকে তা জানেও না। কারণ সে দেশের সরকার এজন্য গির্জা বা চার্চে পুলিশ পাঠিয়ে হামলা করেনি, ক্রুশপরা লোক দেখা মাত্র রামদা, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেনি।

পার্শ্ববর্তী ভারতে হিন্দু ধর্মগুরুদের ফতোয়া অত্যন্ত প্রভাবশালী। বলতে গেলে হিন্দু ধর্মটাই দাঁড়িয়ে আছে আদি ও মধ্যযুগীয় কিছু ফতোয়ার ওপর। হিন্দুদের ফতোয়ার আবার কোরআন-হাদীসের মত একক উৎস নেই। ব্রিটিশ আমলে সতীদাহ প্রথা রোধ করা হয়েছিল আইনের জোরে। আইন করে বিধবা বিবাহ প্রচলন করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মগুরুরা এখনও বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সরব।

ভারত সরকার সেসব ধর্মগুরুর দিকে তো কুকুর লেলিয়ে দেয়নি। তাদের হাইকোর্ট বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারণা দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে রায় দিয়েছে বলেও শুনিনি। মুহূর্তের মধ্যে বাবরী মসজিদ ভেঙে ফেলল ফ্যানটিক হিন্দুরা। এ ভয়াবহ ঘটনার কোনো

www.pathagar.com

বিচারও হয়নি এপর্যন্ত। বাংলাদেশে হঠাৎ করে সরকার ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে এমন ক্ষেপে ওঠার কারণ কি? কেনই বা তাদের নাগরিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে, যত্রতত্র পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্র ও তাদের শিক্ষকদের? মধ্যযুগীয় এই বর্বরতার পেছনে আদৌ কি কোনো উদ্দেশ্য আছে? নাকি এ একদল ফ্যানাটিকের কারবার?

পাশপাশি বাংলাদেশের হিন্দুদের অবস্থা আলোচনা করা যেতে পারে। তারা নিজেদের সংগঠন নিয়ে বেশ জোরেশোরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। সরকার তো তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

আমাদের সরকার এবং বুদ্ধিজীবীদের কাজ-কারবার দেখে মনে হয় তারা ধরেই নিয়েছেন হতদরিদ্র এই দেশের একমাত্র সমস্যা হল মোল্লা আর ফতোয়া। ফতোয়া বন্ধ হলে এবং সমস্ত মোল্লা মেরে ফেললে দেশে কোনো লোক না খেয়ে থাকবে না, চোর-বদমাশ থাকবে না, রামদা, চাপাতি নিয়ে মিছিল হবে না, পুলিশ বুটপরা পা দিয়ে কাউকে লাথি মারবে না।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিন্ন এক অবস্থা। সরকার এবং তার ভাড়া করা লোকজন যেভাবে মোল্লা মাত্রই আক্রমণ করছে, মাদ্রাসার ছাত্র মাত্রই গ্রেফতার করছে, মসজিদে মসজিদে হানা দিচ্ছে তাতে এদেশের মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। দেশের ৮৫% মানুষের ধর্মকে শুধু শুধু আঘাত করার ফল ভয়াবহ হতে পারে। এখন মফস্বল শহরগুলোতে ইসলামপন্থী এবং সরকার বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ যুদ্ধে রূপ নিচ্ছে। অনেকের ধারণা, এ সংঘর্ষ কমার কোনো সম্ভাবনা নেই, বরং ধীরে ধীরে বাড়বে। সরকারি নির্যাতন চলতে থাকলে ইসলামপন্থীদের সাথে এসে যুক্ত হবে সাধারণ মুসলমানরা এবং ক্রমে তা ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের রূপ নেবে, যার ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা আমাদের জন্য এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে মৌলবাদী নাম দিয়ে যে নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হচ্ছে তা কি শুধুই শেখ হাসিনার বা আওয়ামী লীগের একক সিদ্ধান্তের ফল, নাকি এর পেছনে আরও কোনো ষড়যন্ত্র আছে? কারণ ঘটনা যদি গৃহযুদ্ধের দিকে মোড় নেয় তাহলে বাংলাদেশে এবং বাঙালি জাতি ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাতে লাভটা কার? তারাই কি আওয়ামী লীগকে খুঁটি বানিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে? আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা যদি ষড়যন্ত্রটা বুঝতে না পারি, তাহলে সর্বনাশ ঠেকানোর কোনো উপায় থাকবে না।

www.pathagar.com

আরিফুল হক

ওরা বাংলাদেশ থেকে ইসলাম ধর্মকে বিতাড়িত করতে চায়

ডেটলাইন ঃ ১৯ জুন ২০০০

বাংলাদেশ ৯৮.৮ ভাগ মুসলমানের দেশ। বাংলাদেশ বিশ্বের অনুকরণীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যানুপাতিক দিক থেকে ভগ্নাংশ পরিমাণ হলেও জাতীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সিংহভাগ লাভকারী। শিক্ষায়, সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে, ব্যবসায়, শিক্ষকতায়, সংস্কৃতি চর্চায় সংখ্যানুপাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোনো দেশের সংখ্যালঘুরা এত সুযোগ-সুবিধা পায় না। এখানে সেনাবাহিনীতে, পুলিশ বিভাগে, বিচার বিভাগে, মন্ত্রিত্বে, সচিবালয়ে, রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মিডিয়ায় প্রতি তিনজন মুসলমানের পাশে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শতকরা ৩০ ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষক শিক্ষকতা করে থাকেন। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনো অস্তিত্ব নেই। তার পরও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নামক ভারতীয় বিজেপির এদেশীয় অনুচরগোষ্ঠীটি নানা উস্কানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে এ দেশের মুসলমানদের বুকে সাম্প্রদায়িকতার দাবানল জ্বালানোর চেষ্টা করে চলেছে। সম্প্রতি তাদের দাবি এবং কথাবার্তা এতটা লাগামহীন হয়ে পড়েছে যে, এ দেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা নেহায়েত গণ্ডারের চামড়া পরিহিত– ধৈর্য এবং সহনশীল বলেই হয় তা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ভারতের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদীদের দেশ হলে এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখা সম্ভব হতো না।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নামের এই সংগঠনটি কিছুদিন আগে বলেছিল (৯-৬-৯৫), "এমন কর্মসূচি দেব যা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।" বলেছিল, "আমরা কিন্তু এখন অনেক শক্তিশালী। সংসদের ৮০টি আসন আমাদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের দাবি আদায়ে প্রয়োজনে আমরা সাম্প্রদায়িক হব।" উক্ত সভায়ই তারা বলেছিল, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা একটি ঘৃণ্য পদক্ষেপ। ঐ সভায় জনৈক বক্তা বলেছিল, "ইরাক, কুয়েত, ফিলিস্তিনসহ আরব দেশের লোকজন যদি বলতে পারে আমরা আরব ভূমির নাগরিক, তাহলে আমিও বলব, আমি ভারতভূমির সন্তান। জিন্নাহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে '৪৭ সালে দেশ বিভাগ করেছিল। মুসলিম লীগ তখন ব্রিটিশের কাছ থেকে অর্থ পেত। ভারতের নাম শুনলেই জ্বলে উঠলে চলবে না। ভারতসহ সকল সেক্যুলার শক্তির সাথে আমাদের ঐক্যসূত্র থাকতে হবে।" পাঠকবর্গ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এসব কথার একটিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষের কথা নয়। বাংলাদেশে বাস করে যারা নিজেদের ভারতভূমির সন্তান ভাবে কিংবা

www.pathagar.com

হুমকি দিতে পারে, "এমন কর্মসূচি দেব যা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না", তারা কোনোক্রমেই এ দেশের স্বাধীন অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে পারে না।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নামক সংগঠনটির কাছে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক দেশ, আর ভারত নাকি সেক্যুলার শক্তি। যে ভারতে এ পর্যন্ত ২০ হাজারেরও উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লাখ লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। গত ২৯ মে ভারতের সাপ্তাহিক 'নতুন গতি' পত্রিকায় লেখা হয়েছে– "মুসলিমবিরোধী দাঙ্গায় অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের শাস্তি হয় না এ দেশে। হাশিমপুরায় ৪০–৪২ জন মুসলিমকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে নদীতে ফেলে দেয় পুলিশ কর্মীরা। যে ভারত তার দেশের ২৫ ভাগ মুসলমানকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা, চাকরিতে পঙ্গু করে রেখেছে। যে ভারত বিখ্যাত বাবরী মসজিদসহ শত শত মসজিদ, চার্চ ধ্বংস করেছে। যে ভারত খ্রিস্টান পাদ্রী গ্রাহাম স্টেইনকে দুই নিরীহ শিশুপুত্রসহ পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছে। যে ভারত মসজিদের আজান নিষিদ্ধ করেছে, নতুন মসজিদ গড়া বন্ধ করেছে, কোরবানি নিষিদ্ধ করেছে, ঐতিহ্যবাহী কলিকাতা আলীয় মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে, ঐতিহাসিক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার পদক্ষেপ নিয়েছে, সেহেন ভারত নাকি সেক্যুলার শক্তি, তার সাথেই বাংলাদেশের ১২ কোটি মুসলমানের ঐক্যসূত্র গড়ে তুলতে হবে। বাহ! কি চমৎকার প্রতারণামূলক আবদার এই ভারতের অনুচর নামে চিহ্নিত সংগঠনটির। ভারতের সেক্যুলার ইজমের পরিচয় দিতে গিয়ে 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার জুলাই ২০-২৬ সংখ্যায় ভারতীয় সাংবাদিক আশীষ নন্দী লিখেছেন– As India getting modernised, communal violence is increasing. In the earlier centuries riot were rare. After independence we used to have one riot a week. Now we have more than one riot a day. অর্থাৎ ভারত যত আধুনিকায়ন হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তত বেড়ে যাচ্ছে। আগের শতাব্দীতে যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না বললেই চলে, সেখানে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সপ্তাহে একটা করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। আজ প্রতিদিন একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটছে।"

১৯৯২ সালের ২৫ জানুয়ারি সংখ্যা 'টাইমস' পত্রিকায় 'ওদের জ্বালিয়ে দাও' শীর্ষক এক সাক্ষাৎকারে বিজেপির সহযোগী দল শিবসেনা নেতা বালথ্যাকারে বলেছিল, "মুসলমান নয়, ভারত শুধুমাত্র হিন্দুদেরই মাতৃভূমি। মুসলমানরা যদি ভারত থেকে চলে যেতে না চায়, তাদেরকে লাথি মেরে বের করে দেয়া উচিত।" পত্রিকাটিতে আরও লেখা হয়েছিল, "১৯৭৪ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সময়ে ভারতে মুসলিমবিরোধী ১৩ হাজার ৯০৫টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।" ভারতের বহুল প্রচারিত 'দলিও ভয়েস' পত্রিকায় জুন ১৬-৩০, ২০০০ সংখ্যায় লেখা– "Hindu nazis plan to disenfranchise Indian Muslims (ভারতীয় মুসলমানদের ভোটাধিকার থেকে

www.pathagar.com

বঞ্চিত করার পরিকল্পনা করেছে হিন্দু নাজিগণ)। প্রবন্ধে লেখা হয়েছে যে, গুজরাটের পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানদের বহিরাগত আক্রমণকারী হিসেবে দেখিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ঘৃণার ভাব জাগানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের বহিরাগত বাঙালি বা বাংলাদেশী মুসলমান উল্লেখ করে ভোটার লিস্টে নাম উঠানো হচ্ছে না, কোথাও আবার আইএসআই চর, সন্ত্রাসী স্মাগলার, দাগী আসামি, মৌলবাদী প্রভৃতি দুর্নাম রটিয়ে মুসলমানদের অধিকার বঞ্চিত, এমনকি ভোটাধিকার বঞ্চিত পর্যন্ত করা হচ্ছে। কারগিল যুদ্ধের সময় ভারতীয় নেতাগণ সার্বিকভাবে মুসলমানদের পাকিস্তানি চর আখ্যা দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষালয়গুলো বন্ধ করার দাবি জানিয়েছিলেন। যে ভারতে শুধু মুসলমান নয়, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, এমনকি নিজ জাতের নিম্নবর্ণ হিন্দুরা পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার হয়, সেই নাজি আর্য হিন্দুর দেশকে এ দেশের কতিপয় হিন্দুর সংগঠন– হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বলছে সেক্যুলার স্টেট। ভারত আদৌ সেক্যুলার রাষ্ট্র নয়। বরং আমরা বাংলাদেশের ১২ কোটি মুসলমান বড় বেশি সেক্যুলার হয়ে পড়েছি। যার ফলে প্রতি পদে পদে আমাদের লাথি-ঝাঁটা সহ্য করতে হচ্ছে। কেউ 'বাস্টার্ড নেশন' বলে গালি দিচ্ছে, কেউ জাতীয় জাদুঘরের দরজায় লাথি মেরে গোটা জাতিকে চরম অপমান করার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে, আমরা সব অপমান মাথা নিচু করে মেনে নিয়ে দাঁত বের করে হি হি রবে হাসছি। আমাদের গণ্ডারচর্ম পরিহিত সহনশীলতা ওদের সাহস এবং ঔদ্ধত্যকে সীমাহীন বিস্তৃতি দান করেছে। ওরা এখন দাবি তুলেছে, নামের আগে 'মুহাম্মদ' এবং 'আলহাজ' শব্দ ব্যবহার করা চলবে না।"

গত ৬ জুন শহীদ মিনার চাতালে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নামক হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনের কতিপয় সদস্য 'শত্রু সম্পত্তি' আইন নামক অর্পিত সম্পত্তি আইনটি তুলে দিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার আবদার জানিয়ে অনশনের ভড়ং শুরু করেছিল। সেই ভড়ং-এ সহানুভূতি জানানোর জন্য ছুটে গিয়েছিল আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-মিনিস্টারসহ তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নামে পরিচিত বিরোধী দলেরও বেশকিছু মুসলমান সিনিয়র কর্মকর্তা। সরকারি এবং বিরোধী দলের নেতাদের এক সাথে পেয়ে হিন্দু মৌলবাদী ভারতীয় এজেন্টদের গলার সুর গেল কয়েক ধাপ চড়ে। তারা বললেন– "শুধু শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করলেই চলবে না, নামের আগে 'মুহাম্মদ', 'আলহাজ' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শব্দের ব্যবহার বন্ধ করতে 'হবে, তা না হলে পরিপূর্ণ বাঙালি হওয়া যাবে না।"

তারা আরও দাবি জানাল, সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং জাতীয় ধর্ম ইসলামকে বাতিল করে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংযোজন করতে হবে। ৯৮.৮ ভাগ মুসলমানের দেশে প্রকাশ্যে দাবি উঠছে– 'ইসলাম', 'মুহাম্মদ', 'বিসমিল্লাহ', 'আলহাজ' প্রভৃতি শব্দ বাতিল করতে হবে। অথচ ১২ কোটি মুসলমানের মধ্যে 'খামোশ' বলে ধমক দেয়ারও আজ কেউ নেই। ভোটপিয়াসী বিরোধী দলগুলো ক্ষমতায়

www.pathagar.com

যাওয়ার লোভে হিন্দুত্ববাদীদের এসব সাম্প্রদায়িক দাবির প্রতি নীরব সমর্থন জানিয়ে চলেছে। একটি প্রতিবাদ বা বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি বড় দল বিএনপি, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও তেমন প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা যায়নি। শুধু মোলায়েম কিসিমের কিছু প্রতিবাদ জানিয়েই তারা দায়িত্ব স্খলন করেছেন। বাংলাদেশ তবে কি ভারতীয় বিজেপির হিন্দুত্ববাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়?

এসব আচরণ এবং ঘটনাপ্রবাহ দেখলে সন্দেহ জাগে, সত্যিই কি বাংলাদেশ ১২ কোটি মুসলমানের দেশ? মুসলিম অস্তিত্ব বজায় রেখে, মুসলিম জাতিসত্তা নিয়ে টিকে থাকার যোগ্যতা কি বাংলাদেশের আদৌ আছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কপালে তিলক। রাষ্ট্রীয়ভাবে অগ্নিশিখার বন্দনা। কোরআনের পাশেই গীতা পাঠের প্রচলন। সংস্কৃতিতে মঙ্গলপ্রদীপ ও মূর্তি কালচার, ধর্মের নামে, হজের নামে তসবী ও মাথায় পট্টির ভণ্ডামী– এসবই তো প্রসবন করে বাংলাদেশকে মুসলিমপ্রধান দেশ বলা হলেও আসলে সেটা ভোটার লিস্টে মুসলমান নামের আধিক্য থাকার কারণে। ইসলামের সত্যতার প্রতি ঈমান ঘোষণকারী মুসলমানের সংখ্যা এ দেশ থেকে বিলীন হতে চলেছে বা হয়ে গেছেও বলা যায়।

এ দেশে মুশরিকের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেছে। যার ফলে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ নামে পরিচিত বাংলাদেশের বুকে দাবি উঠেছে আল্লাহ, মুহাম্মদ, ইসলাম, আলহাজ শব্দগুলো বাতিল করতে হবে। অথচ মুসলমানদের মধ্যে কি শীতল নীরবতা। আল কোরআন বলছে, মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস, অবাধ্যতা প্রভৃতি কাফিরদের চেয়েও বেশি মারাত্মক। কারণ, এরা বাইরে থেকে হামলা করে না, ঘরের মধ্যে বসেই ডিনামাইট বিছিয়ে দেয়।

এদের সম্পর্কে পবিত্র আল-কোরআনের সূরা 'তওবার' ১নং আয়াতে বলা হয়েছে, "সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।" এবং একই সূরার ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, "অতএব নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর, আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" জাতীয় কবির ভাষায় বলতে হয়, "আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, আজ কোথা সে মুসলমান?" কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবে তেমন ঈমানদার মুসলমান কোথায়? সেই মুসলমান কোথায়, যারা সংখ্যায় সাড়ে ৩শ'র মত হয়েও গোটা আরব বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে বিজয়ী হয়েছিল। আজ বাংলাদেশের ১২ কোটি মুসলমান মুশরিকদের চিন্তা-ভাবনার কাছে মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে আছে। অমুসলিম শক্তির গোলাম হয়ে বসবাস করছে। সাচ্চা মুসলমান কখনও ভ্রান্তমুখী স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়

www.pathagar.com

না, স্রোতের গতিমুখ ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে, লড়াই করে। আমাদের নবী-রাসূলগণও লড়াই করেছেন, জিহাদ করেছেন। জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন, বিপদের ভয়ে বা স্বার্থের প্রলোভনে যুগের গতিকে কখনও নিজের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি। আজ ভোটবিলাসী মুসলমানরা নীরবে আল্লাহ্ ও রাসূলের অবমাননা সহ্য করে চলেছে। প্রতিটি মুসলমান একেকটি দীপের মত। সে যেমন আরো দিতে জানে, প্রয়োজনে শত্রুশিবির জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতেও কার্পণ্য করে না। ইসলাম শুধু কোমলতা বা মাধুর্যপিয়াসীদের ধর্ম নয়। যাদের কঠোরতা, তিক্ততা স্বীকার করার মতো শক্তি নেই, তারা মুসলমান হতে পারে না। ইসলাম চারটি শব্দের ওপর তার শক্তি নিহিত করেছে– 'ইন্না মায়াল উশরি ইয়োশরা'– নিশ্চয়ই কঠোরতার সাথে রয়েছে কোমলতা। যার মধ্যে কঠোর হওয়ার শক্তি নেই, সে কখনও কোমলতা গুণসম্পন্ন হতে পারে না। তার কোমলতা দুর্বলতারই লক্ষণ। ইসলাম দুর্বলের ধর্ম নয়, ইসলাম কাপুরুষের ধর্ম নয়। ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই বীরপুরুষের ধর্ম। কাপুরুষদের দ্বারা যেমন ইসলাম রক্ষা হবে না, তেমনি ১২ কোটি মুসলমানের দেশের অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কোরআনে হাকিম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে, "তোমরা যদি মুমিন হও, তোমরাই জয়যুক্ত হবে।" আজ শুধুমাত্র সংখ্যার প্রাচুর্যে প্রয়োজন নেই, চাই কতিপয় মুমিনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ, যারা ঈমান ও সৎকর্মের অস্ত্রবলে এই দেশটিকে রক্ষা করবে, এ দেশের সকল শত্রুকে নির্মল করবে।

www.pathagar.com

ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী

যন্ত্রণায় জাহিলিয়াতে জীবন

ডেটলাইন ঃ ২১ জুন ২০০০

বাংলাদেশে বহুদিন যাবৎ শুরু হয়ে আজ অবধি এক মাৎস্যন্যায় চলছে। জাহিলিয়াত কায়েম করা হয়েছে নব্বই শতাংশ তওহিদী জনতার এই দেশে। ইয়াজিদী কারবালা চলছে এখানে। জনগণের সকল ত্যাগ স্বীকার লড়াই, জীবনদান এবং তাদের আশার বিরুদ্ধে গিয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইবাদাত, রাষ্ট্রীয় শাসন ও ব্যবস্থাপনা, দেশের ভূগোল-স্বাধীনতা-ভবিষ্যতকে সংকীর্ণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কাফির ও বাতিল শক্তির কাছে ইজারা দেয়া হয়েছে। শকুনের ভাগাড় আজ এদেশ। শ্বাপদের হুঙ্কারে মত্ত আজ এই অতিকষ্টে লব্ধ ভূখণ্ড। মানুষ আজ অসহায়-মূর্খের দম্ভ, লুটেরার তাণ্ডব, লাম্পট্যের উন্মত্ততার কাছে। ইসলাম ও মুসলিম আজ নিজ বাসভূমে পরিত্যক্ত। সার্বিক আয়োজন চলছে কুফর প্রতিষ্ঠার, বাতিল কায়েমের। এখানে তাই সততা, সুরুচি, সভ্যতা নেই। বরং অসততা, কুরুচি ও অসভ্যতাই এখানে সর্বপ্রাবল্য নিয়ে সমুপস্থিত।

এখানে, এদেশে আজ খিলাফত তো দূরের কথা, উল্টো বংশীয় রাজতন্ত্র যেন চেপে বসেছে। দেশটা পৈতৃক বা পারিবারিক তালুক হয়ে গেছে। দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু, মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য দুশমন আজ দেশপ্রেমিকের মুখোশ এঁটেছে। দেশের জন্য সবচেয়ে বড় বোঝা যারা, তারা আজ দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

এমতাবস্থায় এখানে গণতন্ত্র সার্কাস চলছে দিবালোকে চরম স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার পরও। তাগুত ও গাইরুল্লাহর নেতৃত্বে কুফর ও জাহিলিয়াত কায়েম হচ্ছে এখানে। স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, সম্ভ্রম, সম্মান, সৌন্দর্য, সচেতনতা, সততা, সাহসিকতা, সত্য এখানে বিভ্রান্ত, বিকৃত, বর্জিত, বিলীয়মান। এখানে মূর্তি পূজা, কবর পূজা, পীর পূজা, ছবি পূজা, নেতৃত্ব, পূজা, পিতৃ পূজা, স্বপ্ন পূজা, সন্ত্রাস পূজা নিত্য সত্য। আসলে নানারূপে পৌত্তলিকতাই এখানে এখন সর্বত্র বিরাজমান। সেই সঙ্গে পৈতৃক তালুকের মর্জিমাফিক ও পরের ধনের পোদ্দারির ন্যায় অত্যাশ্চর্য ভ্রমণবিলাসের বিকৃতি এবং পুরস্কার বাগানের উন্মত্ত রতিক্রিয়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে চলছে। আর জিহ্বা ও বাকশক্তি দিয়ে এত ভয়াবহ মিথ্যাচার ও অশ্লীলতা সম্ভবত কেউ কখনো দেখেনি, শোনেনি। এখানে আজ বহুদিন যাবৎ দ্বীনী নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য ও দ্বিবিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ এটা ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ। এখানে ইসলামের সমগ্রতা, জীবন পদ্ধতি হিসেবে এর সার্বিকতাকে বিনষ্ট করে ইহুদী-খ্রিস্টান-মূর্তিপূজক কাফির-

www.pathagar.com

মুশরিকদের সৃষ্ট অথচ তাদের কাছেও বাস্তবে পরিত্যক্ত সিকিউলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা নামক নির্জলা বাতিলকে চালানোর সার্বিক আয়োজন হয়েছে। হায়! এদেশের সংবিধানে সর্বপ্রথম এবং সবার উপরে লেখা আছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। হায়! এদেশের সংবিধানেই ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত। হায়! এদেশেই নব্বই ভাগ নামে মুসলমান বাস করে আর শাসকরাও এদেশে নামে মুসলমান।

তথাপি এখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বাস্তব স্বীকৃতির তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং সম্পূর্ণ উল্টো ধারায় গণতন্ত্রের নামে, জনসার্বভৌমত্বের নামে স্বৈরতন্ত্র ও কুফরী প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আল্লাহর আইনের সর্বপ্রধান তো বহু দূরের কথা, এখানে আল্লাহর আইনকে মুছে ফেলে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাগুতের আইনকে চালানো হচ্ছে। জাতীয় সংসদে মদ নিষিদ্ধ করার বিল বাতিল করা হয়েছে। হুদুদ-আল্লাহর তো প্রশ্নই ওঠে না, এখানে উল্টো মদ-গণিকাবৃত্তি-ঘুষ-সুদ-জুয়া-লটারি-যিনা-ধর্ষণ-খুন-জবরদখলসহ যাবতীয় হারাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাস্তা থেকে রসদ পর্যন্ত সবকিছুর মারাত্মক অপব্যবহারও চলছে। এখানে ইসলাম, মুসলিম, আল্লাহ, রাসূল (সাঃ), কুরআন, হাদীস, সালাত, সিয়াম, টুপি, দাড়ি, মসজিদ, আযান, হিযাব, হাজ্জ মানেই মৌলবাদী। আর মূর্তি সংস্কৃতি, তিলক-চন্দন, টিপ-সিঁদুর, ধুতি-পৈতা, উলুধ্বনি-রাখিবন্ধন, মঙ্গলপ্রদীপ-অগ্নিপ্রজ্বলন, অশ্লীলতা-উলঙ্গপনা, পরকীয়া-লিভটুগেদার মানেই সংস্কৃতি, আধুনিকতা ও প্রগতি।

এখানে ইসলামী রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক মূলনীতি যা রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের আদলে গ্রহণ করাটা হতো সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বিষয় এবং শুদ্ধতম উদ্যোগ, তা একেবারেই হয়নি। এখানে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্যের প্রশ্ন নেই। উল্টো ব্যাকডেটেড ও মৌলবাদ অভিধায় প্রত্যাখ্যাত, তাও আবার নামে-মুসলমানদের ক্রোধ-উন্মত্ততার কারণে। 'উলিল আমর' প্রসঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতিবিদদের সামান্যতম ধারণাও নেই। এখানে সবচেয়ে মূর্খ, অন্ধ, তস্কর, বেঈমান আজ উলিল আমরের ভূমিকায় নেমেছে। এখানে মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানতের খিয়ানত করা, অশ্লীল উচ্চারণ–এসবের সর্বময় উপস্থিতি রেখে শাসক একশ' পারসেন্ট খাঁটি মুনাফিক। এখানে শাসকবর্গ ও সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের অধিকার নেই, যা ইসলামে স্বীকৃতি পেয়েছে। ন্যায্য কারণেও মতবিরোধের তেমন প্রচেষ্টা জেল-যুলুম, বঞ্চনা-প্রতারণা, বেইজ্জতী-খুনের পুরস্কার দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এখানে কোনো অমীমাংসিত বিরোধের প্রশ্নে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর দিকে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। এখানে গাড়ল কর্তারাই যাবতীয় ফয়সালা চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত। এখানে শাসক সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত-বিশ্বাসে, জবানে, আচরণে, আমলে, ব্যবস্থাপনায়, বণ্টনে, দুর্নীতিতে, আত্মসাতে। এখানে রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

লক্ষ্য হচ্ছে আখের গোছানোকে, আমানতের খিয়ানত ও যুলুমকে বৈধকরণ। ইনসাফ বা ন্যায়বিচার এদের অভিধানে অনুপস্থিত। সালাত কায়িম ও যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি এখানে নিতান্তই হাস্যকর প্রস্তাবনা। মারূফ প্রতিষ্ঠা ও মুনকার বিতাড়ন নয়, বরং মারূফ বিতাড়ন ও মুনকার প্রতিষ্ঠাই এখানে স্বাভাবিক ও অভিনন্দনযোগ্য নীতি। শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন এখানে সর্বাধিক ফলদায়ক।

এখানে জনগণের মৌলিক অধিকার নেই, ইসলাম যা দিয়েছে। অথচ এদেশের নব্বই ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এখানকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও শাসন কর্তৃপক্ষ ঐতিহাসিক মদীনা সনদ ও বিদায় হজ্জের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে একেবারেই গররাজি। এখানে খলিফা নিয়োগের প্রশ্ন তো ওঠেই না, বরং গদিনসীন হন শাসকরা বংশীয় ধারায়, স্ত্রানী হবার সুযোগে কিংবা সেই সঙ্গে অর্থ-অস্ত্র-সন্ত্রাসের জোয়ার তুলে। মস্তানী এখানে খুবই দ্রুত বিকাশমান ও লাভজনক শিল্প। আগাছার চাষের জন্য এই যমিন খুবই উর্বর। শাসকদের অবস্থান, দৃষ্টি ও জীবনধারা এখানে জনকোষাগার লুটের দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত এবং স্বেচ্ছাচারের দ্বারা শোভিত। এখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বালাই নেই। রাষ্ট্রীয় সম্পদ এখানে জনকল্যাণে নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার ও দল, গোষ্ঠীর পদসেবায় নিয়োজিত। আমানত এখানে একেবারেই অপরিচিত দুর্বোধ্য এক শব্দ, যা কখনই উচ্চারিত হতে শোনেনি শাসকগোষ্ঠী। তস্করবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পরজীবীরাই এখানে প্রভাবশালী ও প্রতাপ প্রদর্শনকারী। সম্মতি, মতামত, সমালোচনা এখানে সর্বাধিক তিরস্কৃত এবং মুহূর্তের মাঝেই বেইজ্জতী লাভ কিংবা জীবনহরণকারীও প্রায়শই। বিচারের বাণী এখানে নীরবে, নিভৃতে কাঁদে। শাসকরা এখানে বিচারালয়ের ওপর উলঙ্গ প্রভুত্ব বিস্তারে সদাতৎপর। সব কিছুকেই পকেটে পুরতে চায় তারা। বঞ্চিত, লাঞ্ছিতের ফরিয়াদ তাই মাথাকুটে মরে এই অন্ধ দাম্ভিক, নিষ্ঠুর অচলায়তনে। মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভার ন্যায় ইসলামী সমাজের ব্যবস্থাপনা এখানে নেই, যদিও কিনা সাংবিধানিকভাবেই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং নব্বই ভাগ মানুষই মুসলমান। সেজন্য সৎ পরামর্শ ও সম্মতি এখানে জঞ্জাল বলে আঁস্তাকুড়ে যায়। অসৎ সংসর্গ ও অসৎ পরামর্শ এখানে পরম সমাদর লাভে ধন্য হয়। আল্লাহর হুকুম, নিয়মের শাসনও আইনের দৃষ্টিতে মানবসাম্য নয়, বরং অনিয়মের উদ্বাহু নৃত্য এবং আইনের লঙ্ঘনের নিরবচ্ছিন্ন ভয়াবহ পৌনপুনিকতা এখানে লাগসই জীবনধারা। ইকামত-ই-দ্বীন এখানে পরিত্যক্ত এবং এটা কোনো প্রাসঙ্গিক বিবেচনাই হতে পারে না। উল্টো এর প্রতিরোধ এখানে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি। এখানে মদ, ঘুষ, সুদ, জুয়া, যিনা, ধর্ষণ, বেইজ্জতী, খুন, বঞ্চনা, অসৎ অর্জন, আমানতের খিয়ানত, লুট, মিথ্যাচার, অত্যাচারসহ যাবতীয় হারামই সবচেয়ে হালাল হিসেবে সমাদৃত। বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, মূর্তি চর্চা, কাফির-মুশরিকদের সার্বিক অনুসরণ, শিকার-বিদআতের বিস্তার, তাগুত ও গাইরুল্লাহর কর্তৃত্ব প্রসার ও এসবের অনুকূলে জীবনের যাবতীয় দিককে কলুষিতকরণ এখানে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং শাসকগোষ্ঠীর

www.pathagar.com

একান্ত আরাধ্য। অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, অজ্ঞতায়, মূর্খতায়, কুসংস্কারে, কূপমণ্ডুকতায়, অপচয়ে, অপব্যবহারে দেশ সয়লাব। ভিতরের-বাইরের খাদক ও ঘাতকরা ছিবড়ে করে ছাড়ছে তের কোটি জনতার এই ভূখণ্ডকে।

এসবের ফলে দেশ ডুবে যাচ্ছে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিপন্ন। এখানে আজ ইসলাম ও মুসলিম চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত। কেবল আখের গোছানো, কেবল সহযোগী হয়ে যাওয়া, কেবল চোখ বুজে থাকা, কেবল পাশ কাটানো, কেবল নিরপেক্ষতার ভান করা, কেবল চাটুকারিতা ও উমেদারী, কেবল দালালী, কেবল উচ্ছিষ্টের লোভ, কেবল পরশ্রীকাতরতা, কেবল উল্টো-পিছনে লেগে যাওয়া এখানে আজ সর্বাধিক চালু কৌশলসমূহ।

তাৎক্ষণিক মুনাফা এবং সংকীর্ণ আত্ম ও দল-গোষ্ঠীর স্বার্থই এখানে আজ সর্বাধিক বড় বিবেচনা ও কার্যকর প্রণোদনা। সাধারণ মানুষও এখানে বড়ই বোধহীন, অসহায়। বুদ্ধি বিক্রেতারা প্রায় সকল পর্যায়েই কৃত্যক ও করণিক। সুশীল সমাজের দোকানদাররা আরো নষ্ট। আর রাষ্ট্রীয় বেতনভোগী-সুবিধাভোগী করণিক-কৃত্যক-আমলা-সন্ত্রাসীরা এবং সাংবাদিক-ব্যবসায়ীরা আজ এই মাৎস্যন্যায় ও জাহিলিয়াতের সহযোগী ও বেনিফিশিয়ারী। ঘোলা পানিতে মাছ শিকার তাদের নির্ভুল অস্ত্র এবং নির্ঘাৎ প্রাপ্তির উপায়। এখানে ধনীরা বড় দস্যু, দরিদ্ররা ক্ষুদে শয়তান, এখানে রাজনীতি গণিকার আখড়া। ধর্মবেত্তারাও এখানে ধাওয়া বুঝে পাল খাটানোয় তৎপর।

মানুষ এখানে পশুবৎ জীবনে রয়েছে। এখানে মানবতা লাঞ্ছিত, পরাজিত। দ্বীন এখানে নির্বাসনে। খুব সামান্য সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে কেউ কথা বলছে না, বোবা সেজে বসে আছে। পাথরের স্তব্ধতা এখানে চেপে বসেছে। কেউ এগোচ্ছে না। কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে না। কেউ সংগঠিত হচ্ছে না। কেউ প্রতিবাদ করছে না। কেউ প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না। কেঁচো বা তেলাপোকার জীবন বাছাই করেছে এখানকার মুসলিম নামধারীরা। অথচ তারা বুঝতে পারছে না যে, তারা আল্লাহর হুকুম, রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ এবং সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে সরে গেছে। তারা বস্তুত শিরক-কুফর-বাতিলকেই আসলে মেনে নিয়েছে। যিল্লতি তাই তাদের অবধারিত নিয়তি। আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে তারা।

এই ভূখণ্ডে, এই জনপদে এখন মানুষের জীবনে শান্তি, স্বস্তি, গতিময় স্থিতি ও কল্যাণ নেই। সবর, শোকর ও তাকওয়ার জিন্দেগীকে এখানে বাছাই করা হয়নি। ঈমান ও সৎ আমলের জিন্দেগীকে এখানে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়নি। তাই এখানে, এদেশে এখন ফুলে সৌরভ নেই। পাখির কুজন হারিয়ে গেছে। অতিথি পাখি পলাতক। এখানে বৃক্ষ কর্তিত, অরণ্য উজাড়, নদী শুকিয়ে মরুভূমি, ফলে-ফসলের বরকত নেই। এখানে শিশুর নির্মল আনন্দ অপসৃত, শিক্ষার্থী পাঠে নেই, জ্ঞানী ও সৃজনশীলগণ একেবারেই

www.pathagar.com

কোণঠাসা। ভয়াবহ মাত্রায় জ্ঞানবিরোধী করে তোলা হচ্ছে এই সমাজকে। এখানে মানুষের পেটে ভাত নেই, পীঠে কাপড় নেই, গৃহে নিরাপত্তা নেই, কোমর বাঁকা হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। উজান দেশের কাফিররা অর্ধশতাধিক নদ-নদীর পানি আটকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে। তাদের দুশমনী চিরাচরিত। তারা আমাদেরকে ইচ্ছামত বন্যায় ডোবায়, খরায় জ্বালিয়ে মারে। সড়ক, বাজার, বন্দর, ভূখণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা– সবকিছু তারা দখল করে নিয়েছে। এরপরও এখানে ওদের সহযোগীরা হালে পানি পায়, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়। স্বদেশে দায়িত্বহীনতা, দস্যুবৃত্তি ও দলন চলতে থাকে শিখণ্ডী শাসকবর্গের। মানুষ এদের হাতে পড়ে পড়ে মার খায়। কখনো কিছুটা প্রতিবাদ ওঠে, তারপর আবার নিস্তরঙ্গ দিন অতিবাহিত হতে থাকে। সবকিছু গা-সহা হয়ে যায়। অথচ এসব তো নিয়তি নয়। এসব তো মানুষরূপী পশুদের সৃষ্ট, বাতিল ব্যবস্থার কারসাজি। তবু সমষ্টি মানুষ, পুরো জনপদ জীবম্মৃত থেকে যায়। কেন? কীভাবে?

নব্বই ভাগ মুসলমান নামধারীর এদেশে তাই আজ সর্বাধিক প্রযোজ্য হতে পারে নিম্নের পংক্তি ক'টি :

শের কি সের মে বিল্লি খেল রাহি
ক্যায়সা হ্যায় মুসলমাঁ কা বদনসীব
শাহাদাত কি তামান্না টুট গায়ি
তসবিহ কা দানো মে জান্নাত টুট রাহি।

বাঘের মাথায় আজ বিড়াল খেলছে। কি দুর্ভাগ্য মুসলমান। শাহাদাতের আগ্রহ-অঙ্গীকার মরে গেছে। তসবিহর দানার মধ্যে আজ তারা জান্নাত সন্ধান করছে।

অবশ্য এতকিছুর পরও আল্লাহভীরু কিছু মানুষ জেগে থাকে, ঈমান রাখে, চেষ্টা করে, প্রতীক্ষার প্রহর গুনে। সুদিনকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তাকবীর ধ্বনি তুলতেই হবে, দুনিয়া প্রকম্পিত করে মুয়াযযিনের আযান ছড়াবেই সবদিকে, সবখানে। মুজাহিদের সরব উপস্থিতি ঘটবেই। জিহাদের সরব বাজবেই। মানুষের মধ্য থেকে নাবিক বেরিয়ে আসবে, রাহবার ছুটে আসবে। সংগঠিত হবেই হিযবুল্লাহ। মুসলিমের দ্বীনুল কাইয়্যমা সমগ্র ভূখণ্ড ও জনপদজুড়ে জীবন-নিয়ন্ত্রক হবে। আল্লহু আকবর ধ্বনি জীবনকে প্রাণময় করবে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' হবে মানুষের অন্তরে ও বাইরে, আত্মায় ও দেহে, ঈমানে ও আমলে, মননে ও কর্মে, সংস্কৃতি ও জীবনের কেন্দ্রীয় নির্ধারক শক্তি। যন্ত্রণায় জাহিলিয়াত আবার একদিন দূর অতীতের দুঃস্বপ্নের মতো পিছনে চলে যাবে। ইয়া রাব্বুল আলামীন, নিশ্চয়ই মুমিনদের জন্য তোমার সাহায্য নিকটবর্তী। ওয়ামা তওফিকী ইল্লাহ বিল্লাহ।

www.pathagar.com

ইউসুফ শরীফ

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এক ভয়াল মহামারী

ডেটলাইন ঃ ২০ অক্টোবর ২০০০

কোনো জাতিকে কম জোর করে পদানত করে রাখতে চাইলে আগে তার সংস্কৃতিকে দূষিত ও বিনষ্ট করতে হয়। কেননা, সংস্কৃতি জাতির প্রাণশক্তি। আর এ প্রাণশক্তিই জাতিকে শির উঁচু করে দাঁড় করায়। এ জন্যই মানব ইতিহাসে দেখা গেছে, প্রাণশক্তিতে বলীয়ান কোনো জাতি কখনই মাথানত করে না, করতে পারে না। সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতি লালনে যত্নবান কোনো জাতির ওপর অন্য কোনো জাতির বিজয় কখনো কোনো কারণে সম্ভব হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এরকম জাতিকে দিনের পর দিন পদানত করে রাখা সাধু সামরিক শক্তির দ্বারা অসম্ভব। অন্যদিকে, বিজিত জাতি যদি দুর্বল সংস্কৃতিসম্পন্ন হয় এবং বিজয়ী জাতি যদি হয় উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী, তখনই একমাত্র বিজয় স্থায়ী হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে এ বাস্তবতার নানা নজির। কাজেই, কোনো জাতিকে পদানত রাখার ষড়যন্ত্র প্রথম ও প্রধান অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে হয় সে জাতির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অর্থাৎ শুরু করতে হয় সংস্কৃতির লড়াই, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। শুরুতেই ঐ জাতির সংস্কৃতিকে দূষিত করার জন্য অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় বিজাতীয় সংস্কৃতির নানা রগরগে উপাচার। যৌনতা ঠাসা এ রমরমে উপাচার হল বিষাক্ত নেশার মতো। অনিবার্য বিষক্রিয়ার কথা জানার পরও তরুণ সমাজ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। কারণ, তার কোমলমতি, চিত্ত তাদের স্থির নয় এবং স্বজাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাও দৃঢ়মূল নয়। আর এ কারণেই যারা কোনো জাতির সংস্কৃতি বিনষ্টের চক্রান্তে লিপ্ত হয়, তাদের প্রথম ও প্রধান টার্গেট থাকে কোমলমতি কিশোর ও তরুণ সমাজ। তাদের দ্বিতীয় টার্গেট থাকে নব্যধনিক শ্রেণী– যারা ভোগ-বিলাসের জন্য সদালালায়িত।

না, কোনো গবেষণামূলক নিবন্ধের অবতারণা করা হচ্ছে না। আর আজকের এই বাংলাদেশে বিষয়টি গবেষণার অপেক্ষায়ও নেই। দেশে ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আজ এতটাই ব্যাপক ও খোলামেলা যে, প্রায় প্রতিটি পরিবার এর দূষণ ক্রিয়ার শিকার। স্যাটেলাইট আগ্রাসনের দরুন এই অপকর্মটি জোরদার ও মোক্ষমভাবে ঘটতে পারছে। তবে, এখনো এদেশে সব পরিবার স্যাটেলাইট কানেকশনের আওতায় আসেনি। কিন্তু এজন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে। কেননা, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো ছাড়াও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের রয়েছে পুরনো হলেও মজবুত মাধ্যম। গত সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে দূষিত করে বিনষ্টির শেষ ধাপে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রিন্ট মিডিয়াকে ব্যবহার করে চলেছে

www.pathagar.com

চক্রান্তকারীরা। অবস্থা আজ কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে তার আংশিক বিবরণ রয়েছে গত ২২ অক্টোবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে যে, ভারত থেকে প্লে-বয় ধরনের ম্যাগাজিন আসছে দেদারছে। যৌন উত্তেজক ছবিসম্বলিত এসব ম্যাগাজিন দেশের যুব সমাজকে বিপথগামী করছে। চোরাইপথে আসা এসব ম্যাগাজিন নগরীর পত্র-পত্রিকা বিক্রয় স্টলে বিক্রি হচ্ছে অবাধে। বিক্রেতাদের বরাত দিয়ে এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এসব ম্যাগাজিনের ক্রেতাদের অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ম্যাগাজিনগুলোর নির্ধারিত ক্রেতার সংখ্যা বেশি।

এ তথ্যাদি যতটা ভয়াবহ, বাস্তব পরিস্থিতি তার চেয়েও ভয়াবহ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই যদি বেশি হারে ভারতীয় যৌন উত্তেজক পর্ণো ম্যাগাজিন কিনে এবং নিয়মিতভাবে কিনে, তাহলে যৌনতা-বিকৃত যৌনতা তাদের সমগ্র চেতনা এবং কর্ম ও আচরণকে গ্রাস করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং খোদ রাজধানীর বুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর অবাধ যৌনলীলার খবরাখবর সাম্প্রতিক সময়ে লজ্জায় জাতির মাথা হেঁট করে দিয়েছে। এর পেছনে ভারতীয় যৌন-পর্ণো ম্যাগাজিন, যৌন উত্তেজক ও বিকৃত যৌনতার রগরগে বিবরণ সম্পন্ন সচিত্র চটি বই এবং স্যাটেলাইটে ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোর যৌনতা ঠাসা অনুষ্ঠানাদির প্ররোচনা যে সক্রিয় তা আজ তার বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দেশে আজ যে হারে অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে এবং এসবের মধ্য দিয়ে যে বিকৃত যৌনতার ভয়ঙ্কর প্রকাশ ঘটছে তার প্ররোচনাও আসছে এ একই সূত্র থেকে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে স্বামীকে বেঁধে রেখে তার সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ, মা-বাবাকে বেঁধে রেখে তাদের সামনে কন্যাকে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যা যে কত অসংখ্য ছবিতে কত বিচিত্রভাবে দেখানো হয়েছে ও হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। উল্লিখিত প্রতিবেদনে শুধু প্লে-বয় ধরনের ম্যাগাজিনের কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়নি, বিকৃত যৌনতায় ঠাসা উত্তেজক সচিত্র চটি পর্ণো বইগুলোর কথা। অথচ, গত ২৭/২৮ বছর ধরে এগুলো আসছে বানের পানির মতো। এগুলো গ্রাস করছে কোমলমতি কিশোর, সদ্য তরুণ, হতাশাগ্রস্ত যুবক এবং এমনকি কিছু কিছু বিকৃত রুচির পৌঢ়দেরও মন-মগজ। ৪ বছরের শিশু কন্যাটি যখন ধর্ষণের শিকার হয়, স্বামীকে বেঁধে রেখে যখন স্ত্রীকে এবং মাকে বেঁধে রেখে তারই সামনে যখন কিশোরী কন্যাদের ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অহরহ খবর প্রকাশিত হয় তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিকৃত যৌনতা ও যৌন উৎপীড়ন কি ভয়াবহভাবে চেপে বসেছে এই সমাজের বুকে। এসবের সরাসরি প্রচারণা আসছে এদেশে অনুপ্রবিষ্ট ভারতীয় সাংস্কৃতিক উপাচার থেকে। ভারতীয় ব্লু ফিল্মতো এখন যত্রতত্র পাওয়া যাচ্ছে। স্যাটেলাইট ট্যানেলগুলো তো অবাধে প্রদর্শন করছে নীল ছবি। শুধু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নয়, সবার সামনেই এখন ভারতীয় যৌন ম্যাগাজিন, পর্ণো পুস্তিকা এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলে যৌনতা ঠাসা ছবি। শ্রমজীবী

www.pathagar.com

অশিক্ষিত তরুণটিকেও অনেক সময় ভারতীয় পর্ণের ম্যাগাজিনের যৌন উত্তেজক ছবিটি সামনে মেলে ধরে নগ্ন থাকতে দেখলে কিংবা বস্তির ঘরে স্যাটেলাইটে ভারতীয় টিভি চ্যানেলে যৌন উত্তেজক গানের দৃশ্য বা ধর্ষণ দৃশ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে দেখলে, এগুলোকেই আজকের দিনে স্বাভাবিক চিত্র বলে মেনে নিতে হবে। আর এ প্ররোচনা থেকেই যদি কোনো অপহরণ, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর খুনের ঘটনা অবলীলায় ঘটে যায়, তাতেইবা অবাক হওয়ার কি আছে!

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের ছায়াছবিতে ভারতের বোম্বের ছবির প্রভাব শতকরা প্রায় একশ' ভাগ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের স্যাটেলাইট চ্যানেলে বিটিভির কোনো কোনো অনুষ্ঠানেও ভারতীয় প্রভাব ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। এদেশের একশ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যেও ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মতো অবাধ যৌনতায় গা ভাসিয়ে দেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। গত ক'দিন ধরে পত্র-পত্রিকায় গুলশানের একটি রেস্ট হাউস ও এতে জমে ওঠা যৌন ব্যবসা সংক্রান্ত যেসব তথ্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে বিটিভির একশ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রী ও একশ্রেণীর প্রযোজকের যে চিত্র ফুটে উঠছে তাও বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনেরই প্রত্যক্ষ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য হতে পারে। দেশের একশ্রেণীর লেখকও যৌন সুড়সুড়িতে ভরা নোংরা কেচ্ছা-কাহিনী লিখে চলেছেন। চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক থেকে শুরু করে এই একশ্রেণীর লেখক পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকলের যেসব বক্তব্য বিভিন্ন সময়ে জানা গেছে, তাতে তারা সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিজাতীয় অপসংস্কৃতি অনুসরণের অজুহাত খাড়া করেছেন এই বলে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই তা করছেন। এ অজুহাত ধোপে কতটা টেকে তা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। তবে দেশে সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যে প্রবল হয়ে উঠেছে এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রায় সর্বাংশ দূষিত করে তুলছে, এটা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সরকার নির্বিকার। অবাধে সীমান্ত পার হয়ে ওপার থেকে আসছে অসংখ্য যৌন পত্রিকা, পর্ণো পুস্তিকা, নীল ছবি, সাহিত্য নামে যৌনতা ঠাসা নোংরা বই এবং প্রকাশ্যে নির্বিবাদে এগুলো বিক্রি হচ্ছে। দেশের তরুণ সমাজ লুফে নিচ্ছে এসব ভারতীয় রগরগে যৌনতাভরা সাংস্কৃতিক উপাচার। আর এর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্ররোচনায় দেশে হু হু করে বেড়ে চলেছে অপহরণ, ধর্ষণসহ নারী নিপীড়ন। আর এসবের সাথে পাল্লা দিয়ে ভারত থেকে আসছে ফেনসিডিলসহ নানা নেশার দ্রব্যও। সারাদেশে ভারতীয় নেশা দ্রব্যের অবাধ বাণিজ্য চলছে। দেশের তরুণ সমাজের বড় অংশটাই ভারতীয় পর্ণো বই-পত্র পড়ছে, টিভিতে যৌনতা ঠাসা ভারতীয় ছবি দেখছে এবং ফেনসিডিল খেয়ে ঝিম মেরে থাকছে। দেশের মূল শক্তি যে যুবসমাজ তার এক বড় অংশ অকাল-যৌনতা, বিকৃত-যৌনতা ও মরণ নেশার আগ্রাসী ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ক্লান্ত অবসন্ন হতে বসেছে। প্রতিদিন দেশের পত্র-পত্রিকায় কত খবর বের হচ্ছে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির। আর

www.pathagar.com

এসবের সূত্র-উৎস অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই সামনে এসে দাঁড়াবে। এ এক ভয়াল মহামারী– যার কবলে পড়েছে বাংলাদেশের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার সবটুকু সম্ভাবনা। আর এর পরিণতিতে যা হবে তারও স্পষ্ট আলামত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গোটা বাংলাদেশ আজ ভারতের পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। দেশের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। শিল্প-কারখানা কিছু বন্ধ হয়ে গেছে এবং বাদবাকিগুলো রুগ্ন হয়ে পড়েছে। অচিরেই পুরোপুরি আমদানিনির্ভর একটি দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সম্পদের যেটুকু মজুদ রয়েছে তাও আমদানির খা-ই মেটানো নিঃশেষ হয়ে যাবে অতি অল্প সময়েই দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারের ওপর সময় ও সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। কি হবে এর পরিণতি? এ প্রশ্নের জবাব জাতির সামনে এখন অনেকটাই স্পষ্ট। তাই আমরা বলবো, এখনো সময় আছে ঘুরে দাঁড়াবার। যারা দরজা-জানালা খুলে রাখার কথা বলে তথাকথিত প্রগতির পালে হাওয়া দেন তাদের সামনে। জাতির ভবিষ্যৎ নেই, আছে ক্ষুদ্র হীন ব্যক্তিস্বার্থ। দরজা-জানালা বন্ধ রেখে অনেকটা বিচ্ছিন্ন থেকে মায়ানমার ও ভিয়েতনাম গত ক'বছরে যতদূর এগিয়েছে বাংলাদেশ তিন দশকেও তার ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেনি। এ হল বাস্তবতা। নিজের হাতে শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে না পারলে খোলা দরজা-জানালা পথে আসা আলো হাওয়া কার জন্য, কিসের জন্য? আর তাই জাতি হিসেবে নিরাপদ অস্তিত্বের জন্য আজ প্রথম দরকার বিজাতীয় অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ। সর্ব পর্যায়ে এই প্রতিরোধ ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ যে তরুণ সমাজ তাকে রক্ষা করা যাবে না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে তারুণ্যের ব্যবহারও হবে না সফল।

www.pathagar.com

সোহেল মাহমুদ

ধর্মপ্রীতি ও ধর্মভীতির আওয়ামী স্টাইল

ডেটলাইন ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০১

আওয়ামী লীগ সরকার সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত এক নীল নক্শার আওতায় তাদের ভাষায় "মৌলবাদী অপশক্তি"-র বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের ভাষায় জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সময়োচিত' ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, "মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে'। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "ধর্মান্ধরা ইসলাম ও মানবতার শত্রু"।

আলেমদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ঠুরতম আচরণ এবং প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে এটা এখন সুস্পষ্ট যে, দেশের অভ্যন্তরে সরকার একটি অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে এবং তা ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে। চমক লাগানোর মতো সরকার হয়তো যুদ্ধকে আরও তীব্রতর করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ সরকার ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে কেন?

আওয়ামী ঘরানা ও তাদের দোসর তথাকথিত সেক্যুলার ও বাম সংগঠনগুলো দেশের ইসলামী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিত্ব ও সার্বিকভাবে আলেম সমাজকে নির্বিচারে 'মৌলবাদী' 'ধর্মান্ধ', 'সাম্প্রদায়িক', 'ধর্মব্যবসায়ী', 'স্বাধীনতাবিরোধী', 'ফতোয়াবাজ', 'রাজাকার-আলবদর', 'নারী নির্যাতনকারী', 'তালেবান', 'মধ্যযুগীয়', 'প্রগতিবিরোধী', ইত্যাদি আপত্তিকর পরিভাষায় আখ্যায়িত করে আসছে। বলাই বাহুল্য, ধর্মনিরপেক্ষ ও কম্যুনিজমের ধ্যান-ধারণা ইসলামের সাথে সঙ্গতিমূলক নয় বলে আলেম সমাজ কোনোদিনই তাকে পছন্দ করেনি বা সমর্থন জানায়নি। নির্বাচনের রাজনীতিতে ইসলামী শক্তিসমূহ কোনোদিনই আওয়ামী লীগ বা বামপন্থীদের ভোট দেয়নি। পক্ষান্তরে, অন্য ধর্মের লোকেরা বিশেষত: হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী দলগুলোর প্রধান শক্তি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ ইসলামপন্থীদেরকে তাদের শত্রু এবং হিন্দুদেরকে তাদের বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। এরপরও আওয়ামী লীগ বিভিন্ন কৌশলে নিজেদেরকে ধর্মপ্রাণ ও ধর্মানুরাগী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছে। যেমন– শেখ হাসিনা মাথায় পট্টি বেঁধে, হাতে তসবীহ নিয়ে, মাঝে মধ্যে বোরকা পড়ে নিজেকে 'পরহেজগার' একজন নারী হিসেবে প্রদর্শন করেছেন। বিশেষত: ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এরূপ অভিনয়ে ভালো ফলও তিনি

www.pathagar.com

পেয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন মসজিদে রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে নামাজ পড়ার ও টুপি পড়ার জন্য। ঠিকই এর পরে বহু আওয়ামী নেতা-কর্মী অস্বাভাবিকভাবে টুপি পরতে শুরু করে, যা কারো কারো ক্ষেত্রে এখনও অব্যাহত আছে। এমন ভণ্ড ও প্রতারক যখন ধার্মিকতার ভান করে তখন তা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি জনগণের কাছেও তার স্বরূপ প্রকাশিত হতে সময় লাগে না। আওয়ামী লীগ 'ধর্মবিরোধী' বলে জনমনে যে শংকা রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য তারা 'বিসমিল্লাহ' (বাংলা ভাষায়) বলতে শুরু করে। ইদানীং বিড়াল তপস্বী সেজে 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগানও দিতে দেখা যায়। এত কিছুর পরেও যখন জনগণ তাদেরকে ইসলামের বন্ধু বলে বিবেচনা করে না, তখন এ সত্যটি উপলব্ধি করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, বকধার্মিক সেজে কিছু সময় কিছু লোককে প্রতারণা করা গেলেও সব লোককে বেশি সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না।

সাম্প্রতিককালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটে ইসলামী দলগুলোর অংশগ্রহণকে আওয়ামী লীগ সহজভাবে নিতে পারেনি। এমনিতেই ইসলামী দলগুলোর পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা ঈমানের দাবিতেই সম্ভব নয়, তদুপরি মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচন তথা ধ্বংসের জন্য সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিচ্ছিল তাতে সমগ্র আলেম সমাজ ক্রমান্বয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে সরকার উৎখাতের আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর প্রধান প্রধান অংশ চারদলীয় জোটে অংশ নেয়। সরকার শুরু থেকেই এদেরকে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এটা করার জন্য সরকার নানাভাবে ফন্দি-ফিকির করলেও এতটুকু সফল হতে পারেনি। আওয়ামী লীগ তার রাজনীতি ও নির্বাচনী কৌশলের অংশ হিসেবেই আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশী অভিযান শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ হয়তো ভেবেছে আগামী নির্বাচনে ইসলামী জনতার ভোট তো পাওয়া যাবেই না; সুতরাং এরা যাতে চারদলীয় জোটে সক্রিয় ভূমিকা নিতে না পারে সেজন্য তাদের হিসাব হচ্ছে, আলেমদের চরিত্র হনন, মামলা-মোকদ্দমা ও জেল-জুলুম দ্বারা যতটা সাইজ করা যায় ততটা তাদের লাভ!

দেশে সার্বিকভাবে সামাজিক জীবনে যেভাবে নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে তার মধ্যে এখন পর্যন্ত আলেম শ্রেণীই অপেক্ষাকৃত ভাল মানুষ বলে সমাজে স্বীকৃত। ঘুষ, দুর্নীতি, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, চুরি, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, চোরাচালান, সরকারি সম্পদ আত্মসাত ইত্যাদি সমাজ ও জনবিরোধ কাজের মাঝে সাধারণভাবে আলেমদের খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি বলে পরিগণিত। সুতরাং সামাজিক জীবনে কোনো প্রকার অপরাধের সাথে তাদেরকে জড়িয়ে আলেমদের ক্ষুব্ধ করে দেয়া আওয়ামী সরকারের পক্ষে সহজ ও বাস্তবসম্মত

www.pathagar.com

নয়। তাই বিকল্প উপায় হিসেবে তাদেরকে দাঁড় করানো হয়েছে 'ফতোয়াবাজ', 'সাম্প্রদায়িক', 'স্বাধীনতা-বিরোধী' ইত্যাদি অভিধায়।

'স্বাধীনতা-বিরোধী' বলে ঢালাওভাবে আলেমদেরকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো আওয়ামী লীগের একটি পুরানো কূটকৌশল ও মিথ্যাচার যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। ১৯৭১ সালে সকল আলেম যেমন স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন না, তেমনি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কাউকে মানুষ হত্যার সাথে জড়িত বলে অভিযুক্ত করাও আইনের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত নয়। বাংলাদেশের কোনো আদালত কোনো আলেমকে যদি ১৯৭১-এ খুনের জন্য শাস্তি দিয়ে না থাকে তাহলে কাউকে সে জন্য দায়ী করা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। তদুপরি ১৯৭১-এর পরে জন্মগ্রহণকারী যারা সর্বোচ্চ ৩০ বছরের যুবক বা সে সময় ১০/১২ বছরের শিশু যাদের বয়স এখন ৪০/৪২ বছর তারা তো কোনোভাবেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা বিরোধিতার জন্য অভিযুক্ত হতেই পারেন না। অথচ আওয়ামী লীগ জ্ঞানপাপীর মতো তাদেরকে স্বাধীনতাবিরোধী বলে অপবাদ দিচ্ছে। এমন কি নারী ধর্ষণের জন্যও তাদেরকে অপবাদ দিচ্ছে। জেনে-বুঝে যারা এভাবে আলেমদের চরিত্র হনন করে চলেছে এবং জনগণের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তাদের আর যা হোক সত্যবাদী বলার সুযোগ নেই; তারা মিথ্যাবাদী, জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী।

এখন আলেম সমাজকে 'স্বাধীনতার শত্রু' বলে আখ্যায়িত করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনো কার্যকলাপে জড়িত থাকারও কোনো অভিযোগ অদ্যাবধি সরকার প্রমাণ বা হাজির করতে পারেনি। কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ও বোমাবাজির ঘটনার সাথে আলেমদের জড়িত করার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সরকারের স্ববিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপে এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি যে, আওয়ামী সরকার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যই আলেমদের পিছু লেগেছে।

এক শ্রেণীর পত্রিকা হলুদ সাংবাদিকতার আশ্রয় নিয়ে আলেম, মাদ্রাসার ছাত্র ও ইসলামী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে গভীর জঙ্গলে অবৈধ অস্ত্র প্রশিক্ষণ, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, বিদেশী তালেবানী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কল্পকাহিনী প্রচার করে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো একটি অভিযোগও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। এখনও কোনো ঠুন্‌কো ঘটনা পেলেই এসব ভারতপন্থী সেক্যুলার পত্রিকাগুলো ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে রঙচঙ লাগিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। স্ববিরোধী ঐসব পত্রিকা আবার আওয়ামী সন্ত্রাসীদের কুকীর্তি সম্পর্কে লিখতে যায় না। সেখানে তারা যেন মুখে কুলুপ এঁটে থাকে–কলম ও বিবেক বন্ধক দিয়ে দেয়।

আওয়ামী সরকার ও বামপন্থী দলগুলো ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'মৌলবাদী' বলে গালি দিয়ে থাকে। একটি পরিভাষা প্রকৃত অর্থে ভালো-মন্দ যে অর্থই

www.pathagar.com

বহন করুক না কেন, আওয়ামী পরিমণ্ডলের বরকন্দজরা যেভাবে যে অর্থে ব্যবহার করবে, সেটাই সবাইকে মেনে নিতে বাধ্য করার প্রবণতা দেখা যায়। এনসাইক্লোপেডিয়াসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থাদিতে 'মৌলবাদ' বা 'ফান্ডামেন্টালিজম'-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা তা থেকে রেফারেন্স নিতে রাজি নয়। তারা মস্তিষ্ক অন্যত্র বন্ধক দিয়ে রাখার কারণে মাউথ স্পীকারের মতো ভারত ও পাশ্চাত্যের মুসলিম বিদ্বেষী চক্রান্তকারীদের শেখানো বুলিই কেবল আওড়াতে থাকে।

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের (বাইবেল) মূল নীতিমালার অনুসারীদের বলা হতো মৌলবাদী। বিপরীতপক্ষে ছিল সংস্কারবাদীরা। এ পরিভাষাটি দীর্ঘকাল যাবত ব্যবহৃত হয়নি। সাম্প্রতিককালে বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠন ও আন্দোলনগুলোকে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান ও ইহুদী চক্র 'মৌলবাদী' বলে গালি দিতে শুরু করে। এর সাথে সুর মিলিয়েছে বাংলাদেশের তথাকথিত 'সেক্যুলার' ও 'বাম প্রগতিবাদীরা'। এরা 'মৌলবাদ' শব্দটিকে এখন ব্যবহার করছে ধর্মান্ধ সন্ত্রাসবাদ অর্থে। এটা তারা জেনেশুনেই করছে। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদী চক্র যেমন নানা প্রোপাগান্ডা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের জঙ্গি সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে, বাংলাদেশেও শয়তানের মানস সন্তানেরা একই কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী সরকার দেশের বরেণ্য আলেমদেরকেও মৌলবাদী সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করে তাদের উপর খড়গহস্ত সম্প্রসারণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে আলেম সমাজ ইসলামের মূলনীতি তথা আল-কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে তারা মানব জীবনকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছেন। এ জন্য তারা নিন্দার্হ হবেন কেন? বরং তারাই আসল সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ বিভ্রান্ত ও সীমালঙ্ঘনকারী অর্বাচীনরা 'নায়েবে রাসূল'-দের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তাদের চরিত্র হননের জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছে।

দেশের ইসলামী দল ও আলেম সমাজকে আওয়ামী নেতা-নেত্রীরা 'সাম্প্রদায়িক' বলে অহরহ আখ্যায়িত করে থাকেন। তাদের ভাবখানা এমন যেন এ দেশের আলেমরা হিন্দুদের বা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তরবারি হস্তে নিত্যদিন হামলা চালাচ্ছে। এটা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় যে, দেশের কোনো আলেম বা কোনো ইসলামী দল বা প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি জীবন বা তার সম্পত্তির ওপর কোনো হুমকি সৃষ্টি করেননি। তারা তাদের বক্তব্য - বিবৃতিতেও অন্য কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ান না। তাদের দলীয় কোনো কর্মসূচি আজ পর্যন্ত হিন্দু.বৌদ্ধ বা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যায়নি। এ দেশের আলেম সমাজ ও ইসলামী দলগুলো অত্যন্ত সহনশীল ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় উজ্জীবিত। অথচ আওয়ামী ঘরানার রাজনীতিক বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা তার স্বরে একই রেকর্ডার বাজিয়ে যাচ্ছে যে, এরা সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

শক্তি। প্রকৃতপক্ষে অতীতে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের ছোটখাটো যে সকল সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ঘটনা ঘটেছে তার সাথেও কোনো আলেম জড়িত ছিল না। খুঁজলে বরং ঐ সকল সন্ত্রাসী কাজে আওয়ামী জনশক্তিকেই বেশি তৎপর হিসেবেই পাওয়া যাবে । হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান ঐক্যপরিষদ সাম্প্রদায়িক কথা বললে আওয়ামীদের দৃষ্টিতে তা দোষণীয় নয়, কিন্তু ইসলামের পক্ষে কেউ কথা বললে তা হয়ে যায় মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক। এ থেকেই বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণু ও বিদ্বেষী। তারা নিজেদের মুসলমানীত্বটুকু মুছতে পারে না শুধু জনগণ কর্তৃক নিন্দিত ও প্রহৃত হওয়ার ভয়ে।

অতি সম্প্রতি হাইকোর্টে ফতোয়া বিরোধী রায় হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী দুর্বৃত্তদের ইসলামবিরোধী তৎপরতায় বেশি হাওয়া লেগেছে। এর সাথে নর্তন-কুর্দন শুরু করেছে কয়েকটি এনজিও। বিশেষ করে কাজী ফারুকের সংগঠন প্রশিকা বাংলাদেশে এনজিওর ছদ্মাবরণে ক্রুসেডে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তথাকথিত সিভিল সোসাইটি ও নাগরিক সমাজের নামে নিজেদের ঘৃণ্য স্বার্থ হাসিলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রচুর বিদেশী অর্থে লালে লাল হয়ে কাজী ফারুকরা বাংলাদেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধকে নির্মূল করার অভিযানে নেমেছে। তারা মুসলমানদের পারিবারিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে চায়। খুশি কবীর নাম্নী এক মহিলাও এনজিও'র দালালী নিয়ে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সমাজ কাঠামোকে পাশ্চাত্যের আদলে গড়তে চান। এরা তাই মরণ কামড় দিয়েছে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে।

'ফতোয়া' শব্দের অর্থ কী তা যেমন হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বিচারকরা ঠিকমত জানেন না, তেমনি যারা ঐ ভ্রান্ত রায়ে উল্লসিত হয়েছেন তারা আরো বেশি মূর্খ। ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি যদি এদের ন্যূনতম দরদ ও ভালবাসা থাকতো তাহলে তারা মূর্খের মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকতো। 'ফতোয়া' একটি ধর্মীয় পরিভাষা। ফতোয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ করা। মানুষের ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়া। ফতোয়া দেয়ার জন্য যোগ্যতা লাগে। যে কেউ ফতোয়া দিতে পারেন না। আবার ফতোয়া মেনে চলা কারো জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং তা আদালতের রায়ের মতো কার্যকর করাও যায় না। ফতোয়া হচ্ছে মুফতীদের বিশেষজ্ঞ মতামত। বাংলাদেশের গ্রাম-জনপদে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনায় গ্রাম্য মাতবর বা গ্রাম্য মসজিদের অল্পবিদ্যার একজন ইমামের প্রদত্ত ভ্রান্ত ফতোয়ার ফলে কিছু নারী জুলুমের শিকার হয়েছে। এগুলোর কোনো ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট কোনো আলেম জড়িত নন। তা সত্ত্বেও সমগ্র আলেম সমাজকে 'ফতোয়াবাজ' বলে গালি দেয়া হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলো হলুদ সাংবাদিকতা করে তিলকে তাল বানিয়ে আলেমদের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিষয়ে কোনো মতামত উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দিতেই পারেন। এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এক সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রে 'ফতোয়া' প্রদানের জন্য মুফতী নিয়োগ করা হতো। এখনও মিসর, সৌদি আরব, ফিলিস্তিনে সরকার নিযুক্ত মুফতী/ গ্রান্ড মুফতী রয়েছেন। তাদের মতামত কখনই আদালতের সমার্থক নয়। আদালত বরং মুফতীদের সাহায্য নিয়ে রায় দিয়ে থাকেন। আদালত কর্তৃক রায় না দেয়া পর্যন্ত ফতোয়া কার্যকর করা যায় না। আওয়ামী চেতনার বুদ্ধিজীবী ও বিচারকরা এসব না জেনেশুনে ফতোয়া প্রদান করাকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে কোরাস গাইতে শুরু করেছে। আসলে এদের সুদূরপ্রসারী অসদুদ্দেশ্য রয়েছে। কোনো কোনো চিহ্নিত আওয়ামী বুদ্ধি ব্যবসায়ী ও এনজিও নেতা বলেছেন, হাইকোর্টের ফতোয়া নিষিদ্ধ করার রায়ের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশা করছিলেন। সুতরাং বোঝা যায়, একটা নীল নক্শার আওতায়ই ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় ইসলামের অনুসারী আলেম ও ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক, হয়েছেও তাই। স্বল্প সময়ের নোটিশে ইসলামী ঐক্যজোট ও ওলামা-মাশায়েখরা পল্টনে লাখ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে ফেলেন। অথচ এর বিরুদ্ধে এনজিও-প্রশিকার উদ্যোগে জনগণ সামান্যই সাড়া দিয়েছে।

আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আওয়ামী মন্ত্রীদের নেতৃত্বে কিছুদিন আগে ঢাকায় যে সন্ত্রাসের তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হলো সেটা নিয়ে আওয়ামী বুদ্ধি ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকরা 'টু' শব্দটি করলো না; সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আদালত গুঁড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিলেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম বিচারকদের মাথায় লাঠি মারতে চাইলেন; প্রধানমন্ত্রী একটির বদলে ১০টি লাথি ফেলার হুমকি দিলেন; হাসান ইমামরা মানুষ খুন করে সকাল-বিকাল নাস্তা করার খোয়াব যখন দেখেন– তাতে দোষের কিছু হয় না। অথচ আলেমরা কোরআন-হাদীসবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাকে সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী কার্যকলাপ বলে গণ্য করা হয়। কে না জানে যে সারাদেশে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবলীলায় সমগ্র জাতি জাহেলিয়াতের মধ্যে আজ নিপতিত। মানবজমিন পত্রিকা লিখেছে আওয়ামী এমপি জয়নাল হাজারীর নৃশংসতায় ফেনী কবরের মতো প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছে। এরূপ আওয়ামী হাজারী আজ শহর-বন্দর-গ্রামে উন্মত্ততায় জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। অথচ তাদেরকে নিবৃত্ত না করে শেখ হাসিনা ঐসব সন্ত্রাসীদের দ্বারা আলেম সমাজকে নিগৃহীত করছে– এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে।

বস্তুতপক্ষে দেশে এখন সত্য-মিথ্যার লড়াই চলছে, চলছে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংঘাত। আওয়ামী নেতৃত্ব চাইছে জাতিকে ধর্মহীন, নৈতিকতাহীন, ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দিকে টেনে নিয়ে যেতে– যা মূলত জাহান্নামের পথকেই প্রশস্ত করবে। অপরদিকে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তি চাইছে জাতিকে স্বকীয়তা, প্রকৃত স্বাধীনতা

www.pathagar.com

ও ইসলামী মূল্যবোধ তথা ঈমানের চেতনায় উজ্জীবিত করতে। আওয়ামী লীগ ১৯৭২-৭৫ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের মুসলমান ও ইসলামের স্বার্থে কোনো কাজ করেনি, বরং ইসলামকে পর্যুদস্ত ও বেইজ্জতী করার জন্য অনেক অপকর্মই করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে আল-কুরআনের বাণী মুছে ফেলা থেকে শুরু করে ইসলামী রাজনীতি পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়। সংবিধানে হিন্দুস্তানের পরামর্শে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সন্নিবেশিত করা হয়। আলেমদেরকে গণহারে জেলে ঢুকানো হয়। অনেককে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

রমনা রেসকোর্সে ঘোড় দৌড় বন্ধ করা আর মদ-জুয়া বন্ধের ঘোষণা করার শেখ মুজিবের ইসলামপ্রীতি প্রচার করে আওয়ামী নেত্রী জনগণকে ধোঁকা দিতে চাইছেন। কিসে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের খেদমত হয় তার বয়ান শেখ হাসিনার কাছে শোনার প্রয়োজন নেই। এ দেশের আলেম সমাজ জানে যে, সেক্যুলার নীতির ধ্বজাধারী ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ ইসলামের বন্ধু নাকি শত্রু। হাসিনা নিজেও এবারে ক্ষমতায় এসে ইসলামের বাণী প্রচার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ইসলামের শত্রুতাকেই পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন। ঘাদানিক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে বহু এনজিও/সংগঠন এ দেশে ইসলামকে নির্মূল করার জন্য আন্তর্জাতিক চক্রের সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। আজকে তারাই শেখ হাসিনার বড় শক্তি ও সহযোগী। সুতরাং ইসলামের চিহ্নিত শত্রুদের সাথে গাঁটছাড়া বেঁধে, আর দেশবরেণ্য আলেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইসলামের বন্ধু হওয়ার দাবি করা চরম ভণ্ডামী ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আওয়ামী সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই একদিন জনগণ গর্জে উঠবে। কারণ এ দেশের মানুষ জালেম ও মোনাফেকদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা তারা ভালোভাবেই জানে।

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেতার-টেলিভিশন

গাজীউল হাসান খান: বিটিভি ও বেতারের স্বায়ত্তশাসন ও আসফউদ্দৌলা কমিশনের রিপোর্ট

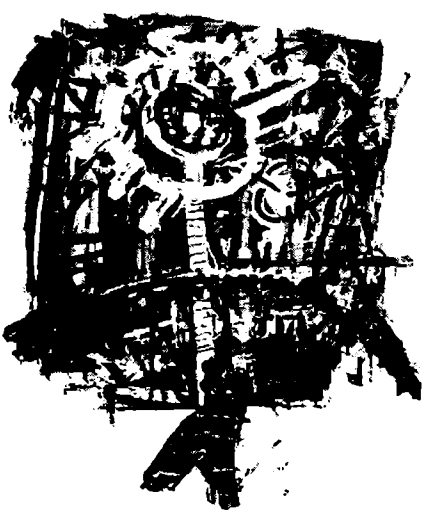

www.pathagar.com

গাজীউল হাসান খান

টিভি ও বেতারের স্বায়ত্তশাসন ও আসফউদ্দৌলা কমিশন রিপোর্ট

ডেটলাইন ঃ ৫ মার্চ ২০০১

'সখি তুমি কার? যখন যার হাতে, তার।' সূচনা থেকেই বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের হয়েছে সেই অবস্থা। সরকারি একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের কারণে এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা সুদূরপ্রসারী গণমাধ্যমগুলো একচেটিয়াভাবে ক্ষমতাসীন দলের প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেখানে এখন বলা যায় সরকারবিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলোর প্রবেশ নিষিদ্ধ। অথচ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কিংবা বিধিব্যবস্থায় এমনটি হওয়ার কথা নয়। দেশের জনগণের অর্থে চালিত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধু সরকার নয়, বিরোধী দলেরও সমান অধিকার রয়েছে। কারণ এগুলো কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয় এবং কোনো বিশেষ দলের অর্থে প্রতিষ্ঠিত কিংবা পরিচালিতও নয়। বিরোধী দলে থাকাকালীন দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে অথবা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সবাই দেশের রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের কথা জোর দিয়ে বলে থাকেন। দেশের বেতার ও টেলিভিশনের মতো দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমকে সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও একচেটিয়া ব্যবহার থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার প্রকাশ করেও ক্ষমতায় গিয়ে তারা তা বেমালুম ভুলে যান। স্বাধীনতার আগে এবং তিরিশ বছর পরেও বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে তাই কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। ফলে এ দু'টি প্রচারযন্ত্র বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে 'সাহেব-বিবি গোলামের বাক্স' বলে জনগণ দ্বারা আখ্যায়িত এবং নিন্দিত হয়েছে। দেশে বসে দেশীয় রেডিও-টিভিতে দেশের প্রকৃত খবর জানতে না পেরে তাদের বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার মতো বিদেশী সংবাদ প্রচার মাধ্যমগুলোর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সংবাদ পরিবেশন কিংবা ঘটনা প্রবাহের সম্প্রচারে উল্লিখিত সংস্থাগুলো (বিদেশী) শুধু নিরপেক্ষই নয়, সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দল কিংবা বিরোধী দলের পাশাপাশি সরকারের বক্তব্যও তারা উল্লেখযোগ্যভাবে তুলে ধরেন জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে। এ দায়িত্বটি আমাদের বেতার ও টেলিভিশন মোটেও পালন করে না। কারণ, তাদের নিরপেক্ষ ও নির্দলীয়ভাবে কিংবা স্বাধীনভাবে কোন ঘটনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার কোনো ক্ষমতা নেই। সে কারণে স্বাধীনতার পর ক্রমশই দেশের বলিষ্ঠ প্রচার মাধ্যমে রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি জোরদার হয়ে ওঠে।

যাবতীয় অপ্রিয়, অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিতর্কিত বিষয়গুলো বাদ দিয়েও এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশ বিগত তিন দশকের মাঝে প্রথম দশক অতিবাহিত হয়েছে অস্থিরতা ও

www.pathagar.com

উত্থান-পতনের মাঝে। দ্বিতীয় দশকে অর্থাৎ এরশাদের শাসনামলের ৯ বছরে রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন উত্থাপন করা একান্তই ছিল একটি অবান্তর প্রসঙ্গ। কারণ, দেশের অধিকারসচেতন মানুষ তখন গণতন্ত্রের আরও মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে ছিলেন আন্দোলনমুখর। বলতে গেলে নব্বই দশকের গোড়া থেকেই রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় আসতে শুরু করে। কিন্তু বিএনপি সরকারের শাসনামলের মাঝ থেকে শেষের দিকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর ১৭৩ দিনের হরতাল ও বিপর্যয়মূলক আন্দোলনের মুখে তাদের পক্ষে (বিএনপি) জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক জটিল বিষয়েরও সমাধান দিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখাও তখন কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ কিংবা রেডিও-টেলিভিশনে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের বিষয়গুলো থেকে দেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাংবিধানিক পদক্ষেপ নিতে নিতেই ফুরিয়ে যায় বিএনপির শাসনকাল। তবু ছিয়ানব্বই-এর নির্বাচনে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয়েই তাদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সোচ্চার হয়েছিল। কিন্তু গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যে পরিমাণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় এসে তারা ধরে ঠিক উল্টো পথটি। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণাটি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণায় থাকলেও এ পর্যন্ত সে ব্যাপারে তারা কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। বরং দেশের বিচার বিভাগকে তারা বিড়ম্বনার মুখে ফেলেছে বারবার। সর্বত্র অভিযোগ উঠেছে, সুস্পষ্ট নির্বাচনী ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি এখনও ঝুলিয়ে রেখেছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল কিংবা একদলীয় প্রচার-প্রপাগাণ্ডার স্বার্থে। প্রায় এক বছর হয়ে এল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, খুব শীঘ্রই তার সরকার বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে তারা ব্যক্তিমালিকানায় 'একুশে টিভি' এবং একটি এফএম বেতার কেন্দ্রের অনুমতি দিলেও বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসন দেয়নি। বেতার ও টিভি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা, গতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং সৃষ্টিশীলতা আনার লক্ষ্যে এ দু'টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার কথা বহু আগে থেকেই ভাবা হয়েছিল। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৯ সেপ্টেম্বর '৯৬ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবী এবং সাবেক সচিব আসফউদ্দৌলার নেতৃত্বে গঠিত সে কমিশন ছয় মাসের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট প্রদান করার কথা ঠিক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এর সময়সীমা আরও তিন মাস বাড়ানো হয়।

www.pathagar.com

'৯৭-এর ১৯ মার্চ কমিশন প্রধানমন্ত্রীর সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হলে প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত কমিশনের রিপোর্টে ব্যক্তিমালিকানায় টেলিভিশনের (বিটিভি) একটি দ্বিতীয় চ্যানেল এবং বেতারকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানান। সবকিছু পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে '৯৭ সালের ১৪ জুলাই কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কাছে বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্ট চূড়ান্ত করার আগে কমিশন বেতার ও টেলিভিশনের সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষ, শিল্পীগোষ্ঠী, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদের মতামত নেন বলে জনাব আসফউদ্দৌলা এ লেখককে জানান। তাছাড়া বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রণয়নের আগে কমিশন প্রধান জনাব আসফদ্দৌলা বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তান এবং ফিলিপিন্সের বেতার ও টেলিভিশনে বিরাজমান স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন দিকগুলো তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করে দেখেন বলে জানান। জনাব আসফউদ্দৌলা জানান যে, বাংলাদেশ বেতার এবং বিটিভিতে জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা ও সৃষ্টিশীলতা আনার জন্য এবং স্যাটেলাইট, টেরেসটোরিয়াল চ্যানেল এবং এফএম রেডিও ব্যান্ডের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কমিশন প্রশাসনিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণীত এ প্রথম রিপোর্টটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেন। এতে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংশোধনী ও সংস্কার সাধনের সুপারিশ করা হয়, যা এ ধরনের কোনো জাতীয় গণমাধ্যমের যুক্তিনির্ভর নিরপেক্ষতার জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত সাড়ে তিন বছরেও প্রধানমন্ত্রী সে রিপোর্টটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে উল্লিখিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেননি। কারণ, এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কমিশনের ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আসফউদ্দৌলার কিছু মৌলিক মতপার্থক্য দেখা দেয় বলে জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিশনের রিপোর্টে মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো বিশেষ ভূমিকা কিংবা তার আদর্শ প্রচারের তেমন কোন বিশেষ সুযোগ খুঁজে পাননি। তাছাড়া সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্টে 'প্রকৌশল ভেল্যু'র পরিবর্তে 'নিউজ ভেল্যুর' ওপর জোর দেয়া হয়েছে বিশেষভাবে। অর্থাৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংবাদকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে কিংবা তার সময় কমিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের ব্যক্তি কিংবা দলীয় প্রচারমূলক কাজে সময় ও সম্পদ ব্যয় না করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী সেটিকে সহজভাবে নিতে পারেননি বলে জানা গেছে।

সে কারণে প্রধানমন্ত্রী নাকি কমিশনের রিপোর্টটি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কথা উল্লেখ করেন। এ বিষয়টি কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব

www.pathagar.com

আসফউদ্দৌলার মন:পুত হয়নি বলে জানা গেছে। তার মতে, এ রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন যারা তারা সবাই শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সম্প্রচার, প্রশাসন ও গণমাধ্যমের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ চরম পর্যায়ে গেলে বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব আসফউদ্দৌলা বর্তমান সরকারের সাথে সমস্ত সম্পর্কের অবসান ঘটান।

বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসনকে কেন্দ্র করে গঠিত কমিশনের অপরাপর সদস্যরা হলেন– বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাবেক কূটনীতিক কেজি মোস্তফা, বিশিষ্ট শিল্পী কলিম শরাফী, শিক্ষাবিদ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, নাট্যশিল্পী হাসান ইমাম ও আসাদুজ্জামান নূর, ড. আনিসুজ্জামান, রামেন্দু মজুমদার, বিটিভির মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ। উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনেকেরই বর্তমান সরকারের প্রতি গভীর আনুগত্য ও সম্পৃক্ততা রয়েছে। তবুও তাদের প্রণীত চূড়ান্ত রিপোর্টটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এখনও গৃহীত হয়নি এবং তিনি তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এদিকে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বৃহত্তম বিরোধী দল বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া একটি গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন যে, প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণের মতো বর্তমান সরকার রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানেও ব্যাপকভাবে দলীয় লোক নিয়োগ করে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার পাঁয়তারা করছে। যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে বর্তমান সরকারের এ ধরনের অশুভ পদক্ষেপটি ব্যর্থ করা হবে বলে জনাব ভূঁইয়া জানান। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো দু'টি উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যমে বর্তমানে একচেটিয়াভাবে সরকার ও সরকারি দলের প্রচারণা চলছে। এ দু'টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নিজস্ব প্রচারযন্ত্রে পরিণত করেছে, যা জনগণের কাছে কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রেডিও এবং টেলিভিশনে সরকারি দলের মতো বিরোধী দলেরও সমান অধিকার রয়েছে। তার মতে, এ দু'টি প্রতিষ্ঠান কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ সেখানে বিরোধী দলের কোনো সংবাদ প্রচার নেই। নেই দেশের কোনো প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দলীয় ব্যক্তিদের হাতে রেডিও কিংবা টেলিভিশন কোনোটিই নিরপেক্ষ হতে পারে না। সুতরাং সে ব্যক্তিদের উভয় প্রতিষ্ঠান থেকে বাদ না দিলে বেতার এবং টেলিভিশনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসন কোনো মতেই অর্থবহ হতে পারে না এবং দেশের সম্মিলিত বিরোধী দল লোক দেখানো কোনো স্বায়ত্তশাসনকে মেনে নেবে না বলে জনাব ভূঁইয়া সম্প্রতি এক সভায় উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

অনেকের ধারণা, ক্ষমতা ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত ছাড়া বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনে স্বায়ত্তশাসন দেবে না। কারণ, স্বায়ত্তশাসন দিলে এ দু'টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সরকারের একচেটিয়া প্রচার আর সম্ভব হবে না। সে কারণেই কি এ বিলম্ব নয়? তাছাড়া এ মুহূর্তে স্বায়ত্তশাসন দিলে যে সমস্ত দক্ষ টেকনিশিয়ান, শিল্পী ও কলা-কুশলীকে হয় অপসারণ না হয় বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়ে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাদের মাঝে এক আইনী লড়াই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে সরকারের আশঙ্কা রয়েছে। ঘটনা যাই হোক না কেন, দেশের এ দুটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে জঞ্জালমুক্ত করার জন্য আসফউদ্দৌলা কমিশন জোর সুপারিশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে : The first of these measures would be the formation of a National Broadcasting Commission, completely independent of Government, answerring of Government, answerring to the Parliamentary Committee, on Information. Both Bangladesh Betar and Bangladesh Television would be administered by the NBC including the approval of their budget. No financial assistance would be soughth from Government. Bangladesh Television and Bangladesh Betar would function out of their own income." আসফউদ্দৌলা কমিশন রিপোর্টে আরও অভিযোগ করা হয়েছে ঃ "There are severe administrative and financial limitations due to total Government control. Corruption, nepotism and partiality of some officials are involved with production of programmes." এ অবস্থায় দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যে কোনো দেশপ্রেমিক সরকারের দায়িত্ব হবে রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো জাতীয় দু'টি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা। এ কথা বলেছেন দেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকে। নতুবা যুগে যুগে এগুলো শুধু 'সাহেব বিবি গোলামের বাক্স' হয়েই জনগণের ধিক্কার কুড়াবে, তাদের (জনগণের) আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারবে না। প্রশ্ন উঠেছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার কথায় কথায় গণতন্ত্রের দোহাই দেয়, স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দেয় অথচ তারা বাংলাদেশ বেতার ও বিটিভির স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট হাতে পেয়ে তা এখনও কার্যকর বা বাস্তবায়িত করছে না কেন?

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

চতুর্দশ অধ্যায়

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি

রাশেদ খান মেনন: টিআই রিপোর্ট ও থলের বিড়াল

ইউসুফ শরীফ: শীর্ষ পর্যায়ে দুর্নীতিপরায়ণতা: এই কলঙ্ক কার

হারুনর রশীদ: ভয়াবহ দুর্নীতি: ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা

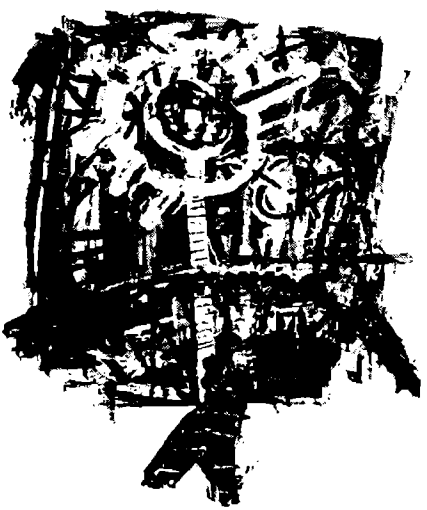

www.pathagar.com

রাশেদ খান মেনন !

টিআই রিপোর্ট ও থলের বিড়াল

ডেটলাইন ঃ ৭ জুলাই ২০০১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় শীর্ষস্থানে রাখায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে। গত ২৭ জুন প্যারিস থেকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০০১ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই তথ্য প্রকাশ পেলে বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে সেটা প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, দেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই রিপোর্ট প্রকাশের পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী পরদিন ক্ষমতাসীন দলের এই প্রতিক্রিয়া আরও বিস্তৃত করে বলেছেন যে, সরকার এই এনজিওটির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করছে। কারণ কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই জরিপ হয়েছে তা রিপোর্টটিতে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়নি। অর্থমন্ত্রী ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এই রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ায় এতই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, তিনি টিআইর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার প্রতিষ্ঠার পেছনে বিরোধী দল বিএনপি এবং গণফোরামের নেতাদের ষড়যন্ত্র ও হাত খুঁজে পেয়েছেন। টিআই বাংলাদেশ চ্যাপ্টার অবশ্য জানিয়েছে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এই 'দুর্নীতির ধারণা সূচক' নির্ণয় এবং তার উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের কোনো হাত ছিল না। টিআইর কোনো স্থানীয় চ্যাপ্টারই এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখে না। তারা এই তথ্য প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা আগে বিষয়টি জানতে পেরেছে এবং প্যারিসে ওই রিপোর্ট প্রকাশের সময়ে এই দেশে তা প্রচারের জন্য সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছে মাত্র।

অর্থমন্ত্রীর মতো প্রধানমন্ত্রীও টিআইর এই রিপোর্ট সম্পর্কে একই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। মাওয়াতে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী টিআইর নাম উল্লেখ না করেও বলেন, কিছুদিন আগে কথা নেই বার্তা নেই একটি সংগঠন হঠাৎ করে বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করল। তিনি প্রশ্ন রাখেন, তাদের এই রিপোর্টে দুর্নীতির পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতিটি কী? প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, এই সংগঠনের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কারা? উত্তরও তিনিই দিয়েছেন, তারা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা কোনো দলের সমর্থক কিংবা অতীতের কোনো মিলিটারি ডিক্টেটরের অ্যাডভাইজার। তিনি বলেন, দেশে যখন আজান দিয়ে দুর্নীতি হয়েছিল তখন তারা কোথায় ছিলেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের একটি বিশেষ গুণ লক্ষণীয়। আর সে গুণটা হচ্ছে কোনো বিষয় যতক্ষণ তাদের পক্ষে থাকে ততক্ষণ ভালো। সেটা যেই মুহূর্তে সামান্যতম তাদের বিরুদ্ধে যায় তখনই তারা দারুণভাবে ক্ষেপে যান। দুর্নীতির এই বিষয়টাও তাই।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির এই ধারণা সূচক প্রকাশের ঘটনা নতুন নয়। ১৯৯৫ সাল থেকেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির এই ধারণা সূচক প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং ১৯৯৬ সালে সেই সূচক অনুসারে বিশ্বের ৫১টি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল চার নম্বরে। আর সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া অথবা বাংলাদেশ সরকার ওই রিপোর্ট সম্পর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। টিআই কর্তৃক ওই সূচকের সময়কাল যেহেতু বিএনপি শাসনামল ছিল, সম্ভবত সেই কারণে তারা কোনো কথা বলেননি। কিন্তু এখন এটা গায়ের ওপর এসে পড়েছে কেবল নয়, এই রিপোর্টে বাংলাদেশে দুর্নীতিতে বর্তমান সরকারের সাফল্যও এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, গোটা জাতিরই লজ্জায় মুখ লুকোবার অবস্থা। বর্তমান সরকার বিএনপি আমলের চার নম্বর থেকে বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে এক নম্বরে উন্নীত করেছে। আগে ওই চার নম্বর স্থান ছিল ৫১টি দেশের মধ্যে। এখন ওই এক নম্বর স্থান হয়েছে ৯১টি দেশের মধ্যে। বিএনপির ওপর এই সাফল্যে তাদের আনন্দ করা উচিত ছিল। কিন্তু থলের কালো বিড়ালটি বেরিয়ে যাওয়ায় তাদের এই দিশেহারা অবস্থা।

আসলে বাংলাদেশ সরকার কি এই দেশটির দুর্নীতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বক্তব্য কী, তা জানত না? আমি ২০০০-এর ১৪ জুলাই 'দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন পয়োজন' শিরোনামে এই কলামেই লিখেছিলাম ওই বছরের বাজেট প্রণয়নের আগে। প্যারিসে দাতা সংস্থা ও দাতা দেশসমূহের জন্য আয়োজিত 'বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম'-এর বৈঠক বিশ্বব্যাংকের প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক কান্ট্রি রিস্ক গাইড অনুসারে বিশ্বের ষষ্ঠতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ২০০০ সালের মার্চে বিশ্বব্যাংকের একদল প্যানেলিস্ট রচিত ওই রিপোর্টে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাংলাদেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের চতুর্থ স্থানে রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। অর্থমন্ত্রী স্বয়ং ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বব্যাংকের প্রস্তুতকৃত এ রিপোর্টে স্বাভাবিকভাবে বিব্রত অর্থমন্ত্রী ওই রিপোর্টটি প্রচার না করার জন্য বিশ্বব্যাংককে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। তার সেই অনুরোধ রক্ষা করতে বিশ্বব্যাংক ওই রিপোর্ট প্রচার করেনি। কিন্তু তার কিছুদিন পর জাতিসংঘের অপর প্রতিষ্ঠান ইউএনডিপি ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ২০০০ সালের বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর রিপোর্ট প্রকাশ করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংকের ওই সমীক্ষার কথা ফাঁস

www.pathagar.com

করে দেয় এবং তার থেকে সবিশেষ উদ্ধৃতিই প্রদান করে। ইউএনডিপি কর্মকর্তারা ওই রিপোর্টে দুর্নীতিকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান অন্তরায় বলে উল্লেখ করেন। ইউএনডিপির ওই রিপোর্টে বিশ্বব্যাংকের ওই সমীক্ষা উদ্ধৃত করে বলা হয়, দুর্নীতি না থাকলে বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার প্রতিবছর কম করে হলেও ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেত। আর পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়াত ৫ শতাংশেরও বেশি। এর সঙ্গে প্রবৃদ্ধির স্বাভাবিক হার যুক্ত করলে দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করা অসম্ভব ছিল না। (উল্লেখ্য, আওয়ামী শাসনের পাঁচ বছরের জাতীয় প্রবৃদ্ধির গড় হার যেখানে ৫.৫ বলে দাবি করা হচ্ছে, সেখানে দুর্নীতি না থাকলে এই হারের যোগফল দাঁড়াত ১০.৫)।

বিশ্বব্যাংকের ওই রিপোর্টের খসড়ায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর তিন দশকে এই দুর্নীতি জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তার প্রাক্কলিত পরিমাণ ওই জাতীয় প্রবৃদ্ধির ২.১ থেকে ২.৯ শতাংশ পরিমাণ। বিশ্বব্যাংকের ওই রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয় যে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারলে তার উন্নয়নের সম্ভাব্য গতি সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত বলে পরিচিত কানাডা, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, নেদারল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের সমান হতো।

ব্যাপারটা এ পর্যন্ত হলেও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ওই সকল রিপোর্টে যে কথাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, তা হলো দারিদ্র্য বিমোচনের যে বড় বড় কথা বাংলাদেশসহ এসব দেশের ক্ষেত্রে বলা হয় সেই দরিদ্র মানুষরাই এই দুর্নীতির চরম শিকার। ইউএনডিপির ২০০০ সালের 'বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন রিপোর্টে' দুর্নীতিকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান অন্তরায় বলে বলা হয়েছে। আর বিশ্বব্যাংকের ওই রিপোর্ট বলছে, জাতির জন্য এই দুর্নীতির মূল্য চরম নিঃসন্দেহে, তবে দরিদ্রদের জন্য চরমতম। রিপোর্টে এতদ্বিষয়ে গবেষণার উল্লেখ করে বলা হয়, কেবল দুর্নীতি দূর করা গেলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ২০২০ সাল নাগাদ ১১ শতাংশে নেমে আসত।

এই দুর্নীতি গরিব মানুষকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে সে সম্পর্কে রিপোর্ট বলছে, 'More immediately, the poor may go without power and water simply because ohters who afford illicit payments for utility look-ups go to the head of the uqeue. They receive lower quality (and quantity) of health and education services when they cannot afford to bribe nurses or doctors, teachers or school adminsitration. They even suffer because roads and embank-

www.pathagar.com

ment works are allowed to deteriorate while govt. funds go into new investment projects that one is riper for larger kickbacks. As for the credit from banks loans flow more freely to those who can remunerate loan officers than to small borrowers with smaller means available for bribe giving.'

(মর্মার্থ ঃ অচিরেই গরিবরা হয়তো পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সেবা থেকে বঞ্চিত হবে এবং এগুলো পাওয়ার ভাগ্য হবে তাদেরই যারা সবার আগে গিয়ে এ জন্য ঘুষ দিতে পারবে। ডাক্তার বা নার্স, শিক্ষক বা স্কুল প্রশাসনকে ঘুষ দিতে পারে না বলে গরিবরা এসব সেবাও পায় খুবই কম, আর পেলেও তা হয় নিম্নমানের। রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি মেরামতের জন্য দেয়া সরকারি অর্থ অন্যান্য নগদ লাভের কাজে খাটানো হয় বলে রাস্তা-বাঁধ জীর্ণতর হতে থাকে, গরিবদের দুর্দশাও বাড়তে থাকে। ব্যাংক থেকে গরিবদের জন্য ঋণ দেয়া হয় বটে, তবে যারা লোন অফিসারদের ভালোভাবে উপরি দিতে পারে সে ঋণের টাকা যায় তাদেরই ঘরে; ঘুষ দেয়ার টাকা নেই বলে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতারা ঋণ পায় খুব কমই।)

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টের সঙ্গে ২০০০ সালের জাতীয় সংসদের বাজেট বিতর্কের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে কথা বলেছিলেন তা একটু মিলিয়ে দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের ওই ভাষণে বলেছিলেন, দেশে এক চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থার রাজত্ব চলছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় দুর্নীতির সঙ্গে শিক্ষকরা সম্পৃক্ত, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্নীতির সঙ্গে ডাক্তাররা দায়ী। আর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ঘুষ না হলে প্রধানমন্ত্রীর চাকরির সুপারিশও কার্যকর হয় না। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না।

প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিকভাবে বেশ চালাক বলেই পরিচিত। সুতরাং বিশ্বব্যাংকের চেপে রাখা রিপোর্টটির ভাষ্য নিজের কথা দিয়ে উগড়ে দিয়েছিলেন জাতীয় সংসদে। উদ্দেশ্য অবশ্য একটাই ছিল, বিরোধী দলকে এই দুর্নীতির জন্য দায়ী করা। তাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, ২১ বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনই এই দুর্নীতির জন্য দায়ী। এখনো তিনি টিআই রিপোর্ট সম্পর্কে অভিযোগ তুলতে গিয়ে সেই কথাই বলতে চান। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর সামনে দেয়া বিশ্বব্যাংকের ওই রিপোর্ট, ইউএনডিপির সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য, এমনকি জাতীয় সংসদে দেয়া তার নিজের ভাষণ এখন মিথ্যা হয়ে গেল কোনোভাবে? আওয়ামী শাসনের দুর্নীতির থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে বলে কি?

www.pathagar.com

ইউসুফ শরীফ

শীর্ষ পর্যায়ে দুর্নীতি পরায়ণতা

ডেটলাইন ঃ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০০

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, নেতারা দুর্নীতিপরায়ণ। এই তথ্য বিভীষিকাময় বাস্তবতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। ক্ষমতাসীন নেতাদের এবং সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার যে দুর্নীতির জন্ম দেয়, তাতে লাভবান হন নেতারা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হন সাধারণ মানুষ। দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা উঁচু মহল থেকে নিচে মাঠ পর্যায়ে নেমে আসে। মূলত উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিস্বার্থজাত তৎপরতা ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে লালিত দুর্নীতি জাতির সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে, জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে করছে পদদলিত। এই বাস্তবতার কথা আমরা বিভিন্ন সময়ে বলেছি। আমরা বলেছি, প্রধান ব্যক্তিটি যদি সৎ, নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল হন, তাহলে তার অধস্তনরা দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারেন না। জাতি হিসেবে আমাদের মূল সমস্যা দুর্নীতি এবং দুর্নীতির কারণ এখানেই নিহিত। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উঁচু মহলের দুর্নীতির বিষয়টি পর্যালোচিত এবং তার মূল উৎপাটনের উদ্যোগ গ্রহণ আজ অপরিহার্য।

এসব কথায় অনেকে নাখোশ হন, ক্ষুব্ধও হন। কিন্তু, কাউকে আহত করার জন্য এসব বলা হয় না। ব্যক্তির চেয়ে যেমন দল বড়; তেমনি দলের চেয়ে জাতি বড়। তাই জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার কথা তুলে ধরতে গিয়ে কিংবা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কথা বলতে গিয়েই দুর্নীতির লালন ক্ষেত্রের কথা, দুর্নীতির শিকড়ের কথাটি বলতে হয়। যে দুর্নীতি দেশ ও জাতির সর্বনাশ করছে, তার শিকড় যে শীর্ষ পর্যায়ে প্রোথিত, এটা দেশের সাধারণ মানুষেরও অজানা নয়। কারণ, শীর্ষ পর্যায় বা নেতৃত্ব পর্যায়ের অনিয়ম দুর্নীতির দরুন তারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন। জনগণের অভিজ্ঞতার কথাটিই প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এটাই অনেক সময় ক্ষমতাসীনদের ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তারা সংবাপদত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পাঁয়তারা করেন। সাম্প্রতিককালে সরকারের এরকম একটি উদ্যোগ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে এবং এ উদ্যোগের পক্ষে কথা বলার বিশেষ লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ, গণতান্ত্রিক দেশে সাংবিধানিকভাবে বাক-স্বাধীনতা, জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে স্বীকৃত সেখানে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের কোনো অপচেষ্টা সমর্থিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

সম্প্রতি ইউএনডিপির পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামবাদভিত্তিক মাহবুবুল হক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার 'দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন, ১৯৯৯' শীর্ষক যে সমীক্ষা

www.pathagar.com

রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়, 'দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জনগণের প্রায় অর্ধাংশের আস্থা থাকলেও ৭৬ শতাংশ মানুষ মনে করে, তাদের নেতারা দুর্নীতিপরায়ণ।' উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৫২৪ জন নাগরিকের ওপর জরিপ চালিয়ে এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। জরিপের উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশী সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রতি তাদের অসন্তোষের কথা প্রকাশ করেছেন। ৭৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তারা উৎকোচ গ্রহণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করছেন, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছে। ৮২ শতাংশ মনে করেন, সরকারের সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ বিভাগ হচ্ছে পুলিশ। ইউএনডিপি'র রিপোর্টে দক্ষ শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৭তম স্থানে। রিপোর্টে-এ-ও বলা হয়েছে যে, দক্ষ শাসন ব্যবস্থার এই সংকট এখনই নিরসনের উদ্যোগ না নেয়া হলে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের দেশগুলোর গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নও স্থবির হয়ে যেতে পারে। রিপোর্টে এ-ও বলা হয়, দুর্নীতি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেই ব্যাহত করছে না, পাশাপাশি এটি বিদেশী ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ হ্রাস করছে, সম্পদপ্রাপ্তি হ্রাস ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি করছে। এটি রাষ্ট্রের বৈধতার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং মানব উন্নয়নকে ধ্বংস করছে।

মানব উন্নয়ন বিষয়ক এই সমীক্ষা রিপোর্টে বাংলাদেশের জ্বলন্ত বাস্তবতা বহুলাংশেই ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে, সাইলেন্ট মেজোরিটি বলে অভিহিত জনসংখ্যার বৃহদাংশ যে সরকারি কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট এবং তারা মনে করে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তো বটেই এবং এমনকি তাদের নেতারাও দুর্নীতিপরায়ণ, এই তথ্য দেশের গুরুতর পরিস্থিতিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। সরকার ইউএনডিপির সমীক্ষা রিপোর্টের এই গুরুতর বিষয়টিকে কিভাবে গ্রহণ করবেন? এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা, শীর্ষ মহলে অর্থাৎ নেতৃত্ব পর্যায়ে দুর্নীতিপরায়ণতা বা দুর্নীতিপ্রবণতা দূর করতে না পারলে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে শিকড় গেড়ে বসা দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়। আলোচ্য রিপোর্টে এই কারণেই শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতিকে 'গ্রান্ড করাপশন' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রথমেই এই পর্যায়ে দুর্নীতি মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে দুর্নীতির মাত্রা যে বেড়েছে, এটাও জরিপে প্রকাশিত হয়েছে।

কাজেই, ইউএনডিপির এই সমীক্ষা রিপোর্টে দেশের অধিকাংশ মানুষের মতামত নিয়ে নেতারা দুর্নীতিপরায়ণ বলে যে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারকে হয় তা মেনে নিয়ে নেতৃত্বের পর্যায় থেকে দুর্নীতিপরায়ণতা নিরসনের কার্যকর উদ্যোগ নিতে

www.pathagar.com

হবে; নয়তো এই সমীক্ষা রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কি করবেন তা সরকারের এখতিয়ারের বিষয়। তবে, এদেশে শীর্ষ মহলে দুর্নীতি যে আজকের দিনের অদক্ষ শাসন ব্যবস্থার মূলে সক্রিয় রয়েছে, এটা এখন ওপেন সিক্রেট বিষয়। কাজেই, অদক্ষ শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে ইউএনডিপির রিপোর্টের মন্তব্য এড়িয়ে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ঢাকায় এই রিপোর্টটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত অর্থমন্ত্রী এই মন্ত্রব্য এড়িয়ে যান বলে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে। এ-ও বলা হয় যে, এই প্রসঙ্গটি উড়িয়ে দিয়ে এর পরিবর্তে মন্ত্রী বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের চিত্র তুলে ধরেন।

অদক্ষ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিংবা নেতৃত্ব পর্যায়ে দুর্নীতিপরায়ণতা সম্পর্কে উত্থাপিত গুরুতর মন্তব্য এড়িয়ে যাওয়া কোনো অজুহাতেই সমীচীন হওয়ার কথা নয়। দ্বিতীয়ত অর্থমন্ত্রীর আরেকটি মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'প্রশাসনের বাইরেও দুর্নীতি চলছে এবং তা রোধের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।' বলার অপেক্ষা রাখে না প্রশাসনের বাইরে দুর্নীতি সম্পর্কিত এ মন্তব্য একটি সংযোজনমূলক মন্তব্য। কিন্তু প্রশাসনে এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে দুর্নীতি বিষয়ে উল্লিখিত রিপোর্টে যা বলা হয়েছে সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলেছেন কিনা কিংবা সরকার সে ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা এ বিষয়ে মন্ত্রী কোনো বক্তব্য রেখেছেন কিনা তা অবশ্য খবরে বলা হয়নি। তবে, প্রশাসনের বাইরের দুর্নীতি রোধের জন্য বর্তমান সরকার যেহেতু বদ্ধপরিকর, সেহেতু প্রশাসনের ভেতরের এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে দুর্নীতি রোধেও বদ্ধপরিকর হওয়ারই কথা। কিন্তু অর্থমন্ত্রী শেষোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেছেন বলে প্রকাশিত খবরে জানা যায়নি। কাজেই অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের পরও এব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, সিদ্ধান্ত– কোনোটাই বিশেষ স্পষ্ট হয়নি। বরং তার বক্তব্যে প্রশাসনের ভেতর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে প্রশাসনের বাইরের দুর্নীতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ প্রবণতাই অনেকাংশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ একটি উত্থাপিত বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার প্রবণতার মধ্যে মূল বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া বা লুকানো, ছাপানোর প্রয়াসও লক্ষণীয় হয়ে ওঠাই স্বভাবিক। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এই প্রবণতা জনসমর্থন লাভ করতে পারে না। কাজেই আমরা মনে করি, নেতৃত্ব পর্যায়ে দুর্নীতিপরায়ণতার আলোচ্য বক্তব্যের ব্যাপারে সরকারকে সরাসরি স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন অবস্থান নিতে হবে। সত্য মেনে নেয়ার মধ্যে যেমন কোনো গ্লানি নেই, তেমনি মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্যে কোনো অসম্মান নেই। আসল কথা হল, সৎ সাহসের সাথে বাস্তবতার মোকাবিলা করা। এই মোকাবিলাই সরকারের কাছে জনগণের কাম্য।

✳ ✳ ✳ ✳

www.pathagar.com

এই কলঙ্ক কার অবদান

ডেটলাইন ঃ

পাঁচ বছরের আওয়ামী শাসন দেশের মানুষকে কি দিয়েছে? আওয়ামী শাসনের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেখা গেল, দেশটা দুর্নীতিতে একেবারে নাম্বার ওয়ান-এ এসে পৌঁছেছে। এরপর আর নামার সুযোগ নেই, থাকলে, নামতো; দুর্নীতির প্রবণতাটা এ রকমই। বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্ত ৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান একদম শীর্ষে। এই জরিপ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের। দুর্নীতিবিরোধী মর্যাদাশীল এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর দুর্নীতির সূচক প্রকাশ করে আসছে। গত ৬টি দুর্নীতির সূচক রিপোর্ট নিয়ে বড় ধরনের কোনো আপত্তি কোনো দেশ জানাতে পারেনি এবং এ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যানেরও কোনো অবকাশ কেউ পায়নি। বরং, যে নাইজেরিয়া গত কয়েক বছর ধরে ট্রান্সপারেন্সির প্রকাশিত দুর্নীতির সূচকে এক নাম্বারে ছিল, সেখানকার নতুন শাসকরাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ ছাড়া, আরো বেশ কিছু দেশ এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি নিরসনে সচেতন উদ্যোগ নিয়েছে। আর তার ফল তারা পাচ্ছে। নাইজেরিয়া দুর্নীতির শীর্ষ অবস্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। গত ক'বছর ধরে এই অঞ্চলে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তান এবার সপ্তম স্থানে এবং ভারত দশম স্থানে উঠে এসেছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে, ট্রান্সপারেন্সির নিরপেক্ষ রিপোর্টকে বিবেচনায় এনে দুর্নীতি নিরসনে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের দরুন। জার্মানভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে মর্যাদা ও গুরুত্ব পেয়েছে ও পাচ্ছে, তা তার নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ ও বিবেচনার জন্য। এই সংস্থার লক্ষ্য মানবজাতি যে দুর্নীতির পদতলে পিষ্ট হচ্ছে, তা থেকে উদ্ধারের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি। বিশেষ কোনো দেশের হয়ে বা বিশেষ কোনো অঞ্চলের হয়েও কাজ করে না এই সংস্থা। আর এজন্যই সংশ্লিষ্ট দেশগুলো ট্রান্সপারেন্সির রিপোর্টকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আওয়ামী সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ট্রান্সপারেন্সির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রত্যাখ্যানের অধিকার সকলেরই আছে, সরকারের থাকবে না কেন! দুর্নীতি দমন ব্যুরোর একজন পদস্থ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে গত শুক্রবার প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ দুর্নীতিতে ঠিক এক নম্বর হয়তো না হতে পারে, তবে তার অবস্থান যে শীর্ষস্থানীয় তাতে আর সন্দেহ কী! প্রকৃতপক্ষে, এ মন্তব্যের সাথে দ্বিমত করার লোক বোধ হয় দেশে কমই আছেন। কেননা, ট্রান্সপারেন্সির রিপোর্টে এদেশে দুর্নীতির সূত্র-উৎস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার সাথে দেশবাসীর অভিজ্ঞতার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। ঐ রিপোর্টে স্পষ্টতই নির্দেশ করা হয়েছে, এই দুর্নীতি সরকারি

www.pathagar.com

প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় ঘটেছে, যার অনুঘটকের ভূমিকায় রয়েছেন রাজনীতিক ও আমলারা। এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত প্রকাশের কোনই অবকাশই নেই। যে রাজনীতিকদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে দুর্নীতি নামক বৃক্ষটি ডালপালা বিস্তার করে এ দেশটির সকল সম্ভাবনাকে গ্রাস করেছে, সেই রাজনীতিকরা অতি অবশ্যই ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা, যে প্রশাসনের অনিয়ম, শৈথিল্য ছাড়া দুর্নীতির জন্ম হতে পারে না, সেই প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের দ্বারাই। কাজেই, চূড়ান্ত বিবেচনায় ক্ষমতাসীন রাজনীতিক ও শীর্ষ আমলারাই দুর্নীতির অনুঘটক ও ছত্রচ্ছায়াদাতা। এদেশের মানুষ গত ক'বছরের এই বাস্তবতা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হয়, যে বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে, সেই ১৯৯৬ সালের ট্রান্সপারেন্সির রিপোর্টে বাংলাদেশ ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ স্থানে। অথচ সাবেক বিএনপি সরকার দেশটিকে দুর্নীতির ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানে রেখে যায়। আর আওয়ামী সরকার তাকে নামিয়ে আনে একেবারে এক নম্বরে অর্থাৎ দুর্নীতিতে বিশ্বসেরা দেশে পরিণত করে। কাজেই, টিআই-এর রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান তো করতেই হয়। যদি এই রিপোর্টে প্রথমত: বাংলাদেশকে বিএনপি আমলের চতুর্থ অবস্থান থেকে উপরে অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম অবস্থানে দেখা যেতো এবং দুর্নীতিতে বিশ্বসেরা হওয়ার পেছনে রাজনীতিকদের অবদান সবার উপরে না থাকতো; তাহলে, আওয়ামী সরকার এই রিপোর্টটিকেই তার পাঁচ বছরের সাফল্যের আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট হিসেবে নিশ্চিত ব্যবহার করতেন। সরকার এই মুহূর্তে ক্ষমতার শেষ প্রান্তে পৌঁছেতো, তাই তার নানা সাফল্যই (!) পঞ্চমুখে বয়ান করছেন। তাতে একটি বড় সাফল্য হতে পারতো ট্রান্সপারেন্সির রিপোর্ট। কেননা, আওয়ামী সরকার ক্ষমতা গ্রহণকালে অঙ্গিকার করেছিলেন দুর্নীতি নিরসনের, যেমন অঙ্গিকার করেছিলেন সন্ত্রাস নির্মূলের। সাফল্যের সূচক হলে গ্রহণ করা হবে, ব্যর্থতার সূচক বলে গ্রহণ করা হবে না– এটা কোনো কল্যাণকামী দলীয় সরকারের প্রবণতা হওয়া উচিত নয় এবং হতে পারে না। যে সরকার দুর্নীতি নির্মূলের অঙ্গিকার করে ক্ষমতাসীন হয়েছিল, সেই সরকারের মেয়াদকাল শেষে দেখা গেল দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় চতুর্থ স্থান থেকে বাংলাদেশ একেবারে এক নম্বরে অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর শীর্ষে গিয়ে ঠেকেছে। সরকার এই চরম ব্যর্থতার মূল্যায়ন কিভাবে করবেন জানি না। তবে, দেশবাসীর জন্য আওয়ামী শাসনের এটাই হয়তো এক নম্বর তোহফা হিসেবে বিবেচিত হবে। মর্যাদাশীল আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের সেরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের পরিচিতির বিষয়টি জনগণকে চরম লজ্জা ও বেদনায় নিক্ষেপ করেছে। বাংলাদেশী জনগণের কপালে এই যে কলংক লেপন হল, তা দূর করবে কে এবং কিভাবে? এই প্রশ্নের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন আজ দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ।

দুর্নীতি নির্মূলে ব্যর্থতা, নাকি দুর্নীতি বৃদ্ধিতে সাফল্য– কি হিসেবে গণ্য হবে তা জনগণের নির্ধারণের বিষয়, আগামীতে তারাই তা করবেন এবং করার সুযোগও সমুপস্থিত– সামনে নির্বাচন। কাজেই, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই।

www.pathagar.com

হারুনুর রশীদ

ভয়াবহ দুর্নীতি : ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা

ডেটলাইন ঃ ১৫ অক্টোবর ২০০০

ভাবা যায়, দুর্নীতির কারণে ২০০০ সালের প্রথম ছয় মাসের ক্ষতির আংশিক পরিমাণই হচ্ছে ১১ হাজার ৫শ' ৩৪ কোটি টাকা? হাজার হাজার ঘটনার মধ্যে মাত্র ২১১টি ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে উপরোক্ত পরিমাণ টাকা। বাদবাকি ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ যদি উপরোক্ত পরিমাণের সমানও হয় তাহলে এই ৬ মাসেই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩ হাজার ৬৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ বছরে দুর্নীতিজনিত ক্ষতির পরিমাণ ৪৬ হাজার ১শ' ৩৬ কোটি টাকা। এই হিসাবকে গড় ধরা হলে বর্তমান সরকারের মেয়াদের পাঁচ বছরে দেশের মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬শ' ৮০ কোটি টাকা। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই হচ্ছে সত্যি, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশে দুর্নীতি বাবদই ক্ষতি যদি এই পরিমাণ হয়, তাহলে সেই দেশ ও জনগণের বর্তমানইবা কি আর ভবিষ্যতইবা কি, তা সহজেই অনুমেয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আমাদের জাঁদরেল অর্থমন্ত্রী হয়তোবা এসব তথ্যকে পাকিস্তানপন্থীদের ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু এসব তথ্য যিনি এবং যাঁরা দিয়েছেন, অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁদের খ্যাতি আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের চেয়ে মোটেই কম নয় এবং তাদের পাকিস্তানপন্থী বলে সন্দেহ করারও কোনো সুযোগ নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-এর প্রফেসর, দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য প্রফেসর মোজাফফার আহমেদ কয়েকদিন আগে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়াজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত ক্ষতির তথ্য প্রদান করে বলেন যে, ৯টি পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্নীতির রিপোর্টের সমন্বয় করেই তারা একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেন এবং তা থেকেই এই উপাত্ত বেরিয়ে আসে।

এই প্রসঙ্গে প্রফেসর মোজাফফার আহমদ আরো যেসব তথ্য প্রকাশ করেন, তা মোটামুটি নিম্নরূপ : ১. মন্ত্রী এমপি, সচিবসহ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ও কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ২. দুর্নীতির শীর্ষে রয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্থানীয় সরকার, তৃতীয় স্থানে শিক্ষা সেক্টর, পরবর্তীতে রয়েছে যথাক্রমে বেসরকারি সেবামূলক সংস্থা, বন ও পরিবেশ সেক্টর, কর সেক্টর, অর্থ বিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ, পানি সম্পদ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ভূমি প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ, নৌ-পরিবহন বিভাগ

www.pathagar.com

এবং সংসদ বিষয়ক সচিবালয়। ৩. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির কারণে বিদেশী বিনিয়োগ দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ৪. দুর্নীতির ব্যাপকতা রোধ করা গেলে জাতীয় আয় ২% থেকে ৩% বৃদ্ধি পেতো এবং মানুষের মাথাপিছু আয় অন্ততঃ দ্বিগুণ হতো। ৫. গত ৪ বছরে কোনো সেক্টরেই দুর্নীতি কমেনি, প্রতি সেক্টরেই দুর্নীতির দৌরাত্ম্য বেড়েছে। ৬. সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত জেলা হচ্ছে ঢাকা এবং সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা। ৭. দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্তের সংখ্যা মোট দুর্নীতিবাজদের দেড় শতাংশের বেশী নয়। ৮. উত্তরা থানা ও রমনা থানা হচ্ছে দুর্নীতির মডেলস্বরূপ। ৯. এনজিওসমূহ দুর্নীতির ঘুণে জর্জরিত। ১০. শিক্ষা, স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য সেক্টরেই বছরের প্রথম ৬ মাসে দুর্নীতিজনিত কারণে ক্ষতির আংশিক পরিমাণ যথাক্রমে ২৩০৫.৪৮ কোটি টাকা, ২১১১.২৩ কোটি টাকা এবং ২০৫১.৪২ কোটি টাকা।

পলিসিগত ত্রুটি ও অযোগ্যতার কারণে ক্ষতির পরিমাণ যদি এর সঙ্গে যোগ করা হয়, তাহলে অঙ্কটা কি দাঁড়াবে, তা ভাবতেই শিউরে উঠতে হয়।

॥ দুই ॥

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-এর 'দারিদ্র্য প্রতিবেদন ২০০০'-এর প্রকাশ উপলক্ষে ঢাকার শেরে বাংলানগরস্থ আইডিবি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের বাংলাদেশস্থ আবাসিক সমন্বয়কারী ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আবাসিক প্রতিনিধি ওয়ার্নার কিনে প্রকাশ করেছেন নিম্নলিখিত তথ্য : ১. বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত অনুযায়ী দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে যে সম্পদ অপচয় ও ক্ষতি হচ্ছে তার পরিমাণ দেশের মোট জাতীয় আয়ের দ্বিগুণ (অর্থাৎ এই ক্ষতি না হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেতো অন্তত ২০০%)। ২. বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষই এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এক-চতুর্থাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমারও নিচে। ৩. নানা দুর্বিপাকে বিপুলসংখ্যক দরিদ্র মানুষই হত-দরিদ্রে পরিণত হচ্ছে এবং ৪. এই দারিদ্র্যের মৌল কারণ হচ্ছে কার্যকর শাসনের অভাব, জাতীয় দারিদ্র্যবিরোধী কার্যক্রমের অনুপস্থিতি ও দারিদ্র্য বিমোচনের 'মিসিং লিংক' খুঁজে না পাওয়া। লক্ষণীয়, বিশ্বব্যাংকের/ইউএনডিপির সমীক্ষা অনুযায়ীও বাংলাদেশে দুর্নীতিজনিত ক্ষতির পরিমাণ জাতীয় আয়ের দ্বিগুণ। একটা দেশ ও জাতির জন্য এর চেয়ে ভয়াবহ চিত্র কি আর কিছুই হতে পারে?

॥ তিন ॥

কয়েকদিন আগে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক প্রতিষ্ঠান আংকটাড-এর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী একযোগে প্রকাশিত 'বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন-২০০০'-এ বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব তথ্য উল্লেখ করা হয় তার কয়েকটি নিম্নরূপ : ১. ১৯৯৮ সালের তুলনায় ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ অর্ধেকে নেমে এসেছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ ছিল ৩০ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার কিন্তু

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালে তা নেমে এসে দাঁড়ায় ১৫ কোটি মার্কিন ডলারে। ২. অথচ এই ১৯৯৯ সালেই ভারতে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) ছিল ২২০ কোটি মার্কিন ডলার এবং পাকিস্তানে তা ছিল ৫০ কোটি ডলার এবং ৩. আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলটি বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হলেও বাংলাদেশ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ইয়রগেন লিজনার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ দেবপ্রিয় বলেন, 'রাস্তায় সারি সারি গাড়ি ও রিকশা থমকে থাকার দরুন এলিফেন্ট রোড থেকে হাইকোর্টের সামনে পর্যন্ত তিন কিলোমিটারেরও কম পথ অতিক্রম করতে আমার সময় লেগেছে ৫২ মিনিট। ইউনাইটেড নেশনস-এর এই কনফারেন্সও শুরু করতে হয়েছে নির্ধারিত সময়ের ৪০ মিনিট পর। যে দেশের রাজধানী শহরের এই অবস্থা, সে দেশে বিনিয়োগ হবে কিভাবে?" বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের হিসাব উল্লেখ করে, তিনি এটাকে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন, "শুধু ঘোষণা দিলেই বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয় না।"

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, "ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এর প্রধান তিনটি কারণ সুশাসন, অবকাঠামো ও অনুকূল পরিবেশের অনুপস্থিতি।"

ইয়রগেন লিজনার বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের একটি উদ্ধৃতি প্রদান করেন। কফি আনান বলেন, "বিশ্বায়নের ট্রেন সবদেশেই যাবে। তবে সে ট্রেন স্টেশনে থামাতে হলে তার প্ল্যাটফরম আরো উঁচু করতে হবে।"

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের এই প্ল্যাটফরম শুধু নিচুই নয়, বলতে গেলে খাদ বরাবর।

॥ চার ॥

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা খাতের ব্যবস্থাপক রবার্তো জাগা এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সরকারের ব্যয়ের গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন যে, বাজেটে এমন কতগুলো উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হয়েছে, যেগুলো অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। জাগা আরো বলেন যে, বাংলাদেশের জন্য রাজস্ব ঘাটতি প্রধান সমস্যা নয়, প্রধান সমস্যা হলো সরকারের ব্যয়ের গুণগতমান। এতে এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি যতোটা রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে পশ্চাদমুখিতা। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ আইডিএ-এর রেয়াতী ঋণ যে পরিমাণ পাওয়ার কথা,

www.pathagar.com

সংস্কার কর্মসূচির ধীর অগ্রগতির কারণে, বাস্তবে পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম। সাহায্য বাড়ানো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভরশীল।

একই অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রেডারিক টি টেম্পল বলেন যে, বিশ্বব্যাংকের আগামী কান্ট্রি এসিসটেন্স স্ট্র্যাটেজিতে দারিদ্র্য বিমোচন ও সুশাসনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও দুর্নীতি দূরীকরণকেও তিনি পর্যাপ্ত সাহায্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত বলে উল্লেখ করেন।

॥ পাঁচ ॥

ক'দিন আগে 'একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি' বিষয়ের ওপর তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ও সাবেক তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টা প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, আব্দুল গফুর প্রমুখ দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদবৃন্দ। তাঁরা বলেন, রাজনীতি এখন এক দ্রুত বিকাশমান ব্যবসা এবং এটি অর্থনীতির কালো দিকের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন ধারাকে জোরদার করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার সমালোচনা করে প্রফেসর রেহমান সোবহান বলেন, ভঙ্গুর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কারণেই উন্নয়নের অঙ্গিকার পূরণে সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি। রাজনীতিতে টাকার দৌরাত্ম্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রাজনীতি এখন ব্যবসারই হাতিয়ার এবং ব্যবসাই রাজনীতিতে সাফল্যের চাবিকাঠি। দেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের ৭৫%-ই এখন ব্যবসাকেই তাঁদের প্রাথমিক পেশা হিসেবে দেখেন (রাজনীতি বা গণস্বার্থকে নয়)। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রকে বিশেষ মূল্য দেয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশে গণতন্ত্র হচ্ছে ধনী মানুষের খেলা।"

এক বছরেই যদি বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ৩০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে ১৫ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে আসে, তাহলে গত ৪ বছরে বাংলাদেশে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কতটা কমেছে? বর্তমান সরকারের গোটা আমলে তা কতটা কমবে? ভাবা যায় কি?

বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের এই ধস এবং দুর্নীতিজনিত কারণে বছরে অন্তত ৪৬ হাজার ১শ' ৩৬ কোটি টাকা ক্ষতিই (যা জাতীয় আয়ের প্রায় ৪ গুণ) কি প্রমাণ করে না বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির স্বরূপ?

বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, আঙ্কটাড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পাকিস্তানপন্থী বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বলে চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ নেই। ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, প্রফেসর রেহমান সোবহান প্রমুখকেও বিএনপিপন্থী, পাকিস্তানপন্থী বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বলা অসম্ভব। এঁদের বক্তব্য থেকে বর্তমান বাংলাদেশের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত পরিস্থিতি ও তার কারণ সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে। তাঁদের প্রতিপাদ্য থেকে নিম্নলিখিত বিষয় সুস্পষ্ট :

১. বাংলাদেশে বিনিয়োগ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে না। ফলে শিল্পায়ন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

২. জাতীয় প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন বা আশানুরূপ হচ্ছে না।

৩. দারিদ্র্য বিমোচন পরিস্থিতিও নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক।

৪. দুর্নীতিজনিত কারণে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে জাতীয় আয়ের দ্বিগুণ।

এর কারণও তাঁরা নির্ণয় করেছেন। কারণসমূহ মোটামুটি নিম্নরূপ :

১. রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দল, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিওসহ সকলেই দুর্নীতির পংকে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। রাজনীতি পরিণত হয়েছে ব্যবসার হাতিয়ারে। ৭৫% এমপিই রাজনীতি বা এলাকার কল্যাণ বাদ দিয়ে তাঁদের অবস্থানকে ব্যবহার করে ব্যবসা করছেন। সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় কেউ কাউকে সংশোধন করতে পারছেন না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব রাজনৈতিক সরকারের। কিন্তু রাজনৈতিক সরকারই চূড়ান্তভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় তারা সরকারি কর্মকর্তাদের সংশোধন করতে পারছেনও না, চাইছেনও না। এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ফলেই বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় ক্ষতির পমিরাণ দাঁড়াচ্ছে অন্তত ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬শ' ৮০ কোটি টাকা।

২. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

৩. যানজটসহ যাবতীয় নেতিবাচক বিষয়ের ওপর সরকারের কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই।

৪. সরকারি ব্যয়ের গুণগতমান খুবই নিম্ন।

৫. অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

এর মধ্যে তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ওপর। এর পরই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন আইন-শৃঙ্খলাহীনতা ও সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার ওপর।

অথচ এই যেখানে বাস্তব চিত্র সেখানে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী বাহাদুররা বলে বেড়াচ্ছেন যে, গত ৪ বছরে তাঁরা অর্থনীতির যে উন্নতি সাধন করেছেন, তার আগে একুশ বছরে এর নাকি ১০০ ভাগের এক ভাগও হয়নি। তাঁরা সম্ভবত ধরেই নিয়েছেন যে, সিভিল সমাজ গরু-ছাগলেরই সমতুল্য, ফলে তাঁরা যাই-ই বলবেন, তা যত অবিশ্বাস্যই হোক না কেন, তাই-ই সিভিল সমাজ অম্লান বদনে বিশ্বাস করে ফেলবে।

দেশ ও জনগণের উন্নয়ন শুধু কাগজে-কলমে হলেই চলে না, তা দৃশ্যমানও হতে হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন আসলে কতটুকু হচ্ছে তা জনগণ উপলব্ধি করতে পারে কতিপয়

www.pathagar.com

সূচক বা ইন্ডিকেটর থেকে। যেমন দ্রব্যমূল্য অনুপাতে আপামর জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে কিনা। দ্বিতীয়ত, প্রতিবছর কর্মবাজার বা জব মার্কেটে যত মানুষ চাকরি বা পেশার সন্ধানে আসছে, তাদের শতকরা কত জন চাকরি বা পেশার সন্ধান পাচ্ছে। তৃতীয়ত, নতুন নতুন শিল্প-কারখানা কতটা গড়ে উঠছে এবং সার্বিক শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা। চতুর্থতঃ, স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক কি অবস্থায় আছে। পঞ্চমত, ঘুষ-দুর্নীতি কি পর্যায়ে আছে। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত পাঁচটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। অনেকে অনুমানই করতে পারছেন না, বর্তমান সরকার যদি আরো এক টার্ম অর্থাৎ আগামী ছয় বছরও ক্ষমতায় থাকেন, তাহলে উল্লিখিত দুর্নীতিইবা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে এবং দুর্নীতিজনিত ক্ষতির পরিমাণইবা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের বর্তমান যে ট্রেন্ড, তাতে চিন্তাই করা যায় না আগামী ছয় বছরে বাংলাদেশ ও ১৪/১৫ কোটি মানব সন্তানের অবস্থা কোন পর্যায়ে উপনীত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আলোচনা যতই 'ফলপ্রসূ' হোক না কেনো এবং যত ভালো চুক্তিই স্বাক্ষরিত হোক না কেন বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে মার্কিন উদ্যোক্তাসহ কোন বিদেশী উদ্যোক্তাই যে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে না এবং বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য দাতাদেশ ও সংস্থার সাহায্যাদিও যে বৃদ্ধি পাবে না, এটা চোখ বন্ধ করেই বলে দেয়া যায়।

কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং তাঁর দলের যে চরিত্র ও ঝোঁক, তাতে আগামী ছয় বছরে তাঁরা কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হবেন বলে আদৌ মনে হয় না। তাঁরা কি পারবেন এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতি থেকে নিজেরা মুক্ত হতে? পারবেন পুলিশসহ তাবৎ প্রশাসনকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে?

অবশ্য এ প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে যে, বিএনপি ক্ষমতায় গেলেও যে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে, তারইবা গ্যারান্টি কোথায়? বিএনপির নেতৃত্ব ও এমপিদের চরিত্র কি আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ও এমপিদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন? এই ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলার বিপর্যয় রোধে বিএনপিরও আদৌ কি কোনো কর্মসূচি ও পরিকল্পনা আছে? থাকলে সেটা কোথায়?

কাদের দিয়ে এবং কিভাবে বিএনপি বা বিএনপি জোট এই অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাবে?

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

পঞ্চদশ অধ্যায়

তেল ও গ্যাস সম্পদ

ড: খন্দকার মোশাররফ হোসেন: বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ ব্যবহার-বিতর্ক

ড: আনোয়ার হাসান : আমাদের গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রসঙ্গে

সিরাজুর রহমান: বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস সম্পদ: দূরদৃষ্টির অভাবে জাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন

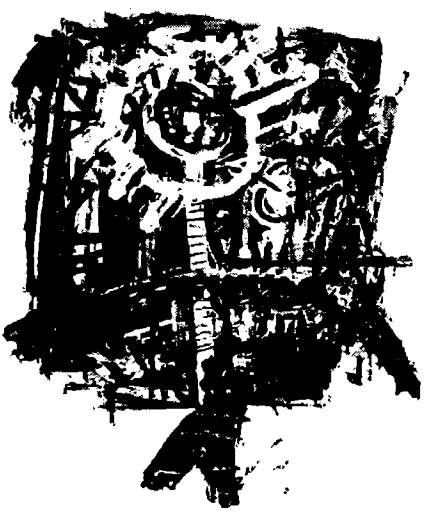

www.pathagar.com

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

বাংলাদেশে গ্যাস সম্পদ ব্যবহার-বিতর্ক

ডেটলাইন ঃ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

ভূমিকা : বর্তমান আধুনিক বিশ্বে তেলের পর প্রাকৃতিক গ্যাসকে প্রাকৃতিক জ্বালানি শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাণিজ্যিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্রমান্বয়ে তেলের স্থান দখল করছে। নবতর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং ব্যবহারের সাথে সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে উন্নতমানের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ রয়েছে, যার ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬৮-৬৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে তেলের ব্যবহার ছিল ৬৮% এবং গ্যাসের ব্যবহার ছিল মাত্র ১৭% দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কার হওয়ায় প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে তা ১৭% থেকে ৭৫%-এ উন্নীত হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ নবায়নযোগ্য সম্পদ নয়। এই অমূল্য সম্পদ এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। এক হিসাবে দেখা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে তা বর্তমান হারে ব্যবহৃত হলে ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এ কথা সত্যি যে, বাংলাদেশে আরও প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। তবে বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক অবকাঠামোতে আরও কি পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কার করা সম্ভব তা নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। বিদেশে গ্যাস রপ্তানি করার অজুহাত সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে কেউ কেউ অনেক কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশন করছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে গ্যাসের মজুদ হয়ত বা দ্বিগুণ করা সম্ভব। আর তা হলেও আগামী ৪০ বছরের মধ্যে সেই দ্বিগুণ মজুদও নিঃশেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের বর্তমান মজুদ ও সম্ভাব্য মজুদ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাতেই যথেষ্ট নয়। এই সীমাবদ্ধ মজুদ থেকে বিদেশে গ্যাস রপ্তানি করা হলে তা হবে আত্মঘাতী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী। এ ধরনের চিন্তা যে শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশের মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হবে তাই নয় বরং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হবে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অপরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হলে অর্থনৈতিকভাবে একটি দেশ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত এককালের তেল সমৃদ্ধ দেশ নাইজেরিয়া। তাই আমাদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসের ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পূর্বে গ্যাসের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য মজুদ এবং দেশের চাহিদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ইতিহাস

বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশ আমলে ১৯১০ সাল থেকেই তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। ১৯১০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ৬টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়, কিন্তু তেল বা গ্যাসের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানের সময়কাল ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ২২টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়, যার মধ্যে ৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। বাংলাদেশ সময়কালে ১৯৯৮ পর্যন্ত মোট ২৯টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়, যার ফলে ১৩টি গ্যাস ক্ষেত্র এবং ১টি ক্ষুদ্র তেল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের সময়কাল দীর্ঘ হলেও অনুসন্ধান কূপ খননের সংখ্যা মাত্র ৫৭টি। হাইড্রোকার্বন সম্ভাবনাময় দেশে অনুসন্ধান কূপের এই সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাংলাদেশের সময়কালে দেখা যায় যে, গড়ে প্রতিবছর ১টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো জ্বালানি ঘাটতির দেশে অনুসন্ধান কূপ খননের এই হার মোটেও যথেষ্ট নয়। সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশের সাফল্যের হার (২.৭১ঃ১) যা পৃথিবীর যে কোনো সাফল্য হার থেকে অনেক বেশী (পৃথিবীর গড় সাফল্যের হার ১০ঃ১)। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতির দেশে গ্যাস আবিষ্কারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসঙ্গতির কারণে পর্যাপ্ত অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির ভিত্তিতে অনুসন্ধান

প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উত্তোলনে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন ও ঝুঁকিপূর্ণ। সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য যে পরিমাণ কূপ খনন প্রয়োজন ছিল তা সম্ভব হয়নি। এ কারণে আরও গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৬টি বহুজাতিক তেল কোম্পানী বঙ্গোপসাগরে উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির আওতায় অনুসন্ধানকার্য পরিচালনার জন্য ব্লক ইজারা নেয়। কয়েকটি কোম্পানী কিছু কাজ করার পর অনুসন্ধান কাজ পরিত্যাগ করে বাংলাদেশ থেকে চলে যায়। একটি কোম্পানী বঙ্গোপসাগরে ১টি গ্যাস ক্ষেত্রও আবিষ্কার করে। এরপর বাংলাদেশে দু'একটি কোম্পানী বিচ্ছিন্নভাবে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ব্লক গ্রহণ করে কিন্তু আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পলিসি ঘোষণা এবং আমেরিকার হিউস্টনে প্রথম 'বিডিং রাউন্ড' অনুষ্ঠানের পর বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন তেল কোম্পানী এগিয়ে আসে। কেয়ার্ন এনার্জি কোম্পানী বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সাংগু গ্যাস ক্ষেত্রটি ১৯৯৫ সালে আবিষ্কার করে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রতি বহুজাতিক তেল কোম্পানীগুলোর উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৯৭ সালে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশের সকল ব্লকে উন্মুক্ত করে দ্বিতীয় 'বিডিং রাউন্ড' অনুষ্ঠান করে। প্রথম রাউন্ডের সফলতায় দ্বিতীয় রাউন্ডে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এই সুযোগে দেশের চাহিদা মোতাবেক উৎপাদন এবং গ্যাস রপ্তানির বিধিনিষেধের প্রতি তোয়াক্কা না করে ও পেট্রোলিয়াম পলিসিতে ঘোষিত নীতিমালা অনুসরণ না করে দেশের সকল ব্লক বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির ভিত্তিতে ব্লক বিতরণের ঘোষিত নিয়ম ও শর্ত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কোম্পানীর প্রস্তাব মূল্যায়নে গোপনীয়তা, দীর্ঘসূত্রতা ও অবৈধ যোগাযোগ সম্পর্কিত খবরা-খবর ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, প্রস্তাব গ্রহণ করার পর টেন্ডারের শর্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। এমনকি বর্তমান সরকার আমেরিকার দুটি বিখ্যাত কোম্পানী যথা- টেক্সাকো (Texaco) এবং শেভরন (Chevron) -এর মতো কোম্পানীকে একটি বিশেষ ব্লক গ্রহণের জন্য আয়ারল্যান্ডের একটি অখ্যাত টাল্লো কোম্পানীর সাথে যৌথ উদ্যোগের (Joint venture) পরামর্শ দিয়েছে। এ ছাড়া উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির ভিত্তিতে ব্লক ইজারা লাভের প্রস্তাব সাধারণত কারিগরি ধরনের হয়ে থাকে। উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের জন্য যে 'তিন সচিব' বিশিষ্ট উচ্চতর কমিটি করা হয়েছিল তার মধ্যে কোনো বিশেষজ্ঞ রাখা হয়নি। প্রস্তাব মূল্যায়নে আরও অন্যান্য অস্বচ্ছতার কথা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এখনও প্রস্তাবগুলো মূল্যায়নের এবং দরকষাকষির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও বাংলাদেশের অবশিষ্ট সকল সম্ভাবনাময় ব্লক বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম পলিসিতে ঘোষিত নীতি মোতাবেক বাংলাদেশ তার নিজস্ব উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবছর কমপক্ষে ৪টি অনুসন্ধান কূপ খনন করবে। এই নীতিকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের একমাত্র তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা/বাপেক্স'র জন্য কোনো ব্লক নির্ধারিত না রেখে সকল ব্লক উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অথচ বিএনপি সরকারের আমলে উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির ভিত্তিতে বিদেশী কোম্পানীর সাথে আলোচনার পূর্বেই পেট্রোবাংলার জন্য সম্ভাবনাময় ব্লকসমূহ রিজার্ভ রাখা হয়েছিল। এর ফলে সরকারি উদ্যোগ প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের উন্নয়নের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় পেট্রোবাংলা দেশের স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ লাভ করেছিল। বর্তমান সরকার পেট্রোবাংলা বা বাপেক্সকে নিষ্ক্রিয় করে এবং ব্লক থেকে বঞ্চিত করে প্রকারান্তরে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে জনগণকে এবং জাতীয় সংসদকে অবহিত করা ও মতামত গ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। অন্যথায় এরকম জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য বর্তমান প্রজন্মকে দায়ী করা হবে।

www.pathagar.com

উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবশিষ্ট সম্ভবনাময় সকল ব্লক যদি ইজারা দেয়া হয় এবং আগামী কয়েক বছরে যদি আরও কয়েকটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হয় তাহলে বিদেশী কোম্পানীগুলো যে পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন করবে তা ব্যবহারের চাহিদা আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশে সে পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি হতে যে সময় লাগবে সে পর্যন্ত কি আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলো অপেক্ষা করতে রাজি হবে? বিদেশী কোম্পানীগুলো এদেশে বিনিয়োগ করবে লাভের জন্য এবং যত দ্রুত সম্ভব বিনিয়োগ ফেরত নেয়াই হবে তাদের মূল লক্ষ্য। বর্তমান সরকার যদি গ্যাস রপ্তানি না করার বিষয়ে সত্যিকারভাবে আন্তরিক হয় তাহলে কিভাবে দেশের সকল সম্ভাবনাময় ব্লক এক সাথে ইজারা দেয়ার আয়োজন করছে? জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে সরকারের এত গোপনীয়তা আজ জনমনে সন্দেহ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্তমান মজুদ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২১টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ নির্ণয় করা হয়েছে এবং ১টি গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ এখনও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। আবিষ্কৃত ও মূল্যায়িত ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট প্রমাণিত ও সম্ভাব্য (Proven and probable) মজুদ রয়েছে ২৩.০৯৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার মধ্যে উত্তোলনযোগ্য (Recoverable) মজুদ ছিল ১৩.৭৯০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে যে ১১টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে তাতে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন করা হয়েছে মোট ৩.৪৩৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার ফলে দেশে বর্তমানে উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ আছে ১০.৩৫৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান ও ভবিষ্যতে দেশের গ্যাসের ব্যবহারের হার এবং দেশের চাহিদার অভিক্ষেপণ বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে, দেশের অবশিষ্ট মজুদ ২০১৫ সাল নাগাদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। গত ১৯৯৯ সালের ৩০ জুন অনুষ্ঠিত সংসদের বৈঠকে এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বর্তমান সরকারের প্রতিমন্ত্রী সংসদকে অবহিত করেছেন যে, দেশের অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস দ্বারা ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। অতএব সকল মূল্যায়নেই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে পরিমাণ অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদ আছে তা ২০১৫ সালের পর নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ বহুকাল থেকেই ভূতাত্ত্বিক ও ভূকাঠামোগত কারণে হাইড্রোকার্বন সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে পরিচিত। দেশে আরও গ্যাস আবিষ্কার করা সম্ভব হবে বলে সকল বিশেষজ্ঞ মনে করেন। দেশে তেল আবিষ্কারেরও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আরও কি পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কার করা সম্ভব হবে তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি বা এই লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে কোনো প্রকার গবেষণা বা স্টাডিও করা হয়নি। বাংলাদেশের ভূকাঠামো ও ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং দেশে এ পর্যন্ত পরিচালিত অনুসন্ধান ইতিহাস ও

www.pathagar.com

সাফল্যের হারের বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে আরও কি পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কৃত হতে পারে তা কিছুটা ধারণা পোষণ করেন। বাংলাদেশের যমুনা নদীর পশ্চিমাংশে অনুসন্ধান কূপ খনন করে এবং ভূকম্পন জরিপকার্য পরিচালনা করে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের পশ্চিমের অর্ধ অংশ গ্যাস আবিষ্কারের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। এ পর্যন্ত দেশে যে পরিমাণ গ্যাস-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তা সকলই দেশের পূর্বাঞ্চলেই অবস্থিত এবং ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের সম্ভাবনাও পূর্বাঞ্চলেই রয়েছে। এই সীমাবদ্ধ এলাকায় ভূকম্পন জরিপ ও ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গ্যাস আবিষ্কার হতে পারে এরকম সম্ভাবনাময় স্ট্রাকচারের সংখ্যা সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞদের কমবেশী ধারণা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত ৮৮ বছরে যে পরিমাণ স্ট্রাকচার অনুসন্ধান করে গ্যাসের বর্তমান মজুদ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে সে পরিমাণ সম্ভাবনাময় ও অনুসন্ধানযোগ্য স্ট্রাকচার অনুসন্ধানের জন্য অবশিষ্ট রয়েছে। সম্ভাবনাময় সকল স্ট্রাকচারে (অফশোর এবং অনশোর) অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করা হলে এ পর্যন্ত অনুসন্ধান সাফল্য বিবেচনায় দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ গ্যাস মজুদ আছে তার সমপরিমাণ গ্যাস ভবিষ্যৎ আবিষ্কার হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা ছাড়াই কোনো কোনো মহল 'বাংলাদেশ গ্যাসের উপর ভাসছে' বা 'বাংলাদেশে ১০০ ট্রিলিয়ন গ্যাস মজুদ আছে' বলে দেশের গ্যাস মজুদ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত চিত্র উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করেছে। সকল তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছেন যে, গ্যাসের বর্তমান মজুদ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য মজুদ আবিষ্কার করা সম্ভব হলে তাও ২০৪০ সাল নাগাদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই সীমিত মূল্যবান সম্পদ, অনবায়নযোগ্য এবং দেশের একমাত্র জ্বালানির উৎস প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যবহার কৌশল গ্রহণের পূর্বে আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে এবং চা বাগান, শিল্প, কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থালী কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। খাতওয়ারী ব্যবহারের তথ্য ও উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বাৎসরিক গ্যাস উৎপাদনের সিংহভাগই বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে যেখানে গ্যাসের মোট উৎপাদন হয়েছে ২৮২.০০৭ বিঃ ঘনফুট, সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১২৩.৫৫১ বিঃ ঘনফুট এবং সার উৎপাদনে ৮০.০৭৪ বিঃ ঘনফুট গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ঘাটতির কথা কারও অজানা নেই। দেশের শতকরা ৮৪ ভাগ মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। একবিংশ শতাব্দীতে একটি দেশের শতকরা ৮৪ ভাগ মানুষের

www.pathagar.com

জীবন বিদ্যুৎবিহীন চলতে পারে তা কল্পনাতীত। কৃষিপ্রধান দেশের সার উৎপাদনও কত জরুরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে তার শতকরা ৮৫-৯০ ভাগই উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। ভবিষ্যতে যেসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে তার সবগুলোই গ্যাসভিত্তিক। সে কারণে দেশের বাণিজ্যিক জ্বালানি শক্তির একমাত্র উৎস প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যবহার কৌশল নির্ধারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কতা ভাবতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বর্তমানে জাতির সামনে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশের সকল জনগণের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া এবং দেশের শিল্পায়নের স্বার্থে শিল্প কলকারখানায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা। বর্তমানে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারী চাহিদা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাসের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হলে গ্যাসের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। ১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়াম পলিসি প্রণয়নের সময় বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে একটি অভিক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাতে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে গ্যাসের চাহিদা হবে ২৬০০ এমএমসিএফডি এবং ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৫৫০০ এমএমসিএফডি। উল্লিখিত সময়ে বর্তমানে যে পরিমাণ উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ আছে তা থেকে প্রতিদিন ১০০০ এমএমসিএফডি'র বেশি সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। ফলে ২০১০ সালে গ্যাস সরবরাহের সম্ভাব্য ঘাটতি ১৬০০ এমএমসিএফডি যা ২০২০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫০০ এমএমসিএফডিতে উন্নীত হবে। এই বিশাল ঘাটতি পূরণ করতে হবে ভবিষ্যৎ আবিষ্কারলব্ধ সম্ভাব্য মজুদ থেকে। দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি ও শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ ঘাটতি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান কার্যক্রম এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের যেখানে পূর্ণোদ্যমে কোনো আয়োজন নেই সেখানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যুক্তিতে দেশের মূল্যবান অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাস বিদেশে রপ্তানির পক্ষে বহুমুখী প্রেসক্রিপশন ও পরামর্শ বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসকে LNG (Liquified Natural Gas)-এ রূপান্তরিত করে বিদেশে রপ্তানি করা যায়। এলএনজি প্লান্ট স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও পুঁজিঘন শিল্প। পাইপলাইনের মাধ্যমে সরাসরি গ্যাস রপ্তানি করা যায়। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও খরচও হবে কম। পাইপলাইনের মাধ্যমে কেবল পার্শ্ববর্তী দেশেই রপ্তানি সম্ভব। সে ক্ষেত্রে রপ্তানি বাজার হবে সীমাবদ্ধ।

www.pathagar.com

ড. আনোয়ার হাসান

আমাদের গ্যাস সম্পদের ব্যবহার প্রসঙ্গে

ডেটলাইন ঃ ২৫ অক্টোবর ২০০০

পরম করুণাময় আল্লাহতালা আমাদের যে গ্যাসসম্পদ দান করেছেন সে জন্য তাঁর প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানান উচিত। গ্যাস না থাকলে আমাদের কি ভয়ানক দুরবস্থা হতো তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। পরিকল্পিতভাবে এই গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে না পারলে আমরা অচিরেই এক চরম দুর্দশায় পতিত হবো। যে কোনো সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় সেই সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ করা। কিন্তু আমাদের গ্যাস সম্পদ মজুদের পরিমাণ পুরোপুরি নির্ণয় ব্যতীতই বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ও তাদের এদেশীয় এজেন্টরা দেদার ফায়দা লোটার মতলবে আমাদের গ্যাসের প্রায় পুরোটাই পাইপলাইনে ভারতে পাচার করার জন্য গত বেশ কয়েক বছর ধরে নানারকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলছে। বর্তমানে নিশ্চিতভাবে মজুদ আমাদের গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট বা টিসিএফ (পূর্বের ১০ সিটিএফ+অল্প কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্রের প্রায় ২ টিসিএফ)। আমাদের দেশে বর্তমানে গ্যাসের সুবিধা পাচ্ছে আমাদের জনগণের মাত্র ১০% এবং বিদ্যুৎ (যার উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ৭০% গ্যাস)-এর সুবিধা পাচ্ছে মাত্র ১০%। বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালে ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ ছিল ০.৩৪৬ (দশমিক তিন চার ছয়) টিসিএফ। ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় জ্বালানি নীতি (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য) অনুসারে নিশ্চিত মজুদ ১২ টিসিএফ দিয়ে আমাদের ১৫/১৬ বছর চলবে (প্রেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রণীত ওই হিসাবের জন্য পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)।

এ অবস্থায় আমাদের গ্যাসসম্পদ রপ্তানি করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানীগুলো নিজেদের ফায়দার নিমিত্তে গ্যাস রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ সরকারকে গ্যাসের সাম্ভাব্য মজুদের বিশাল কাল্পনিক পরিমাণের কথা বলে প্রলোভিত করার চেষ্টা করছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে। এটা নাকি তারা তাদের স্যাটেলাইট দিয়ে কি-সব উপায় বুঝে ফেলেছে। আমাদের প্রযুক্তিজ্ঞান না হয় কম, তাই বলে এতটুকুও কি আমরা জানি না যে, আকাশের স্যাটেলাইট দিয়ে মাটির গভীরের গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয়ের কোনো প্রযুক্তি বর্তমানে তো নেই, ভবিষ্যতেও কোনোদিন উদ্ভাবনের কোনো সম্ভবনা নেই। হয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো 'বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখানোর' চেষ্টা করছে নতুবা উপরোক্ত এদেশীয় এজেন্টদের অপশক্তিতে এতটা নিশ্চিতবোধ করছে যে, যা খুশি তাই একটা বলে দিচ্ছে। ইউরোপিয়ান আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলো অতিরিক্ত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৫ টিসিএফ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলো গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৫৫ টিসিএফ প্রচার করছে। তবে এ বিষয়ে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে এ

www.pathagar.com

দেশের একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। তার আবিষ্কার হচ্ছে বাংলাদেশের অতিরিক্ত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১০০ টিসিএফ। সম্প্রতি বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রীও নাকি ১০০ টিসিএফ-এর কথা বলেছেন। পরে তাকে যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি নাকি উত্তর করেছিলেন যে, অনেকেই বলে থাকে বলে তিনিও বলেছেন। জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব যে গ্যাস সম্পদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেই সম্পদ সম্পর্কে সরকারের একজন মন্ত্রী কি করে এমন দায়িত্বহীনের মতো কথা বলতে পারেন তা বোধগম্য নয়। ওই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এ দেশের কিছু সচেতন ব্যক্তি ও সংগঠনের জোরাল প্রতিবাদের ফলে সরকার অনেকটা বাধ্য হয়ে গত মার্চে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালে আমাদের গ্যাসের সম্ভাব্য মজুদ নিরূপণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। মার্কিন জ্বালানি দফতরের মুখ্য উপসহকারী সচিব ক্যালভিন হামফ্রের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সময় জানা গেল যে, উপরোক্ত চুক্তির অধীনে মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের (USGS) সহায়তায় এ বছর আগস্ট মাসে বাংলাদেশের গ্যাসের সম্ভাব্য মজুদ নিরূপণের জন্য জরিপ শুরু হয়েছে এবং এই ডিসেম্বরেই তার ফল পাওয়া যাবে। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের গ্যাস সম্পদ সম্পর্কে সবচেয়ে জরুরি এই তথ্য যদি মাত্র চার মাসেই পাওয়া যায় তবে বিদেশী কোম্পানীগুলো ও তাদের এদেশীয় দোসররা এতদিন কেন আন্দাজে মজুদ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে আসছিল।

এ থেকে কি এটা নিশ্চিত করা প্রতীয়মান নয় যে, বিদেশী কোম্পানীগুলো আমাদের গ্যাস সম্পদ ভারতে পাচার করে দেদার মুনাফা লোটার অপচেষ্টা করছে এবং এ দেশের কিছু দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিবিদ মোটা রকম বখরার বিনিময়ে ওই অপচেষ্টায় মদদ যোগাচ্ছে? এমনি অবস্থায় যখন মার্কিন কোম্পানীগুলোই ভারতে গ্যাস রপ্তানির জন্য বেশী চাপ দিচ্ছে তখন ওই দেশেরই বিশেষজ্ঞদের (USGS) ওপর অতি গুরুত্বপূর্ণ উক্ত জরিপের দায়িত্ব দেয়ায় কেউ যদি নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্ন তোলেন তবে নিশ্চয়ই সেই প্রশ্নের গুরুত্ব উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেন ওই জরিপে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য দেশের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হল না? এ অবস্থায়ও একটি বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, রপ্তানি করার মতো গ্যাস আমাদের নেই। বাংলাদেশের সম্ভাব্য গ্যাস ক্ষেত্রের প্রিলিমিনারি সার্ভে প্রায় সম্পন্ন এবং বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত যে, বর্তমানের মজুদ ১২টিসিএফ-এর পর বড়জোর ১০/১৫ টিসিএফ গ্যাসের মজুদ রয়েছে। ১৯৯৫ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতি অনুসারে আমরা নিশ্চিত, ১২ টিসিএফ যোগ সম্ভাব্য ১৫ টিসিএফ মোট ২৭ বা ধরে নেয়া যাক ৩০ টিসিএফ দিয়ে আমাদের খুব বেশি হলে ২৯/৩০ বছর চলবে। কাজেই (USGS)-এর সহায়তায় যে জরিপ করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কখনও রপ্তানি হতে পারে না। তার উদ্দেশ্য হতে হবে প্রয়োজনের নিরিখে আমাদের জাতীয় জ্বালানি নীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন।

www.pathagar.com

অতি শীঘ্র বিকল্প জ্বালানি সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের গ্যাস মূল্যহীন হয়ে পড়বে, কাজেই তড়িঘরি করে ভারতে গ্যাস রপ্তানি করে ফেলা দরকার এমনি বিভ্রান্তি ও প্রচার করে থাকে উপরোক্ত স্বার্থান্বেষীরা। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি ফসিল ফুয়েলের কোনো রকম বিকল্পই নয়। সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির প্রযুক্তিগতজ্ঞান আবিষ্কার বলতে গেলে সম্পূর্ণ (এরপর অতি সামান্য একটু আধটুই উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে)। সৌরবিদ্যুৎ ফসিল ফুয়েল থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের চেয়ে ১৪/১৫ গুণ কস্টলি।

একমাত্র বিশেষ অবস্থায় (যেমন-স্যাটেলাইটের পাওয়ার সাপ্লাই বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ) সৌরবিদ্যুৎ কস্টএফেকটিভ হয়। বায়ুশক্তি অত্যন্ত সীমিত, আমাদের দেশে এই শক্তি ব্যবহারের কোনো সম্ভাবনাই নেই। ইন্টারন্যাশনাল এটমিক এনার্জি কমিশন কয়েক বছর আগে একটি ঘোষণায় বলেছে যে, ২০৫০ সাল পর্যন্ত ফসিল ফুয়েলই (তেল-গ্যাস-কয়লা) হবে একমাত্র প্রধান জ্বালানি। ৫০ বছর পর সৌর বা বায়ুশক্তি ফসিল ফুয়েলের বিকল্প হবে এ কথা ভেবে কিন্তু তারা ওই ঘোষণা দেননি, বরং এটমিক ফিউশন রিএক্টর (ফিশন রিএক্টরের ঠিক উল্টো প্রযুক্তি) হয়ত আগামী ৫০ বছরের গবেষণার ফলে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাস্তবায়িত করা যাবে, এই আশা থেকেই ওই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে এটমিক ফিউশনের জন্য যে ২/৩ লাখ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা লাগেসে প্রযুক্তি কখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না বলে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা। জ্বালানির এমনি ধরনের অবস্থায় পৃথিবীর বহু দেশ নিজেদের প্রচুর মজুদ থাকা সত্ত্বেও তাদের জ্বালানির চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আমদানির মাধ্যমে মিটিয়ে থাকে (এরপর যখন জ্বালানি আর কিনতে পাওয়া যাবে না তখন নিজেদের মজুদ হাত দেবে)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মজুদ আছে ৩০ বছরের তেল, ৬৫ বছরের গ্যাস ও ২৫০ বছরের কয়লা, ভারতে রয়েছে ১৫ বছরের তেল, ৩২ বছরের গ্যাস ও ২৭৫ বছরের কয়লা। সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তি যদি শীঘ্রই ফসিল ফুয়েলের বিকল্প হয় তবে উপরোক্ত ধরনের বিপুল মজুদ থাকা সত্ত্বেও কেন ওই দেশগুলো তেল-গ্যাস আমদানি করে? এ থেকে কি এটা সুস্পষ্ট নয় যে আমাদের ধোঁকা দিয়ে আমাদের একমাত্র ফসিল ফুয়েল গ্যাস ভারতে পাচার করার ষড়যন্ত্র চলছে?

লক্ষণীয় যে, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো আশুগঞ্জ থেকে দিল্লী পর্যন্ত পাইপলাইন বসিয়ে ভারতে গ্যাস রপ্তানির পরামর্শ দিচ্ছে। তাদের মতে, তরলীকৃত গ্যাস (সিএনজি) কন্টেইনার দিয়ে ভারতে রপ্তানি করা লাভজনক নয়। এ কথা কোম্পানীগুলো কেন বলছে তা বুঝতে বেশী বেগ পেতে হয় না। মার্কিন কোম্পানী ইউনোকল ওই পাইপলাইন বসাতে চাচ্ছে ১.৭ বিলিয়ন ডলার খরচ হেঁকে। একবার কন্ট্রাক্টটা পেয়ে গেলে তারপর নানা অজুহাতে ওই ডলারকে ৪/৫ বিলিয়নে বর্ধিত করে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না তাদের (কিছু বখরা অবশ্য দিতে হবে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের)। এর চেয়ে ভয়াবহ

www.pathagar.com

কথা হচ্ছে, পাইপলাইনে কারচুপি করার পূর্ণ সুযোগ পাবে। ৫/৭ বছরে ১০ টিসিএফ বা এমনি পরিমাণ গ্যাস ভারতে পাচার করে বলবে যে ২ বা ১ টিসিএফ রপ্তানি করা হয়েছে (মিটার ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ চুরির ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তো রয়েছে এ দেশে)। ওই পাচারের ফলে আমাদের গ্যাস ৫/৭ বছরে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেলে বিভিন্ন অজুহাত দেখান হবে যেমন তখন বলা হবে, মজুদ নিরূপণে ভুল হয়েছিল, ১২ টিসিএফ গ্যাস ছিল না, ছিল ৩/৪ টিসিএফ। ৫/৭ বছরে এ দেশের গ্যাস সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলা হলে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক দূরবস্থায় পতিত হবে এ জাতি। তখন (ক) আমদানিকৃত জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। বিদ্যুতের মূল্য ৩/৪ গুণ বা তারও বেশি বৃদ্ধি পাবে। ফলে শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যয় ২/৩ গুণ বেড়ে যাবে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ শিল্পকারখানা ধ্বংস হয়ে যাবে। (খ) গ্যাসের অভাবে গ্যাসভিত্তিক সার উৎপাদনের কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। সারের অভাবে আমাদের কৃষি উৎপাদনে এক চরম বিপর্যয় দেখা দেবে।

(গ) জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাবে, যার জন্য আমাদের পরিবেশ হবে বিপন্ন।

(ঘ) বাসগৃহের বিদ্যুৎ বিল ৪/৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে। যেমন-এখন যিনি মাসে ৫০০ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিচ্ছেন, তাকে তখন দিতে হবে ২০০০/২৫০০ টাকা। রান্নার জন্য এখন গ্যাস বিল মাসে ৩০০ টাকা তখন কাঠ দিয়ে রান্না করতে অন্তত ১৫০০/২০০০ টাকা খরচ হবে। অধিকাংশ লোকের পক্ষে ওই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হবে না। ভারতে গ্যাসের রপ্তানির জন্য বিভিন্ন প্রকারের চাপ প্রয়োগ ছাড়াও মাঝে-মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রলোভনও দেখান হয়ে থাকে এ দেশের জনগণকে।

একজন দেশী আমলা (প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব) বিজ্ঞের মতো বলেছেন যে, গ্যাস বিক্রি করে বাংলাদেশ কুয়েত হয়ে যাবে, আরেক আমলা বলেছেন সিঙ্গাপুর। কয়েকদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দফতরের উপসহকারী সচিব ক্যালভিন হামফ্রে বাংলাদেশ সফরে এসে গ্যাস বিষয়ে বহু কথার সাথে এও বললেন যে, গ্যাস রফতানির পয়সা দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করা যাবে– বাংলাদেশের জনগণ রিকশা ছেড়ে উঠতে পারবে জেট বিমানে। এজন্য বাংলাদেশকে নাকি ৩ থেকে ৭ টিসিএফ গ্যাস ২০ বছরে ভারতে রপ্তানি করতে হবে। এখন মিঃ হামফ্রের পরামর্শ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৭ টিসিএফ রপ্তানির হিসাব করা যাক। এক ইউনিট (১০০০ সিএফ) গ্যাসের দাম গড়ে ৩ ডলার ধরে নিয়ে ৭ টিসিএফ গ্যাসের দাম হয় ২১ বিলিয়ন ডলার। ইতিমধ্যে সম্পাদিত লুটপাটের পিএসসি (উৎপাদন-বন্টন চুক্তি) অনুসারে বাংলাদেশের ভাগে পড়বে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার। ২০ বছরে গড়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০ কোটি ধরে নিলাম (কম করেই ধরা হল)। সে হিসাবে ২০ বছরে প্রত্যেক বাংলাদেশীর ভাগে পড়বে প্রায় ২ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রতিবছর ১০০ টাকা।

www.pathagar.com

১০০ টাকা জিএনপি বাড়লে যে রিকশা ছেড়ে জেটে ওঠা যায় তা মনে হয় অনেক বাংলাদেশী জানে না এবং সেজন্যই তারা গ্যাস রপ্তানির বিরোধিতা করছে। অবশ্য এক হিসাবে মিঃ হামফ্রের কথায় সত্যতা আছে। ৮ বিলিয়ন ডলার যদি ২০ কোটি বাংলাদেশীর মাঝে ভাগ না হয়ে ২০ জন বাংলাদেশীর পকেটস্থ হয় (পূর্বে বর্ণিত পাইপ লাইন-কারচুপির মাধ্যমে) তবে তারা প্রত্যেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ২০০০ কোটি টাকা পাবে (সমান ভাগাভাগি ধরে নিয়ে)। এই বাংলাদেশীরা অবশ্যই জেটে চলাফেরা করতে পারবে, ইচ্ছে করলে প্রাইভেট জেটেই। ৭ টিসিএফ গ্যাস রপ্তানি করা হলে বিদেশী কোম্পানীগুলো ২০ বছরে পাবে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রতিবছরে প্রায় ০.৬৫ বিলিয়ন ডলার। গ্যাস রপ্তানির জন্য যে রকম চাপ দিচ্ছে কোম্পানীগুলো এবং তাদের হয়ে মার্কিন সরকার সে তুলনায় বছরে ০.৬৫ বিলিয়ন ডলার খুব একটা বেশী উল্লেখযোগ্য অর্থ বলে মনে হয় না। এ থেকে কেউ যদি মনে করেন যে, বিষয়টির পেছনে সুপ্ত জিওপলিটিক্যাল কারণ রয়েছে তবে তাকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

তবে পলিটিক্যাল সাইনটিস্টরা এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।

যেসব পিএসসি (উৎপাদন-বণ্টন-চুক্তি)-এর মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে গ্যাসক্ষেত্র ইজারা দেয়া হয়েছে (এবং রুখতে না পারলে আরও দেয়া হবে) সেগুলোতে অতি গোপনীয় ট্যাগ লাগিয়ে এ দেশের জনসাধারণ ও এমনকি সংসদীয় কমিটির কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর মালিক জনগণ। এ অবস্থায় গ্যাস সম্পদ সংক্রান্ত যে কোনো চুক্তির বিস্তারিত জানার অধিকার রয়েছে জনগণের, কোনো অবস্থাতেই তা গোপনীয় হতে পারে না। বিভিন্ন সূত্র থেকে বিএসসিগুলো সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তাতে সুস্পষ্ট করেই বলা যায় যে, ঐগুলোতে বাংলাদেশের স্বার্থ পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে দেদার মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। সে হিসাবে ঐ পিএসসিগুলোকে লুটপাটের পিএসসি বললে মনে হয় না কোনো ভুল করা হবে। আসলে আমাদের গ্যাস সম্পদ আহরণের জন্য বিদেশী কোম্পানীর কোনো দরকার ছিল না। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স এজন্য যথেষ্ট। গ্যাস অনুসন্ধান, আবিষ্কার, উত্তোলন এবং এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স-এর ইতিহাস যথেষ্ট ভালো। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নিজস্ব জনবল ও প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা ১৯টি কূপ খনন করে ৯টি গ্যাসক্ষেত্র এবং একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে। তাদের সফলতার পরিমাণ ১ঃ২-এর সামান্য কম। নিঃসন্দেহে এটা বিশ্ব পরিসংখ্যানে একটি ঈর্ষণীয় অনুপাত। তেল গ্যাস শিল্পে দু'টি কূপ খনন করে একটিতে কৃতকার্য হওয়া নিঃসন্দেহে একটি উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তির প্রকাশ ও প্রমাণ। অথচ এখন তাদের আবিষ্কৃত ক্ষেত্রসমূহও ২৩ ব্লকের মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানীগুলোর কাছে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বাপেক্সের জন্য

www.pathagar.com

কোনো ক্ষেত্র রাখা হয়নি। বাপেক্স ভেঙে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাদের গ্যাস আহরণে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, যন্ত্রপাতি ও ১৩০০ জনশক্তি রয়েছে, কার স্বার্থে তাকে ভেঙে দেয়া হচ্ছে। তাতে কে লাভবান হবে? কেন বাংলাদেশকে বিদেশ-নির্ভর করা হচ্ছে? একে কতিপয় স্বার্থন্বেষীর হীন চক্রান্ত বললে কি বেশী দোষারোপ করা হবে?

বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষণা করেছে যে, ৫০ বছরের গ্যাস মজুদ নিশ্চিত করার পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে তবে রপ্তানি করা হবে। কিন্তু তাদের মুখের ঐ কথার সাথে কাজের কোনো মিল নেই। এই ফাঁকি কি তাঁরা জেনেশুনেই দিচ্ছেন, না তাঁদের অজ্ঞতাপ্রসূত, তা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন।

স্যাটেলাইট দিয়ে গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করা যে একটি ধোঁকা মাত্র এবং আনুমানিকভাবে ৫০/১০০ টিসিএফ-এর মজুদ ধরাটা যে অর্থহীন তা বুঝতে তো বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। বাংলাদেশের নিশ্চিত যোগ সম্ভাব্য মোট মজুদ (বেশী বেশী করে ধরে নিয়েও) ৩০ টিসিএফ দিয়ে যখন খুব বেশী হলে ২৯/৩০ বছর চলবে তখন ৫০ বছরের ঘোষণা দেয়াটা যদি অজ্ঞতাপ্রসূত না হয়, তবে তা একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক স্টান্ট ছাড়া আর কি? তবে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর কাছে একের পর এক ব্লকগুলো লীজ দেয়া, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ থেকে গ্যাস আমদানির সাম্প্রতিক জোরালো ঘোষণা, খ্যাত-অখ্যাত বিদেশীদের (যাদের অধিকাংশেরই গ্যাস বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞতা নেই) দিয়ে মাঝে মধ্যে দামী দামী হোটেলে আয়োজিত সেমিনারে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে জোর ওকালতিকরণ ইত্যাদি থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আওয়ামী লীগ সরকার ভারতে গ্যাস রপ্তানি করতে চায়।

'৭০ ও '৮০-র দশকে নাইজেরিয়ার কিছু দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনৈতিক নেতারা দেশের প্রায় সব জ্বালানি তেল তড়িঘড়ি করে বিদেশের কাছে বিক্রি করে দিয়ে প্রচুর পাউন্ড-ডলার আত্মসাৎ করে বিদেশের ব্যাংকে জমা রেখেছিল। এ অপকর্মে তাদের সহায়তা করেছিল কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানী। ঐ সমস্ত দুর্নীতিবাজ নাইজেরিয়ান এবং তাদের বংশধরেরা এখন ইউরোপ-আমেরিকায় উক্ত তেল বেচা পাউন্ড-ডলার দিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করে। আর প্রায় সব তেল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার স্বদেশী নাইজেরিয়ারা আবার আগের মতো দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়ে তাদের লুটপাট হয়ে যাওয়া তেল সম্পদের জন্য আফসোস করে মরছে। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার গড় মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ১৪০ ডলার এবং ৮৬০ ডলার। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার গড় মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ৩৫০ ডলার এবং ৩০০ ডলার। গত তিন দশক ধরে নাইজেরিয়া পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করেও ১৯৯৮ সালে তার গড় মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে কম, একবার ধনী হয়ে পুনরায় গরিব হওয়া অত্যন্ত মর্মান্তিক। নাইজেরিয়ার সাধারণ মানুষ পেট্রোলিয়াম রপ্তানির সুফল না পেলেও

www.pathagar.com

পেট্রোলিয়াম অন্বেষণের জন্য সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কুফল ভোগ করছে। ভারতে গ্যাস পাচার হয়ে গেলে আমাদের অবস্থা নাইজেরিয়া বা তার চেয়ে খারাপ হবে। ঐ ভয়াবহ দূরবস্থা থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে বাঁচাতে হলে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে ব্লক ইজারা দেয়া বন্ধ করতে হবে। তখন আর কোম্পানীগুলো 'উৎপাদিত গ্যাসের বাজার বাংলাদেশে নেই এবং কাজেই তাদের পাওনা আদায়ের জন্য গ্যাস রপ্তানি করতে হবে' এই কথা বলে চাপ দিতে পারবে না। ইতিমধ্যে সম্পাদিত লুটপাটের পিএসসিগুলো বাতিল করতে হবে। এতে অবশ্য আইনগত বাধা আসবে, কিন্তু ঐ ধরনের লুটপাটের পিএসসিগুলো যে এদেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভারী ভারী উৎকোচ দিয়ে সম্পাদন করিয়ে নিয়েছে বিদেশী কোম্পানীগুলো তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এই উৎকোচ প্রদান প্রমাণ করে চুক্তিগুলো বাতিল আইনত করা যাবে বলে আমার সাধারণ ধারণা। তবে এ বিষয়ে আইন বিশেষজ্ঞরা আরও ভালো বলতে পারবেন। গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের দায়িত্ব দিতে হবে এদেশের নিজস্ব কোম্পানী বাপেক্সকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি জ্বালানি খাতে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক।

জ্বালানি খাতে দুটি বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন :

(ক) বাপেক্সকে আরও উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা যেমন, টেকনিক্যাল নো-হাউ এবং যন্ত্রপাতির ব্যাপারে সাহায্য।

(খ) আমাদের গ্যাস সম্পদ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার একেবারে বন্ধ করার জন্য মার্কিন কোম্পানীগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ।

সরকারকে আমাদের বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে আন্তর্জাতিক দরে ক্রয় করে (যা বর্তমান দর থেকে প্রায় দুইগুণ বেশী) ব্যবহারের জন্য জনগণ, সারকারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে দিতে হয়। তাতে করে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতি হাজার সিএফটি গ্যাস যার দাম প্রকৃতপক্ষে ৬২ টাকা তার বিপরীতে আন্তর্জাতিক দর ১২২ টাকায় (২.৫৫ ডলার এবং যা ওঠানামা করে) ক্রয় করায় প্রতি হাজার সিএফটি গ্যাসের জন্য সরকারকে প্রায় ৬০ টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সরকার কেয়ার্ন ও অক্সিডেন্টাল থেকে প্রায় ২৫০ কোটি টাকায় গ্যাস ক্রয় করেছে। তাতে সরকারের প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়েছে।

বছরে এই ভর্তুকির পরিমাণ হবে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। এখানে প্রশ্ন হল যেখানে বাপেক্সের গ্যাসে উৎপাদন খরচ প্রতি হাজার সিএফটি ৫৮ টাকার বিপরীতে ৬২ টাকায় বিক্রি করে প্রতি হাজার সিএফটিতে ৪ টাকা লাভ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে উৎপাদন বণ্টন চুক্তিতে প্রতি হাজার সিএফটিতে ৬০ টাকা ভর্তুকি দেয়া কেন? একইভাবে আইপিপি (আমাদের গ্যাস দিয়ে বিদেশী কোম্পানীর বিদ্যুৎ উৎপাদন)-এর অধীনে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্যও সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রায় বছরে ৩,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। এই অবস্থায় দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি নাজুক অবস্থায় পৌঁছাবে।

www.pathagar.com

দেশের রপ্তানি আয়ের সিহংভাগ শুধু গ্যাস ক্রয়ে ব্যয় হলে দেশের অর্থনীতির যে দূরবস্থা হবে তা কি সহজে অনুমেয় নয়? এ দুর্দশা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে বিদায় করে দিয়ে বাপেক্স-এর ওপর গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে। উপসংহার হিসেবে এদেশের দেশপ্রেমিক জনগণের দাবিস্বরূপ আমি নিম্নলিখিত প্রস্তবগুলোর উত্থাপন করছি।

১। কোনো অবস্থাতেই আমাদের গ্যাস রপ্তানি করা যাবে না।

২। আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১০ বছরের স্বল্প মেয়াদি, ২৫ বছরের মধ্যম-মেয়াদি এবং ৫০ বছরের দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৩। উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে গ্যাস ক্ষেত্রগুলো খনন করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই বেহিসাবী খনন করা যাবে না।

৪। বিদেশী কোম্পানীগুলোকে গ্যাস ক্ষেত্র ইজারা দেয়া বন্ধ করতে হবে। দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে প্রয়োজনবোধে আরও উন্নত করে তাদের ওপর আমাদের গ্যাস ক্ষেত্র খননের পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে।

৫। আমাদের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।

৬। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্য আমদানি করে। এই টাকা বাঁচানোর জন্য একটি গ্যাসভিত্তিক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপন করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট

(ক) ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় জ্বালানি নীতি :

সরকার ১৯৯৫ সালের জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করে ২০০০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি ব্যবহারের নীতিমালা ঠিক করেছে। জ্বালানি নীতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট (GNP) এর প্রবৃদ্ধি থেকে ১.৪ ভাগ বেশী বাড়াতে বলা হয়েছে। এই নীতিতে ২০০০ সালের মধ্যে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৬.৪%, বিপরীতে বিদ্যুতের প্রবৃদ্ধি ৮.৭৭% এবং ২০০৫ সালে ৯.৮৬% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বলা হয়েছে। জ্বালানি নীতিতে গ্যাস উত্তোলন বাড়িয়ে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন সিএফটি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪৫-৫০%, সার কারখানায় ২৫-২৭%, শিল্প কারখানায় ১৩-১৮% এবং বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী কাজে ৮-১০% হারে ব্যবহারের নীতি প্রণয়ন করেছে।

(খ) পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রণীত জাতীয় জ্বালানি নীতি অনুসারে আমাদের আগামী ২০ বছরে গ্যাসের চাহিদা।

www.pathagar.com

সিরাজুর রহমান

বাংলাদেশের গ্যাস ও তেল সম্পদ দূরদৃষ্টির অভাবে জাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন

ডেটলাইন ঃ অক্টোবর ১৯৯৮

১৯৯৮ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহের একটা সংবাদ ছিল এরূপ : "প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল বরাবর বিস্তীর্ণ এলাকায় তেল ও গ্যাসের সন্ধান ও আহরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরো ১০ বছরের জন্য বাড়িয়ে দিয়েছেন, যদিও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য (সংসদের) উভয় দল তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছে"।

"এই নিষেধাজ্ঞা অন্তত ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী মার্কিন উপকূলের তিন থেকে ২০০ মাইলের মধ্যে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য কোনো এলাকা ইজারা দেওয়া যাবে না। তিন মাইল সীমার মধ্যে উপকূলের নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর ওপর ন্যস্ত।" এ হলো খবরটির বাংলা অনুবাদ।

আমার ছোটবেলার এক বন্ধু লন্ডনের এক হোটেল থেকে টেলিফোন করেছিলেন ১৯৭২ সালের শেষের দিকে। বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। তিনি এবং তার অন্য এক প্রকৌশলী বন্ধু ঢাকা যাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। যুক্তরাষ্ট্রে বসে তারা কানাঘুষা শুনছিলেন যে, বাংলাদেশ থেকে তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাস জাপানে রফতানি করে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রস্তাব দিয়েছেন কেউ কেউ। এসব খবরে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা বুঝিয়ে বলবেন, সে পরিকল্পনা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর হবে।

আমার বন্ধুর যুক্তিগুলো খুবই পরিষ্কার ছিলো। বাংলাদেশের মওজুদ গ্যাসের পরিমাণ নিয়ে আঁচ-অনুমান যাই হোক, প্রমাণিত পরিমাণ অন্তহীন নয়। দেশ অত্যন্ত অনুন্নত বলে গ্যাসের পরিমাণ সাময়িকভাবে বিরাট মনে হতে পারে, কিন্তু জনসংখ্যার সঙ্গে জ্বালানির চাহিদাও হু হু করে বাড়ছে এবং এই দেশটিকে মোটামুটিও উন্নত করতে হলে জ্বালানির চাহিদা বহুগুণে বেড়ে যাবে; বাংলাদেশের প্রমাণিত মওজুদ তখনকার চাহিদার জন্য মোটেও যথেষ্ট হবে না। জ্বালানির অনটন তখন আবার বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

কয়েকটা মন্দভাগ্য দেশের দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন তিনি। পেট্রো-ডলারের লোভে অধীর হয়ে সে সব দেশ যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্যাস ও তেল রফতানি করেছে। হঠাৎ পাওয়া বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার সিংহ ভাগই গেছে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিক ও আমলাদের পকেটে, সেটা তারা বিদেশী ব্যাংকে লুকিয়ে রেখেছেন কিম্বা সে অর্থে

www.pathagar.com

বিদেশে সম্পত্তি কিনেছেন। বাকি অর্থ ব্যয়িত হয়েছে বিলাসসামগ্রী আমদানি কিম্বা অপ্রয়োজনীয় লোক দেখানো এবং চোখ ধাঁধানো প্রকল্পে। শিগগিরই দেখা গেলো যে, তেল কিম্বা গ্যাসের মওজুদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই বহুজাতিক কোম্পানীগুলো চম্পট দিয়েছে। তাড়াতাড়ি তেল কিম্বা গ্যাস সম্পদ আহরণ এবং মুনাফা অর্জনের লোভে যেখানে -সেখানে তারা খনি খুঁড়ছিলো। সেসব খনিমুখ এলাকা তারা বিধ্বস্ত অবস্থাতেই ফেলে গেছে। বিশাল বিশাল এলাকার মাটি ও পরিবেশে বিষাক্ত থেকে গেছে। এদিকে হঠাৎ পাওয়া অর্থে কিছু মানুষের সমৃদ্ধি বেড়েছিলো, দেখাদেখি সাধারণ মানুষও অর্থলোভী, অলস এবং বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। তারপর হঠাৎ করেই আবার দুর্দিন ফিরে আসার তীব্র আঘাত সহ্য করা তাদের জন্য সহজ ছিলো না।

অর্থাৎ এই দেশগুলোর জ্বালানি সম্পদ ব্যবহার করে উন্নত দেশগুলো আরো সমৃদ্ধ হয়েছে, কিছু রফতানিকারী দেশগুলো আবার দারিদ্র্যের তিমিরে ফিরে গেছে। ওদিকে মানুষের প্রত্যাশা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। সম্পদ ও জাঁকজমকের মোহ কেটে যেতেই সমাজে দেখা দিয়েছে তোলপাড়, অশান্তি আর বিদ্রোহ। সেটা খুবই স্বাভাবিক ছিলো, কেননা আশাহত ও ভাগ্য-বঞ্চিত মানুষ কখনই সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সহায়ক নয়। আরো সাম্প্রতিককালে দুটো দেশের পরিচিত ইতিহাস আমার বন্ধুর সিকি শতকেরও বেশীদিন আগের যুক্তিগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে। ষাট ও সত্তরের দশকে নাইজেরিয়ার তেল সম্পদ অফুরন্ত মনে করা হয়েছিলো। বহুজাতিক তেল কোম্পানীগুলো মধুলোভী মৌমাছির মতোই দেশটিকে ছেঁকে ধরেছিলো। নবলব্ধ পেট্রো-ডলার দিয়ে নাইজেরিয়া উন্মাদের মতো বিলাস সামগ্রী আমদানি করেছে। বিলাসবহুল মোটর গাড়ি না হলে যেন সাধারণ মানুষেরও চলে না। এই সব মনোভাব সাধারণ মানুষকে এমনই পেয়ে বসেছিলো যে, যারা পেট্রো-ডলার পায়নি তারাও বিলাসের বেলায় পিছিয়ে পড়ে থাকতে রাজি ছিলো না। শুনেছিলাম যে, তখন লেগোসে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনারের সরকারী মার্সেইডিস গাড়িও চুরি হয়ে গিয়েছিলো, আর কখনই সে গাড়ি ফেরত পাওয়া যায়নি। মার্সেইডিস গাড়ি তখন নাইজেরিয়ায় সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ইতিমধ্যে ব্যাপক শোনা গিয়েছিলো যে, সামরিকজান্তা এবং কিছুসংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতি ও আমলা তেল রফতানিলব্ধ অর্থের সিংহের ভাগ শোষণ করে নিয়েছে এবং বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। সচরাচর এ ধরনের লোপাট এবং পাচার করা সম্পদের সন্ধান পাওয়া কঠিন; কেউ কখনো সাক্ষী-সাবুদ রেখে দুর্নীতি করে না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু অতি সম্প্রতি জানা গেছে যে, নাইজেরিয়ার একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে; বিদেশী ব্যাংকে তার নাকি একশ' কোটি ডলারেরও বেশী জমা আছে; একজন প্রাক্তন সামরিক শাসকের বাড়িতে নগদই কয়েকশ' কোটি ডলার এবং পাউন্ড পাওয়া গেছে; বিদেশী ব্যাংকে তাঁর পরিবারের নাকি আরো শত শত কোটি ডলার গচ্ছিত আছে। এ পরিবার নাইজেরিয়ার বর্তমান সরকারকে ৪৫ কোটি পাউন্ড ফেরত দিয়ে মামলা থেকে অব্যাহতি পাবার প্রস্তাব দিয়েছিল।

www.pathagar.com

নাইজেরিয়ার ভেতরে এখন যা ঘটছে তাতে কোনো দেশেরই ঈর্ষার কারণ ঘটবে না। পশ্চিম আফ্রিকার এই বিশাল এবং জনবহুল দেশটিকে অজস্র অসমাপ্ত এবং পরিত্যক্ত প্রকল্পের সমাধিক্ষেত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার বদ্বীপ অঞ্চলে বহু নিঃশেষিত তেলকূপ মাটি ও পরিবেশকে বিষাক্ত করে রেখেছে। সে মাটিতে কিছুই ফলে না, ফলানো সম্ভব নয়। সে এলাকার মানুষ পরিবেশের পুনর্বাসন অথবা ক্ষতিপূরণের দাবিতে কয়েক বছর ধরেই আন্দোলন করে আসছিলো। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলেই তেল কোম্পানীগুলোর চাপে নাইজেরিয়ার সামরিক সরকার চার বছর আগে কবি কেন সারাবিবা এবং তার আটজন সমর্থককে ফাঁসি দিয়েছিলো। দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার স্থানীয় মানুষ এখনো সে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। (অক্টোবর '৯৮) আন্দোলনের অংশ হিসেবে তারা তেল উত্তোলনের একটা পাটাতন দখল এবং কয়েকজন বিদেশী তেল কোম্পানী কর্মকর্তাকে পণবন্দী করেছিলো। ঐ অক্টোবরেই যেনতেনভাবে তৈরী একটা তেলের পাইপলাইন ফেটে গিয়েছিলো; গমকে গমকে বেরিয়ে পড়া তেলে আগুন লেগে সাতশ' জনেরও বেশী মানুষ মারা গেছে, আহত হয়েছে আরো কয়েকশ'। এই দরিদ্র মানুষগুলোর বসতি তেলের ওপর হলেও জ্বালানি কেনার সামর্থ্য তাদের নেই; তারা ভাঙা পাইপ থেকে উপচেপড়া তেল সংগ্রহ করে আনতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ দিয়েছে। আরো একটি তথাকথিত তেল ও গ্যাসসমৃদ্ধ দেশ ইন্দোনেশিয়া। এদেশের তেল বাবদ পাওনা অর্থের সিংহ ভাগ দুর্নীতিবাজদের পকেটে গেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এবং তার পুত্রকন্যা ও জামাতারা দেশে এবং বিদেশে হাজার হাজার কোটি ডলারের মালিক হয়েছেন বলে খবরাদি কয়েক বছর ধরেই ছড়াচ্ছিলো। কিন্তু সুহার্তোর অত্যাচারী প্রশাসনের ভয়ে দীর্ঘদিন সে দেশের মানুষ উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায়নি। তেল ও গ্যাস থেকে পাওয়া বিপুল সম্পদে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য লাঘব হয়নি, বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের মতোই তারা বৈধ এবং অবৈধভাবে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান প্রভৃতি দেশে শ্রমিকের চাকুরীর সন্ধানে বেরিয়েছে। আটানব্বইয়ের অর্থনৈতিক সঙ্কট সে দেশেগুলোকেও কাবু করেছে, তারা অন্যদের মতো ইন্দোনেশীয় শ্রমিকদেরও দেশে ফেরৎ পাঠিয়েছে। দারিদ্র্য, অনাহার আর অত্যাচারে জর্জরিত ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষ অবশেষে বিপ্লবের পথ ধরতে বাধ্য হয়েছে। সে বিপ্লবে সুহার্তো ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্কট কাটেনি। তারা রক্তঝরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে; ইন্দোনেশিয়া এখনো সে সঙ্কট পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। হয়তো ইন্দোনেশিয়ায় এবং নাইজেরিয়ায়ও কোনো দিন স্থিতি আসবে। কিন্তু ততোদিনে হয়তো তাদের ভূগর্ভের জ্বালানি সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে; জ্বালানির অভাবে তাদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশে খনিজ তেল এবং গ্যাসের সন্ধান ও উত্তোলনের জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলোর কাড়াকাড়িকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। ছোট এই দেশটির সকল আনাচ-কানাচকে ১১টি ব্লকে বিভক্ত করে ইজারা দেওয়া হচ্ছে। এই

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির গুজব অন্তহীন। এমনকি এই লন্ডনেও প্রধানমন্ত্রীর এক নিকট আত্মীয়া, কোনো একটি বিদেশী তেল কোম্পানী এবং হ্যাম্পস্টেডের একটি বাড়িকে জড়িয়ে নানান গুজব উঠছে। ওদিকে বিদেশী তেল কর্মকর্তা এবং কূটনীতিকরা আড়ালে বলছেন যে, ইজারা নিয়ে মাসের পর মাস বিলম্ব হচ্ছে মন্ত্রী আমলা আর অন্যদের অফুরন্ত খাঁটতি ও দাবির কারণে। এককালের আমদানি লাইসেন্স বিক্রির মতো ইজারা বিক্রি নিয়েও নাকি দরকষাকষি চলছে। বিদেশী কোম্পানীগুলোর সমর্থকরা আড়ালে বাংলাদেশী সমাজ, প্রশাসন আর রাজনীতিকদের নিয়ে ছি-ছি করছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইজারা লাভের তদ্বির চালিয়ে যাচ্ছে কিছু বিশেষ কারণে। বহু দেশেই এখন জ্বালানির অভাব আছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারত অর্থনৈতিক বিকাশের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেতে পারছে না জ্বালানির অভাবে। বাংলাদেশী গ্যাস পাওয়া গেলে এবং খনিজ তেল সামান্য ব্যয়ে সে দেশে রফতানি করা সম্ভব; তেল কোম্পানীগুলোর তাতে কম ব্যয়ে মোটা মুনাফা হবে।

কিন্তু বাংলাদেশের ভবিষ্যতের প্রশ্ন তেল কোম্পানীগুলোর মুনাফার হিসাবের মধ্যে স্থান পাচ্ছে না। স্বাধীনতার পর ২৯টি মূল্যবান বছর অতিক্রান্ত হলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে না। এ সময়ে বাংলাদেশ হাজার হাজার কোটি ডলার বিদেশী সাহায্য পেয়েছে। এ অর্থের সিংহ ভাগই অল্প কিছু লোকের কল্যাণে লেগেছে, দেশের কাজে লেগেছে অতি সামান্য। এদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। সঙ্কট তাতে বহুগুণে বেড়ে যাবে। অর্থনীতির বিকাশ এবং শ্রমশিল্পের প্রসার না ঘটলে এ দেশের মানুষের অন্ন সংস্থান হবে না। কিন্তু ততোদিন বাংলাদেশের জ্বালানি কিম্বা অন্য কোনো সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে কি? এবং বলাই বাহুল্য যে, গ্যাস ও তেল রফতানির অর্থও দলবলে অদৃশ্য হয়ে যাবে। বাংলাদেশ ভবিষ্যতেও আন্তর্জাতিক ভিখিরি হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তার দেশের মানুষের স্বার্থ ও ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। সে জন্যই কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর দেশের মানুষ দুর্দিনে তাঁকে জোরালো সমর্থন দিয়ে আসছে। বিল ক্লিনটন তাঁর দেশের সমুদ্রসীমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সম্পদগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিরাপদ রেখে যেতে চান। যুক্তরাষ্ট্রের দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে, সাধ্যমতো তারা পরস্পরের বিরোধিতা করে এবং রাজনৈতিক দল দুটোর ওপর তেল কোম্পানীগুলোর প্রস্তাব যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, দেশের সমুদ্রসীমার ভেতরের তেল ও গ্যাস সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রাখার ব্যাপারে সংসদের উভয় দলের অনেক সদস্য একমত। বিদেশে যখন সস্তায় জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে তখন নিজের দেশের সম্পদ ব্যবহার করে অনাগত বংশধরদের ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখার প্রয়োজন কোথায়? সেজন্যই প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সমুদ্রসীমায় গ্যাস ও তেলের সন্ধান ও আহরণ আপাতত আরো ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশে এমন দেশপ্রেমী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব আছে কি?

www.pathagar.com

আওয়ামী দু:শাসনের শ্বেতপত্র

ষোড়শ অধ্যায়

ট্রানজিট বিতর্ক

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া: ট্রানজিট বিতর্ক: পক্ষে-বিপক্ষে

ড: এস এম লুৎফর রহমান: ট্রানজিট করিডোর একটি ষড়যন্ত্র

ড: মাহবুব উল্লাহ : ট্রানজিটের ফাঁসে বাংলাদেশ

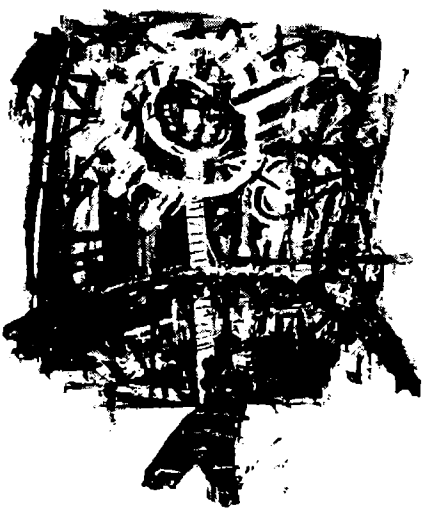

www.pathagar.com

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া

ট্রানজিট বিতর্ক ঃ পক্ষে-বিপক্ষে

ডেটলাইন ঃ ৭ আগস্ট ১৯৯৯

বছর দুই আগে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমমন্ত্রী আইকে গুজরাল সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের আমন্ত্রণে ঢাকা এসেছিলেন। সে সময় তিনি বিশিষ্ট নাগরিকের এক সমাবেশে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপরে বক্তৃতা করেন। তার বক্তৃতার শুরুতেই তিনি জানালেন যে, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ায় ভারতীয়রা খুব খুশী হয়েছেন। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়ে যারা খোঁজ-খবর রাখেন, তাদের বুঝতে বেগ পেতে হয় না কেন ভারতীয়রা বর্তমান সরকারকে আপনজন হিসেবে গণ্য করেন। গত তিন বছরে ক্ষমতাসীন সরকারের কার্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আমাদের বর্তমান সরকার কেন প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রকে আমাদের বন্ধুত্বের ফুলের ডালি উজাড় করে দিতে চায়। আমরা একটি পানি চুক্তি করেছি ৩০ বছর মেয়াদী। পানির মত একটি অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ- যার চাহিদা ক্রমশই বাড়বে– সেই ধরনের একটি জিনিসের সর্বনিম্ন পানি প্রবাহের নিশ্চয়তা ছাড়া ভাটির দেশ বাংলাদেশের অবস্থা কি হতে পারে, তা টের পাওয়া যাবে আর কিছুদিন পরে। বিভিন্ন সময়ে খবরে জানা গেছে যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের বাংলাদেশে অবস্থিত (?) ক্যাম্প নাকি ধ্বংস করা হয়েছে; সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের খবর সমর্থিত অথবা অসমর্থিত কিছুই হয়নি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল তারা যে ভারতের আশ্রয়ে থেকে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করত তা তো স্পষ্ট, কিন্তু ভারতের সাথে এ ধরণের চুক্তি কেন করা হল না যে, ভবিষ্যতে ভারত ভূমি থেকে আর কেউ বিদ্রোহ করলে তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

সাম্প্রতিক সময়ের এ ধরনের অনেক কিছু তুলে ধরা যায় যা থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট হবে যে আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশীকে কোন কিছু প্রতিদান ছাড়াই একের পর এক চুক্তি করতে থাকব। স্থানাভাবে এর সবকিছু এখানে উল্লেখ করছি না– সর্বশেষ যে বিষয়টি আজ সামনে এসেছে তা ভারতকে পশ্চিম বাংলা থেকে ঐদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মালামাল পরিবহনের সুবিধা বা ট্রানজিট প্রদান। এ ব্যাপারে সরকার পক্ষের বক্তব্য প্রথমত আলোচনা করা যেতে পারে।

বলা হচ্ছে যে, ১৯৮০ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা হচ্ছে এই যে, ১৯৮০ সালের চুক্তিটি ১৯৭৩ সালের চুক্তির নবায়নকৃত রূপ। ১৯৮০ সালে যখন চুক্তিটি নবায়ন করা হয়, তখন তা থেকে কোন একটি ধারা বাদ দিলে তা অযথাই একটি বিতর্কের জন্ম দিতে পারতো। বিএনপির তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, এই বিতর্কটি তৎকালীন সরকার এড়াতে চেয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে এটি যদি আর বাস্তবায়ন না করা যায়, তাহলে তার আর কার্যকারিতা থাকে না এবং চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও তা যে

www.pathagar.com

গত ১৯ বছরে বাস্তবায়িত হয়নি সে কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও ১৯৮০ সালে বিএনপি সরকার ট্রানজিট সুবিধা দিয়েই থাকে তাহলে আজ আর সে প্রশ্ন আসছে কেন? সরকার পক্ষ থেকে আর একটি অনুরূপ যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে, বলা হচ্ছে– ১৯৯৩ সালে বেগম জিয়ার শাসনামলে সাপটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তৎকালীন সরকার ভারতকে ট্রানজিট দিয়েছে এ যুক্তিও অসাড়। কারণ প্রথমত, সাপটা চুক্তিটি সার্কভুক্ত সাতটি দেশের যৌথ ইচ্ছার প্রকাশ। এটি একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়ত,এটি আঞ্চলিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য একটি চুক্তি। তৃতীয়ত, এ চুক্তিতে যা বলা হয়েছে তার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় নিম্নরূপ– সার্কভুক্ত দেশগুলো "এতদঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ আরও গতিশীল করার উদ্দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা, যাতায়াত অবকাঠামো এবং ট্রানজিট সুবিধাদি বর্ধিত ও উন্নত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে সাপটা চুক্তির ১২ নম্বর ধারায় ট্রানজিট সম্পর্কে যা উল্লেখ আছে তার উদ্দেশ্যও 'বানিজ্য সম্প্রসারণ'। মূল প্রশ্নটি এখানেই, আমরা ভারতকে যে ট্রানজিট সুবিধা দিতে যাচ্ছি- তাতে কি ভারতের সাথে আমাদের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে? স্পষ্টতই না। অপরপক্ষে ট্রানজিট বলা হত তখনই, যদি নেপালকে বাংলাদেশের সাথে (বাংলাদেশকে নেপালের সাথে) বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য দু'দেশের মধ্যবর্তী ভারতীয় এলাকায় মালামাল পরিবহনের সুবিধা ভারত দিত। এ সুবিধার জন্য নেপাল দীর্ঘদিন যাবত ভারতের কাছে দেন-দরবার করছে, কিন্তু এখনো তা তারা পায়নি। যতটুকু সুবিধা কিছুদিন আগে দেয়া হয়েছে, তাতে এত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে যে ব্যবস্থাটি অকার্যকর হয়ে রয়েছে। এই ট্রানজিটই আসলে সাপটা চুক্তির বার নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমরা যে ট্রানজিট ভারতকে দিতে যাচ্ছি, তা আদৌ সাপটা চুক্তির ১২ নম্বর ধারায় পড়ে না। অথচ এ কথা উল্লেখ করা হচ্ছে বারবার কেবলমাত্র জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই। আর একটি যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত ট্রানজিট দিলে আমরা নাকি বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব। এ নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন– বছরে নাকি ষাট-সত্তর কোটি টাকা উপার্জন করব, কেউ কেউ বলছেন– কয়েক'শ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন– আমরা বছরে ২ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করব। কেউ কেউ আবার আরও এককাঠি ওপরে চারশ' কোটি ডলারের স্বপ্নও দেখিয়েছেন যা হিসাবে আসে ২০ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বাংলাদেশের বার্ষিক বাজেটের সমান– এমন হলে আমরা নাউরু দ্বীপের জনগণের মত মজাসে দিবানিদ্রা দিয়ে আর জিটিভি দেখে কালাতিপাত করতে পারতাম। ফসফেট সমৃদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই দ্বীপটির জনগণের জাগতিক সব চাহিদা মেটাতেই যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাদের মূল্যবান খনিজ বিক্রি করেই নাকি তার থেকে বেশী অর্থ আসে।

অতএব দ্বীপবাসীদের আর কিছু করার প্রয়োজন হয় না। অলস বলে পরিচিত বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিশহাজার কোটি টাকার স্বপ্ন মজার বৈকি। লাখ লাখ লোকেরও নাকি কর্মসংস্থান হবে। গত কয়েক বছরে কত লাখ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছেন তার খবর অবশ্য বলা হয়নি। আর একটি যুক্তি দেকানো হচ্ছে যে, আমর ট্রানজিট দেব না– যা দেব

www.pathagar.com

তা ট্রান্সশিপমেন্ট, এই কথা যেই বললেন ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার, আর সাথে সাথে ঐকতানের মত সবদিক থেকে বেজে উঠল ট্রানজিট না ট্রান্স-শিপমেন্ট। এই ট্রান্স-শিপমেন্ট আসলে কি?

এক পত্রিকার একজন বিশিষ্ট সম্পাদক এর ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আমরা মুটেগিরি করব। আসলে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে এও জনগণকে বিভ্রান্ত করার আরেক কৌশল। যা বলা হচ্ছে তা এই যে, ভারতীয় মালবাহী ট্রাক আমাদের দেশের মধ্যে ঢুকবে না, তাদের মালবাহী গাড়ীগুলো থেকে মালামাল বাংলাদেশ পশ্চিম বাংলার সীমান্তে আমাদের মালবাহী গাড়ীতে ভর্তি করা হবে, আমরা তা বয়ে নিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা বা অন্য কোন সীমান্তে পুনরায় খালাস করে দেব। এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন এসে যায় দুই সীমান্তে দুইবার মালামাল খালাস এবং ভর্তি করার কারণে স্বভাবতই পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যাবে, ভারতীয়রা কখনই বেশীদিন তা মেনে নেবে না, তখন প্রশ্ন আসবে তাদের মালবাহী যানের সরাসরি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলাচলের সুবিধার দাবী। ভারতের ১৫ টনি বিশালাকার যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত পরিবহন অবকাঠামো আমাদের নেই। তখন হয়ত নিজের স্বার্থেই তাদের ব্যবসায়ীরা এ খাতে অর্থলগ্নি করতে চাইতে পারে। ব্যবসায়ী পুঁজি একবার লগ্নি হলে স্বভাবতই তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা চাইবে অবাধ যাতায়াতের জন্য আমাদের সড়ক পথের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বা করিডোর। আর এর পরিণতি কি হতে পারে ইতিহাসে তার ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে।

উপরে যে ঘটনা পরম্পরার দৃশ্য বলা হয়, কেউ কেউ যুক্তি দেখাতে পারেন যে, এ কটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তা বাস্তব নয়। আমরা কিন্তু তা মনে করি না। কারণ ভারত একটি বৃহৎ দেশ। আমরা যতই ঐ দেশের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করি না কেন, অন্যদিক থেকে সে ধরনের মনোভাব প্রকাশিত হবে না। আমাদের বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় অন্তত তাই মনে হয়। লক্ষণীয় যে, নেপাল একটি ছোট দেশ। যারা ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিতের ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত বইটি পড়েছেন তারা জানেন, নেপালকে ভারত যে ট্রানজিট দিতে গড়িমসি করে আসছে তার কারণ ভারতীয়রা মনে করে যে, তার দ্বারা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আমাদের তিনবিঘা করিডোর নিয়েই কি হয়েছে। দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা ছিটমহলগুলোতে যাওয়ার জন্য একটি ফুটবল মাঠের সমান ছোট্ট ভারতীয় ভূখন্ড পার হতে হয় তারও দুই মাথায় ভারতীয়রা রেখেছে কড়া সেনা পাহারা এবং আরো কত বাধা-নিষেধ। সেই দেশ যখন আমাদের দেশের উপর দিয়ে কয়েকশ' মাইল পথ অতিক্রম করবে তাতে যদি বাংলাদেশীরা শঙ্কিত হয়, তাহলে তাদেরকে দোষ দেয়া যাবে কেমন করে।

ভারত আমাদের প্রতিবেশী– এটি একটি ভৌগোলিক সত্য। ভারত বিরাট এক দেশ। অর্থনৈতিকভাবে আমাদের তুলনায় অনেক উন্নত, শিক্ষাদীক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সব কিছুতেই তারা এগিয়ে। অপরদিকে সামরিকভাবেও প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী একটি দেশ ভারত। এগুলোর কোন কিছুই আমরা পরিবর্তন করতে পারব না। এছাড়া আমাদের বিশ্বায়নের যুগে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং স্বাধীন দেশ হিসেবেও টিকে থাকতে পারি। আর তাই

www.pathagar.com

কোনরূপ ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত না হয়ে ভারতের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই আমাদের কাম্য। কিন্তু এ সম্পর্কও সব সময়ই হতে হবে দুটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক। এ দেশে যদি দুর্বল সরকার থাকে, তাহলে ঐ অবস্থায় পৌছানো যাবে না। আমাদের দেশে কোন কোন মহল বর্তমান সরকারকে ভারতঘেঁষা বলে অভিহিত করে, তারা বলতে চায়, এ সরকার নিজেদের দেশের স্বার্থ বিবেচনায় না এনে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতেই যেন উদ্বিগ্ন। এটি একটি রাজনৈতিক বিতর্ক। যার মধ্যে আমরা যেতে চাই না। তবে ক্ষমতা গ্রহণের আগেও যে আওয়ামী লীগের সাথে ভারত সরকারের কোন কোন বিষয়ে শলাপরামর্শ হত, তা উপরে উল্লেখিত জে এন দীক্ষিতের বই থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, তিনি যখন ১৯৯৩ সালে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বৈদেশিক বিষয়ের পরামর্শদাতা বলে পরিচিত জনাব কিবরিয়া (বর্তমানে অর্থমন্ত্রী) তার সাথে দেখা করেছিলেন। এ সাক্ষাৎকারের সময় জনাব কিবরিয়া জানতে চেয়েছিলেন, ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি (যা এ দেশে সাধারণভাবে গোলামী চুক্তি হিসেবে পরিচিত) যদি বাতিল করে বা নবায়ন না করে, তাহলে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া কি হবে। একই বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের প্রধান প্রফেসর রেহমান সোবহানও দীক্ষিতের সাথে আলোচনা করেছিলেন বলে তার বইয়ে উল্লেখ আছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারত সরকারের গ্রীন সিগনাল পেয়েই তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে চুক্তিটি বাতিল করবে– এ ধরনের আরো কত আলাপ-আলোচনা দুই পক্ষের মধ্যে হয়েছে কে জানে। তবে ট্রানজিট সম্পর্কে আর একটি বিষয় আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

১৯৯৪ সালে গুজরাল সাহেব সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসেছিলেন। ঐ সময়ে ইংরেজী দৈনিক দি ডেইলী স্টারে (১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪) তার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি বলেছিলেন, ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিলে ভারত বাংলাদেশকে গঙ্গা নদীর পানি দেবে। দুই বছর পর একই পত্রিকায় প্রকাশিত (৮ জুলাই, ১৯৯৬) ভারতের তৎকালীন বিদেশ সচিব জনাব সালমান হায়দারও একই কথা বলেছিলেন। পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া খুবই দৃঢ়তার সাথে ট্রানজিট সমস্যা শীঘ্রই সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এদিকে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বলতে থাকলেন যে, পানি বন্টন সমস্যার সমাধান আসন্ন। দুই পক্ষের এরূপ আশাবাদ প্রকাশ কী কাকতালীয় নয়?

আমরা এ আলোচনায় ট্রানজিট সমস্যার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছি। বিষয়টি যেহেতু রাজনৈতিক, সেহেতু ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করে এই সমাধান হওয়া উচিত। জাতীয় স্বার্থে যেমন আবেগের কোন অবকাশ নেই, তেমনি অস্বচ্ছতাও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

www.pathagar.com

ড. এস এম লুৎফর রহমান

ট্রানজিট-করিডোর একটি ষড়যন্ত্র

ডেটলাইন ঃ ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০০

সাফ সাফ বলা দরকার যে, 'ট্রানজিট', 'ট্রান্সশিপমেন্ট' ও 'করিডোর'– তিনটি আলাদা আলাদা টার্ম। এগুলোর অর্থ আলাদা আলাদা রকম। অথচ অভিধান অনুযায়ী অর্থ যত রকমই ভিন্ন ভিন্ন হোক বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় সরকারের কাছেই তার অর্থ এক, লক্ষ্যও এক। সেটি হল– ভারতীয় সব যানবাহন বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতের যে কোন এলাকায় যাতায়াত করতে পারবে। ভারতের তরফ থেকে এ দাবি কেবল ভারতীয় বাংলা থেকে গাড়ী চালিয়ে বাংলাদেশের বুক মাড়িয়ে আগরতলা পৌঁছানো নয়, আগরতলা শিলিগুড়ি থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে এবং শিয়ালদা থেকে চালনা-মংলা অবধি অবাধে যানবাহন চলাচলের দাবিও বটে। এই স্থলপথে যাতায়াতের অধিকারের সঙ্গে 'পানিহীন পানিপথে' (নৌ-ট্রানজিট) এবং আকাশ পথের (বিমান ট্রানজিট) ও অবাধ ব্যবহার বা গমনাগমন চায় ভারত। 'পোর্ট ট্রানজিট', 'রোড-ট্রানজিট', 'রেল-ট্রানজিট', 'নৌ-ট্রানজিট', 'এয়ার ট্রানজিট' 'ওয়ার-ট্রানজিট' (সাত এলাকার বিদ্রোহ দমনের নামে)– আজ ভারতের বড় দরকার। আর সে কারণেই সে চায় 'ট্রানজিট'। সাদা বাংলা, মানুষ, পণ্য, বিস্ফোরক, সামরিক কনভয় ও অস্ত্রশস্ত্রবাহী অবাধ চলাচল, যেমনটি ব্রিটিশ আমলে পরিবহনের ব্রিটিশ সরকার করতে পারত; ঠিক তেমনি। অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্ববিধ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। ভারত সরকার, ভারতীয় খবরের কাগজ ও কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীরা একেই বলছেন 'ট্রানজিট'। তারা হৃদ্যতার নমুনা হিসেবেও এই 'ট্রানজিট' চান! এ ব্যাপারে, ভারতে সরকারি দল বিরোধী দলে কোন কোন ভিন্ন মত, ভিন্ন কথা নেই। আলাদা কোন বক্তব্য নেই– ওখানকার ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিকদেরও।

কিন্তু বাংলাদেশের কথা কি, তা আলোচনা করা আবশ্যক। বাংলাদেশ সরকার কি চায়, বাংলাদেশের বিরোধী দল কি চায়, বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলো, কূটনৈতিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীরা কি চান– সে প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ।

সবাই জানেন, গত ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশের সরকারি মহল ভারতের ঐ দাবির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল এবং সে দাবি দ্রুত মেটাবার জন্য আগ্রহীও বটে। ভারত সরকারের এই বিশেষ দাবি মেটাবার উদ্যোগ তাই এ দেশের তখনকার সরকার ১৯৯২ সালেই গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে এ সত্য আলোচনা হয়েছে বলে এখানে তার পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

শুধু বলা দরকার যে, গত আমলে (১৯৯১-১৯৯৫ বা '৯৬) ভারতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভারতের সবরকম ট্রানজিট দেবার চুক্তি সই ও বাস্তবায়ন (আংশিক) হলেও এ আমলেও ঐ সব বিষয়ে একই রকমে পুনরায় চুক্তি সম্পাদন ও তা পুরো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটা একটা রহস্যময় ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু এর হেতু আছে, তা পরে কখনও আলোচনা করা হবে। ভারতীয় দাবিতে একই বিষয়ক পুনঃচুক্তি সম্পাদনে ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহ, ভারতীয় দাবির এত বেশী অনুপূরক যে, বাংলাদেশের জনগণ তাকে সন্দেহের চোখে না দেখে পারছে না। কারণ তারা জানে– 'অতি ভালো, ভালো নয়।' অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ তাদের জানা কথা! শরৎচন্দ্রের কথাটাও আমাদের জানা আছে যে, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না; দূরেও ঠেলে দেয়' সেজন্য অস্বাভাবিক 'ভারতপ্রেম' বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে– ভারতের একশ' পার্সেন্ট অনুগত হলেও এই সরকারকে ভারতীয় সরকার-বেসরকারি তরফ কতটা আপন ভাবে? কতটা ভালোবাসে? কতটা ভালো চোখে দেখে? প্রশ্নটা উঠত না, যদি গত ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস থেকে গতকাল পর্যন্ত (১৭-২-২০০০) অকারণে বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর অপতৎপরতা, সরকারি পুশ-ইন বন্ধ থাকত। বন্ধ থাকত সীমান্তে ভূমিদখল, ছিটমহল দখল, বিডিআর জওয়ানসহ বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা, চর দখল, দ্বীপ দখল, ফসল দখল, গরু-ছাগল চুরি, চোরাচালান, সীমান্ত অস্বীকার করার সাহস দেখাতে ভারতীয় দুই প্রদেশের পুলিশ স্কোয়াডের বাংলাদেশের অনেক ভিতরে ঢুকে আবার প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। অতএব, বাংলাদেশে ভারতপন্থী, ভারতবিরোধী যে কোন সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, ভারতীয়রা যে তাদের অভিন্ন চোখে দেখে এবং এক দাঁড়িপাল্লায় মাপে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার গত সাড়ে তিন বছরেরও বেশী সময় ধরে এসব বিষয়ে ভুক্তভোগী হয়েও যেন নীরবে নিথর। ভারতীয় আচরণের শিকার হয়েও এই সরকারের যেন কথা–

"মেরেছ কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দিবে না॥"

'কলসীর কানা'র আঘাত খেয়ে হয়তো 'প্রেম' দেয়া যায়; কিন্তু সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আঘাতের আঘাত খেয়েও 'প্রেম' দেয়া যায় কিনা, তা জনগণের জানা নেই । এজন্যই জনগণ আজ দু'নেত্রীর 'দায়বদ্ধতার রাজনীতি'র প্রতি বিরূপ হয়ে ভারতের ঐ পরম কাম্য 'ট্রানজিট' বিরোধী হয়ে উঠেছে। সে কথা সরকার বোঝেনি বা বুঝতে পারেনি তাও নয়। তথাপি, তারা জনগণের বিরোধ আমল দিয়ে যেমন ভারতকে, সাফ না বলে দিতে পারছে না, তেমনি তারা তাদের অজ্ঞাত, দুর্বোধ্য ও রহস্যময় দায়বদ্ধতার রাজনীতির জন্য ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তাদের দোটানায় পড়তে হয়েছে। এই 'দোটানা'কে কাটিয়ে উঠতে তারা শব্দের মারপ্যাচের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

www.pathagar.com

তাঁরা ভারতীয় দাবির সাথে একটি কৃত্রিম অমত প্রকাশ করার অজুহাত হিসেবে 'ট্রানজিট'-এর বিপরীতে যে শব্দটি বেছে নিয়েছে সেটি হল 'ট্রান্সশিপমেন্ট'। শব্দটা নতুন। কোন অভিধানে-বিশ্বকোষে নেই। না থাক। তাকে কী আসে যায়। শব্দটার সাথে ট্রাক-লরির সম্পর্ক কিছু মাত্র না থাকলেও এবং রাস্তা দিয়ে জাহাজ চালানো সম্ভব না হলেও তাতে ক্ষতি কি? পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, 'প্রেমের নৌকা পাহাড় বইয়া যায়।' কেননা, গাঁজা খেলে যেমন হুঁশ থাকে না, প্রেমে পড়লেও নাকি তেমনি হুঁশ থাকে না। আর সে 'প্রেম' যদি 'নারী' বা 'পুরুষ' প্রেম না হয়ে, হয়– ক্ষমতাপ্রেম; তাহলে তো কথাই নেই। গাঁজা খোরের গাঁজার নৌকা তখন হিমালয়কেও নদীবৎ গণ্য করে।

এ কারণে আমাদের সরকারি তরফ যখন ভারতের সাথে দরকষাকষির বিভ্রম সৃষ্টি করতে 'ট্রান্সজিট'কে 'ট্রান্সশিপমেন্ট' নাম দিয়ে তার অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করে চলেছে– জনগণ তখন তার মুখোশ খুলে ধরে বলছে– এটা 'করিডোর' দান, 'ট্রানজিট'ও না, 'ট্রান্সশিপমেন্ট'ও নয়। এ হল বৈরী ভারতকে অবাধ যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশের ভূমি ছেড়ে দেয়া। এটা যে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে পারে, সেই যুক্তি দিয়েই ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তানকে তার দূরে দূরে অবস্থিত দু'টি অংশের মধ্যে যাতায়াতের সুযোগ দেয়নি। কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান সরকারের দাবি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রত্যাখ্যান করেন। একই যুক্তি দিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে এবং নেপাল সরকারকে বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও নেপাল থেকে বাংলাদেশে যাতায়াতের বা যানবাহন চলাচলের সুযোগ দেয়নি এবং দিচ্ছে না ভারত। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। ঐ যে আগেই বলেছি– 'ভাবেতে মজিলে মন/যুক্তিটুক্তির কি প্রয়োজন?'

কিন্তু এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সরকারি প্রচার-কৌশল ও প্রচার মাধ্যম (বিটিভি)এর দক্ষতাকে ধন্যবাদ। গত নভেম্বর মাসে বিএনপিকে ঘায়েল করতে 'রেল-ট্রানজিট'-এর সপক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি 'প্রামাণ্য' অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তাতে দু'টি জিনিস দেখানো হয়। তার একটি হল– ১৯৯৪ সাল থেকে পাঁচটি পথে বাংলাদেশ-ভারত রেল ট্রানজিট চালু রয়েছে এবং তাতে প্রচুর অর্থ লাভ হচ্ছে; আর অপরটি হল– ভারত নেপালের পরিবহন-যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশকে ট্রানজিট দিয়েছে। তার প্রমাণও ট্রেন চালিয়ে দেখানো হল। আমরা জানিনে, বিশ্বের কোন দেশের কোন সরকার অন্য দেশের সরকারি চাহিদা মেটাতে এরকম নির্লজ্জভাবে দেশের স্বার্থবিরোধী মিথ্যা প্রচার, নিজেদেরই রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে জনগণের সামনে চালাতে পারে কিনা।

ঐ অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সাহেব নিশ্চয় সচেতন ছিলেন না যে, তিনি সরকারিভাবে সংসদে এবং অন্যত্র দেয়া বক্তৃতা-বিবৃতিতে ভারতকে ট্রানজিট নয়, 'ট্রান্সশিপমেন্ট'-এর সুবিধা দেবার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি। এটি চূড়ান্ত হবে এক্সপার্ট কমিটির সুপারিশে যদি বলা হয়, 'ট্রান্সশিপমেন্ট' দান বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হবে, তবেই তা দেয়া হবে। অথচ সেই 'এক্সপার্ট কমিটি'র রিপোর্ট বা সুপারিশ প্রণয়নের

www.pathagar.com

আগেই বিটিভিতে কিভাবে 'ট্রানজিট'-এর সপক্ষে (ট্রান্সশিপমেন্টেরও নয়) সরকারিভাবে প্রচার চালানো যায়? তাহলে 'এক্সপার্ট কমিটি'র কথা কি ভূয়া? এটাও জনগণকে ধোঁকা দেয়ার আর একটি কৌশল। অন্যদিকে অনুষ্ঠানটি ছিল 'ট্রানজিট' বিষয়ক। নির্দিষ্টত, বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যমান (১৯৯৪ থেকে) 'ট্রানজিট' প্রসঙ্গে। সেখানে বাংলাদেশের ট্রেন নেপাল যাচ্ছে দেখাবার অর্থ কি? বাংলাদেশ-নেপাল ট্রেন লাইন কবে স্থাপিত হয়েছে, কবে চালু হয়েছে– সে তথ্য আজ পর্যন্ত এদেশের কোন পত্র-পত্রিকায় কখনও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। অনুষ্ঠানটির তৃতীয় অসঙ্গতি হল– ১৯৯৪ সাল থেকে পাঁচটি রুট দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত 'রেল-ট্রানজিট' চালু হয়ে থাকলে এবং তাতে বিএনপি আমল অপেক্ষা বর্তমান আমলে কয়েক গুণ বেশী অর্থ লাভ হতে থাকলে; জনমত তো ঐ প্রচারের ফলে 'ট্রানজিট'-এর দিকেই যাবে; 'ট্রান্সশিপমেন্ট'-এর দিকে নয়। তাহলে বর্তমান সরকার 'ট্রানজিট' বাদ দিয়ে 'ট্রান্সশিপমেন্ট'-এর অনিশ্চিত দিকে কেন যেতে চায়? প্রচারণাটি তাহলে 'ট্রান্সশিপমেন্ট'-এর জন্য, না 'ট্রানজিট'-এর জন্য? আর একেই বাংলাদেশের একশ্রেণীর খবরের কাগজ, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী বলেছেন 'করিডোর' দান।

কিন্তু গোটা ব্যাপারটা যে 'করিডোর' 'ট্রান্সশিপমেন্ট' বা 'ট্রানজিট' প্রদান নয়, সাতচল্লিশ-পূর্ব যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন মাত্র; তা দুই নেত্রীর (সরকারি দলের নেত্রী/প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী)ই সরকারি কাজকর্ম, কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। এর কয়েকটি বড় বড় প্রমাণের একটি হল পূর্বে কথিত ১৯৯২ সালে বিএনপি সরকার কর্তৃক '৪৭-পূর্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে সীমান্তের বিভিন্ন যোগাযোগ-পয়েন্টগুলোর অবস্থা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ। তার বিরুদ্ধে তৎকালীন বিরোধী দল কিছুমাত্র প্রতিবাদ জানায়নি।

একই রকম অপর প্রমাণ, বর্তমান সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে গৃহীত পদক্ষেপ। বাংলাদেশ-ভারত উভয় পক্ষের দু'টি প্রতিনিধি দলের যৌথ সীমান্ত পয়েন্টগুলো পরিদর্শন। এর বিরুদ্ধেও বর্তমান বিরোধী দল কোন উচ্চবাচ্য তেমন করছে না, করবেও না।

আর তৃতীয় বড় প্রমাণ, ১৯৯৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী এক মঞ্চে উপস্থিত থেকে উপমহাদেশে পুনরুজ্জীবন নামক সেমিনারে অংশগ্রহণ। সেমিনারটি হয়েছিল 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর' মিলনায়তনে।

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের প্রতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীরও যে তীব্র ক্ষোভ বিদ্যমান, তা সম্প্রতি জনাব গোলাম আযমের একটি উক্তির প্রতি কটাক্ষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তাই এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় বাংলাদেশ সরকার উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবনের জন্যই ভারতের হুকুম বরদার হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং সে কারণে এটি 'করিডোর', 'ট্রান্সশিপমেন্ট', 'ট্রানজিট' কিছু নয়; দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অবস্থা '৪৭-পূর্ব হালতে ফিরিয়ে নেয়াই লক্ষ্য। কোনক্রমেই এটা থেমে থাকবে না, যদি জনগণ এর বিরুদ্ধে রাজপথে না নামে।

www.pathagar.com

ডঃ মাহবুব উল্লাহ

ট্রানজিটের ফাঁসে বাংলাদেশ

ডেটলাইন ঃ ৩ আগস্ট ১৯৯৯

গত ২৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য চলাচলের ব্যাপারে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিবহন করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভিতর দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের প্রস্তাব সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৯৮০ সালের বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ৮ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "Contracting states agree to undertake apropriate steps and measures for developing and improving communication system transport, infrastructure and transit facilities for accelerating the growth of trade with region" সংবাদে প্রকাশ, পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের সুবিধা প্রদানের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ জানানোর প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য চলাচলের প্রস্তাবটি নিয়ে আসে। এ কথা সত্য যে, ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কাল থেকেই ট্রনজিট সুবিধা চেয়ে আসছে। ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ অপরাহ্নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশে ঢাকায় এসে পৌঁছান। ইন্দিরা গান্ধীর এই সফরের সময় ১৯ মার্চ পূর্বাহ্নে বঙ্গভবনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দলিল স্বাক্ষর করেন। এই দলিল দু'টির একটি হল Treaty of friendship, Co-operation and peace between the Republic of India and The Peoples Republic of Bangladesh এবং অপরটি হল Joint Declaration issued at the end of the visit of Prime Minister of India, Mrs, Indira Gandhi to Bangladesh, Dacca, 19 March, 1972. প্রথমোক্ত দলিলটি বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ ২৫ বছর মেয়াদি গোলামী চুক্তির দলিল হিসেবেই জানে। এই দলিলের আর্টিকেল ৮, ৯ ও ১০ বাংলাদেশকে বস্তুত ভারতের সামরিক চাহিদার অনুষঙ্গে পরিণত করে এবং বাংলাদেশ ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন সব দেশের সাথে বন্ধুত্ব ও মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনে নিবারিত হয়। যৌথ ঘোষণা বা Joint Declaration-এর দলিলটিকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ভারত ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকের সিদ্ধান্ত এবং উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারির বৈঠকে সিদ্ধান্তের বরাত দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "Both the Prime Ministers approved the principles of the revival of transit trade and the agreement on border trade. They directed that these agreements as well as the general trade

www.pathagar.com

and payments agreements should be signed by the end of March, 1972" সুতরাং পণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের জন্য ভারতের বারংবার অনুরোধ জানানোর ব্যাপারে জনাব তোফায়েল আহমদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যা বলেছে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, আংশিক সত্য মাত্র। সত্যটা হল এই যে– ভারত বাংলাদেশের কাছে ট্রানজিট সুবিধা (ট্রানজিট কিনা সেই আলোচনায় আমরা পরে আসছি) পাওয়ার জন্য সেই ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকেই কথা পাড়ছিল। ১৯৮০-এর বাণিজ্য চুক্তির বরাত না দিয়ে ১৯৭২-এ ভারত ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়ের বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলা হলে পূর্ণ সত্য বলা হত। সত্য কথনে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচণ্ড লজ্জা। তা না হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঊষালগ্নে তারা যখন ক্ষমতাসীন তখন তারা যা করেছিলেন তা লুকিয়ে রাখবেন কেন? কাজটা যদি সত্যি ভালো হয়, তাহলে এর জন্য অন্যের বা অন্য সময়ের দোহাই পাড়তে হবে কেন? তুমি করেছ বলেই আমি করব এটা কখনই সৎ মানুষের যুক্তি হতে পারে না। লক্ষণীয় যে, ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে যা নিয়ে এত কথা চালাচালি তা বাস্তবায়ন করতে এত বিলম্ব কেন? ইতিহাসের এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৪-এর ১২ মে থেকে ১৭ মে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পাঁচ দিনের জন্য ভারত সফর করেন। এই সফরের সময় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বেশক'টি বিষয়সহ এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, আখাউড়া ও চাঁদপুর হয়ে কলিকাতা ও আগরতলার মধ্যে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালানো হবে। জেএন দীক্ষিত-এর ভাষায় "An agreement was reached to carry out a feasibility study for a rail link between Calcutta and Agartala via Chandpur and Akhaura in Bangladesh" (J. N. Dixit. Liberation and Beyond, Page 186). এই সফরের সময় শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ ও ভারতের সীমারেখায় পরিবর্তন আনার ব্যাপারেও সম্মত হন। সম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেরুবাড়ী ভারতের কাছে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিনিময়ে ভারত দহগ্রাম ও আঙরপোতা ছিটমহলের প্রবেশ পথ বাংলাদেশকে অনাদিকালের জন্য ইজারা দিতে সম্মত হয়। মি. দীক্ষিতের মতে, ১৯৭২-এর মার্চে ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরের পর ১৯৭৪-এ শেখ মুজিবুর রহমানের ভারত সফর ফলাফলের বিচারে ছিল অত্যন্ত সারবত্তাপূর্ণ।

আমরা ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিটের ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কাল থেকেই ট্রানজিটের কথা হচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের মতো প্রবল প্রতাপান্বিত শাসকও ভারতকে ট্রানজিট দিতে পারেননি যা তিনি অন্তত দু'বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধীর নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন। কেন পারেননি তা জেএন দীক্ষিতের ভাষায় বলা যেতে পারে। জেএন দীক্ষিত লিখেছেন, "In the transformed political atmoshphere and in the content of the pressures he was coming under, Mujib could not be responsive to Indian suggestions for tran-

www.pathagar.com

sit facilities through Bangladesh to the North-Eastern states of India. Nor was he capable of responding to the proposal that the Chittagong Port be developed with Indian collaboration as a transit port to the North-Eastern states." (J. N. Dixit: Liberation and Beyond. Page 206) কথাটা তাহলে দাঁড়াল কি? পিতা যা করতে সাহস পাননি কন্যা তাই করেছেন। একজন দোর্দণ্ড স্বৈরাচারী হওয়া সত্ত্বেও পিতা কিছু কিছু ব্যাপারে জনমতকে সমীহ করতেন অথচ ২৮ জুলাই'র মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হল কন্যা জনমতের থোড়াই কেয়ার করেন। এজন্যই সম্ভবত ইংরেজি প্রবচনে বলা হয়েছে, Where angels fear to tread, Fools walk in কথা বলে ১৯৮০ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতকে ট্রানজিট বা করিডোর দেয়ার অঙ্গীকার করাই হয়ে থাকে তাহলে আজ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হচ্ছে কেন? কিংবা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারই বা দরকার কি? আসলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এখন '৮০ সালের চুক্তির দোহাই পাড়া হচ্ছে। ১৯৮০ সাল থেকে গত ১৯ বছর ভারত এটা আদায় করে নিতে পারেনি কেন? আর বাংলাদেশ যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তাহলে তা প্রতিপালন কেন করেনি? ভারতের কৌশলটি অত্যন্ত স্পষ্ট, বাংলাদেশে যখন ভারতের পছন্দের সরকার ক্ষমতাসীন থাকে না তখন ভারত বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে অনীহ হয়। আর যে মুহূর্তে আওয়ামী লীগের মতো ভারত পছন্দ সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে, তখন দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানের ভান করে ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। ঐতিহাসিকভাবে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দেশে দেশে ট্রানজিটের যে ব্যবস্থা চালু আছে তা হচ্ছে– প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে বা দ্বিতীয় একটি রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে তৃতীয় রাষ্ট্রে গমনাগমনের জন্য। ট্রানজিটের এই সুযোগ ভুবেষ্টিত রাষ্ট্রের ন্যাচারাল রাইট হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভুবেষ্টিত এলাকা নয়। শিলিগুড়ির ভিতর দিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তার স্থল যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ব্যবহার করে ভারত তার এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পণ্য চলাচলের যে দাবি তুলেছে তাতে অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে এমন সন্দেহ অমূলক নয়। ভারত বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারত থেকে ভারতেই পণ্য নিয়ে যাবে। কাজেই এটাকে কোনক্রমেই ট্রানজিট বলা যায় না। এটা করিডোর ইতিহাসে নজির আছে। এরকম করিডোর দিতে গিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশ বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইউরোপের মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন আসে। এসব পরিবর্তনের একটি ফল হল নতুন রাষ্ট্র হিসেবে পোল্যান্ডের অভ্যুদয় কি অর্থে বলা যায়, একটি পুরাতন রাষ্ট্রের পুনরাবির্ভাব। প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার ভূখণ্ড নিয়ে এই রাষ্ট্রটি গঠিত হয়। পোল্যান্ডকে সমুদ্র পথে যাওয়ার সুযোগ দেবার জন্য এক অদ্ভুত কাজ করা হল। জার্মানী বা প্রুশয়াকে কেটে দুই ভূখণ্ডে ভাগ করা হল এবং পোল্যান্ডকে সমুদ্রে পৌঁছানোর সুযোগ দেয়ার জন্য একটি ভূমি করিডোর

www.pathagar.com

দেয়া হল। ফলস্বরূপ পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রুশিয়ায় যাওয়ার জন্য এই পোলিশ করিডোর অতিক্রম করতে হত। এই করিডোরের কাছেই রয়েছে বিখ্যাত ডানজিগ নগরী। ডানজিগ নগরীকে একটি মুক্ত নগরীতে পরিণত করা হল অর্থাৎ এই নগরী জার্মানীরও নয়, পোল্যান্ডেরও নয়। এটা হয়ে গেল লীগ অব নেশানস-এর আওতায় নিজেই একটা রাষ্ট্র। জওহরলাল নেহরু লিখেছেন- We find thus that after the world war, Europe as indeed the whole world to some extent, was like a seething cauldron. The peace of versailles and the treaties did not improve matters. The new map of Europe settled some old national problems by freeing the poles and the Czechs and the Baltic peoples. But at the same time it created fresh national problems by puttintg part of the Asutrian Tyrol under Italy, and part of Ukraine under Poland and by other unhappy territorial distributions in esatern Europe. The most curious and irritating arrangement was that of the Plish corridor and Danzig (Jawaharlal Nehru: Glimpses of World History, Page-792)

পোলিশ করিডোর ও ডানজিগের অদ্ভুত ও বিরক্তিকর পরিণতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নেহরু আরও লিখেছেন-

Germany accepted her western Franch frontier as defined by the Treaty of versailles; as to her castern frontier, with the Polish corridor to the sea She refused to accept it as final, but she promised to use peaceful means only in her attempts to get it changed. If any party broke the agreement, then the others bound themselves to stand together to fight it (Jawaharlal Nehru Glimpses of World History, Page-809) পোলিশ করিডোরের এই সংঘামতয় তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশের বুক চিরে ভারতকে করিডোর সুবিধা দিলে বাংলাদেশের জন্য তা কি বিস্ময়কর পরিণতি নিয়ে আসবে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতের একাংশ থেকে ভারতের অন্য অংশে পণ্যসামগ্রী চলাচলের সুবিধাদানের নীতিগত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ভারতকে করিডোর দেয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই অনুমোদনের নিহিতার্থ হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অস্তিত্ব বিনাশেরই অনুমোদন। ইতিপূর্বে, পার্বত্য কালো চুক্তি ও বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পাদনও ছিল এই সরকারের বাংলাদেশবিরোধী পদক্ষেপসমূহের প্রকট দৃষ্টান্ত। ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে ১৯৭২ সাল থেকেই ট্রানজিটের নামে করিডোর সুবিধা লাভের জন্য চাপ প্রদান করে আসছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি মৌলনীতি হল- কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়, অথচ ভারত কখনই বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনাগুলো মিটিয়ে দেয়নি। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি অভিন্ন

www.pathagar.com

নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশকে প্রদানের বিষয়টি আজও অমীমাংসিত, দক্ষিণ তালপট্টি আজও ভারতের দখলে, ছিটমহল সমস্যার আজও কোন সম্মানজনক সমাধান হয়নি, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিনা উস্কানিতে সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক ও বিডিআর জোয়ানদের হত্যা করছে এবং বাংলাদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করছে, ভারত-বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ও একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল সীমা চিহ্নিত হয়নি, পুশইনের নামে ভারত বাংলাদেশের ওপর প্রায় দুই কোটি জনসংখ্যার বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইছে, দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে ভারত পার্বত্য বিদ্রোহীদের আশ্রয় ও মদদ দিয়েছে– ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এতগুলো সমস্যা অমীমাংসিত থেকেছে শুধুমাত্র ভারতের আধিপত্যবাদী মানসিকতার কারণে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হওয়ার সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বহির্বাণিজ্যের সুবিধার্থে কলিকাতা বন্দরে ছয় মাসের জন্য ট্রানজিট সুবিধা চাওয়া হয়েছিল, তখন নেহরু প্যাটেলরা বলেছিলেন ছয় মাস তো দূরের কথা ছয় দিনের জন্যও নয়। অতি সম্প্রতি ঢাকায় এসকাপের উদ্যোগে এশিয়ান হাইওয়ে সংক্রান্ত আলোচনায় ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা পাকিস্তানকে পূর্বের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্য হাইওয়েতে পাকিস্তানী যানবাহন ব্যবহারের বিরোধিতা করেছে। একই সঙ্গে নেপালকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা দিতে আপত্তি করেছে। ভারত প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সবকিছু পেতে চায় বিনিময়ে কিছুই দিতে চায় না। বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাবান্ধা সীমান্তবন্দরে ১৯৯৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর নেপাল-বাংলাদেশ ট্রানজিট উদ্বোধন করলেও তা ভারতের অসহযোগিতার কারণে ১৫ মিনিটের বেশী কার্যকর হয়নি। নেপালের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট বাণিজ্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে ভারতের প্রথম ডেপুটি হাই-কমিশনার ও ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব জেএন দীক্ষিত বিষয়টি সোজাসাপ্টা ভাষায় কবুল করে নিয়েছেন। দীক্ষিত লিখেছেন– Our security and political agencies felt that allowing transit facilities to Bangladesh through our territory to Bhutan and Nepal would only increase the problems that India already faced in terms of illegal migration and security threats" (J. N. DIXIT : Liberation and Beyond, Page 253).

ভারত তার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সাবধান অথচ অন্যের নিরাপত্তার বিষয়টি মোটেও আমলে আনতে চায় না। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭টি রাজ্যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলছে। এই বিদ্রোহকে সহজসাধ্যভাবে দমনের জন্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সামরিক সরঞ্জাম এবং রসদসামগ্রী সরবরাহের জন্যই ভারত বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। বাংলাদেশ সরকার ভারতের এই অভিসন্ধিতে সাড়া দিলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা চরমভাবে ক্ষুণ্ন হবে। কারণ বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিরোধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণের জন্য এটা কখনই কাম্য নয়।

www.pathagar.com

সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, ভারতীয় কনটেইনারগুলো পরখ না করেই সীলড অবস্থায় ভারতে প্রেরণের সুবিধা দেয়া হবে। এরকমটি যদি হয় তাহলে ঐসব কনটেইনারে করে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখনও স্থিতিশীলতা অর্জন করেনি। ফলে হরতাল, ধর্মঘটজনিত কারণে ভারতীয় কনটেইনারগুলোর চলাচল বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হলে তার জন্য ভারত অতিরিক্ত ডেমারেজ চার্জ করতে পারে। এ ছাড়া যদি কোন কারণে কনটেইনারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ভারত এগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর কভার দাবি করতে পারে। ফলে, বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের গমনাগমনের সুযোগও উন্মুক্ত হবে। এ নিয়ে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে বাংলাদেশ ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। সুয়েজ খালকে কেন্দ্র কের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইসরাইলের আক্রমণের শিকার হয়েছিল মিসর। আমরা যেন সে কথা ভুলে না যাই। এ ছাড়া পোলিশ করিডোরের তিক্ত অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই।

অনেকেই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট তথা করিডোর দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার যুক্তি হাজির করেন। ইতিমধ্যে অবাধ চোরাচালানের ফলে বাংলাদেশ ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে। তার ওপর ট্রানজিটের নামে আগত ভারতীয় কনটেইনারে ভর করে আরও শতগুণ চোরাচালানি পণ্যসামগ্রী চোরাচালানে সয়লাব বাংলাদেশের বাজারে মহাপ্লাবন সৃষ্টি করবে না তার নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? ফলে বাংলাদেশের শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, কেউ কেউ মনে করেন ভারতকে ট্রানজিট দিলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যে বাংলাদেশী পণ্য প্রবেশাধিকার পাবে। এই যুক্তিও ধোপে টেকে না। কারণ অধিকতর দক্ষ ভারতীয় শিল্পের পণ্য যদি কম পরিবহন ব্যয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে পৌঁছতে পারে তাহলে নিকটবর্তী রাজ্যসমূহে নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিযোগী হয়ে উঠবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কি জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে, কি অর্থনৈতিক দিক থেকে ট্রানজিটের নামে করিডোর হবে বাংলাদেশের বড় ফাঁস। ট্রানজিটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ভারতীয় কূটনীতিকরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার পিনাক আর চক্রবর্তী গত ৩০ জুলাই ইউএনবির মাধ্যমে যে বিবৃতি দিয়েছেন এটা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ট্রানজিটের সুযোগ নিয়ে উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে ভারত তার সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহন করতে পারে বিরোধী দলের এ অভিযোগ সম্পর্কে চক্রবর্তী বলেন, 'এটি হচ্ছে কিছু লোকের অস্বচ্ছ কথাবার্তা, যাদের এর বিরুদ্ধে অন্য কোন যুক্তি নেই। অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের বিরুদ্ধে তাদের কোন বক্তব্য নেই।' এ থেকে স্পষ্ট যে, ভারত বাংলাদেশের ঘাড়ে ট্রানজিট চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এ জন্য বাংলাদেশের বিরোধী

www.pathagar.com

রাজনীতিকদের সমালোচনা করতেও ভারতীয় কূটনীতিক কসুর করছেন না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এটা হল ভারতীয় কূটনীতিক-এর নির্জলা হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয় নিয়ে কথা বলার সাহস এরা কোত্থেকে পান? ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র অনুধাবন করতে হবে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অনিরুধা গুপ্ত লিখেছেন– "India may like to stretch its strategic parameters from Mauritious to Fiji, from the Burmese borders to Aksai Chin, but its, immediate concern is to establish primacy in the region whereby its neighbours should accept that their national security cannot stay apart from but must become conplementary to India'. This calls for the construction of a regional order in which the ranks of south Asian nations are determind by the nature of their relations with India. This is what we call the Brahmatic Framework of power in world affairs. (Anirudha Gupta: A Brahmatic Framework of Power in South Asia?- Economic and Political Weekly, April 7, 1990) অনিরুধা গুপ্তের মতো একজন ভারতীয় পণ্ডিত তার প্রবন্ধে ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার ব্রাহ্মণরূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "The primacy India seeks to achieve in the sub-continent is that of the Brahman in relation to other nations in the region. Whether they accept or reject India's authority, their position must be determined by the nature of their positive of negative relation to India, as the regional Brahman!"

ট্রানজিটসহ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের প্রশ্নে আমাদের অবশ্যই ভারতীয় রাষ্ট্রের এই ব্রাহ্মণসুলভ চরিত্রটি স্মরণ রাখতে হবে। অন্যথায়, আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

ট্রানজিট করিডোরের অর্থহীন অর্থনীতি

বাংলাদেশোত্তরকালে এ দেশের অর্থনীতিবিদরা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বেশ অনীহ হয়ে পড়েছেন। পাকিস্তান আমলে এমন পরিস্থিতি ছিল না। সে সময় আঞ্চলিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য, সরকারের রাজস্বনীতি, মুদ্রানীতি, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রবাহের ওপর তাদের ছিল প্রচণ্ড প্রভাব। বাংলাদেশ আমলে অর্থনীতিবিদদের এই প্রভাব অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। অর্থনীতিবিদরা নিজেদের পেশাদারিত্বের খোলসে আবদ্ধ করতে গিয়ে দেশ ও সমাজের ওপর প্রভাব হারিয়ে ফেলেছেন। অর্থনীতিবিদদের এই নেপথ্যচারী ভূমিকা

www.pathagar.com

কাঙ্খিত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তাদের এই নেপথ্যচারী আচরণ দেশবাসীকে মূল্যবান পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করছে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

এ দেশের কয়েকজন অর্থনীতিবিদ সম্প্রতি ভারতকে ট্রানজিট/করিডোর দেয়ার প্রশ্নে তাদের স্বভাবসুলভ নীরবতা ভঙ্গ করেছেন। দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার কাছে এ বিষয়ে গত ৬ আগস্ট তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো খুব সুস্পষ্ট না হলেও চিন্তার খোরাক সৃষ্টিতে অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ সবিস্তারে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তার প্রতিক্রিয়া দ্ব্যর্থতায় ভরপুর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিপূর্ণ। প্রফেসর মাহমুদকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন থেকে জানি। অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্ত ও প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রতিটি পরীক্ষায় সগৌরবে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করার কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদালয়ের মতো জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতি শাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে তার যোগ্যতা তাকে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টায় পরিবৃত হতে সাহায্য করে। এমন একজন প্রতিশ্রুতিবান মানুষের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক বেশী। প্রফেসর মাহমুদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, "আমরা যে ধরনের পণ্যসেবা দিচ্ছি তাতে কি স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে? বিশ্বে আর কোথাও এভাবে ট্রানজিট সুবিধা দিয়েছে কিনা কিংবা ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার কারণে স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। সেদিক থেকে বাংলাদেশের এ ধরনের সুবিধাদান আমি বলব একটি ইউনিক উদাহরণ। বাংলাদেশের তুলনায় ভারত অনেক বড় দেশ। এখন বাংলাদেশকে তারা তাদের করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এই ছোট্ট ভূখণ্ড তাদের নানা দিকে থেকে বন্দী করে রেখেছে। তারা একই ভূখণ্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে পারছে না। আর সেজন্যই বাংলাদেশের কাছে তাদের এই চাওয়া। ট্রানজিট দেয়া হলে তা আমাদের স্বাধীনতার জন্য হুমকি হবে কিনা, তা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। কারণ এ বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দরকার তা আমার নেই।" প্রফেসর মাহমুদ জানেন না বিশ্বে আর কোথাও এভাবে ট্রানজিট সুবিধা দিয়েছে কিনা– এ কথা বিশ্বাস করা যায় কি? তিনি কি পোলিশ করিডোরের কথা জানেন না, তিনি কি ইটালীর ফিউমের কথা শোনেননি, তিনি কি সুয়েজ খালের ও পানামা খালের রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা জানেন না? আধুনিককালের যে কোন শিক্ষিত মানুষের এ বিষয়েগুলো নখদর্পণে থাকার কথা। তাহলে "এ ধরনের সুবিধাদান আমি বলব একটি ইউনিক উদাহরণ"– এ কথা বলার মধ্য দিয়ে তিনি ট্রানজিটওয়ালাদের খুশি করতে চাইছেন? তার যা প্রতিভা তাতে তো কাউকে তোয়াজ করার কোন কারণ নেই। বাংলাদেশের ছোট্ট ভূখণ্ড ভারতকে নানাদিক থেকে বন্দী করে রেখেছে, তারা একই ভূখণ্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে পারছে না– প্রফেসর মাহমুদের এই কথাটি

www.pathagar.com

মোটেও সত্য নয়। শিলিগুড়ি দিয়ে ভারতীয় যাত্রী ও পণ্যসামগ্রী উত্তর-পূর্ব ভারতে চলাচল করতে পারে। এই তথ্য কেন যে তার নজরে আসল না আমি বুঝে উঠতে পারছি না। প্রফেসর মাহমুদ ট্রানজিট দেয়া হলে আমাদের স্বাধীনতা যে হুমকির সম্মুখীন হবে সে বিষয়ে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নেই বলে জানিয়েছেন। আমি আগেই বলেছি, প্রফেসর মাহমুদ একজন প্রতিভাধর অর্থনীতিবিদ। বিশ্বের যেসব প্রতিভাধর অর্থনীতিবিদের কথা শুনেছি, পড়েছি এবং যাদের স্বচক্ষে দেখেছি তারা তো তাদের জ্ঞানচর্চা শুধুমাত্র অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। ক্লাসিক্যাল যুগে অর্থনীতিকে বলা হত 'পলিটিক্যাল ইকোনমি' বা 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি হিসেবে যে জার্নালটির সম্পাদনার সাথে প্রফেসর মাহমুদ জড়িত আছেন সেটির নাম 'বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি'। রাজনীতির অঙ্গনে অর্থনীতির প্রধান সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয় বলেই রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক গভীর। লেনিন বলেছেন, "Politics is the concentrated expression of economics" অর্থাৎ "রাজনীতি অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ।" গুনার মির্ডাল, জোয়ান রবিনসন, জে এম কেইন্স, ন্যুট ইউক্সেল, জন স্টুয়ার্ট মিল, ডেভিড রিকার্ডো, স্যামুয়েলসন পারেটোর, স্টিগলার, মিল্টন ফ্রিডম্যান, বুকানন, হার্বাট সাইমন, রজেনস্টাইন রোডান, জানোস কোরনাই, অটাসিক, রেনে দ্যুমো, জিরাড ডেবরু, জে আর হিকস, ডন প্যাটেনকিন, অমর্ত্য সেন, এফ এ হায়েক, কৌশিক বসু, সুখময় চক্রবর্তী, কৃষ্ণা ভরদ্দাজ, অমিয় কুমার বার্গচী, র‍্যামন্ড ফার্থসহ আরও যতসব জগতের নামকরা অর্থনীতিবিদের কথা আমরা জানি তারা কেউ ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বের বিষয়গুলো চর্চা ও অনুধাবন না করে নিছক অর্থনীতি শাস্ত্রের বৃত্তে আবদ্ধ থেকে সফল অর্থনীতিবিদ হয়েছেন এ কথা বলা যাবে কি? তাহলে প্রফেসর মাহমুদ কি কারণে রাজনীতির ওপর অর্থনীতির প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে আড়ষ্ট হন তা বুঝে উঠতে পারিনি। তার কাছে বোদ্ধা সমাজের প্রত্যাশা অনেক বড়। যে কোন কারণেই হোক না কেন, তিনি যদি তার স্বভাবসুলভ আড়ষ্টতা ত্যাগ করে স্পষ্ট ভাষণে সাহসী হতেন তাহলে জাতি উপকৃত হত। তাহলে তার এত বড় হওয়ার পেছনে জাতির কাছে তার যে ঋণ সেটা কিঞ্চিৎ পরিশোধিত হত।

প্রফেসর মাহমুদ বলেছেন, "কথা হচ্ছে, ট্রানজিট ইস্যুকে আমরা কিভাবে অপারেট করছি তা দেখা দরকার– এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না আমরা ভারতকে সুবিধা দিলে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হব। এতে আমাদের অর্থনৈতিক প্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু এই খাতে কত আয় হবে তা আগে থেকে অনুমান করতে পারার কথা নয়। এটা তো অর্থনীতির সেই চিরাচরিত সরবরাহ ও চাহিদা সূত্রের ব্যাপার। এখানে বাংলাদেশের মনোপলি ব্যবসা করার সুযোগ রয়েছে। ডিমান্ড যত বেশী হবে ততই আমাদের অবস্থান সুসংহত করতে পারব, তবে একই সাথে দেশের সিকিউরিটি দেখতে হবে। চাহিদা বেশী হলে টোলও বেশী বসাবে। এক্ষেত্রে ৪০০ ডলার না তার চেয়ে বেশী হবে তা আগে

www.pathagar.com

থেকে নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। আমি মনে করি, এই অঙ্ক ভেরিয়েবল। এটা পরিবর্তনশীল হবে।"

আমার কথা হল, সমস্যাটা কেবলমাত্র দক্ষভাবে অপারেট করার বিষয় নয়। অপারেট করার অর্থ হচ্ছে, আমরা ট্রানজিট/করিডোর দিতে প্রস্তুত আছি। আমি বলব, আমরা করিডোর দিতে চাই না। এজন্য আমার যেমন নিরেট অর্থনৈতিক যুক্তি আছে, তেমনি আছে রাজনৈতিক যুক্তি। প্রফেসর মাহমুদ বাংলাদেশের মনোপলি ব্যবসা করার সুযোগ আছে বলে মনে করেন। মনোপলি সম্পর্কে অর্থনীতির পাঠ্যবইয়ে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া আছে। মনোপলি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা একজন, ক্রেতার সংখ্যা অনেক। এ কারণে এ বাজারে বিক্রেতা পণ্য সেবার দাম ও পরিমাণ দুটোই নির্ধারণ করতে পারেন। মনোপলি ব্যবসায়ীর লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। প্রশ্ন হল, ভারতকে ট্রানজিট/করিডোর সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশ যে পণ্য চলাচল সুবিধা ভারতের কাছে বিক্রি করবে তাতে যে বাজার কাঠামোর উদ্ভব ঘটবে তা কি মনোপলি না বাইলেটার‍্যাল মনোপলি। বাংলা ভাষায় 'বাইলেটার‍্যাল মনোপলি' কথাটির অর্থ হল 'দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার' বাইলেটার‍্যাল মনোপলিতে বিক্রেতা থাকে একজন, ক্রেতাও থাকে একজন। এক্ষেত্রে বিক্রেতা বাংলাদেশ, ক্রেতা ভারত। অনস্বীকার্য যে, ট্রানজিট/করিডোরের সুবিধা ভারতের শত শত ব্যবসায়ী-শিল্প প্রতিষ্ঠান ভোগ করবে। কিন্তু তারা এই বাজারে পৃথক পৃথকভাবে প্রবেশ করবে না। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার হবে তাদের মাধ্যম। সেক্ষেত্রে ভারত সরকারই তাদের মুখপাত্র হয়ে তাদের স্বার্থের কথা বলবে। একটি ব্যবসায়ী ফার্মের সাথে শ্রমিকরা যখন ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয়ে মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য দরকষাকষি করে তখন নির্দিষ্ট শ্রমের বাজারের চরিত্র হয়ে পড়ে 'বাইলেটার‍্যাল মনোপলি'। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের যে ভূমিকা, ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট/করিডোরের ব্যাপারে হবে ভারত সরকারের একই ভূমিকা। সুতরাং স্পষ্টতই এখানে পক্ষমাত্র দু'টি- ভারত ও বাংলাদেশ। প্রফেসর মাহমুদের ভাষ্যমত একজন ও অনেকজন নয়। একরম বাজারে বিক্রেতা যে দাম চায় এবং ক্রেতা প্রাথমিকভাবে যে দাম প্রদান করতে চায় তার মধ্যে বিরাট একটা ফারাক থাকে বলে বাজারে দামের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। ফলে উভয়ের মধ্যে দরকষাকষি শুরু হয় এবং অবশেষে ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রাথমিকভাবে ঘোষিত দামের মাঝামাঝিতে দাম নির্ধারিত হয়। দাম কত হবে সেটা নির্ভর করে ক্রেতা বিক্রেতার দরকষাকাষির ক্ষমতা এবং উভয়ের অন্যান্য ধরনের ক্ষমতার ওপর। অর্থনীতির বিশ্লেষণের হাতিয়ারগুলো সম্পর্কে যাদের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা A Koutsoyinunis প্রণীত Modern Micro Economics গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮৯ থেকে ১৯১ পৃষ্ঠায় Bilateral Monopoly সংক্রান্ত সেকশনটি দেখে নিতে পারেন। Bilateral Monopoly -তে দুই পক্ষের লেনদেনের চুক্তির শর্তাবলী কি হবে? এ প্রসঙ্গে প্রফেসর স্যামুয়েলসন

www.pathagar.com

এবং উইলিয়াম ডি, নরঢাস তাদের Economics গ্রন্থে বলেন, "Unfortunately, this is one important question that no economic theory can answer with precision. This is a situation known as 'Bilateral Monopoly' where two sides have strong bargaining power. The result depends on psychology, politics and countless other intangible and unperdictable factors. As far as the economist is concerned, however, the final outcome of Bilateral Monopoly is in principle indeterminate- as indeterminate as the haggling between two millionaires over the value of a fine painting. (ত্রয়োদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা–২৭০) Bilateral Monopoly-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হল, যদি পণ্য বা সেবার বাজারে এই বাজার কাঠামো বিরাজ করে তাহলে ক্রেতা একচেটিয়া বিক্রেতাকে কিনে ফেলার চেষ্টা করে এবং এভাবে সে তার উৎপাদনের Vertical Integration ঘটায়। এই Vertical Integration-এর ফলাফল অভিনব। এতে উৎপাদন বাড়ে এবং পূর্বোক্ত মনোপলিস্ট বিক্রেতা যে দাম আদায় করতে চায় তার তুলনায় দাম হ্রাস পায়। তাহলে বাংলাদেশ যদি ট্রানজিট/করিডোর সুবিধার মাধ্যমে ভারতের কাছে পণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট সেবা বিক্রয় করে তাহলে একদিন যদি ভারত গোটা বাংলাদেশটাকেই নিয়ে নিতে চায়, যার ফলে সে বহু মাধ্যম ও বহু পথে উত্তর-পূর্ব ভারতে পণ্য বিপণন করতে পারবে তাতে অসম্ভব কি আছে? ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কাশ্মীরে কারগিল যুদ্ধ চলা অবস্থায় বাংলাদেশে এসেছিলেন ঢাকা-কলিকাতা বাস সার্ভিস উদ্বোধন করতে। তিনি সে সময় উক্তি করেছিলেন যে, ভারতের বহুদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেছিলেন, মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটিসের কথা। ভারতের বহুদিনের পরিকল্পনাটি কি? পরিকল্পনাটি হল, ভারতের '৪৭ পূর্ব মানচিত্রে ফিরে যাওয়া। এগুলো নেহরু ডকট্রিন, ইন্দিরা ডকট্রিন ও গুজরাল ডকট্রিনেরই কথা। ভারত তার বহুদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ক্রমাগতভাবে কোশেশ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বিদ্রোহের মদদ দিয়ে, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনে উৎসাহ যুগিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের ৫৪টি অভিন্ন নদী থেকে পানি প্রত্যাহারের আয়োজন করে, ছিটমহলের জটিলতা অব্যাহত রেখে, উভয় দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা চিহ্নিত না করে এবং বাংলাদেশের ভেতরে পঞ্চমবাহিনী সৃষ্টি করে ভারত তার বহুদিনের পরিকল্পনা সুচারুভাবে বাস্তবায়িত করে চলেছে। বাংলাদেশের কাছ থেকে ট্রানজিট/করিডোর আদায় করাও ভারতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারই অংশ। এদিকে ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশের আয় কত হবে সেই অংক বৃদ্ধির এক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। গত ১১ আগস্ট বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর এক অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতকে ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ বছরে আড়াই বিলিয়ন বা ২৫০ কোটি

www.pathagar.com

মার্কিন ডলার আয় করবে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২,৫০০ কোটি টাকা। অথচ কয়েকদিন আগে সিলেটের বিয়ানী বাজারের এক সামাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ বছরে ৪০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪০ কোটি ডলার আয় করবে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এই অংক দাঁড়ায় দুই হাজার কোটি টাকা। অপরদিকে, একটি ইংরেজি দৈনিকে রিপোর্ট করা হয়েছে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদের মতে, ভারতকে ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ দৈনিক ১ কোটি টাকা করে বছরে ৩৬৫ কোটি টাকা আয় করবে। যারা এসব হিসাব দেন তারা প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তি অথচ এদের হিসাব একেকরকম। এরা কেউ ট্রানজিট দিতে গিয়ে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক ব্যয় হবে তার উল্লেখ করছেন না। বাংলাদেশের সড়ক পথগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ হবে, বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথে মহাযানজট সৃষ্টি হবে, বাংলাদেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য চলাচলের সুযোগ হারাবে, বাংলাদেশের শিল্প কারখানাগুলো বিলুপ্তির পথে যাবে, বাংলাদেশে চোরাচালান বৃদ্ধি পাবে, বাংলাদেশ উত্তর-পূর্ব ভারতে তার স্বাভাবিক বাজার হারাবে, ভারতীয় যানবাহনের ডিজেল ও পেট্রোলের যোগান দিতে গিয়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের ওপর চাপ পড়বে এবং সর্বোপরি, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে– এসব কোন কথাই তারা বলছে না। শুধুমাত্র বাংলাদেশের জনগণকে প্রলুব্ধ করার জন্য শত-সহস্র আয়ের অংকের হিসাব ঝুলানো হচ্ছে। বলা হয়, বাংলাদেশের ২৫টি পণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা পাবে। এটাতো "খোলামফুচি' মাত্র। অপরদিকে, ট্রানজিটের Bilateral Monopoly মার্কেটে বাংলাদেশের দর কষাকষির কোন হাতিয়ার অবশিষ্ট রইল কি? বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে অভিন্ন নদীর পানি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতা, সমুদ্রসীমায় বা এ ধরনের অন্যান্য বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোন সুবিধাই চাওয়া হল না। অথচ ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার জন্য কি টোল পাওয়া যাবে তা নিয়ে দর কষাকষির টেবিলে বসলে ভারত এসব বিষয় নিয়ে বাংলাদেশকে Bully করতে পারবে। হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করার স্বপ্ন তখন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্থনীতি

ড: মাহবুব উল্লাহ: বাজেটের রাজনৈতিক অর্থনীতি

ড: মোহাম্মদ আবদুর রব : আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশ : ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মুনশী আবদুল মান্নান: সরকারের এক নম্বর সাফল্য দাবী এবং বাস্তবতা

শাহ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম: অর্থ ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে চরম দুর্যোগ

শাহ আহমেদ রেজা: জাতীয় অর্থনীতি মহাদুর্যোগের সম্মুখীন

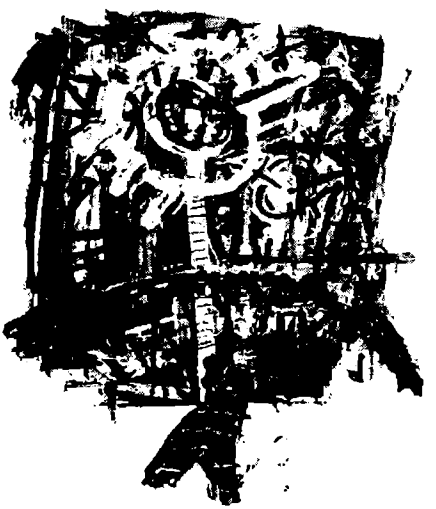

www.pathagar.com

ডঃ মাহবুব উল্লাহ

বাজেটের রাজনৈতিক অর্থনীতি

ডেটলাইনঃ **১৪ জুন ২০০০**

অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে আগামী ২০০০-২০০১ অর্থবছরের জন্য ৪২ হাজার ৮৫৯ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পেশ করেছেন। ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হবার পর বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের এটা ৫ম বাজেট। ক্ষমতায় থাকার ক্ষেত্রে আগাম ছেদ না পড়লে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এই বাজেট বাস্তবায়নেরও পূর্ণ সুযোগ পাবে। এমনকি পরবর্তী অর্থবছরের জন্য আরেকটি বাজেট পেশ করে যেতে পারবে। বাস্তবে এর কতটা সম্ভব হবে তা নির্ভর করছে দেশের রাজনৈতিক হালচালের ওপর।

অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থায়নের সংক্ষিপ্তসার নিম্নোক্ত সারণী থেকে দেখা যেতে পারে:

অর্থায়নের সংক্ষিপ্ত সার

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ		বাজেট ২০০০-২০০১	সংশোধিত বাজেট ১৯৯৯-২০০০	বাজেট ১৯৯৯-২০০০
রাজস্ব প্রাপ্তি	কর রাজস্ব	১৯২৭৭	১৭০৯৬	১৮৬৩৫
	কর বহির্ভূত রাজস্ব	৪৯২১	৪২৪৯	৫৫১৬
	মোট	২৪১৯৮	২১৩৪৫	২৪১৫১
ব্যয়	অনুন্নয়ন রাজস্ব	১৯৬৩৩	১৮৪৪৪	১৭৮০০
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৭৫০০	১৬৫০০	১৫৫০০
	অন্যান্য	৫৭২৬	৩০০৯	২৮৭৮
	মোট	৪২৮৫৯	৩৭৯৫৩	৩৬১৭৮
সামগ্রিক ঘাটতি		১৮৬৬১	১৬৬০৮	১২০২৭
অর্থসংস্থান	বৈদেশিক সম্পদ	৯৪২১	৮৮৩২	৮৩৬০
	অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৭২৬	৩৮৪২	৩৬৬৭
	ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ	৩৫১৪	৩৯৩৪	০
মোট অর্থায়ন		১৮৬৬১	১৬৬০৮	১২০২৭

www.pathagar.com

২০০০-২০০১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটটি রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সরকারের বিদায়ের মুহূর্ত যত কাছাকাছি চলে আসে এবং ভোটারদের মুখোমুখি হবার বিবেচনা যখন জরুরী হয়ে পড়ে তখন বাজেট প্রণয়নে জনতুষ্টিবাদী প্রবণতা অর্থনৈতিক যৌক্তিকতাকে পরাস্ত করে। এবারের বাজেট তার ব্যতিক্রম নয়। নির্বাচনে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য 'ভোটার পছন্দ' ব্যয়ের ফর্দ ও দলীয় ক্রোনি (Crony) সৃষ্টির সহায়ক সুযোগ-সুবিধা এই বাজেটকে আকীর্ণ করে ফেলেছে। এবারের বাজেট যে কারণে অর্থনীতিবিদসহ নানা মহলের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার বিষয়ে পরিণত হয়েছে তাহলো অর্থায়নের বিষয়টি। বিদায়ী অর্থবছরে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা সফল হয়নি এবং ব্যাংকিং খাত থেকে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ কতটুকু বাস্তবানুগ সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন তোলা যায়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের কর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮,৬৩৫ কোটি টাকা। অথচ এই অর্থবছরে কর আদায় সম্ভব হয়েছে ১৭,০৯৬ কোটি টাকা ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪,২৪৯ কোটি টাকা। ফলে রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২,৮০৬ কোটি টাকা কম হয়েছে। অন্যদিকে, অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭,৮০০ কোটি টাকা, কিন্তু সংশোধিত বাজেটে এই ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৮,৪৪৪ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় লক্ষমাত্রার চাইতে ৬৪৪ কোটি টাকা বেশী। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। একদিকে রাজস্ব সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা, অন্যদিকে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন নির্বাহ করার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি সরকারের জন্য অর্থায়নের সংকট সৃষ্টি করেছে। ফলে সরকারকে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিতে হয়েছে ৩,৯৩৪ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়ে ব্যয় নির্বাহের কোন প্রস্তাবনা ছিল না। এবার তো অর্থমন্ত্রী যে বাজেট প্রস্তাব রেখেছেন তাতে কোন রাখঢাক না করেই অর্থমন্ত্রী জানান দিয়েছেন ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৫১৩ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ নেয়ার কথা না থাকলেও রেকর্ড পরিমাণ প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিতে হয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে এমন আস্থা রাখা খুবই কঠিন যে , সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৩,৫১৪ কোটি টাকায় সীমিত রাখতে পারবে। বস্তুত অর্থমন্ত্রী জনাব কিবরিয়া এবারের বাজেট পেশের মাধ্যমে জাতিকে জানিয়ে দিলেন রাজস্ব আদায়ে সরকারের পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার এবং অর্জনের অসম্ভব রাজস্ব আদায়ের উচ্চচাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রার কথা।

প্রশ্ন হলো, সরকার রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলো কেন? এর কারণ দ্বিবিধ- প্রথমতঃ রাজস্ব প্রশাসনের ব্যর্থতা; দ্বিতীয়তঃ ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। রাজস্ব প্রশাসনের ব্যর্থতা মূলতঃ প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবজাত। দেশের সামগ্রিক কর ব্যবস্থায় এমন কিছু দুর্বলতা রয়েছে যার ফলে কর আদায়কারী কর্মকর্তারা কর আদায়ে উৎসাহ বোধ করার চাইতে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হতে বেশী উৎসাহ বোধ করেন-

www.pathagar.com

করদাতারাও কর প্রদানের চাইতে কর না দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আমাদের দেশে এখনও কর প্রশাসন প্রণোদনা (Incentive) ভিত্তিক না হয়ে হুকুম নির্ভর রয়ে গেছে। আজকের যুগে হুকুম নির্দেশের ব্যবস্থাপনা কত যে অকার্যকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার ফলে আইন বহির্ভূত অর্থনৈতিক খাত (যেমন- চোরা চালান, অবৈধ মাদক ব্যবসা, আমদানীর সময় ভুয়া ঘোষণা) স্ফীত হয়। ফলে সরকারের রাজস্ব আদায়ের সফলতা অর্জন করতে পারে না। বেআইনী অর্থনৈতিক খাত স্ফীত হলে আইনী অর্থনৈতিক খাত মার খেতে বাধ্য। আইনী অর্থনৈতিক খাতের বিকাশের তাৎপর্য হলো মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে হিসাবযোগ্য জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ। এ ধরনের বিকাশ কৃষি ও অকৃষি উভয়খাতেই সম্ভব। তবে, সরকারের রাজস্ব আদায়ের অন্যতম উৎস হলো শিল্প ও সেবাখাতের সমন্বয়ে গঠিত অকৃষিখাত । এ খাত থেকেই আসে ভ্যাট ও আবগারী শুল্ক। আমাদের দেশে রাজস্ব আদয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা মূলত কাংপিখত শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনের ব্যর্থতা। একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকার কত দক্ষভাবে অর্থনীতিকে পরিচালনা করতে সক্ষম তা বিচার করা যায় শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির মাত্রা থেকে। বিগত বছরে এই খাতে অর্থনীতি ছিল স্থবির। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ৫.৫ শতাংশ হারে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ঘটেছে বলে সরকার যে দাবি করছে তা প্রধানত উৎসারিত হয়েছে আত্মপোষণশীল (subsistence) কৃষিখাত থেকে। এ খাতের উৎপাদন নির্ভর করে কৃষকের বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তির (Survival instinct) ওপর, তদুপরি রয়েছে প্রকৃতির উৎপাদন-অনুকূল আচরণ। এক্ষেত্রে সরকার খুব সামান্যই সাফল্যের দাবিদার হতে পারে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ১২ মাসের গড়ে মূল্যস্ফীতির হার ৪.৫৮ শতাংশ। সামষ্টিক অর্থনীতির স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই হার সন্তোষজনক। কিন্তু ভবিষ্যতে মূল্যস্ফীতি অসহনীয় স্তরে বৃদ্ধি পেয়ে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। বাংলদেশের জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশের ব্যয়ের তালিকায় খাদ্যসামগ্রী প্রধান স্থান দখল করে আছে। যদি খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকে তাহলে অবাঞ্ছিত মূল্যস্ফীতি ঘটতে পারে না। অপরদিকে, খাদ্যশস্যের দাম নির্ভর করে খাদ্য উৎপাদনের মাত্রাকে সন্তোষজনক রাখার মূল্যস্ফীতির অভিঘাত বাঞ্ছনীয় স্তরে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। যদি আগামীতে প্রকৃতি বিরূপ হয় তাহলে সরকারের ঋণ করিয়া ঘি খাইব' নীতি মারাত্মক মূল্যস্ফীতি ঘটাতে পারে। সেক্ষেত্রে ভোটারপ্রিয় বাজেট ক্ষমতাসীন দলের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়ার ক্ষোভ বাজেট-উত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এ কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়েনি এবং ব্যাংকিং খাতে যে অতিরিক্ত তারল্য আছে সেটাকে আমরা উন্নয়নশীল কাজে অর্থাৎ বিনিয়োগে ব্যবহার করেছি। আর বাংলাদেশই বিশ্বে এরকম একমাত্র দেশ নয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে সরকারের ব্যাংকঋণের পরিমাণ

www.pathagar.com

শতকরা ১০ ভাগের বেশী। পাকিস্তানে এ অবস্থা হয়তো তারচেয়েও খারাপ। উন্নত দেশেও এভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ হয়। জাপানে শতকরা ৮ ভাগের উপর ঋণ করা হয়েছে।" অর্থমন্ত্রী পাকিস্তানের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত। পাকিস্তানের অর্থনীতি কত যে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে তা সম্প্রতি সেদেশের সামরিক সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে কঠোর এবং করদাতাদের কাছে অপ্রিয় সিদ্ধান্তের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে জাপানে মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে ঘাটতি অর্থায়ন কাম্য হতে পারে আর ভারতের রয়েছে একটি শক্তিশালী, বিকাশমান শিল্প ও সেবা খাত। অর্থমন্ত্রী সম্ভবত একটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন নন যে, ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থায়নের কুফল একটা খধম বা সময়গত ব্যবধানের পর দেখা দেয়। তাছাড়া বাংলাদেশে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ প্রধানত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যই করা হয়। অবকাঠামোর উন্নয়ন ব্যয় বিশাল এবং এর সুফল অর্থনীতিতে অত্যন্ত মন্থরগতিতে আসে বলে অবকাঠামোগত বিনিয়োগের মূল্যস্ফীতিগত চাপ বেশ তীব্র। ফলে আগামী দিনগুলোতে মূল্যস্ফীতি সহনীয় স্তরে বজায় থাকবে-একথা হলফ করে বলা যায় কি?

একটি দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য করারোপ ও জনগণের কাছ থেকে ধার করে তহবিল সংগ্রহ করা যথেষ্ট নাও হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে অনেক উন্নয়নশীল দেশে ঘাটতি অর্থায়ন প্রকল্প প্রণয়নকারীদের কাছে আকর্ষণীয় বিবেচিত হয়েছে। ঘাটতি অর্থায়ন তখনই হয় যখন একটি সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ করে অতিরিক্ত খরচের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করে। এভাবে অর্থায়ন অতিরিক্ত নোট ছাপানোর নামান্তর। এই পদ্ধতিতে অর্থায়ন করার সুবিধা হল এই যে, সাধারণ কর ও জনগণের কাছ থেকে ধার করার তুলনায় অনেক বেশী পুঁজি সৃষ্টি করা যায়। এছাড়া আর্থিক আয় বাড়ার ফলে পণ্য ও সেবার চাহিদা উচ্চুস্তরে বজায় রাখা সম্ভব হয়। এর ফলে উৎপদনকারীরা অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। এই নতুন বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। তবে, ঘাটতি অর্থায়নের অন্তঃস্থিত কারণ মূল্যস্ফীতি কারক। যতক্ষণ পর্যন্ত নবলব্ধ আয় অলস মুদ্রার সমতুল্য থাকে অর্থনীতির ওপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। যদি নতুন চাহিদা ভোগ্যপণ্যের বর্ধিত উৎপাদন দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় তাহলে অর্থনীতি কাম্যমাত্রায় সম্প্রসারিত হবে। কিন্তু বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে বর্ধিত ভোগ চাহিদা খাদ্যশস্যের মতো উৎপাদনের দিক থেকে অস্থিতিস্থাপক পণ্যের ওপর নিপতিত হয় তাহলে মূল্যস্ফীতির চক্রাবর্ত সৃষ্টি হবে। বিগত সময়ে খাদ্যোৎপাদন সহায়ক পরিবেশের কারণে লক্ষ্যমাত্রার চাইতে বেশী হওয়ায় মূল্যস্ফীতির সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না বলে মূল্যস্ফীতির হুমকী থেকেই যাচ্ছে।

একটি বাজেট নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করা যেতে পারে। প্রথমত, বাজেট প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি মূল্যস্ফীতি না মূল্য সংকোচন পরিহার? দ্বিতীয়ত, বাজেট যেসব সুবিধা দেয়

www.pathagar.com

সেসব কি এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? তৃতীয়ত, কোন অপচয়ধর্মী খরচ করা হয়নি তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়কি? চতুর্থত, কর ব্যয় এবং কাজের বণ্টন সকল শ্রেণী ও আয়স্তরের মানুষের মধ্যে বোঝা ও সুবিধাকে ভাগ করে নেয়ার সুযোগ দেয় কি? বস্তুত অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখা যাবে বিদায়ী অর্থ বছরের বাজেট ও প্রস্তাবিত বাজেট এই ৪ টি বিচার্য বিষয়ে কাম্য ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে ১ জুলাই ২০০০ থেকে ৩০ জুন ২০০১ সময়ের মধ্যে কোন প্রকার শর্ত ব্যতিরেকে ১০ শতাংশ হারে আয়কর প্রদান সাপেক্ষে অঘোষিত আয় ঘোষণার সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কর বিভাগ কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে এরূপ ঘোষণা গ্রহণ করবে। কালো টাকার মালিকরা তাদের দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের দ্বারা অর্জিত কালো টাকা হালাল করার একটা মোক্ষম সুযোগ পেল। কিন্তু যেসব সদাচারণকারী ব্যক্তিরা নিয়মমাফিক এর চেয়েও উচ্চচহারে আয়কর প্রদান করে আসছেন তারা কি এর ফলে তাদের সদাচারণের জন্য তিরস্কৃত হলেন না? এটা অত্যন্ত অন্যায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার ফলে দেশের সর্বত্র চাঁদাবাজি, তোলাবাজি, চোরাপণ্যবাজি, ডাকাতি ও ছিনতাই বেশুমার বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি, তবুও কেউ যদি দাবী করেন সরকারের চাইতে বেসরকারি মাস্তান, চাঁদাবাজ ও তোলাবাজরা অনেক বেশি পরিমাণ নিরীহ জনগণের ওপর এক ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে-তা বলা অযৌক্তিক হবে কি? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সরকারের তুলনায় এসব বেসরকারি 'কর আদায়কারীরা' অনেক বেশী দক্ষ ও শক্তিশালী। কথা হল এভাবে জবরদস্তি তোলাবাজির পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের কর্মকান্ড নানারকম অনিশ্চয়তা ও ভীতির মধ্যেও যে চালিয়ে যাচ্ছে- এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, সরকারি প্রশাসন দক্ষ হলে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বেশ পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব । আমরা সকলেই জানি, জনগণের কাছ থেকে বেসরকারি এজেন্টদের তোলা আদায় কোনোক্রমেই দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। অর্থমন্ত্রী কি তার বাজেট প্রস্তাবনায় চাঁদাবাজিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য কোনো অভিনব ধরনের বাজেটারি পলিসি উত্থাপন করতে পারতেন না? অর্থনীতি শাস্ত্রে আজকাল যেভাবে প্রণোদনা উৎসাহিত ও নিরুৎসাহিত করার কলাকৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে তার ফলে এতদুদ্দেশ্যে কোনো ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা কঠিন হত না। কিন্তু তা না করে কালো টাকাকে সাদা করার সুযোগের প্রস্তাব রেখে অর্থমন্ত্রী কি চাঁদাবাজ, তোলাবাজ, ছিনতাইকারী ও দুর্নীতিবাজদের বেআইনী কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করলেন না? তাহলে আমরা কি ধরে নেব এসব দুস্কৃতকারীরা শাসকদের লালিত-পালিত?

www.pathagar.com

বিগত সংশোধিত বাজেটে দেখা যাচ্ছে প্রথমবারের মতো গত ৫ বছরের মোট সম্পদপ্রাপ্তিতে রাজস্ব আয়ের অংশ ৬০ শতাংশের নিচে নেমে গেছে এবং একইভাবে ব্যাংকসূত্র থেকে অর্থায়নের প্রায় ১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষণীয় বিষয় হল, ব্যাংকসূত্রের অর্থায়ন অব্যাহত থাকবে ৯ শতাংশের ওপর এবং মোট সম্পদ প্রাপ্তিতে রাজস্ব আয়ের অংশ ৮২.৮ শতাংশে দাঁড়াবে। অন্যদিকে, বৈদেশিক অনুদানের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অসম বোঝার সৃষ্টি করবে। বর্তমান সরকারের আমলে ক্রমাগতভাবে ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত কমে এসেছে। গত ৪ বছরে জিডিপিতে রাজস্ব হিস্যার পরিমাণ যথাক্রমে ৯.৪৯, ৯.৩৮, ৮.৯৭ এবং ৮.৮৫ শতাংশ।

বাজেটে রাজস্ব ব্যয় সবচেয়ে বড় বরাদ্দের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় লোক প্রশাসনে। এই খাতে বৃদ্ধি হয়েছে ২৫%। এ থেকে অনুমান করা যায়, আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের জন্য এই বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক সংস্কার ও পূনর্বিন্যাস ব্যতিরেকে এই উদ্দেশ্য সফল হবে কি? তাছাড়া নির্বাচনের আগে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দিয়ে তুষ্ট করার একটি প্রচেষ্টাও এর মধ্য নিহিত থাকতে পারে। বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্নীতিপরায়ন ৫টি দেশের মধ্যে অন্যতম। দুর্নীতিতে প্রশাসনিক দুর্নীতি অন্যতম। দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র না দিয়ে কেবলমাত্র লোক প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি করে কোনো ফলোদয় হবে না।

গত তিনবছরে বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ২১ থেকে ২২ শতাংশে স্থবির হয়ে রয়েছে। এর ভেতর ব্যক্তি বিনিয়োগ জিডিপির ১৫.৫ শতাংশে স্থির হয়ে রয়েছে। গত বছর মোট বিনিয়োগ ছিল ২২.১ শতাংশ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে এটি ছিল ২২.৪ শতাংশ। এর মধ্যে ব্যক্তি বিনিয়োগ সামান্য বেড়ে ১৫.[illegible] শতাংশ হয়েছে। শিল্পখাতে স্থবির হয়ে রয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে জিডিপিতে শিল্পখাতে বিনিয়োগ ছিল ১৫.৯ %। ১৯৯৮-৯৯ সালে কমে হয় ১৫.৬ % এবং সমাপ্ত বছরে তা আরও কমে দাঁড়ায় ১৫.৪%। শিল্পে বিনিয়োগের এই প্রবণতা কোনোক্রমেই কাম্য নয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সামাজিক সেবামুলক খাতে বরাদ্দ অঙ্কের হিসেবে বড় দেখালেও গুণগত বিচারে তাৎপর্যহীন। শিক্ষাখাতে সর্বোচচ পরিমাণ ৫,৫৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই খাতে বরাদ্দ কোথায়, কিভাবে ব্যয় করা হবে তা বোঝা না গেলে এই বরাদ্দের ব্যাপারটা হবে গালভরা বুলিমাত্র। কারণ, নিছক বেতন ভাতা ও ইট-সুড়কীর ওপর ব্যয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোনোক্রমেই যুগোপযোগী হতে সাহায্য করবে না।

www.pathagar.com

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটি হচ্ছে বিদ্যুৎখাতে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ২০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে এই খাতে শুল্ক আদায় করা হয়েছে ৪৪ কোটি টাকা। বিদ্যুতের দাম দফায় দফায় বাড়ছে, বিদ্যুতের ব্যবহারও বাড়ার কথা, তাহলে মাত্রাতিরিক্ত কম মাত্রায় বিদ্যুতের শুল্ক দেখানো হল কেন? প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য উন্নয়ন ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল ৯৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০৬ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থবছরের এই খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হযেছে ১০৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ ২২৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য উন্নয়ন ব্যয় ধার্য করা হয়েছে শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশি। শুনেছি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি সুপার ক্লাস লাক্সারী বিমান কেনা হবে। এই বিমান খরচটাও কি এর অন্তর্ভুক্ত? প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কোন উন্নয়নের জন্য এত বেশি বরাদ্দ হয়েছে অর্থমন্ত্রী তা খোলাসা করে বলেননি। কেউ যদি সন্দেহ করে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য শতাধিক কোটি টাকা বাড়তি বরাদ্দ করা হচ্ছে তা অমূলক হবে কি? সবকিছু মিলিয়ে এ কথা বলা যায় প্রস্তাবিত বাজেট ও সংশোধিত বাজেট সরকারের অদক্ষতা, অপরিণামদর্শিতা এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদ দুষ্ট, জনগণের ওপর আরোপিত খরচের বোঝা বই আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রব

আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশ: ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ডেটলাইন ঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০০০

আপাত বাহ্যিক দিক দিয়ে জোড়াতালি ও গোঁজামিল দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আওয়ামী লীগ সরকার একটি প্রবৃদ্ধিশীল এবং অবস্থাসম্পন্ন দেখানোর চেষ্টা করলেও খোদ সরকারি হিসাবেই দেশের অর্থনীতির ক্রমাবনতিশীল চিত্র ফুটে ওঠে। গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের ১৯৯৯ সালের (জুন) মাসে প্রকাশিত 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা' (অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়)-এর তথ্য থেকে দেখা যায়, আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের GDP (Gross Domestic Products) বা গড় জাতীয় উৎপাদন ক্রমেই নিম্নগামী হয়ে চলেছে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম জাতীয় বাজেটে যেখানে জিডিপি প্রবৃত্তির হার ১৯৯৬-৯৭-এ ছিল ৫.৯%, ১৯৯৭-৯৮ এ তা ৫.৭% এ দাঁড়ায় এবং ১৯৯৮-৯৯-এ মাত্র ৪.৪% এ নেমে আসে। শেষোক্ত হিসাবটি বিশ্বব্যাংক-এর উৎস হতে প্রকাশিত সাম্প্রতিক 'এশিয়া উইক' থেকে নেয়া। ঐ একই উৎস থেকে দেশের মুদ্রাস্ফীতির ক্রম-উর্ধ্বগামিতার চিত্র দেখা যায়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে যেখানে দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল মাত্র ৩.৯%, পরের বছর ১৯৯৭-৯৮ সালে তা ৭.০%-এ উন্নীত হয় এবং ১৯৯৮-৯৯-এ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৮% এ দাঁড়ায় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৯)। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জিডিপি'র সাথে সাথে দেশের মানুষের মাথাপিছু গড় আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতির দিকে। গত তিনটি অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় G.N.O (Nom) ৩১০-৩৩০ মার্কিন ডলার থেকে (নভেম্বর, ২০০০) তা ২৯৯ মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে। আওয়ামী সরকারের শাসনামলে দেশের ছোট-বড় কল-কারখানা শিল্প স্থাপনা দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়েছে। বিদেশী বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের বাণিজ্যিক আগ্রাসনের মুখে বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের হাজার হাজার শিল্প স্থাপনা, মিল, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং দেশের শিল্পোৎপাদন দারুণভাবে কমে যাচ্ছে। দেশের পাট শিল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশের বর্তমানকালের অর্থনীতির মূল চালিকা গার্মেন্টস শিল্পও প্রচণ্ড চাপ ও হুমকির মুখে। আওয়ামী লীগের ভারতমুখী ত্রুটিপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যনীতির ফলে আমাদের গার্মেন্টস শিল্প উল্লেখযোগ্য হারে বৈদেশিক রপ্তানি কোটা হারিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ১৯৯৯ সালের 'বংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' থেকে দেখা যায়, দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প-বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উভয় ক্ষেত্রেই দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি দারুণ নিম্নাভিমুখী।

www.pathagar.com

১৯৯৫-৯৬ সালে দেশের গড় শিল্পোৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৩ ভাগ; ১৯৯৬-৯৭ তা ৩.৫%-এ নেমে আসে এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা দাঁড়ায় মাত্র ২.২% ভাগে।

আওয়ামী সরকারের শাসনামলে দেশের প্রান্তিক ক্ষুদ্র কুটির শিল্প-নির্ভর উদ্যোগক্তাদের অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে গেছে। আওয়ামী শাসনের বিগত পাঁচ বছরে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অবাধ সস্তা ও বাহ্যিক চাকচিক্যময় পচা ভারতীয় পণ্যের বল্গাহীন আমদানিকে সরকারি প্রশ্রয় ও মদদ্‌দানের ফলে বাংলাদেশের গরীব তাঁতীরা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তারা তাঁদের হাজার হাজার কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাঁরা এখন অসহায় হয়ে পথে বসেছে। দেশের মাঝারি এবং ছোট ব্যবসায়ীদেরও ঐ একই অবস্থা। এককথায়, দেশের শিল্প উৎপাদনের অবস্থা চরম দুর্বল ও ভঙ্গুর।

আওয়ামী সরকার দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ফাঁকা বুলি আওড়ালেও খাদ্যদ্রব্যের ক্রম-ঊর্ধ্বগতি, মাছ-গোশ্‌ত ও তরিতরকারির অগ্নিমূল্য এবং ভোজ্যতেল, দুধ, ডিমসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দুর্লভ্যতা আওয়ামী সরকারের তথাকথিত স্বয়ম্ভরতার অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রকটিত করে তুলেছে। সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের F.P.M.U-এর তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৯৬-৯৭ সালে যেখানে দেশে সর্বসাকুল্যে ৯৬৭ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। আওয়ামী শাসনের পরবর্তী দুটি অর্থবছরে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা কয়েক গুণ বেড়ে যথাক্রমে ১৯৫১ হাজার মেট্রিক টন এবং ৫৪০৬ হাজার মেট্রিক টনে দাঁড়ায়।

দেশের অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতির মূল চালিকা বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতও আওয়ামী সরকারের অদূরদর্শিতা, অপরিপক্কতা ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। বিদেশী মাফিয়া বহুজাতিক কোম্পানীর নব্য ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিভিন্ন বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর সাথে যোগসাজশ করে আওয়ামী লীগ দেশের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত অলাভজনক উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তির মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানীসমূহের কাছে তুলে দেয়ার চক্রান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে। পরিহাসের বিষয়, আমাদের দেশের সম্পদই নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে ঐ সব বিদেশী বহুজাতিক বেনিয়া কোম্পানীগুলো তা দ্বিগুণের চেয়ে বেশী মূল্যে আবার আমাদের কাছে বিক্রি করার উদ্যোগ নিয়েছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এবং ভারত ও মার্কিন সরকারের নেপথ্য যোগসাজশে বাংলাদেশের মাত্র ১০/১২ ট্রিলিয়ন সিএফটি প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদকে ৪০/৫০ এমনকি কখনো কখনো ১০০ ট্রিলিয়ন সিএফটি সম্ভাব্য মজুদপ্রাপ্তির গোয়েবলসীয় প্রচার চালিয়ে দেশের ১৩ কোটি জনগণকে বিভ্রান্ত করে ঐ বেনিয়া বিদেশী কোম্পানীগুলো দেশের অত্যন্ত মহার্ঘ্য ও সীমিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে ভারতে পাচার করে দেবার নীলনক্‌শা বাস্তবায়ন করে চলেছে। উল্লেখ্য,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ শিল্প-স্থাপনা, কল-কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী প্রকল্প দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস-নির্ভর তাপবিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। আওয়ামী সরকার যখন ভারতে আমাদের অত্যল্প অনবায়নযোগ্য বা 'নন-রিনিউএ্যাবল' (Non-Renewable) প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ গ্যাস রপ্তানির অশুভ পাঁয়তারায় রত তখন গত ৪ ডিসেম্বর, ২০০০ দেশে লোডশেডিংয়ের রেকর্ড সৃষ্টি হয়। ঐ দিন দেশব্যাপী নজিরবিহীন প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট পরিমাণ লোডশেডিং হয় এবং দেশের ৩টি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬টি ইউনিটের মধ্যে ১২টি বন্ধ পয়ে পড়ে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া ও প্রলম্বিত লোডশেডিং এখন দেশের অতি পরিচিত নাগরিক দুর্গতি ও অর্থনৈতিক শোচনীয়তার পরিচায়ক।

বাংলাদেশের আল্লাহ প্রদত্ত চমৎকার বিনিয়োগ উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী সরকারের দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের হার কমিয়ে দিয়েছে। খোদ আওয়ামী সরকারের সমর্থক বলে পরিচিত 'থিংক ট্যাঙ্ক' অধ্যাপক রেহমান সোবহান পরিচালিত 'সেন্টার পর পলিসি ডায়লগ' (সিপিডি) প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, বর্তমানে দেশের বিদেশী বিনিয়োগ খাতে চরম মন্দা চলছে। জিপিডি ও ইউপিএল-এর যৌথভাবে প্রকাশিত ঐ রিপোর্টে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনীতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেশের প্রখ্যাত আওয়ামী ঘরানার অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের লেখা প্রবন্ধ "Recent Trends in Bangladesh Economy, 1999"-তে দেখা যায়, ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে যেখানে বাংলাদেশে ৩২০.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশী নীট ইনভেস্টমেন্ট হয়, পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গিয়ে ২৬২.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পরের অর্থবছরে তা আরো কমে গেছে। এমনকি অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারী দেশের বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে তাদের বিনিয়োগ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেয়ারও উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানা গেছে। ডক্টর ভট্টাচার্যের ঐ একই প্রবন্ধ থেকে দেখা যায়, আওয়ামী শাসনামলে দেশের আমদানি ও রপ্তানি অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই চরম নেতিবাচক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে দেশে মাত্র ৫.১৫% ভাগ আমদানি বৃদ্ধি হয় এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা খুবই অল্প বেড়ে ৬.৪৬% বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ঐ একই অর্থবছরদ্বয়ে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ সালে দেশের রপ্তানি অর্থনীতির অবস্থা আরো করুণ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে যেখানে গড় ১৬.৮২ ভাগ প্রবৃদ্ধি ঘটে পরের বছর তা মাত্র ৩.০%-এর চেয়েও নিচে নেমে যায়। দেশের অর্থনীতি বিপুলাংশে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর হয়ে পড়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বাংলাদেশকে মোট ১৬৬১.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৭৯০.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে ২৬৪৮.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশী আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয় এবং ঐ সকল অর্থবছরে যথাক্রমে

www.pathagar.com

১৪৮১.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১২৫১.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৫৩৬.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থের বাস্তব যোগান দেয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, জাতি আজ বিপুল পরিমাণের বৈদেশিক ঋণে ন্যুজ ও তার সুদের অর্থ পরিশোধের ভারে জর্জরিত। উপরোক্ত আলোচনা ও পরিসংখ্যান থেকে আওয়ামী শাসনামলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থার চরম দেউলিয়াত্ব এবং করুণ অসহায়তার চিত্র ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্মরণকালের সর্বনিম্নস্তরে নেমে গেছে। বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশী টাকার বিনিময় হার মার্কিন ডলারের নিরিখে রেকর্ড হিসাব ১৯ বার অবমূল্যায়ন বা ডিভ্যালুয়েশন করা হয়। মাত্র পাঁচ বছর আগে যে ১ মার্কিন ডলারের মূল্য ৪০ টাকা ছিল তা আজ ৫৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী সরকার বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানির হারও সর্বকালের সর্বনিম্নে দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসার পর পরই দেশের স্টক মার্কেটে বিরাট বিপর্যয় ও ধ্বস নামে। ১৯৯৮ সালে ভারতের দুরাচার ফটকাবাজিরা কলিকাতার এজেন্টদের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক মার্কেটে কৃত্রিম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বাংলাদেশের গরীব ও ক্ষুদ্র হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। সংবাদ পত্রিকান্তরে জানা যায়, ঐ স্টক ও এক্সচেঞ্জ জালিয়াতি ও বিপর্যয়ের চক্রান্তে ভারতীয় র‍্যাকেটিয়ার্সদের সঙ্গে আওয়ামী সরকারের কোনো কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যোগসাজশও ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে যে অর্থনীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে তা পুরোপুরি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিপি প্রভৃতি সংস্থার মর্জিমাফিক ও ইচ্ছায় তৈরী ও বাস্তবায়িত হয়। পরনির্ভরতা ও বৈদেশিক ঋণের শর্তের চাপে বাংলাদেশের সরকারসমূহ কোনোই স্বাধীন অর্থনীতি প্রকল্প বা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে নি।

www.pathagar.com

মুনশী আব্দুল মান্নান

সরকারের এক নম্বর সাফল্য দাবী এবং বাস্তবতা

ডেটলাইনঃ ৩০ জুন ২০০১

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ২২ জুনের ভাষণে জানিয়েছেন : ২০০০-২০০১ অর্থবছরে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ২ কোটি ৬৪ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। তিনি দাবি করেছেন : বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো খাদ্য উৎপাদনে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ১০ লাখ ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত রয়েছে, যা যে কোনো আপতকালীন ব্যবহার করা যাবে। খাদ্যের জন্য কোথাও হাত পাততে হবে না। এই প্রথম নয়, এর আগেও তিনি খাদ্য উদ্বৃত্তের দাবি করেছেন। দাবীর পাশাপাশি সকল কৃতিত্ব যে সরকারের, তাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলেন নি। ২২ জুনের ভাষণেও উল্লেখ করেছেনঃ কৃষিতে ভর্তুকি প্রদানসহ আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষি ঋণ, সার, বীজ, সেচ নিয়মিতভাবে কৃষকের জন্য সরবরাহ করার বাস্তবসম্মত কর্মসূচির ফলে পর পর পাঁচবার বাম্পার খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছে।

সরকার তার উন্নয়নের পাঁচ বছরে কৃতিত্ব ও সাফল্যের যে ফিরিস্তি দিয়েছে তাতে খাদ্য উৎপাদনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বে আনা হয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বিগত সরকারের পাঁচ বছরের সঙ্গে বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরের তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থিত করা হয়েছে। বিগত সরকারের পাঁচ বছরে কৃষিখাতে বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধি গড়ে শূণ্য দশমিক ৫ শতাংশেরও কম ছিল। বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরে কৃষিখাতে বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ২ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত সরকারের আমলের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে এই প্রবৃদ্ধির হার ৮ গুণেরও বেশী। এই সরকারের আমলে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ৭৪ লাখ টনেরও বেশী। জানানো হয়েছে: বর্তমান সরকার পাঁচ বছরে সারের জন্য ভর্তুকি দিয়েছে ৫১৯ কোটি টাকা। সেচযন্ত্র ও ডিজেলের জন্য ভর্তুকি দিয়েছে যথাক্রমে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ ও ২৭ শতাংশ।

বিগত সরকার যেখানে গড়ে প্রতিবছর ১ হাজার ১শ ৯৫ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে বর্তমান সরকার সেখানে বিতরণ করেছে ৩ হাজার ২শ' ৪৫ কোটি টাকা। একটি উদ্ভট দাবিও এই সঙ্গে করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ কৃষকরা তাদের ধানের ন্যায্য মূল্য পাচেছ।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের দাবি প্রধানত ৪ টি। এগুলো হলো :

১. খাদ্যশস্যের বাম্পার ফলন হয়েছে। উৎপাদন বেড়েছে।

২. দেশ খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

২. এই সাফল্যের কৃতিত্ব সরকারের।
৩. কৃষকরা তাদের ধানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে।

দাবিগুলো সংক্ষেপে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। সত্য বটে, দেশে বিগত পাঁচ বছরে খাদ্যশস্যের ভালো ফলন হয়েছে। স্বভাবতই উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু সরকারের দাবি অনুযায়ী বেড়েছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য উদ্বৃত্তের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উদ্বৃত্তের দাবিটিও সংশয়মুক্ত নয়।

গত ৩১ মার্চ আমরা এক নিবন্ধে খাদ্য উদ্বৃত্তের সরকারি দাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। বর্তমানে সরকারের চার বছরের হিসাব নিকাশ সামনে রেখে বলেছিলাম : বিগত চার বছর ধরে দেশে বাম্পার ফলন হচ্ছেছ। এ সময়ে কোনো বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে মোট খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি ৮৮ লাখ টন। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ১ কোটি ৯৮ লাখ টন, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ২ কোটি ৩০ লাখ টন।

চার বছরের শেষ বছরে ৩২ লাখ টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ঘটনা বিস্ময়কর। পূর্ববর্তী তিন বছরে বেড়েছে ৩২ লাখ টন। যাদুই চেরাগের কল্যাণ ছাড়া এই বিরাট বৃদ্ধি অসম্ভব ও অবাস্তব। শুধু আমরাই নই, বিশ্ব খাদ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধিও এই হিসাবটি সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। তার মতে 'যদি পরিসংখ্যানটি সঠিক হয়ে থাকে তবে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে একটা ভিন্ন অবস্থায় পৌঁছাবে।' অতঃপর ঐ নিবন্ধে আমরা বলেছিলাম: যদি সঠিক হয়ে থাকে বলে তিনি পরিসংখ্যানটির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উদ্বৃত্ব খাদ্য ঘাটতি উৎপাদন ও আমদানির ফল'। অর্থাৎ যে উদ্বৃত্তের কথা বলা হচ্ছেছ, তার মধ্যে আমদানির অবদান রয়েছে। তাঁর হিসাবে, ১৯৮০ সালে এ দেশে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ছিল বর্তমানে তার অতিরিক্ত ১৫ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন। এখন সেই প্রয়োজন ২ কোটি ২০ লাখ টন'। লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে উৎপাদনের যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে বার্ষিক চাহিদা ২ কোটি ২০ লাখ টন বাদ দিলে উদ্বৃত্ত থাকে ১০ লাখ টন। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের মতো ২০০০-২০০১ অর্থবছরের উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ আরও ৩৪ লাখ টন বেশী বলে দেখানো হয়েছে। এই অসম্ভব অস্বাভাবিক হিসাব থেকে তো উদ্বৃত্তের পরিমাণ পাঁচ বছরে আরও অনেক বেশী হওয়ার কথা। সোজা হিসাব । মোট বার্ষিক খাদ্য উৎপাদন ২ কোটি ৬৪ লাখ টন। সুতরাং উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৪৪ লাখ টন। অথচ সরকার দাবি করছে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১০ লাখ ৭০ হাজার টন। হিসাবের মধ্যে শুভংকরের একটা বিরাট ফাঁকি থেকে যাচেছ।

www.pathagar.com

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবটি যে কল্পিত ও বানানো তাতে সন্দেহ নেই। সরকারি হিসাবে এই সরকারের প্রথম তিন বছরে উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ১০ লাখ টন। আর পরের দু'বছরে বেড়েছে ৬৬ লাখ টন। খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে সত্য; কিন্তু দু'বছরে এতটা বিপ্লব ঘটে যায়নি যে, ৬৬ লাখ টন বাড়তে পারে।

তাহলে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধির কথাই কি ঠিক যে, খাদ্য ঘাটতি অপরিবর্তিত আছে এবং উদ্বৃত্ত আমদানিরই ফল? এবার আসা যাক পরিসংখ্যানে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত ৫ বছরে ১ কোটি ১২ লাখ টন খাদ্য ঘাটতির বিপরীতে খাদ্য আমদানি হয় ৮৭ লাখ টন। অপরদিকে বর্তমান সরকারের ১৯৯৬-৯৭ থেকে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত ৪ বছরে খাদ্য ঘাটতি দেখানো হয় ৪৪ লাখ ৯৬ হাজার টন। আর এর বিপরীতে ১ কোটি ৫ লাখ ৮ হাজার টন খাদ্য আমদানি করা হয়। অর্থাৎ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে খাদ্য উদ্বৃত্তের তো প্রশ্নই ওঠেনা। উপরন্তু ঘাটতি ছিল প্রায় ৪৫ লাখ টন। আর এই ঘাটতি পূরণের জন্য ১ কোটি ৫ লাখ টনেরও বেশী খাদ্য আমদানি করা হয়। প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, চলতি বছরের ৭ মাসে ৮ লাখ টন খাদ্য আমদানির এলসি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া খাদ্য সাহায্য হিসাবে আরও পাওয়া যাচ্ছে ৬ লাখ টন। খবরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে : চলতি ও বিগত অর্থবছরে খাদ্য উৎপাদন ও আমদানির বিপরীতে চাহিদা মেটানোর পর ৭৩ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা। এর সঙ্গে সরকার কথিত প্রায় ১১ লাখ টন উদ্বৃত্ত যোগ করলে পুঞ্জিভূত উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৮৪ লাখ টন। এর সঙ্গে যুক্ত হবে প্রাপ্ত সাহায্য।

কোনো দিক থেকেই হিসাব মিলছে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের কারসাজি করা হয়েছে। উৎপাদন বেশী দেখিয়ে কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর ঘাটতি পূরণের জন্য যথেচ্ছ আমদানি করা হয়েছে। উৎপাদন যদি বার্ষিক মোট চাহিদার চেয়ে বেশী হয় তাহলে এতো আমদানি কেন? আর আমদানি যদি এতো বেশী তবে এতো উৎপাদন কোথায় গেল? গোটা ব্যাপারটি সেই বিড়ালের গোশতো খাওয়ার মতো হয়েছে। বিড়াল গোশতো খেয়েছে এক কেজি। গোশতো খাওয়ার পর বিড়ালের ওজন এক কেজি। বিড়াল যদি এক কেজি গোশতো খেয়ে থাকে তবে বিড়াল কোথায়? আর বিড়ালের ওজন যদি এক কেজি হয় তবে গোশতো গেল কোথায়? বিশেষজ্ঞদের ধারণা, জিডিপি'র অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি দেখানোর জন্য ইচ্ছামত খাদ্য উৎপাদন দেখানো হয়েছে। গত পাঁচ বছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির যে হার দেখানো হচ্ছে, বলাও হচ্ছে তার জন্য বিপুল খাদ্য উৎপাদনের ভূমিকাই প্রধান। অথচ প্রকৃত হিসাব-নিকাশে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য উৎপাদন যা দেখানো হচ্ছে, আসলে উৎপাদন হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। আমদানি বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানেও গোলমাল লেগে গেছে। উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে নয়, আমদানি থেকে

www.pathagar.com

এসেছে। এজন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারনায় খাদ্য উৎপাদন ও উদ্বৃত্বের কথা বলে ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যেই এই 'অনৈতিক কারবার' করা হয়েছে বলে সহজেই ধরে নেয়া যায়। এটা এক ধরনের প্রতারণা এবং এই প্রতারণা করা হয়েছে দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাফল্য এককভাবে দাবি করার ঘটনাও সরকারের নৈতিক সদাচারের মধ্যে পড়ে না। একথা সকলেরই জানা গত পাঁচ বছর আবহাওয়া ছিল উৎপাদন অনুকূল। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার প্রভাব প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ওপর খুব একটা পড়েনি। দ্বিতীয়ত কৃষকরা অন্যান্য ফসল আবাদ অপেক্ষা খাদ্যশস্য আবাদে অধিক মনোযোগ দিয়েছে। প্রাকৃতিক আনুকুল্যের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম যুক্ত করে তারা উৎপাদন বাড়িয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির অপরিহার্য উপকরণ সারে সরকার ভর্তুকি দিয়েছে সত্য, কিন্তু সেই ভর্তুকির সুবিধা কৃষক পর্যায়ে খুব কমই পৌঁছেছে। প্রতিবছরই সার প্রাপ্তির ব্যাপারে কৃষকদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। চাহিদা মতো সরবরাহ তারা সবসময় পায়নি। বাজারে সারের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অনেক বেশী দামে কৃষকদের সার কিনতে বাধ্য করা হয়েছে। বীজ ও কীটনাশকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ঘটেছে। বড়াই করে বলা হয়েছে, কৃষিঋণ অনেক বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু সেই ঋণের কত অংশ প্রকৃত কৃষক পেয়েছে এবং কত অংশ সরকারি দলের লোকজন ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে তার হিসাব দেয়া হয়নি। প্রকৃত কৃষক ঋণ পেয়েছে সামান্য। তাদের নগদ অর্থের জন্য সুদখোর এনজিও ও মহাজনদরে দ্বারস্থ হতে হয়েছে। এর খেসারতও তাদের দিতে হয়েছে। অনেক প্রান্তিক কৃষক ইতিমধ্যে ভিটামাটি ছাড়া হয়েছে। অনেকের দুর্ভোগ বিপর্যয় উঠেছে চরমে।

কৃষক তাদের ধানের ন্যায্য মূল্য পাচেছ সরকারের এই দাবিকে আগেই 'উদ্ভট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এই দাবির মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। খুব বেশী অতীতে যাওয়ার দরকার নেই। চলতি ইরি- বোরো নিয়ে কৃষকরা কী বিপাকে পড়েছে. তার উল্লেখ করলেই সরকারের দাবির অসারতা প্রমাণিত হবে। প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হচ্ছেছ, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ধান ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারছে না।

সরকারি ক্রয় কেন্দ্রগুলোতেও কৃষকরা ধান চাল বিক্রির সুবিধা নিতে পারছে না। উৎপাদনের তুলনায় এবার সংগ্রহ লক্ষ্য কম ধরা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ীও অনেক এলাকায় ক্রয় কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ক্রয় কেন্দ্রকেন্দ্রিক একশ্রেণীর দালাল সাধারণ কৃষকের কাছ থেকে কম দামে ধান কিনে ক্রয় কেন্দ্রে বেশী দামে বিক্রি করছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় ধান-চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ২ লাখ ৬৭ হাজার

www.pathagar.com

টন। এর মধ্যে ধান ১ লাখ ৩৬ হাজার টন এবং চাল ১ লাখ ৩১ হাজার ২৯৪ টন। মধ্য জুন পর্যন্ত ধান কেনা হয়েছে ৩৫ হাজার টন এবং চাল ৫৩ হাজার টন। ঐ অঞ্চলে ধান-চালের দাম একেবারে পড়ে গেছে। গড়ে ধান প্রতি কেজি ৬.৩০ থেকে ৬.৬৭ টাকা দরে এবং চাল প্রতি কেজি গড়ে ১০.৬৩ টাকা থেকে ১১.২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। পক্ষান্তরে সরকারি দাম প্রতি কেজি দাম ৮.২৫ টাকা প্রবং প্রতি কেজি চাল ১০ টাকা। অন্য এক খবরে জানা গেছে, ধান-চাল বেচে কৃষকদের উৎপাদন খরচ পর্যন্ত উঠে আসছে না। অনেকেই উচচ সুদে মহাজনী ঋণ নিয়ে উৎপাদন করছে। তারা ধান-চাল বেচে ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। মহাজনদের চাপের মুখে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকে পালিয়ে বেড়াচ্চেছ। সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় পড়েছে প্রান্তিক ও বর্গা চাষীরা। অভাব মেটাতে ও ঋণের দায় পরিশোধের জন্য তারা ধান-চাল স্বল্পমুল্যে ছেড়ে দিয়ে নি:স্ব হয়ে পড়েছে। এরপরও যদি দাবি করা হয় কৃষকরা ন্যয্যমুল্যে তাদের ধান-চাল বিক্রি করছে, তাহলে বলার বিশেষ কিছু থাকে না। কৃষকদের সঙ্গে এর চেয়ে বড় মস্করা আর কি হতে পারে?

উপসংহারে বলতে হয়, সরকারের এক নম্বর সাফল্যের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্চেছ না। অন্যান্য সাফল্যের অবস্থা কি হবে বা হতে পারে এ থেকে তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাহুল্য সত্য সবসময়ই সত্য। তাকে আড়াল করা যায় না। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ফায়দা পাওয়া যায় না। যারা প্রকৃত সত্য অন্ধকারে রেখে কল্পিত সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এক সময় না এক সময় তাদের ধরা পড়তেই হয়। যারা এটা করে তাদের চুড়ান্ত বিচারে অপাংক্তেয় ও প্রত্যাখ্যাত হতেই হয় এবং জনগণের আস্থা হারাতে হয়।

* * *

খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের দাবী বনাম চাল ও গম আমদানী

পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্তি উপলক্ষে সরকার যখন নানামুখী কৃতিত্ব ও সাফল্য সম্পর্কিত প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত, তথ্যাভিজ্ঞ মহলের পক্ষ থেকে তখন সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানকে সামনে আনা হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ এসব তথ্য ও পরিসংখ্যানকে অস্বীকার করার কিংবা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং তার ফলে আবার সরকারের কথিত সাফল্য অর্জনের সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর কারণ সরকার শুধু বাম্পার ফলনের কৃতিত্ব দাবী করেই থেমে যায়নি, একই সঙ্গে একথাও বলেছে যে, বর্তমান সরকারের আমলেই নাকি দেশ প্রথমবারের মত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। প্রচারণাকালে মূলকথায় সরকার জানাতে চেয়েছে, যেন এখন আর চাল ও গমসহ খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় না এবং দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্য চাহিদা পূরণ করার পরও উদ্বৃত্ব থেকে যায়। নিজেদের দাবীর সমর্থনে একটি পক্ষ থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যানও উপস্থিত করা হয়েছে। যেমন একটি পরিসংখ্যানে সরকার জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে খাদ্যের চাহিদা যেখানে ২১৬ লাখ

www.pathagar.com

টন, সেখানে চাল ,গম ও ভুট্টা সহ কাদ্যেশস্যের উৎপাদন হবে ২৬৪ লাখ টন। বীজ,পশু খাদ্য ও অপচয় বাদ দিয়ে সরকারের হিসাবে উদ্বৃত্বের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২১ লাখ টন।

অন্যদিকে বাস্পাব পরিস্থিতি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সরকারের দাবীকে সত্য বলে ধরে নিলে মানতে হবে যে, দেশকে এখন কোনো ধরনের খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় না। অথচ সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, আমদানী শুধু নয়, বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১-এর সর্বশেষ পরিসংখ্যানে উদ্ধৃত করে গত সোমবার প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় ২০০০-২০০১ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) শুধু চাল আমদানীর জন্যই বিভিন্ন ব্যাংকে ৬১ কোটি ৫১ লাখ মার্কিন ডলারের এলসি খোলা হয়েছে। একই সময় আমদানীর জন্য অনিষ্পন্ন এলসি রয়েছে ৩৪ কোটি ৩৩ লাখ ডলারের। অর্থাৎ গত এপ্রিল পর্যন্ত ১৫৭ কোটি ৩৮ লাখ ডলারের এলসি খোলা হয়েছে, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ ৯শ হাজার কোটি টাকার বেশী। এ ছাড়া মে ও জুন মাসে আরো ২ হাজার কোটি টাকার চাল ও গম আমদানী করা হয়েছে এবং হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। যার অর্থ, চলতি অর্থবছরে সব মিলিয়ে চাল ও গম আমদানীর জন্য প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে ও হচ্ছে। কথা আরো আছে। এখানে শুধু বৈধ পথে আমদানীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে রয়ে গেছে চোরাচালানের মাধ্যমে আমদানীর আলাদা হিসাব। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও বিআইডিএসসহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টে আনুমানিক হিসাব দিয়ে জানানো হয়েছে যে, বৈধ আমদানীর প্রায় সমান পরিমান খাদ্যশস্য ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে আসছে। অর্থাৎ সহজ কথায় বলা যায়, বৈধ ও অবৈধ পন্থায় দেশে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার খাদ্যশস্য আনা হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমান সরকারের আমলে প্রতি অর্থবছরেই খাদ্য শস্য আমদানীর জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয়েছে। ১৯৯৮ - ৯৯ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী সেবার ৬৮ কোটি ডলারের চাল এবং ৩১ কোটি ৭০ লাখ ডলারের গম আমদানী করা হয়েছিল।

উপরে উপস্থাপিত কয়েকটি মাত্র তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই বলা যায়, সরকার অসত্য প্রচারণা চালাচ্ছে এবং দেশকে আসলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় নি। সরকারের দাবী সত্য হলে ১১ হাজার কোটি টাকার বেশী মূল্যের খাদ্য শস্য আমদানী করতে হতো না এবং চোরা পথেও আসতো না প্রায় সমান পরিমাণের খাদ্যশস্য। আমরা মনে করি,এটাই যুক্তিসঙ্গত সহজ হিসাব এবং এই হিসাবকে অসত্য হিসেবে প্রমাণ করতে চাইলে সরকারকে অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্য একটি অনুমানকেও প্রসঙ্গত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন,এমনও হতে পারে যে, আমাদনীর তথ্য গোপন রেখে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যও

www.pathagar.com

সরকারের দেশে উৎপদিত খাদ্য শস্য হিসেবে দেখিয়ে চলছে এবং তার ভিত্তিতে দাবী করছে যে, দেশ খাদ্যেশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরকার খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সত্য আড়াল করে চলেছে এবং জনগণকে অসত্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করেছে। আমরা সরকারের এই চাতুরীপূর্ণ কৌশলের তীব্র নিন্দা জানাই। সরকারের উচিত, দেশবাসীকে প্রকৃত তথ্য জাননো। সরকারকে এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে যে, সত্যি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়ে থাকলে কেন এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে চাল ও গম আমদানী করতে হয়েছে। আমরা আশা করি,সত্যি গোপন করার ক্ষতিকর কৌশল অবলম্বন করার পরিবর্তে সরকার এমন পদক্ষেপ নেবে, যাতে দেশ পর্যায়ক্রমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। সরকারকে এজন্য সার ,বীজ ও কীটনাশক সহজলভ্য করার পাশাপাশি ফসলের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তিও নিশ্চিত করতে হবে এবং কৃষিঋণ প্রদানসহ সকল পন্থায় কৃষককে উৎসাহ যোগাতে হবে। আমরা মনে করি না যে, কেবলই অসত্য প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে বাম্পার ফলন ঘটানো কিংবা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব ।

www.pathagar.com

শাহ মোহাম্মাদ নুরুল ইসলাম

অর্থ ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চরম দুর্যোগের ফলেই ১৭ তম অবমূল্যায়ন

ডেটলাইন ঃ ৩১ আগস্ট ২০০০

অর্থ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় এখন বড় দুর্দিন। ১৩ আগস্ট থেকে কার্যকর করা ডলারের সাথে টাকার অবমূল্যায়ন তারই একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ। নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যাবে না যে, দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য আশানুরূপ নয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও সন্তোষজনক নয়। আর এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, আমাদের বাংলদেশ ব্যাংক যত প্রকার কৌশলই করুক না কেন, এমন এক রাক্ষুসে বাঘ হাঁ করে আসছে যে, সমুদয় বৈদেশিক মুদ্রাই সে গ্রাস করবে। ওই বাঘকে থামাতে না পারলে দেশের অর্থনীতির তো মেরুদন্ড ভাঙবেই, সেই সাথে হারাতে হবে দেশের মুল্যবান জ্বালানী সম্পদ গ্যাসকেও।

ইতিমধ্যেই ইউনোকলের অভিযোগ শুরু হয়েছে। গ্যাস কোম্পানীগুলোও এই একই পথ অনুসরণ করতে যাচেছ। এসব বহুজাতিক কোম্পানী চাচ্ছেছ যে, উৎপাদিত গ্যাস পেট্রোবাংলা ক্রয় করুক অথবা উৎপাদিত গ্যাস রপ্তানী করার অনুমতি দেয়া হোক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামী যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে এটাই হবে টপ এজেন্ডা। ইতিমধ্যেই পেট্রোবাংলা বিদেশী কোম্পানীর কাছে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করতে পারছে না। পেট্রোবাংলাকে এই মূল্য পরিশোধ করতে হবে ডলারে। আর এই ডলার দেয়ার জন্যে অবশ্যই হাত দিতে হবে রিজার্ভে। কোনো ক্রমেই আমাদের প্রান্তিক পর্যায়ে রিজার্ভ পরিস্থিতি এটা অনুমোদন করে না।

নিয়মানুযায়ী আমদানির মূল্য পরিশোধ রপ্তানির মূল্যকে ব্যয় করা শুধু সুস্থতার লক্ষণ। বাংলাদেশে রপ্তানীর মূল্য দ্বারা আমদানির মাত্র ৩০/৩৫ ভাগ পূরণ করা হয়। ফলে সেখানেই ঘাটতি থেকে যায়। এমতাবস্থায় আভ্যন্তরীণ বাজারে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য ডলারে পরিশোধের রিজার্ভ কোথায় পাওয়া যাবে? উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সাধারনভাবেও যে অন্তত ৩ মাসের আমদানি মুল্যের সার্বক্ষণিক মজুদ রাখতে হয়। এটা রাখা সম্ভব হচ্ছেছ না বলে প্রায়ই অর্থ বিশেষজ্ঞরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। ব্যস্ত থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়। এই দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠার অবসানে ইতিপূর্বে এই সরকারই ১৬ বার টাকার অবমূল্যায়ন করেছে। টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু যে লক্ষ্যে এই অবমূল্যায়ন সেটা যে অর্জন করা যায় নি তা প্রমাণ করে ১৭তম অবমূল্যায়ন। অবশ্য আমাদের সুদক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সুশিক্ষিত অর্থমন্ত্রী এই কথাটুকু স্বীকার

www.pathagar.com

করেন না। এতে সরকারের অপদার্থপনা প্রকাশ পাবার নিশ্চয়তা থাকে। অবমূল্যায়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নানাবিধ হলেও বলা হয়, (১) রপ্তানীকারকরা উৎসাহিত হবে, (২) রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা শক্তি বাড়বে; এবং (৩) বিদেশে কর্মরত প্রবাসীরা অধিক পরিমাণে বাংলদেশে অর্থ প্রেরণ করবে। সুতরাং অবমূল্যায়ন হবার সাথে সাথে একশ্রেণীর রপ্তানিকারক এবং অর্থনীতিবিদ অভিনন্দন জানান। অনেকে একাডেমিক আলোচনাও করেন। বাস্তবে এসবের মধ্যে কোন গভীর দৃষ্টিভিঙ্গর ছাপ থাকে না। শুধু অবমূল্যায়ন ব্যতীত অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়কে উল্লেখ করাও হয় না। টাকার অবমূল্যায়নে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবার এবং পরিমাণে অধিক পণ্য রপ্তানি হবার কথা। কিন্তু গত ৪ বছরে ১৬ বার অবমূল্যাযন করে বাংলাদেশের কোন পণ্য বাজার সম্প্রুসারিত হয়েছে এবং রফতানীর পরিমাণই বা কতটা? প্রচলিত পণ্যগুলোতো দিন দিনই নিঃশেষ হবার কথা। অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে যে দুটি পণ্য দেশকে দাঁড় করে রেখেছে, সে সব পণ্য নিয়ে কতই না কচলানি হচ্ছে। পণ্য উৎপাদনকারীদের ওপর অভ্যন্তরীণ হাজারও সমস্যা। ওদিকে ক্রেতা দেশগুলোর সাথেও সরকারি সমঝোতা ও তৎপরতা নেহায়েত দায়সারা গোছের। আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাসীন হবার পর হতেই শুরু হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে নানা সমস্যা। হিমায়িত মৎস্য রপ্তানির ব্যাপারে এবং তৈরী পোশাক রফতানীর ব্যাপারে বাংলাদেশ টিকে আছে শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুগ্রহের ওপর। জিএসপি, কোয়ালিটি ইত্যাদি নিয়ে এখনো তো চলছে রশি টানাটানি। এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে আইন পাস করে বিশেষ সুবিধায় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার কিছু দেশকে তৈরী পোশাক রপ্তানির বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। এখন বাংলাদেশ সবেমাত্র চিঠি লিখছে। বিষয়টি বিস্ময়কর নয় কি? আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য পরিষদবর্গ ফি বছরই যুক্তরাষ্ট্র যাচ্চেছন- তাতে তো বাংলাদেশই সুবিধা পাবার কথা। তা পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রতিবছরই সরকার প্রধান ও তার বিশাল লটবহর আশাবাদ ব্যক্ত করছে যে, বিনিয়োগ আনা, বাণিজ্য বৃদ্ধিই এ সফরগুলোর মুল কারণ। যেনতেন করে বিল ক্লিনটনকেও আনা হল দেশে। আবার প্রধানমন্ত্রীও খেতাব পেলেন। এসব দেখে মনে হচেছ, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রই শুধু নয়, সমস্ত মিশনগুলো অনুষ্ঠান করা, প্রধানমন্ত্রীর কীর্তি গাওয়া এবং বিদেশে হানিমুন নিয়ে ব্যস্ত আছে। দেশটার জন্য তারা কাজ করছেন-আজ আর একথা বলা যাচ্চেছ না। নিশ্চিত করে বলা যায়, বাংলাদেশ বাণিজ্যিক কূটনীতিতে মার খেয়েছে। এ জন্যই অবমূল্যায়ন। আমাদের আশাপ্রদ তেমন কিছু দিতে পারছে না।

আমাদের অন্যতম রপ্তানি আইটেম তৈরী পোশাক ও হিমায়িত মৎস্য। এটা জেনেও আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে খাত দুটি সমস্যাকবলিতই হয়েছে। মনে হচেছ সমস্যা সরকারই সৃষ্টি করতে নানারূপ কমিটি, তদন্ত কমিশন, উদ্ভট নীতিমালা তৈরী করে। সহজভাবে কোনো কাজই হয় না। এছাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নতুন কোন খাতও তৈরী করা হয়নি। অথচ তেমন বহু খাতই ছিল্। সুতরাং টাকার মূল্যের

www.pathagar.com

অবমূল্যায়নই একমাত্র সমাধান নয়। আশা করা হয় যে, টাকার অবমূল্যায়নে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বেশী করে তাদের উপার্জনের অর্থ পাঠাবে বাংলাদেশে। এই আশা কিভাবে করা যায় এবং কতটুকু বা করা যুক্তিসংগত। নিশ্চয়ই যারা বিদেশে কর্মরত আছেন-তারা সাধ্যমতই তাদের অর্থ নিজ দেশে পাঠান। ১ ডলারে ৫১ টাকার বদলে ৫৫ টাকা পাওয়া গেলে হয়ত তারা মিতব্যয়ী হবেন। তাতে কি বিশাল বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির খুব একটা উপকার হবে? এজন্য কি শ্রম ঘাটতির দেশে সরকারিভাবে বাংলাদেশী নিয়োগের সার্বক্ষণিক উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিল না? এটা কি নেয়া হয়েছে? এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হাজার হাজার বাংলাদেশী দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। এখনও লক্ষাধিক বাংলাদেশী প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। সরকার এই ব্যাপারেও দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করছে মাত্র। এজন্যেই টাকার অবমূল্যায়নই বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য আহামরি জাতের কোন সুযোগ সৃষ্টি করে না।

সুফলের দিক থেকে অবমূল্যায়ন যখন প্রায় শূন্য-তখন কুফলের বহরটা বেশ বড়ই হচ্ছেছ। প্রতিটি অবমূল্যায়নের পর আমদানিকৃত ভোগ্য পণ্যের বাড়তি মূল্য লক্ষ্য করছি। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রেতা সাধারণ। দেশের মুল্যস্ফীতিতে এজন্য অবমূল্যায়ন একটি স্লো পয়জনের কাজই করছে। যারা মূলধনী পণ্য বা উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল আমদানি করছেন-তাদেরও উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। তাদের সমস্যা হচেছ তারা পণ্য উৎপাদন করেও অভ্যন্তরীণ বাজারে চোরাচালানের জন্য প্রতিযোগিতায় শক্তি হারিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচেছ যে সব মূল্য সরকার ধার্য করে। কিম্বা সরকারই আমদানি করে। এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত জ্বালানী তেল। পেট্রোবাংলা সরকারী সংস্থা। এই সংস্থায়ই সিস্টার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে জ্বালানি আমদানী করে। আর সরকার তার কায়দা মতো তেলের বিক্রয়মুল্য ধার্য করে। এজন্য নাকি পেট্রোবাংলা লোকসান গুনছে। আবারও অবমূল্যায়নে সেই লোকসান বাড়বে তাতে সন্দেহ কি? অবশ্য এর মধ্যে সরকারের একটা ঘাপলাবাজিও রয়েছে। জানা গেছে, জ্বালানি আমদানীর ওপর সরকারই ৮০/৮৫ ভাগ শুল্ক কর ইত্যাদি আদায় করে। এভাবেই বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্য কম থাকলেও বাংলাদেশে জ্বালানির মূল্য কমানো হয়নি। বরং বলা হয়েছে, লোকসান হচ্ছে। এই জাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনামুলক প্রক্রিয়াও বহুক্ষেত্রেই রয়েছে। এন্যই বলতে হয়, বাংলাদেশের টাকার অবমূল্যায়ন সঠিক কাজে আসে না।

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, একদিকে ঝড়ের বেগে যখন অবমূল্যায়ন করা হচ্ছেছ তখন বলা হচেছ যে, আমাদের প্রতিবেশীরা আরও বেশী অবমূল্যায়ন করেছে, তখন বাংলাদেশে রফতানী পণ্যের উৎপাদন এবং তা বন্দরে শিপমেন্টের এক স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যে কোনো উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে বিদ্যুতের বিকল্প নেই। সেই বিদ্যুত ৪ বছরেও উন্নতির মুখ দেখলো না। বিদ্যুত পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে এই প্রচারণায় প্রধানমন্ত্রী সহ অনেক মন্ত্রীর মুখে ফেনা উঠেছে। আর বিদ্যুত পরিস্থিতির উন্নয়ন না

www.pathagar.com

ঘটায় সকল প্রকার বিদ্যুতনির্ভর উৎপাদন বাড়তি ব্যয় চাপের সম্মুখীন। যোগাযোগ সমস্যা হয়ে উঠেছে বন্দরে। এমন কোনো সময় দেখা যায়নি, যখন চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ধাক্কা লাগেনি, চরে আটকে যায়নি, আগুন লাগেনি, মাল চুরি হয়নি বা বন্দরে ধর্মঘট চলেনি। এ সবের মূলে সরকারি দলেরই ঘনিষ্টজনেরা। এটা যেমন একটা বিস্ময়ের ব্যাপার, তেমনি বিস্ময়ের ব্যাপার বাংলদেশের বন্দর ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশেরই বন্দরে এই জাতীয় একটি ঘটনাও ঘটেছে বলে কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ কথা আবারও বলা চলে যে, শুধু টাকার অবমূল্যায়নই বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একমাত্র সমাধান না, সেজন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকেও স্বাভাবিক ও অনুকূল করতে হবে।

www.pathagar.com

শাহ আহমদ রেজা

জাতীয় অর্থনীতি অকারণে মহাদুর্যোগের সম্মুখীন

ডেটলাইন ঃ জুলাই ২০০১

হাসিনার মতো একজন তুখোর নেত্রী যে প্রধানমন্ত্রী পদে মন্ত্রীর পক্ষে সবসময় আলোচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। মন্ত্রীদের কেউ কেউ দৃশ্যপটে আসেন ঘটনাক্রমে কিংবা বিশেষ কোন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। সেদিক থেকে দুজন ভাগ্যবান বলতেই হবে। একজন দুর্দান্ত ক্ষমতাধর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-যিনি প্রধান মন্ত্রীর পর পর প্রায় নিয়মিতভাবে সংবাদ শিরোনাম হন, নেতিবাচক অর্থে হলেও আলোচিত হন, বর্তমান নিবন্ধে অবশ্য মোহাম্মদ নাসিমকে টেনে আনা হবে না। আনা হবে দ্বিতীয় জনকে তিনি অর্থমন্ত্রী এস এম এস কিবরিয়া। বলা বাহুল্য, এর একাধিক কারণও মন্ত্রী কিবরিয়া নিজেই সৃষ্টি করেছেন। ক্রমাগত বর্থতা এবং ধ্বংসাত্মাক নীতি ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি উপস্থাপিত ঘাটতি বাজেট একটি প্রধান কারণ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে এসেছে মন্ত্রীর নেয়া আক্রমণাত্মক অবস্থান। অনেকটা অযাচিত ও আকস্মিকভাবে তিনি বিএনপি সরকারের সফল অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে আক্রমণ করে বসেছেন এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন থেকে শুরু করে সাংবাদিক সম্মেলন ভাষণ পর্যন্ত বিভিন্ন উপলক্ষে এমন কিছু কথা বলেছেন-যেগুলো গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার ও সৌজন্যের বিচারে শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত ও আপত্তিকরই নয়, প্রত্যক্ষভাবে উস্কানিমূলকও। যেমন মন্ত্রী কিবরিয়া বলেছেন, এম সাফুর রহমান নাকি একজন 'অ্যাকাউন্ট্যান্ট' বা হিসাবরক্ষক এবং পক্ষে দেশের অর্থনীতি বোঝা বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা তার দ্বারা সম্ভব নয়। মন্ত্রী কখাগুলো এমনভাবেই বলেছেন, যেন এম সাইফুর রহমান কোন মহাজনের দোকানে হিসাবের খাতা লেখেন এবং আয়-ব্যয়ের যোগ-বিয়োগ করেন। এ পর্যন্ত এসেই থেমে যাননি মন্ত্রী কিবরিয়া। একই সংগে তিনি নিজের যোগ্যতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এবং দ্বিধা ও লজ্জায় এগিয়ে ঘোষণা করেছেন, তিনি নাকি শুধু অর্থমন্ত্রী নন, একজন 'অর্থনীতিবিদও'।

একজন ব্যর্থ, দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত অর্থমন্ত্রী হঠাৎ কেন 'অর্থনীতিবিদ' হতে চাইলেন, সে প্রশ্ন যেমন উঠছে তেমনি আলোচিত হয়েছে মন্ত্রীর প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকটি। একথা প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী মন্ত্রী কিবরিয়াও আগে আক্রমণের নিন্দনীয় কৌশলকে অবলম্বন করেছেন এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ধ্বংসাত্মক ব্যর্থতার বিভিন্ন দিককে আড়াল করা। আলোচনায় ১৮ হাজার ৬৬১ কোটি টাকার বিপুল ঘাটতিসহ উপস্থাপিত বাজেটের প্রসঙ্গ এসেছে এবং তথ্যাভিজ্ঞরা প্রকাশ্যেই বলেছেন, সাবেক অর্থমন্ত্রীকে আক্রমণের মধ্যদিয়ে মন্ত্রী কিবরিয়া আসলে জনগণের দৃষ্টিকে বাজেটের দিক থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

যথেষ্ট চাতুরিপূর্ণ হলেও অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্য অবশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি, বাজেটের নানাদিক নিয়ে কম-বেশী নিন্দা ও সমালোচনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার পরিবর্তে এখানে সাবেক অর্থমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া ও বিভিন্ন বক্তব্যের উল্লেখ করা দরকার। পর্যালোচনায় দেখা যাবে, এম সাইফুর রহমান মন্ত্রী কিবরিয়াকে সর্বতোভাবে নিরাশ করেছেন এবং আক্রমণের এমন যুৎসই জবাব দিয়েছেন, যেগুলোর কোনটির প্রেক্ষিতেই 'অর্থনীতিবিদ' অর্থমন্ত্রী কোনো পাল্টা জবাব দেয়ার সুযোগ পাননি। বিরোধী দলগুলোর সংসদ বর্জনের কারণে জনাব কিবরিয়া সম্ভবত আশা করেছিলেন যে, এবার তিনি সহজে পার পেয়ে যাবেন। কিন্তু এম সাইফুর রহমান তাকে পাকরাও করেছেন জনসমাবেশে এবং সবশেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে। ওদিকে মন্ত্রী কিবরিয়ার সমর্থনে যেমন মন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীন নেতাদের অনেকে এগিয়ে এসেছেন, সাবেক অর্থমন্ত্রীর পক্ষেও তেমনি এসেছেন বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ। বিএনপির নেতারা বলেছেন, ক্ষমতাসীন দলের যারা এম সাইফুর রহমানের সমালোচনা করেছেন, তারা তার 'নখের পরিমাণ যোগ্যতা' রাখেন না এবং তাদের 'চৌদ্দ পুরুষের পক্ষেও' জনাব সাইফুর রহমানের সমান পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এ সাইফুর রহমানও চমৎকার জবাব দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মন্ত্রী কিবরিয়ার মতো অন্তত শ' পাঁচেক 'অর্থনীতিবিদ' তার প্রতিষ্ঠানে এবং তার অধীনে চাকরি করেছেন। শুধু তাই নয়, সাইফুর রহমান আরো বলেছেন, অর্থনীতিতে এমএ পাস করলেই 'অর্থনীতিবিদ' হওয়া যায় না এবং জনাব কিবরিয়ার মতো 'অর্থনীতিবিদ'দেরকে তার প্রকিষ্ঠানে 'বয়েজ' নামে ডাকা হয়। সাবেক অর্থমন্ত্রী বর্তমান অর্থমন্ত্রীর যোগ্যতার দিকটিকেও সামনে এনেছেন এবং মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, মন্ত্রী কিবরিয়ার একটি দোকান চালানোর যোগ্যতাও নেই।

এম সাইফুর রহমান এরপর চলতি অর্থবছরের বাজেট প্রসঙ্গে এসেছেন এবং প্রথমেই বলে নিয়েছেন, অর্থমন্ত্রী হলেও জনাব কিবরিয়া জানেন না বাজেট আসলে কি এবং একটি দেশের বাজেট কোনো 'ফাজলামোর' বিষয় নয়। তিনি আরো বলেছেন, 'একটি দায়িত্বশীল সরকার ক্ষমতায় থাকলে অযোগ্যতা ও অব্যবস্থাপনার জন্য এমন অর্থমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতো।' এম সাইফুর রহমান অবশ্য অযথা এত কঠোর মন্তব্য করেননি। বিশেষ করে গত ৪ জুলাই রাজধানীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি খাত ধরে ধরে বাজেটের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, অর্থমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীনদের সর্বব্যাপী ব্যর্থতা, অযোগ্যতা এবং অদক্ষতার কারণেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ক্রমাগত নেতিবাচক ও নিম্নমুখী হয়েছে। সাবেক অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশের অর্থনীতি আজ 'মহাদুর্যোগের সম্মুখীন' এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা বাংলাদেশের ৩০ বছরের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। এম সাইফুর রহমানের আলোচনায় প্রধানত এসেছে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও শেয়ার বাজারের প্রসঙ্গ, সরকারের

www.pathagar.com

ব্যাংক ঋণ প্রসঙ্গও এসেছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে। বিএনপি সরকারের অর্থমন্ত্রী থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি দুই তিন সরকারের আমলের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। যেমন রাজস্ব ব্যবস্থাপনার পর্যালোচনাকালে সাইফুর রহমান জানিয়েছেন, বিএনপি সরকারের চার বছরে যেখানে রাজস্ব ব্যয় বেড়েছে ৯ শতাংশ হারে, আওয়ামী লীগ সরকারের তিন বছর নয় মাসে সেখানে বেড়েছে ১৫ শতাংশ হারে। অন্যদিকে বিএনপি সরকারের আমলে যেখানে রাজস্ব আয় বেড়েছে ১৫ শতাংশ হারে, সেখানে আওয়ামী লীগে সরকারের আমলে রাজস্ব কমে এসেছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশে। গত ৩০ বছরের মধ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আর কখনো এত মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেনি জানিয়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী এ পরিস্থিতির জন্য বর্তমান অর্থমন্ত্রীর অদক্ষ, আনাড়ি ও অদূরদর্শী ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছেন এবং আরেকটু এগিয়ে বলেছেন, তিনি নিজে অর্থমন্ত্রী থাকলে তার প্রধানমন্ত্রী তাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে বলতেন।

অন্য একটি কারণেও এম সাইফুর রহমান বর্তমান অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেছেন। কারণটি দেশের শেয়ার বাজার ধ্বংস করে দেয়া এবং তারপর একথা জানানো যে, অর্থমন্ত্রী হলেও এস এ এম এস কিবরিয়া নাকি ষ্টক এক্সচেঞ্জ এবং শেয়ার বাজার কি তা বোঝেন না। সাবেক অর্থমন্ত্রী প্রসঙ্গত কয়েকটি দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন, এসব দেশে শেয়ার বাজারে বিপর্যয় ঘটলেও সরকার পুঁজির প্রবাহ বাড়িয়ে দিয়ে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে এনেছেন। অন্যদিকে অদক্ষ ও আনাড়ি অর্থমন্ত্রীর পরামর্শে আওয়ামী লীগ সরকারের শুধু শেয়ার বাজারকেই ধ্বংস করেনি, একই সাথে কঠোর আর্থিক নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকেও স্থবির করে ফেলেছে। প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গত কারণে এসেছে সরকারের নেয়া ব্যাংক ঋণের দিকটি। দুই সরকারের তুলনামূলক আলোচনাকালে এম সাইফুর রহমান বলেছেন, বিএনপি সরকার যেখানে চার বছরে ব্যাংক থেকে নীট ঋণ নিয়েছিল ৪ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা, আওয়ামী লীগ সরকার সেখানে তিন বছর নয় মাসেই ব্যাংক ঋণ নিয়েছে ১১ হাজার ৯০ কোটি টাকা। সরকার নিজে এত বিপুল অর্থ ঋণ নেয়ায় অনিবার্যভাবেই বেসরকারী খাত বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করে এম সাইফুর রহমান জানিয়েছেন, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বেসরকারী খাতে যেখানে ঋণ বেড়েছে মাত্র ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ, সেখানে সরকারী খাতে বেড়েছে ৩৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। অথচ বিএনপি সরকারের শেষদিকে ব্যাংক ঋণ কমেছিল মাইনাস ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ এবং বেসরকারী খাতে বেড়েছিল ২৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সাবেক অর্থমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সরকারের ঋণ নেয়ার উদ্দেশ্যেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং জানিয়েছেন, প্রধান উদ্দেশ্য হলো সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া এবং অনুৎপাদনশীল বিভিন্ন খাতে ব্যয় মেটানো। তিনি এক পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেছেন, বর্তমান সরকারের রাজস্ব বাজেটের ২০ শতাংশ অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধে এবং এই অর্থের পরিমাণ দেশের প্রতিরক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের চেয়েও বেশী। আরো অনেক প্রসঙ্গই বলেছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী। তিনি

www.pathagar.com

জানিয়েছেন বিএনপি সরকারের আমলে যেখানে রপ্তানি খাতে ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল, আওয়ামী লীগ সরকার সেখানে সাড়ে সাত শতাংশের বাইরে অর্জন করতে পারেনি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রসঙ্গে এক কথায় তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই রিজার্ভ এক ডলারও বাড়েনি, বরং বর্তমান রিজার্ভ পরিস্থিতি অত্যন্ত আশংকাজনক পর্যায়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই, এম সাইফুর রহমান বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান অর্থমন্ত্রীকে যথেষ্ট বেসামাল করে ছেড়েছেন এবং সে কারণেই অত্যন্ত কঠোর মন্তব্যযুক্ত হলেও এস এম কিবরিয়া অনেক কষ্টে সংযম দেখাতে বাধ্য হয়েছেন। ৮ জুলাই এ নিবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত সংবাদপত্রে মন্ত্রী কিবরিয়ার কোন প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া চোখে পড়েনি। ফলে না মেনে উপায় নেই যে, তিনি সম্ভবত ধরাশায়ী হয়ে পড়েছেন এবং বার্ধক্য এসে অর্থনীতিবিদ হওয়ার শখও তার অনেকাংশে মিটে গেছে । মন্ত্রী কিবরিয়া সম্পর্কিত এমন ধারনা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তথ্যাভিজ্ঞরা কিন্তু মনে করেন না যে, সাবেক অর্থমন্ত্রী প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা থেকে দৃশ্যপটে এসেছেন। তথ্যানির্ভর যে কোন পর্যালোচনায় দেখা যাবে, বিএনপি সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে কথায় কথায় তুলনামূলকভাবে আলোচনায় গেলেও এম সাইফুর রহমান বলেছেন একজন দেশপ্রেমিকের অবস্থান থেকে এবং সমালোচনাও করেছেন গঠনমূলকভাবে । বড় কথা তিনি অন্তত অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার মত হীনমন্যতার শিকার হননি; উষ্কানী দেন নি সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে। এম সাইফুর রহমান একই সাথে গনতান্ত্রিকক শিষ্টাচার ও সৌজন্যেরও প্রমান রেখেছেন। না হলে বাজেটের অন্য অনেক দিককেও তিনি আলোচনার অর্ন্তভুক্ত করতেন এবং উপভাগ্য কিছু মন্তব্য করার লোভ সংবরণ করতেন না। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত হিসেবে শেয়ার বাজারের কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতের মাড়োয়ারীসহ এদেশের স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রে শেয়ার বাজার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এতদিনে যিনি শেয়ার বাজার ও স্টক ও এক্সচেঞ্জ বোঝেন না বলে জানাচ্ছেন, সে অর্থমন্ত্রী তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরব থেকেছেন। যেমন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পর যখন সুপরিকল্পিতভাবে শেয়ার বাজারকে 'চাঙ্গা' করা হচ্ছিল এবং মূল্যসূচক যখন ৩৬০০ পর্যন্ত ওঠানোর পর রাতারাতি ২৬০০-তে নামিয়ে আনা হয়েছিল, মন্ত্রী কিবরিয়া তখনও উদ্বিগ্ন হননি। বরং জনগণকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলেছেন, মূল্যসূচক ১৬০০-এর নীচে না নামা পর্যন্ত তিনি উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ দেখেন না। অর্থাৎ জনগণ শেয়ার বাজারে আরো বেশী টাকা বিনিয়োগ করতে পারে। অথচ শেয়ারের সেই মূল্যসূচক এমনকি ৫০০-রও নীচে নেমে গেছে, কিন্তু মন্ত্রী কিবরিয়া কখনো উদ্বিগ্ন হয়েছেন বলে জানা যায়নি। ভারতীয় মাড়োয়ারী ও এদেশের সিদ্দিকীদের ষড়যন্ত্রে দেশবাসীর সর্বনাশ ঘটাবার পর এতদিনে তিনি বলতে চাচ্ছেন, অর্থমন্ত্রী হলেও তিনি নাকি শেয়ার বাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ বোঝেন না। মন্ত্রী কিবরিয়ার কপাল ভালো যে, এত বড় অপরাধের পরও এম সাইফুর রহমান সৌজন্য ও সংযম দেখিয়েছেন, কারো পুত্রবধূর প্রসঙ্গ টেনে আনেনি, বরং অত্যন্ত দায়িত্বশীল রাজনীতিক হিসেবে অর্থমন্ত্রীকে পদত্যাগ

www.pathagar.com

করার পরামর্শ দিয়েছেন। এখানেও শেষ নয়, এম সাইফুর রহমানের স্থানে জনাব কিবরিয়া থাকলে তিনি নিঃসন্দেহে নিজের স্ত্রীকেন্দ্রিক অর্থনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করতেন না। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, ঈদের প্রাক্কালে জনাব কিবরিয়ার স্ত্রী নাকি কোনো মার্কেটেই ঢুকতে পারেন নি এবং সে ঘটনার উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলে বসেছিলেন-এতেই বোঝা যায়, দেশের অর্থনীতি সচল এবং খুবই ভালো অবস্থায় রয়েছে। এই একটি মন্তব্যের মধ্যদিয়েই অর্থমন্ত্রীর জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও সংযত সাবেক অর্থমন্ত্রী সে প্রসঙ্গে যাননি, কারণ, এর সঙ্গে সৌজন্য ও রুচিবোধের বিষয় জড়িত রয়েছে। এম সাইফুর রহমান সম্ভবত তার উত্তরসূরিকে লজ্জিত করতে চাননি।

আমরাও এসব বিষয়কে প্রাধান্যে আনতে চাই না। এবারের বাজেট নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। কারণ, এর ফলে চরম অস্বস্তিতে পড়বেন 'অর্থনীতিবিদ' অর্থমন্ত্রী। আমরা শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, সাবেক অর্থমন্ত্রী সঠিকভাবেই জনাব কিবরিয়ার পদত্যাগ দাবী করেছেন এবং তার এ মন্তব্যও যথার্থ যে, 'একটি দায়িত্বশীল সরকার ক্ষমতায় থাকলে অযোগ্যতা ও অব্যবস্থাপনার জন্য এমন অর্থমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতো।' এম সাইফুর রহমান এক্ষেত্রে সম্ভবত আওয়ামী লীগ সরকারের চরিত্র ও উদ্দেশ্যের দিক দু'টিকে এড়িয়ে গেছেন। না হলে তিনি দেখতেন যে, মন্ত্রী কিবরিয়া আসলে 'যোগ্য' ভূমিকাই পালন করে চলেছেন এবং জাতীয় অর্থনীতি অযথাই মহাদুর্যোগের সম্মুখীন হয়নি।

* * *

অবমূল্যায়ন জাতীয় অর্থনীতি ও সরকারের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য

ডেটলাইনঃ মে ২০০১

আওয়ামী লীগ সরকারের 'ভাগ্য' ভালোই বলতে হবে। কারণ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো পর্যায়েই জনগণের অর্থনৈতিক দাবি বা চাহিদাকে সামনে আনেনি এবং এসবের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া দূরে থাক, চিন্তা পর্যন্ত করেনি। বিরোধী দলগুলো বরং রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে ঘটনাক্রমিক আন্দোলন করেছে, সবশেষে ব্যস্ত থেকেছে কেবলই সরকারের পতন ঘটানোর আন্দোলন নিয়ে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, কোনো একটি আন্দোলনেই বিরোধী দলগুলো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, সরকারও ক্ষমতায় রয়েছে যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে। পর্যালোচনায় দেখা যাবে, সরকারের প্রচন্ড দমন-নির্যাতন অসফলতার একটি কারণ বটে, কিন্তু প্রধান কারণ হলো জনগণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে না পারা। এই সত্য মানতে হবে যে, নিজেদের জীবন ঘনিষ্ট বা অর্থনৈতিক কোনো দাবী ও কর্মসূচি না থাকায় জনগণ কখনো আগ্রহ দেখায়নি এবং প্রতি মুহূর্তে শোষিত ও নিষ্পেষিত হলেও ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

আন্দোলনে অংশ নেয়নি। সব মিলিয়ে আরো একবার প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করা যায় না এবং জনগণ সাধারণত এমন আন্দোলনে অংশও নেয় না- যেগুলো সর্বোতভাবেই রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রক্ষমতার রদবদলকেন্দ্রিক এবং যেগুলোর দাবী ও কর্মসূচির মধ্যে জনগণের প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রশ্নসাপেক্ষে মনে হতে পারে, কিন্তু ওপরের কথাগুলো অকারণে বলা হয়নি। বিরোধী দলের ব্যর্থতা বা জনগণের অংশগ্রহণ না করার তথ্যকে সামনে আনা এখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য আসলে এ কথা জানানো যে, ঐতিহ্যগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আওয়ামী লীগ সরকার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে এবং প্রায় বাধাহীনভাবে নিজেদের পরিকল্পনার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন করেছে, এখনো করে চলেছে। বলা বাহুল্য, দেশপ্রেমিক সকল মহল মনে করেন এবং এই অভিযোগ প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে যে, সরকারের পরিকল্পনায় কখনো জাতীয় স্বার্থের জন্য কল্যাণকর ও ইতিবাচক তেমন উপাদান থাকে না। ফলে সরকার যত 'সাফল্যের সঙ্গে' পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করছে, দেশপ্রেমিকদের মধ্যে তত বেশী উদ্বেগ বাড়ছে, তারা ভীত ও শংকিত হয়ে পড়ছেন।

নতুন পর্যায়ে কথা উঠেছে দেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন শান্ত ও স্থিতিশীল এবং ক্ষমতাসীন দলের পাশাপাশি বিরোধী দলগুলোও যখন নির্বাচনমুখী কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তেমন একটি সময়ে হঠাৎ দেশের অর্থনীতিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়া হয়েছে। হ্যাঁ, টাকার অবমূল্যায়নের কথাই বলা হচ্ছে-মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার আরো একবার এবং বড় ধরনের অবমূল্যায়ন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এটা বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৮ তম অবমূল্যায়ন এবং এবার একধাপেই টাকার দাম কমানো হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ-টাকার হিসাবে সরাসরি তিন টাকা। এক ধাপে এত বেশী অবমূল্যায়ন করার রেকর্ডও অবশ্য এ সরকারেরই রয়েছে- গত বছরের আগষ্ট মাসে ১৭ তম দফায় ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতাসীন হয়, তখন এক মার্কিন ডলারের দাম ছিল ৪০ দশমিক ৮৪ টাকা। এবার সর্বশেষ অবমূল্যায়নের ফলে একই মার্কিন ডলারের দাম হয়েছে ৫৭ দশমিক ৫০ টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পৌনে দু'মাস বাকি থাকতেই সরকার মাত্র এক ডলারের বিপরীতে টাকার দাম কমিয়েছে ১৬ দশমিক ৭৬ টাকা। অন্য কথায় বলা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের ১০০ টাকাকে ৮৩ টাকা বানিয়ে ছেড়েছে।

সরকারের পক্ষে বাংলদেশ ব্যাংকের জন্য যুক্তির কোনো অভাব হয়নি এবং অবমূল্যায়নের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই সব যুক্তিকেই সামনে এনেছে, যেগুলো শুধু পুরনো নয়, প্রতিটি উপলক্ষে ব্যবহৃতও হয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে-অবমূল্যায়নের ফলে নাকি দেশের রফতানী আয় ও প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্সের পরিমাণ অনেক বাড়বে এবং কমবে অপ্রয়োজনীয় আমদানী ব্যয়। একযোগে এসেছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর উদ্দেশ্যের কথাও। কিন্তু কথাটি এমনভাবে বলা হয়েছে যেন, ওটাও একটি উদ্দেশ্য মাত্র, প্রধান উদ্দেশ্য নয় অথচ তথ্যাভিজ্ঞ ও সচেতন সকলেই জানেন, দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং গত ২৪ মে অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিনটিতে এই রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ১১৮ কোটি মার্কিন ডলার- যে পরিমাণকে এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্নে হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি এড়াতে চাইলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অবশ্য ধরা পড়ে গেছেন। সংবাদপত্রের কাছে তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, রিজার্ভের ওপর চাপ কমানোর জন্য অবমূল্যায়ন করা ছাড়া নাকি তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। অর্থাৎ সর্বশেষ অবমূল্যায়নের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে দেশের বিপজ্জনক রিজার্ভ পরিস্থিতি। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর থেকে কোনো পর্যায়েই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিরাপদ বা সন্তোষজনক পরিমাণ থাকেনি। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুসারে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও আমদানির ওপর নির্ভরশীল দেশের যেখানে গড়ে ২২৫ কোটি ডলার রিজার্ভ থাকা দরকার, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সেখানে প্রায় সব সময় রিজার্ভ থেকেছে ১৫০ কোটি ডলারের নীচে। সর্বশেষ পর্যায়ে এই রিজার্ভ মাত্র ১১৮ কোটি ডলার পর্যন্ত হয়েছে, যা দিয়ে এমনকি দেড় মাসেরও আমদানী ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সরকারের ধ্বংসাত্মক ব্যর্থতাকেই প্রধান করে তোলে সেকথা সম্ভবত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত পর্যালোচনায় দেখা যাবে, রফতানী আয় এবং রেমিটেন্স ও রিজার্ভের পরিমাণ বাড়ানোর মতো উদ্দেশ্য অর্জনের কোনো ক্ষেত্রেই সরকার সামান্যও সফলতার প্রমাণ রাখতে পারেনি। উদাহরণ হিসেবে রেমিটেন্সের দিকটিকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে এবং দেখা যাবে, দফায় দফায় টাকার অবমূল্যায়ন করা হলেও বাড়বার পরিবর্তে রেমিটেন্সের পরিমাণ বরং কমেছে পর্যায়ক্রমে। যেমন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়েছে, ২০০০ সালের তুলনায় চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসেই সাড়ে ৮ শতাংশ কমে রেমিটেন্সের পরিমাণ নেমে এসেছে মাত্র ৫৮ কোটি ১০ লাখ ডলারে। জানা গেছে, রেমিটেন্স কমে যাওয়ার দু'টি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথম কারণটি হলো, জনশক্তি রফতানীর লক্ষমাত্রা অর্জনে সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং রফতানী কমেছে গড়ে ২২ দশমিক ১৪ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে দু'একটি পরিসংখ্যানের উল্লেখ করলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। সরকার যেখানে কাতারে ১৮ হাজার বাংলাদেশীকে পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল, সেখানে পাঠানো সম্ভব হয়েছে মাত্র ৫৯৪ জনকে। কাতারে এমনিতেও রফতানী কমেছে ৭৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ। অন্য দেশগুলোতেও হ্রাসের হার আশঙ্কাজনক (যেমন লিবিয়ায় রফতানী কমেছে ৪২ দশমিক ০৮ শতাংশ)।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখযোগ্য আরেকটি বিষয় হলো, বিশেষ করে এখানে আরবসহ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের ভারতমুখী নীতি ও কর্মকান্ডকে সুনজরে দেখছে না এবং বাংলাদেশ ওলামা-মাশায়েখসহ ইসলামী শক্তিসমূহের ওপর পরিচালিত দমন-নির্যাতনে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বলা হচ্ছে, মূলত সে কারণেই মুসলিম বিশ্বে জনশক্তি রফতানী কমে গেছে এবং এখনো বাড়বার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে রেমিট্যান্স হ্রাস পাওয়ার দ্বিতীয় কারণটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জটিল পদ্ধতি ছাড়াও দেশের ভেতরে ব্যাংকগুলোতে সীমাহীন দুর্নীতি চলছে এবং তার ফলে রেমিট্যান্স টাকা ওঠাতে প্রবাসীদের আত্মীয়-স্বজনরা মারাত্মক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এজন্যই প্রবাসীরা নিতান্ত বাধ্য না হলে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থ পাঠায় না, তারা বরং হুণ্ডির অবৈধ পন্থাকে অগ্রাধিকার দেয়। একই কারণে আবার বার বার অবমূল্যায়ন করা সত্ত্বেও সরকারের তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা জমা পড়ছে না, ফলে রিজার্ভও বাড়ছে না। সুতরাং এমন যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয় যে, টাকার অবমূল্যায়ন করা হলেই প্রবাসীরা বেশী পরিমাণ অর্থ পাঠাতে উৎসাহিত হবে। বাস্তবে টাকা যারা পাঠানোর তারা ঠিকই পাঠাচ্চেছ। পার্থক্য হলো, এসব টাকা আসছে হুন্ডির মাধ্যমে, দুর্নীতিগ্রস্ত ও জটিল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়।

রফতানী আয় বাড়ানোর যুক্তি সম্পর্কেও কমবেশী একই কথা প্রযোজ্য। দাম কমানোয় ক্ষেত্র বিশেষে টাকার অংকে আয় বাড়তেই পারে, কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা গেছে, উৎপাদন খাতে আমদানি নির্ভরতা প্রবল হওয়ায় সাধারণভাবে প্রকৃত রফতানী আয় কোনো পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়েনি। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে এক পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, ১৭ তম অবমূল্যায়নের আগে যেখানে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৫ শতাংশের কাছাকাছি, সেখানে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে মাত্র এক-শতাংশের সামান্য বেশী। অর্থাৎ প্রায় ৬ শতাংশ অবমূল্যায়ন করার পরও প্রকৃত রফতানী আয় মোটেই বাড়েনি। সুতরাং এমন আশা করা কিংবা বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত নয় যে, এবার হঠাৎ করে তা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাবে। অর্থনীতিবিদসহ তথ্যাভিজ্ঞরা বরং মনে করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে রফতানী আয় সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যা ও বিভ্রান্তি তারা লক্ষ্য করেন রফতানীমুখী শিল্পের যন্ত্রপাতি কাঁচামালও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় সেজন্যই ডলারের দাম বাড়লেই আমদানিকালে প্রায় সমানভাবে চাপ বা ঘাটতি পড়ে এবং রফতানী আয়ের ব্যবধান দিয়ে ঘাটতি পুরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে সব মিলিয়ে রফতানী আয়ও রাতারাতি বাড়ানো যায় না।

এভাবে পর্যালোচনায় দেখা যাবে, একমাত্র অপ্রয়োজনীয় আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার যুক্তি ছাড়া অবমূল্যায়নের পক্ষে কোনো যুক্তিই সমর্থনযোগ্য নয় (এক্ষেত্রেও সরকারের অনুসৃত এবং কথায়-কথায় পরিবর্তিত নীতি প্রধানত দায়ী যার ফলে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রতি মাসে ২৫ কোটি ডলার পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় আমদানী বেড়ে চলেছে)। টাকার মান ১৮ বার অবমূল্যায়ন করায় বাস্তবে আরো একবার প্রমাণিত হলো যে, আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ সরকার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর নীতির পরিণতিতে জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসের কাছাকাছি এসে গেছে এবং সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার রীতিমত দিশাহারা হয়ে পড়েছে। নাহলে কেবলই অবমূল্যায়নের ধ্বংসাত্মক পন্থাকে এতো বেশীবার আশ্রয় করতো না।

অর্থনীতিবিদসহ তথ্যাভিজ্ঞরা কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের এই দিশাহারা অবস্থা এবং যে কোনোভাবে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টার মধ্যে আতঙ্কিত হওয়ার উপাদান লক্ষ্য করছেন। শেয়ার বাজারে ধস নামানোর থেকে ভারতীয় পণ্যের স্বার্থে দেশীয় শিল্পের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা পর্যন্ত নানামুখী কার্যক্রমকে বিবেচনায় রেখে বলা হচ্চেছ, সরকার আসলে জাতীয় অর্থনীতিকেই ধ্বংসের আয়োজন করে যাচেছ। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সরকারের অন্য দুটি নীতি সিদ্ধান্তে ও কার্যক্রমের উদাহরণ। প্রথম ক্ষেত্রে সরকার বিপুল পরিমাণ কাগুজে নোট এবং চলতি অর্থবছরে প্রথম ৯ মাসেই নোটের সরবরাহ বাড়িয়েছে ২২ দশমিক ৮১ শতাংশ। বিগত অর্থবছরে একই সময়ে বৃদ্ধির হার ছিল ২৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কোনো নির্ধারককেই সরকার বিবেচনায় নিচ্চেছ না, অর্থনীতির সাধারণ নিয়মকেও সরকার উপেক্ষা করে চলেছে। পরিণামে মুদ্রাস্ফীতিসহ ক্ষতিকর বিভিন্ন পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে-যার ধকল সামাল দিতে হবে পরবর্তী সরকারকে, জনগণকে তো বটেই।

এদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সরকার অত্যন্ত কঠিন শর্ত মেনে হলেও সাপ্লায়ার্স বৈদেশিক ঋণের জন্য প্রদেয় ২ শতাংশ সুদের তুলনায় এই ঋণের হার অনেক বেশী, এমনকি ৭ শতাংশ পর্যন্ত এবং সুদে আসলে ঋণের সমুদয় অর্থ ১৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, সরকার আগামী ২০০৩ সালের মধ্যে ১৫২ কোটি ৩০ লাখ টাকা ডলার সরবরাহকারী ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যার জন্য সুদ গুনতে হবে ২৬ কোটি ২৬ লাখ ডলার। শুধু তাই নয়, মূলত বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে সরকার ইতোমধ্যে চীনের কাছ থেকে ৪৮ কোটি ৫৬ লাখ ডলারসহ ১০০ কোটি ডলারের বেশী ঋণ নিয়েও ফেলেছে। বলা হচেছ, এর পরিণতিতে পরবর্তী সরকারকে মারাত্মক বিপদে পড়তে হবে এবং বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশ এমনকি ঋণগ্রস্ত দেশ হিসেবেও পরিচিতি পেয়ে যেতে পারে।

আমরা মনে করি, অবমূল্যায়নসহ জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনার সময় অনেক বেশী পরিমাণে কাগুজে নোট সরবরাহ এবং সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের মতো জরুরি বিষয়গুলোকেও বিবেচনায় রাখা দরকার। তাহলেই সম্ভবত আওয়ামী লীগ সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সম্পর্কে আংশিকভাবে হলেও ধারণা পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, সে পরিকল্পনায় দেশ ও জাতিকে লাভবান বা সমৃদ্ধ করার কোনো উপাদান নেই। সরকার বরং অর্থনীতিকে এমন এক ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকেই ঠেলে দিতে চাচ্চেছ, বাংলাদেশ যাতে কখনো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে না পারে।

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের শ্বেতপত্র

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

মানবাধিকার রিপোর্ট ২০০০ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর

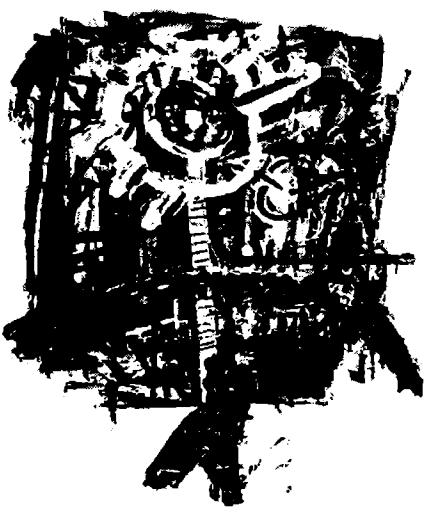

www.pathagar.com

মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০০
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

ঢাকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি– ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ণ বিবরণী নিচে দেয়া হলো ঃ

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। এই পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা ওই নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। এ দেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক প্রচারাভিযান ও নির্বাচনসহ রাজনীতির সকল স্তরে সহিংসতা লক্ষণীয়। সহিংসতা, ভোটারদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও কারচুপির কারণে নির্বাচন প্রায়শই ব্যাহত হতে দেখা যায়। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে সংসদে যোগদান থেকে বিরত রয়েছে, যার ফলে সংসদের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আইন বিষয়ে এবং জাতীয় ইস্যুগুলোতে প্রকৃত বিতর্ক এড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষমতা অপপ্রয়োগের অভিযোগ করেছে। বিচার বিভাগের উচ্চ পর্যায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করে এবং প্রায়শই সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়; তবে নিম্ন আদালতের কর্মকর্তারা নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীনস্ত হওয়ায় সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপন্থী অভিমত প্রকাশে আগ্রহী নয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দু'টি বাহিনী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকার প্রায়ই পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি বিরাজ করছে ও শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তারা অনেকগুলো মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার জন্য দায়ী।

বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। এদেশে প্রায় ১৩ কোটি জনসংখ্যার বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৫০ ডলার। দেশের সমস্ত শিশুর অর্ধেকেরও সামান্য কিছু বেশি অপুষ্টিতে ভুগছে। মোট শ্রমশক্তির সত্তর শতাংশ কৃষিকর্মে নিয়োজিত। এই খাত থেকেই দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ অর্জিত হয়ে থাকে। অর্থনীতি বাজার-ভিত্তিক, তবে সরকার এখনো একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে

www.pathagar.com

চলেছে। প্রধানত বেসরকারি মালিকানাধীন পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের ভিত্তিতে দেশের শিল্পখাত ধীরে ধীরে বিকাশমান। একটি ক্ষুদ্র বিত্তশালী গোষ্ঠী বেসরকারি অর্থনীতির সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করলেও এদেশে একটি উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী রয়েছে। গ্যাস খাত এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন স্থাপনায় বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য এদেশের জন্য এখনো গুরুত্বপূর্ণ তবে রপ্তানি থেকে বর্ধিত আয় এবং বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের অর্থ প্রেরণের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক সাহায্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। সংস্কারের মধ্যমে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, কায়েমি অর্থনৈতিক স্বার্থ, প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যকার দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ দ্বারা এগুলো ব্যাহত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার দুর্বল। পর্যায়ক্রমিক প্রাকৃতিক দুর্যোগও উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। এ ছাড়া, ১৯৯৮ সালে একটি প্রলয়ংকরী বন্যা হয়। এসব সত্ত্বেও বিগত অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৫.৫ শতাংশ।

সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে তার নাগরিকদের মানবাধিকারের প্রতি সাধারণভাবে সম্মান প্রদর্শন করে। যাহোক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড খারাপ এবং সরকার গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ বেশ কয়েকটি বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং কয়েক ব্যক্তি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে পুলিশী হেফাজতে প্রাণ হারায়। সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশ নিয়মিতভাবে নির্যাতন, প্রহার এবং অন্যান্য ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়। প্রায়শই পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মারধর করে। নির্যাতন ও আইন গর্হিত মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সরকার কদাচিৎ দোষী সাব্যস্ত ও শাস্তি বিধান করে। কারাগারসমূহের অবস্থা অধিকাংশ বন্দীর জন্য অত্যন্ত দুর্বিষহ। কারাগারে ও অন্যান্য সরকারি হেফাজতে মহিলা বন্দীদেরকে ধর্ষণ একটি সমস্যা। যাহোক এ বছর এই ধরনের কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। সরকার লোকদের যথেচ্ছ গ্রেফতার ও আটক করা অব্যাহত রাখে। এ ছাড়াও, রাজনৈতিক বিরোধী ও অন্যান্য নাগরিককে হয়রানির উদ্দেশ্যে নিবর্তনমূলক আটক এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে আটকের ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ ধারার প্রয়োগ সরকার অব্যাহত রাখে। সরকার সমর্থকদের ওপর হামলাকারী বিরোধীদলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সরকার হানাহানিকে উৎসাহিত করে। বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দয়ের করে এবং কিছু ক্ষেত্রে এই সমস্ত অভিযোগ ভূয়া হতে পারে। নতুন প্রণীত জননিরাপত্তা আইন (পিএসএ) পুলিশকে তার ক্ষমতা অপব্যবহারের আরো সুযোগ করে দিয়েছে। বিচার বিভাগের বেশির ভাগই সরকারি প্রভাবাধীন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়েছে, অপরদিকে বিচার শুরুর পূর্বে দীর্ঘকাল যাবৎ ধৃত ব্যক্তিদের আটক রাখার কারণেও

www.pathagar.com

সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে ঘরবাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং সরকার বস্তিবাসীদের জবরদস্তি করে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। কার্যত, সব সাংবাদিকই কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ চর্চা করেন। সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং অন্যদের দ্বারা সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের প্রচেষ্টার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য জনসমাবেশের স্বাধীনতা সীমিত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের চলাচলের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে। সরকার সাধারণত মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোকে তাদের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দেয়; কিন্তু অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর একটি স্থানীয় শাখার নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতি এখনো বজায় রেখেছে। শিশু নিপীড়ন এবং শিশু পতিতাবৃত্তি এখানে সমস্যা। নারীর প্রতি সহিংসতা এবং বৈষম্য গুরুতর সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে। প্রতিবন্ধী, আদিবাসী মানুষ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে বৈষম্য একটা সমস্যা। ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী আহ্‌মাদিয়ার সদস্যদের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যেই সহিংস ঘটনা ঘটেছে। সরকার কিছু কিছু শ্রম অধিকার, বিশেষ করে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে শ্রম অধিকার সীমিত করার তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং সাধারণভাবে শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নে সক্রিয় নয়। গৃহকাজে নিয়োজিত বহু শিশুসহ অনেকে এমন পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হয় যা দাসত্বের সমতুল্য এবং অনেককেই নির্যাতন ভোগ করতে হয়। শিশু শ্রম এবং শিশু শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন ব্যাপক ও গুরুতর সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করে। তবে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), ইউনিসেফ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির ফলে প্রধান রপ্তানি শিল্প তৈরি পোশাক খাতে শিশু শ্রম প্রায় ৯৫ শতাংশ নির্মূল হয়। এই চুক্তির মেয়াদ জুনে বর্ধিত করা হয়। বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এবং কোনো কোনো সময় জবরদস্তিমূলক শ্রমের জন্য নারী ও শিশু পাচার গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং তাদের কর্মীদের প্রায়শ সংঘটিত সহিংস ঘটনার ফলে মৃত্যু এবং অগণিত লোকের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে আলোচ্য বছরে সম্ভবত তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক হরতাল হওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পায়। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে দণ্ড প্রদানের প্রবণতার কারণে অনেকের প্রাণহানি ঘটেছে।

মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন

অনুচ্ছেদ ১

ব্যক্তিসত্তার অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন :

ক. রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

পুলিশ কয়েকটি বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। নিরাপত্তা বাহিনী কখনো কখনো অবাঞ্ছিতভাবে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার করে। ৯ই ফেব্রুয়ারি পুলিশ কর্মকতারা

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আহমেদ হোসেন সুমনকে গ্রেফতার করার চেষ্টায় গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ কর্মকর্তারা সুমনের ভাই এবং ১২ বছর বয়স্কা ভাতিজীকে গুলি করে আহত করে। পরিবারের সদস্যরা যখন হতাহতদের একটি ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল তখন পুলিশ তার গাড়ির ওপর আবার গুলি চালায় এবং এতে গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। হত্যাকাণ্ডে জড়িত পুলিশদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ৩রা মে পুলিশ কর্মকর্তারা সাভার ইপিজেড-এ একটি কারখানায় ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে দুজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। অসন্তুষ্ট শ্রমিকরা এই কারখানাটি দখল করে রেখেছিল। কারখানায় অভিযানকালে ছুরিকাঘাতে আহত আরো দুজন শ্রমিক পরে মারা যায়। ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকার একটি পুকুরে পড়ে যাওয়া মাহবুব হাসান খান ওলিকে উদ্ধারের চেষ্টারত লোকজনের উদ্দেশ্যে পুলিশ কর্মকর্তারা বন্দুক তাক করে। পুলিশের হাতে গ্রেফতার এড়াতে ওলি পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। ওলি পুকুরে ডুবে মারা যায়। ১৯৯৯ সালের মার্চে পুলিশ কর্মকর্তারা কলেজ ছাত্র মুজিবর রহমানকে পানিতে চুবিয়ে মারে। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় তিন জন পুলিশ মোহাম্মদ শাহজাদা টুকুকে মারাত্মকভাবে মারধর করে এবং পরে একটি খালে ছুড়ে ফেলে। টুকু সেই খালে ডুবে মারা যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। বছরের শেষ নাগাদ এই সব ঘটনায় জড়িত পুলিশ কর্মকর্তাদের কাউকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হয়নি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী আলোচ্য বছরে কারাগারে ও পুলিশী হেফাজতে ১৩৪ জন মারা যায়। একটি স্বাধীন মানবাধিকার সংগঠনের হিসাবে আলোচ্য বছর পুলিশের হাতে, কারাগারে, আদালতের হেফাজতে ও সেবা শিবিরে ৭০ জন মারা গেছে।

পুলিশের অধিকাংশ ক্ষমতার অপব্যবহারের কোনো বিচার হয় না। বিচার না হওয়ার কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অবসানের ক্ষেত্রে গুরুতর অন্তরায় হয়ে রয়েছে। যাহোক, কয়েকটি ঘটনায় যেখানে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পুলিশের শাস্তিযোগ্য অপরাধের প্রমাণ রয়েছে, সেখানে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৯ সালের মার্চে ঢাকায় গোয়েন্দা দফতরের অফিসের ছাদে পানির ট্যাংকে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেলে চার জন পুলিশকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলাটি এখন চলছে। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে আগারগাঁওয়ে একটি রিকশাচালককে গুলি করে হত্যা করার দায়ে এক পুলিশ সার্জেন্টের বিরুদ্ধে মামলা বছরের শেষ নাগাদ ঝুলছে।

১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে একজন কলেজ ছাত্রকে পুলিশী হেফাজতে পিটিয়ে মারার অভিযোগে অভিযুক্ত ও আটক ১৩ জন পুলিশ কর্মকর্তাসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা অব্যাহত রয়েছে। বছরের শেষ নাগাদ অভিযুক্তদের মধ্যে ৯ জন আটক ছিল এবং মামলা অব্যাহত ছিল।

১৯৯৫ সালে সরকার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কথিত হত্যাকারীকে হত্যার অভিযোগ দায়ের করে। জাতীয় পার্টির নেতা এরশাদকে ১৯৯৭ সালে জামিন দেয়া হয়। ১৯৯৮ সালের

www.pathagar.com

শেষের দিকে এরশাদ বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অধিকতর জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে সরকার মামলা ত্বরান্বিত করতে পারেন। পরবর্তীকালে এরশাদ হরতাল আহ্বান এবং পার্লামেন্ট বয়কটের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিরোধী দলের সংগে জোট বাধেন। ২৪শে আগস্ট এরশাদের শাসনামলে তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে একটি মামলায় হাইকোর্ট এরশাদকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ ডলার (প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা) জরিমানা করে। এরশাদ আদালতে আত্মসমর্পণ করলে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০শে নভেম্বর তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলে সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগ রায় দেন যে জরিমানা পরিশোধ করলে বা জরিমানা পরিশোধ না করে ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করলে তাকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। বছরের শেষ নাগাদ এরশাদ কারাগারে রয়েছেন। আগামী পাঁচ বছর এরশাদের জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হতে পারে।

১৯৯৮ সালে একজন বিচারক ১৯৭৫ সালে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা) এবং তার পরিবারের ২১ জন সদস্যকে হত্যার দায়ে ১৫ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ২৮শে জুন হাইকোর্ট রায়ের বিরুদ্ধে আপিল এবং দণ্ড পর্যালোচনা শুরু করে। ১৪ই ডিসেম্বর দুজন বিচারকের একটি প্যানেল সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেন। বাকি পাঁচজনের সাজার ক্ষেত্রে দুজন বিচারক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। এদের বিষয়ে হাইকোর্টে আরো পর্যালোচনা বছরের শেষ নাগাদ অব্যাহত ছিল।

সরকার ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে চার জন ঊর্ধতন আওয়ামী লীগ নেতাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত আট ব্যক্তিকে কারাগারে আটক রেখেছে। নিহত নেতৃবৃন্দ তখন কারাগারে আটক ছিলেন। ১২ই অক্টোবর এদের বিরুদ্ধে এবং কারাগারের বাইরে আরো ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বছরের শেষ নাগাদ মামলার শুনানি শুরু হবার কথা ছিল ২০০১ সালের ২৪শে জানুয়ারি।

সাধারণ নাগরিকদের নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে অপরাধীদের দণ্ড দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। সরকার জানায় যে এই ধরনের ঘটনায় একজনের মৃত্যু ঘটেছে, যেখানে ১৯৯৯ সালের প্রথম নয় মাসে ২০ জনের মৃত্যু ঘটে। কর্তৃপক্ষ এই ধরনের সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কদাচিৎ গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান করে থাকে।

জনতার প্রহারে মৃত্যু সম্পর্কে সংবাদপত্রের খবর সাধারণ ঘটনা। সংবাদপত্রের এই সব খবর হিসাব করলে দেখা যায় যে মে মাসে কমপক্ষে ১৪ জন এবং জুন মাসে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও সংবাদ ভাষ্যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে উন্মত্ত জনতার সহিংসতায় আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার এবং বিচার ব্যবস্থা কাজ করে না বলে সাধারণ মানুষের ধারণার প্রতিফলন। মানবাধিকার গ্রুপগুলো এবং সংবাদপত্রের খবরে আভাস দেয়া হয়েছে যে নৈতিক অপরাধের জন্য

www.pathagar.com

অভিযুক্ত মহিলাদের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের বিরুদ্ধে সামাজিক বিচারের মাধ্যমে দণ্ডদান সাধারণ ব্যাপার। এই সব বিচার কাজে কোনো কোনো সময় ধর্মীয় নেতারা নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

উন্মত্ত জনতার সহিংসতার ঘটনাও ঘটে। ১৮ই আগস্ট দেশের উত্তরাঞ্চলে সাঁওতাল উপজাতির নেতা আলফ্রেড সরেন এক উন্মত্ত জনতার আক্রমণে নিহত হন। এই হামলায় আরো অনেকে আহত হন। একটি জমি নিয়ে বিরোধে উপজাতিদের ওপর ক্রুদ্ধ বাঙালিরা এই হামলা চালায় বলে জানা যায়।

সহিংসতা, যা প্রায়শ হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত, তা বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বত্র বিরাজমান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা, প্রায়ই একই দলের বিভিন্ন উপদলের সমর্থকরা সমাবেশ ও বিক্ষোভ চলাকালে প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। সরকারি হিসাবে আলোচ্য বছরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হানাহানিতে ১৫ জন নিহত এবং ৫৬ জন আহত হয়েছে। আওয়ামী লীগের সমর্থকরা প্রায়ই পুলিশের প্রশ্রয়ে ও সহায়তায় হিংসাত্মক পন্থায় বিরোধী দলের সমাবেশ ও মিছিল ভেঙে দেয়। বিরোধী দলগুলোও হরতাল কার্যকর করতে সশস্ত্র সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের আশ্রয় নেয়। আলোচ্য বছরে হরতাল সংশ্লিষ্ট সহিংসতায় চারজন এবং হরতাল অমান্য করে বেপরোয়াভাবে চালানো গাড়ি চাপা পড়ে আরো ৫ জন মারা যায়।

২রা ফেব্রুয়ারি হরতাল শুরু হবার কয়েক ঘণ্টা আগে বিএনপির সদর দফতরে এক বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি নিহত হয়। সরকার বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বোমা তৈরির অভিযোগ করে। অপরদিকে বিরোধী দল অভিযোগ করে যে এটা ছিল বিরোধী দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে একটি সরকারি ষড়যন্ত্র। ২রা ফেব্রুয়ারি হরতালে ঢাকায় আরেক ব্যক্তি বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারির হরতালে পুরনো ঢাকায় একজন ব্যবসায়ী নিহত হয়। ৩০শে আগস্ট হরতাল চলাকালে পুরনো ঢাকায় অজ্ঞাতপরিচয় কয়েক ব্যক্তি বিএনপির যুব ফ্রন্টের এক নেতাকে হত্যা করে।

১৯৯৯ সালে বিরোধী দল আহূত এক হরতালে প্রত্যক্ষদর্শীরা ঢাকার ধানমন্ডি এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনকে তার সশস্ত্র অনুসারীদের হাতে আটক বিএনপির দুজন তরুণ সদস্যকে হত্যা করার আদেশ দিতে দেখেন। মকবুল হোসেনের দলের সদস্যরা এরপর আটক বিএনপি কর্মী দুজনের মধ্যে একজন, সজল চৌধুরীকে কাছে থেকে গুলি করে। পরে সে মারা যায়। অপর বিএনপি কর্মীকে তারা মারধর করে। দাঙ্গা থামানোর প্রস্তুতি নিয়ে এক ডজন পুলিশ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি বা বন্দুকধারীদের আটক করেনি। সরকার জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। যা হোক পুলিশ সজল চৌধুরীর পরিবারের সদ্যদের উপর্যুপরি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে। সজল চৌধুরির পরিবার সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন ও তার সশস্ত্র সদস্যদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করেছিল। পরিবারের একজন সদস্যকে ফৌজদারি অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়

www.pathagar.com

এবং একজন বিচারক তাকে জামিন দিলে তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে (এসপিএ) আটক করা হয়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে পুলিশ এই মামলায় আদালতে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। পুলিশ তার রিপোর্ট গ্রহণ করে মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করে দেয়। মকবুল হোসেন এর পর নিহত ব্যক্তির পরিবারকে তাদের বিরুদ্ধে কেন মানহানির অভিযোগ আনা হবে না তার ব্যাখ্য দাবি করে উকিলের নোটিশ দেন।

হরতালের সময় ছাড়াও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ১৬ই জুলাই বিশিষ্ট সাংবাদিক শামসুর রহমানকে যশোরে হত্যা করা হয়। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চোরাচালান ও সন্ত্রাসের ওপর প্রতিবেদন লিখেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করেন। অন্যরা দায়ী করেন শাসকদলের সদস্যদের যারা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। বছর জুড়ে আরো অনেক সাংবাদিক সরকারি বা সমাজের অন্যান্য শক্তির হাতে নিহত হয়েছে বা আক্রমণের শিকার হয়েছে। ১১ই আগস্ট খুলনায় একজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এস এম এ রবকে হত্যা করা হয়। একটি মাওবাদী গ্রুপ এই হত্যার দায়িত্ব স্বীকার করে। যাহোক রবের পুত্র দাবি করেন যে ক্ষমতাসীন দলে তার পিতার প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। খুলনায় মেয়র পদে রব দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী হবেন বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেয়ায় তার পিতার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষিপ্ত হয়েছিল। ১৬ই আগস্ট প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা পুরোনো ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতা কামাল হোসেনকে হত্যা করে। ২০শে আগস্ট বিএনপিপন্থী আইনজীবী হাবিবুর রহমান মণ্ডল যখন পুরোনো ঢাকায় আদালতের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। একই দিন সকালে খুলনার কাছে বাগেরহাটে আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবী কালিদাস বড়াল তার নিজের দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে গুলিতে নিহত হন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। দুজন নিহত আইনজীবীর জন্য এক শোক মিছিলের ওপর গুলি চালানো হলে কয়েকজন আহত হয়।

২১শে জুলাই একটি জনসভাস্থলের কাছে একটি বিরাট বোমা উদ্ধার করা হয়। পরের দিন সেখানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। ২৩শে জুলাই একটি হেলিপ্যাডে দ্বিতীয় আরেকটি বোমা আবিষ্কার করা হয়। আগের দিন সেই হেলিপ্যাডটি প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৯৯ সালের মার্চে সিলেট অঞ্চলে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মুহিবুর রহমান মাণিকের বাসভবনে বোমা তৈরির সময় দুজন নিহত হয়। সংবাদপত্রে জল্পনা কল্পনা করা হয় যে বোমা তৈরি করা হচ্ছিলো স্থানীয় উপদলীয় বিরোধে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। এই জল্পনা কল্পনার প্রতিবাদ করা হয়। পুলিশ বোমা তৈরিতে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ১৯৯৯ সালের মে মাসে মাণিককে গ্রেফতার করে। আদালত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ২৯শে ফেব্রুয়ারি অভিযোগ দায়ের করে। বছরের শেষ নাগাদ মাণিক জামিনে মুক্ত রয়েছেন। ১৬ই আগস্ট মাণিকসহ আরো ৫০ জন সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের দুটি উপদলের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে আহত হন। ১৯৯৯ সালের ৭ই মার্চ যশোরে বামপন্থী শিল্পী সংগঠন উদীচীর এক অনুষ্ঠানে দুটি বোমা বিস্ফোরিত

www.pathagar.com

হলে ১০ জন নিহত হয়। ১৯শে জুলাই এক বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ২৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলাম। বছরের শেষ নাগাদ এই মামলায় অভিযুক্ত ইসলাম ও আরো দুজন জামিনে আছেন এবং ১৮ জন কারাগারে আছেন। অন্য তিন জন মুক্ত রয়েছেন। বিচারের অপেক্ষায় ইসলাম ও আরো দু'জন যারা জামিনে রয়েছেন তারা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খারিজ করে দেয়ার আবেদন করেন। তারা বলেন যে তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। হাইকোর্ট ২০০১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জামিন বহাল রাখেন। ১৯৯৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি মুখোশ পরিহিত বন্দুকধারীরা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা কাজী আরেফ আহমেদ ও আরো চারজনকে গুলি করে হত্যা করে। তারা তখন কুষ্টিয়ার কাছে একটি গ্রামে একটি জনসমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। এই ঘটনার জন্য ১১ই জুলাই ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদের মধ্যে ২৫ জন আটক রয়েছে। বছরের শেষ নাগাদ মামলাটি চলছিল।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে এবং একই দলের বিভিন্ন উপদলের মধ্যেও ব্যাপক সহিংসতা ঘটে থাকে। রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধি পেলে ১২ই জুলাই বন্দুকধারীরা স্বয়ংক্রিয় বন্দুক দিয়ে চট্টগ্রামে একটি ভ্যানের ওপর হামলা চালালে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের (বিসিএল) ছয়জনসহ আটজন নিহত হয়। সরকার এই হামলার জন্য বিরোধী জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করেন। প্রধানমন্ত্রী তার ছাত্র সমর্থকদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার সমর্থক ও পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঘোষণা করেন যে ক্ষমতাসীন দলের একজন নিহত হলে বিরোধী দলের দশটি লাশ ফেলে দিতে হবে। ১২ই জুলাই হত্যাকাণ্ডের পরে জামাত বিরোধী অভিযানে কমপক্ষে দুজন জামাত কর্মী নিহত হয় ও আরো কয়েকজন আহত হয়। শত শত লোককে গ্রেফতার করা হয়। বিরোধী দল জোর দিয়ে বলে যে ভ্যানের ওপর হামলাটি ছিল এর আগের দিন বিসিএল-এর দুটি উপদলের মধ্যে গোলাগুলির জের। এই গোলাগুলিতে বিসিএল-এর তিনজন কর্মী নিহত হয়। ২০শে আগস্ট পুরনো ঢাকায় কবি নজরুল কলেজে বিসিএল-এর দুটি উপদলের মধ্যে সংঘর্ষের ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ছবিতে পুলিশের উপস্থিতিতে একজন বিসিএল কর্মীকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরতে দেখা যায়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ঢাকায় তার যুব সংগঠনের কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে স্থগিত করে। ১৫ই ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দকে হত্যা মামলায় আদালত দুটি ভিন্ন রায় দিলে যে দাঙ্গা বাধে তাদের একজনকে বন্দুক উচিয়ে ধরার ছবি অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। লোকটিকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা হেমায়েতউদ্দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তার বিরুদ্ধে কোনো পুলিশী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ২রা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক উপদলীয় বিরোধী দু'জন নিহত হলে এর কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকাণ্ড স্থগিত করে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবসায়ীদের ও সাধারণ মানুষের কাছে থেকে বলপূর্বক চাঁদা আদায় সাধারণ ব্যাপার। জোর করে চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে ধর্মঘটে গেছে। ২৫শে মেতে কয়েকজন তরুণ ঢাকায় একটি সেলুলার ফোনের দোকানের মালিক ইফতেখার আহমেদ শিপুকে গুলি করে হত্যা করে। শিপু তাদেরকে বিনামূল্যে একটি সেলুলার ফোন দিতে অস্বীকার করেছিল। শিপুর আত্মীয়স্বজনদের দায়ের করা একটি মামলায় ক্ষমতাসীন দলীয় একজন সংসদ সদস্যের পুত্র ও আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়। সংবাদপত্রের বিবরণ এবং পরবর্তীকালে একটি মানবাধিকার সংগঠনের তদন্তানুযায়ী একজন প্রভাবশালী স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার পুত্র সুমনের নেতৃত্বে একটি দল ১৫ই সেপ্টেম্বর দুজন তরুণকে অপহরণ করে প্রায় এক হাজার ডলার (৫০ হাজার টাকা) মুক্তিপণ দাবি করে। অপহৃতদের পিতামাতারা মুক্তিপণ না দেওয়ায় পরের দিন একটি ড্রেনে তাদের দেহ টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া যায়। মানবাধিকার সংগঠনটির প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয় যে পুলিশ অপহৃতদের উদ্ধারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি, বরং তারা ঐ দলটির সদস্যদের সঙ্গে মদ সিগারেট পান করে। অপহৃত তরুণ দুটি তখন তাদের হাতে আটক ছিল। পরবর্তীকালে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা হয়। পুলিশ ঐ দলটির কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতার করে।

খ. নিখোঁজের ঘটনা

১৮ই সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলামকে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। প্রতিবেশী ও বিএনপি সূত্রে জানা যায় যে, এই অপহরণের পেছনে ছিল আওয়ামী লীগের স্থানীয় শাখার সাধারণ সম্পাদক। অপহৃত ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। পুলিশ পরে এই অপহরণের প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সাধারণ সম্পাদক, তার দুই পুত্র এবং আরো ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক বা তার দুই পুত্রকে গ্রেফতার করা হয় নি।

গ. নির্যাতন, অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর ব্যবহার বা শাস্তিদান

সংবিধানে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তিদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা হোক, পুলিশ গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নিয়মিতভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। হুমকি দেয়া, পেটানো এবং মাঝে মধ্যে বৈদ্যুতিক শক দেয়ার মাধ্যমে নির্যাতন করা হতে পারে। সরকার কদাচিৎ নির্যাতনকারীদের সাজা দিয়ে থাকে এবং শাস্তির ঝুঁকি না থাকায় পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৮ সালে পুলিশের হেফাজতে

www.pathagar.com

একজন কলেজ ছাত্রকে পিটিয়ে মারার কথিত অভিযোগে ঢাকার কয়েকজন পুলিশকে গ্রেফতার করা হলে ঢাকার ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার প্রকাশ্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন তথ্য আদায়ের উদ্দেশ্যে এই ধরনের কৌশলের দরকার রয়েছে।

বিরোধী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা নাসির উদ্দিন পিন্টু অভিযোগ করেন যে, পুলিশী হেফাজতে থাকাকালে তাকে পেটানো হয়, ঘুমাতে দেয়া হয়নি এবং পানিতে চুবানো হয়। তিনি আরো জানান যে, ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশের হেফাজতে থাকাকালে যথাযথ খাবার ও পানি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। একটি মানবাধিকার সংগঠন জানায় যে, সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা গেছে যে ১৩ই জুন ঝিনাইদহে পুলিশ কর্মকর্তারা বিলাল নামে ১২ বছরের একটি ছেলেকে গ্রেফতার করে তাকে ন্যাংটো করে একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখে, তার পুরুষাঙ্গে একটি ইট ঝুলিয়ে দেয় এবং লাঠি দিয়ে মারধর করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো সে একটি ভিক্ষুককে উত্ত্যক্ত করেছিল। মানবাধিকার সংগঠনটি জানায় যে, ছেলেটির পরিবার এতোই ভয় পেয়েছিল যে তারা এই ঘটনা সম্পর্কে কোনো ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার সাহস পায়নি। পরবর্তীকালে নিকটস্থ বেতাই পুলিশ ক্যাম্পের একজন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং অন্যান্য পুলিশকে বদলি করা হয়।

পুলিশী ও অন্যান্য সরকারি হেফাজতে আটক মহিলা বন্দীকে ধর্ষণ একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি গত মার্চে এক বক্তৃতায় স্বীকার করেন যে পুলিশের হেফাজতে প্রায়ই ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। বিগত বছরগুলোতে পুলিশের হেফাজতে ধর্ষনের ঘটনার খবর ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হলে হৈচৈ পড়ে যায়। আলোচ্য বছরে এই ধরনের ধর্ষণের খবর না থাকলেও এটা স্পষ্ট নয় জনগণের ব্যাপক নিন্দার ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, না এই ধরনের ধর্ষণের খবর আর প্রকাশিত হচ্ছে না।

মানবাধিকার গ্রুপগুলো এবং সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী পুলিশ ১৯৯৯ সালের জুলাইতে টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয়ে অভিযান পরিচালনাকালে সহিংসতা ও লুটতরাজের আশ্রয় নেয়। তারা উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদকারী পতিতালয়ের বাসিন্দা এবং ৪০ জনের অধিক মহিলা মানবাধিকার কর্মীর ওপর হামলা চালায়। উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের বিভিন্ন ভবঘুরে কেন্দ্রে আটকে রাখা হয়। সেখানে প্রহরী ও বাসিন্দারা তাদের ওপর যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি করে। দুটি মানবাধিকার সংগঠনের মতে বছরের শেষ নগাদ ১২ জনের কম যৌনকর্মী এই সব কেন্দ্রে আটক ছিল।

পুলিশ কখনো কখনো তাদের হেফাজতের বাইরে মহিলাদের ধর্ষণ করে। সরকারি খবরে জানা যায় যে, মে মাসে একজন পুলিশ কনস্টেবল পুলিশী হেফাজতের বাইরে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে। তদন্তের পর কনস্টেবলটিকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং

www.pathagar.com

তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। মামলাটি বছরের শেষ নাগাদ বিচারাধীন ছিল। একটি মানবাধিকার সংগঠন বছরের প্রথম নয় মাসে পুলিশ কর্তৃক তাদের হেফাজতের বাইরে নয়টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করে। তাছাড়া মহিলারা যখন ধর্ষণের কথা (বা পারিবারিক বিরোধের কথা) জানায়, তখন তাদের প্রায়ই "নিরাপত্তামূলক হেফাজতে" আটক রাখা হয়। সেখানে তাদের খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কখনো কখনো তাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয় বা পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো ধর্ষণ করা হয়। কারা কর্মকর্তাদের পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি মানবাধিকার সংগঠন জোর দিয়ে বলে যে সেপ্টেম্বর নাগাদ ৩০৭ জন মহিলা (প্রাপ্তবয়স্কা ও অপ্রাপ্তবয়স্কাসহ) এবং ১১৪ জন পুরুষ "নিরাপত্তামূলক হেফাজতে" ছিল। সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৩৯ জন মহিলাসহ ৩৫৩ জন বছরের শেষ নাগাদ নিরাপত্তামূলক হেফাজতে ছিল।

পুলিশ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় প্রায়ই অতিরিক্ত, কখনো কখনো মারাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। মে মাসে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য কাদের সিদ্দিকীর একটি পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশের আগে পুলিশ সিদ্দিকীকে তার বাসভবনের সামনে থামিয়ে দেয়, তার সমর্থকদের ভীত সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে শূন্যে গুলি ছুড়ে এবং তাকে এমনভাবে মারধর করে যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তার দলের চারজন কর্মীকে জননিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। ৬ই আগস্ট পুলিশ টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও ব্যাটন চার্জ করে বিরোধী চারদলীয় একটি সমাবেশ ভেঙে দেয়। কমপক্ষে ২৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ৫ই অক্টোবর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বন্যাকবলিত এলাকায় যেতে এবং একটি পূর্ব নির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতা দিতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটি সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পুলিশের সহায়তায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা খালেদা জিয়ার জনসভার জন্য তৈরি করা মঞ্চটি ভেঙে দেয়। সরকারি নেতৃবৃন্দ জানায় যে, বেগম জিয়ার জনসভার স্থানটিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যায় বলা হয় যে বিরোধী দল যদি প্রধানমন্ত্রীর আগে বা পরে তাদের কর্মসূচির সময় নির্ধারণ করতো তাহলে "এই দুঃখজনক পরিস্থিতির" সৃষ্টি হতো না। বিরোধী দল এর প্রতিবাদ করে জানায় যে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি ঘোষিত হবার আগেই তাদের জনসভার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দিয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের বেশ আগেই তাদের কর্মসূচি শেষ করা হবে। নভেম্বরে পুলিশ জামাতে ইসলামীর ৫০০ জনের একটি মিছিল ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে আনুমানিক ১০০ জন আহত হয়। পুলিশ মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং ফাঁকা গুলি ছুড়ে। অন্যদিকে মিছিলকারীরা ঘরে তৈরি বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ৪০ জন বছরের শেষ নাগাদ আটক ছিল। পৃথক একটি ঘটনায় জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি শফিউল আলম প্রধানকে ১৯৯৯ সালে মারধর করার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে কোনে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

৩রা মে সাভার ইপিজেড-এ অসন্তুষ্ট শ্রমিকরা একটি পোশাক কারখানা দখল করে নিলে পুলিশ সেখানে ঝটিকা আক্রমণ চালায়। এই অভিযানে পুলিশ অফিসাররা অসংখ্য লোককে আহত করে। এই ঘটনায় চারজন নিহত হয় এবং ২০ জনের বেশি লোক আহত হয়।

একটি মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী সংগঠনের মে মাসের প্রতিবেদনে বলা হয় যে শিবিরগুলোতে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা মারধর, অন্যান্য ধরনের দৈহিক নিপীড়নসহ নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে এবং অতীতে শিবির প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদের বার্মায় ফিরে যেতে বাধ্য করার জন্য বল প্রয়োগ করেছে। সরকার কখনো কখনো কথিত আইন লঙ্ঘনকারীদের পরিবারের সদস্যদের শাস্তি দিয়ে থাকে।

পুলিশের দুর্নীতি একটি সমস্যা। বিশ্বাসযোগ্য খবর রয়েছে যে নারী ও শিশু পাচারে পুলিশ সহায়তা করে বা জড়িত।

বিরোধী দল ও ক্ষমতাসীন দল, উভয়েই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে থাকে বা সহিংসতার হুমকি দিয়ে থাকে। সমাবেশ, মিছিল ও হরতালের সময় সহিংসতা একটি সাধারণ ব্যাপার। ১৩ই ফেব্রুয়ারি বিরোধী চারদলীয় জোটের একটি যৌথ মিছিলের ওপর অজ্ঞাত পরিচয় লোকেরা হামলা চালায়। বিদেশী কূটনৈতিক সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মিছিলের কয়েকজন লোক রাস্তায় কয়েক ডজন গাড়ি ভাঙচুর করে। ৭ই আগস্ট আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা নারায়ণগঞ্জে বিএনপির একটি মশাল মিছিলে গুলি চালায়। বিএনপির মিছিলকারীরা আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের ওপর মশাল ছুড়ে মারে এবং পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ বিএনপির মিছিলকারীদের ধাওয়া করলে আওয়ামী লীগের কর্মীরা স্থানীয় বিএনপি অফিস ভাঙচুর করে। ১৬ই আগস্ট সিলেট বিভাগে ক্ষমতাসীন দলের দুটি উপদল বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হলে প্রায় ৫০ জন আহত হয়। আগস্টে দু'জন নিহত আইনজীবীর স্মরণে একটি শোক মিছিলে অজ্ঞাতপরিচয় লোকেরা গুলি চালালে দুজন পুলিশসহ চারজন আহত হয়।

অভিযোগ রয়েছে যে অতীতে সরকারকে বিব্রত করা এবং জনমতকে নিজেদের দিকে টানার উদ্দেশ্যে কিছু বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকান্ড, বিশেষ করে হরতাল আহ্বান করা হতো সহিংস সংঘর্ষ বাঁধানোর জন্য। যাহোক আলোচ্য বছরে হরতালের সংখ্যা এবং প্রচণ্ডতা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

২২শে ডিসেম্বর বিএনপি তার ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করলে নতুন নেতৃত্বের বিরোধী ছাত্রদলের কর্মীরা বিএনপির দুজন নেতার বাড়িতে হামলা চালায় এবং গাড়ি ভাঙচুর করে ও সম্পত্তি বিনষ্ট করে। তারা অভিযোগ করে যে নতুন নেতারা ছাত্র নয়, সুপরিচিত সন্ত্রাসী।

www.pathagar.com

দেশের কয়েকটি স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু আহমেদীয়া সদস্যদের ওপর হামলা চালানো হয়।

গ্রামঞ্চলে মানবাধিকার গ্রুপ ও সংবাদপত্রের খবরে কথিত অনৈতিক কাজের জন্য মহিলাদের বিরুদ্ধে সামাজিক বিচারের ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। এই সব বিচারে বেত মারার মতো অবমাননাকর ও বেদনাদায়ক শাস্তি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক বা ক্রুদ্ধ স্বামী বা প্রতিশোধকামী ব্যক্তিরা কখনো কখনো মহিলাদের মুখের ওপর এসিড নিক্ষেপ করে।

২১শে জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় একটি মঞ্চের কাছে একটি বিশাল বোমা আবিষ্কৃত হয়। পরের দিন ঐ মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল। ২৩শে জুলাই একই স্থানে প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য তৈরি একটি হেলিপ্যাডের কাছে মাটির নিচে অনুরূপ দ্বিতীয় আরেকটি বোমা পাওয়া যায়। কেউ আহত হয়নি। সরকার প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য বিরোধী দলকে অভিযুক্ত করেন। জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামপন্থী দলের সদস্যসহ কয়েক ডজন লোককে গ্রেফতার বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত থাকার জন্য ২০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে ১১ জনের বিরুদ্ধে পরে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বছরের শেষ নাগাদ চারজন আটক ছিল এবং অন্যদের পুলিশ ধরতে পারেনি।

কারাগারের অবস্থা অধিকাংশ বন্দীর জন্য দুর্বিসহ। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ১০ আগস্ট এক সেমিনারে বলেন যে বন্দীরা "মানবেতর জীবন" যাপন করছে। সরকারি পরিসংখ্যানে আভাস পাওয়া যায় যে আলোচ্য বছরে ১৩৪ জন লোক কারাগারে ও পুলিশ হেফাজতে মারা গেছে। বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে কারাগারের দুর্বিসহ পরিস্থিতি এদের অনেকের মৃত্যুর অন্যতম কারণ। অধিকাংশ কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দী রয়েছে এবং এগুলোতে পর্যাপ্ত সুবিধার অভাব রয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে কারাগারগুলোতে ৬৩,৪৮৯ জন রয়েছে। এই সংখ্যা কারাগারগুলোর সরকারি ধারণ ক্ষমতার ২৬৫% ভাগ বেশি। কারাবন্দীদের ১৬,৩৯৩ জন সাজাপ্রাপ্ত এবং ৪৭,০৯৬ জন বিচারাধীন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারাকক্ষগুলোতে বন্দীর সংখ্যা এতোই বেশি যে তাদের পালা করে ঘুমাতে হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যেখানে তিন হাজারের কম লোকের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে ৮ হাজারের বেশি অবস্থান করছে বলে প্রকাশ। ১৯৯৮ সালে একটি বিচার বিভাগীয় প্রতিবেদনে কারাগারগুলো দুর্বল ভৌত অবস্থা এবং খাবার তৈরির অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। কারাগারগুলোর অভ্যন্তরে মাদকদ্রব্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কারাগারগুলোতে বন্দীদের সবার সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয় না। কারাকক্ষগুলোর তিন ধরনের শ্রেণী বিন্যাস আছে; এ, বি ও সি। সাধারণ অপরাধী ও নিচু স্তরের রাজনৈতিক কর্মীদের সাধারণত সি শ্রেণীতে আটক রাখা হয়। এই সব কক্ষের মেঝে নোংরা, কোনো আসবাবপত্র নেই এবং খাবারের মানও খারাপ। এই সব

www.pathagar.com

কক্ষে বন্দীদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কৌশলের প্রয়োগ সাধারণ ব্যাপার। "এ" ও "বি" শ্রেণীর কারাকক্ষগুলোর অবস্থা লক্ষণীয়ভাবে উন্নততর। "এ" শ্রেণীর কারাকক্ষগুলো সংরক্ষিত রাখা হয় বিশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য। সরকার কারাগারগুলোর ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কারাগার নির্মাণ শুরু করেছে।

সাধারণভাবে সরকার স্বাধীন মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের কারাগার পরিদর্শন করার অনুমতি দেয় না। প্রতিটি কারাগার এলাকায় বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটিগুলো প্রতি মাসে কারাগার পরিদর্শন করে, কিন্তু তারা তাদের পরিদর্শনের সময় প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করে না। জেলা জজও মাঝে মধ্যে কারাগার পরিদর্শন করেন, কিন্তু কদাচিৎ তাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করে থাকেন।

ঘ. বলপূর্বক গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন

সরকার বলপূর্বক লোকজন গ্রেফতার ও আটক, এমনকি নাগরিকদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের ব্যতিরেকে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এসপিএ অথবা বিএসএ) প্রয়োগের মাধ্যমে আটক করা অব্যাহত রেখেছে। সংবিধানের বিধি অনুসারে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আটকের কারণ জানতে হবে, তার ইচ্ছানুসারে আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট আটকাদেশ অব্যাহত রাখার বিষয়টি অনুমোদন না করলে তাকে মুক্তি দিতে হবে। এসব চাহিদা পূরণের কথা থাকলেও সংবিধান নির্দিষ্ট রক্ষাকবচসহ নিবর্তনমূলক আটক অনুমোদন করে। বাস্তবে, কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এমনটি অ-নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রেও এসব সাংবিধানিক ধারা লঙ্ঘন করে থাকে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে হাইকোর্টের দু'জন বিচারকের একটি প্যানেল আটকাদেশ সংক্রান্ত আইন ও ক্ষমতার নির্বিচারে অপব্যবহার করার জন্য পুলিশ বাহিনীর সমালোচনা করেন।

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ নম্বর ধারার অধীনে কোনো ওয়ারেন্ট অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই যে কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ তৎপরতায় জড়িত থাকার সন্দেহে আটক করা যেতে পারে। কিছু ব্যক্তিকে প্রথমে ৫৪ নম্বর ধারায় আটক করা হলেও পরবর্তীতে কোনো অপরাধের সাথে জড়িত বলে অভিযুক্ত করা হয়, অন্যদেরকে আবার কোনো অভিযোগ ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বিগত বছরে ৫৪ ধারার অধীনে ১০,৫৮২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৯৮ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে পুলিশ ৫৪ নম্বর ধারার অপপ্রয়োগ করে থাকে। সরকার কখনো রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ও তাদের পরিবারবর্গকে হয়রানি কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্যে ৫৪ নম্বর ধারার আশ্রয় নেয়। ১২ই জুলাই চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের ছাত্র সমর্থকদের নিহত হবার পর জামাত-ই ইসলামীর বিরুদ্ধে সরকারি অভিযানে পুলিশ ৫৪ নম্বর ধারায় ১৫ই জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৮ জন জামায়তপন্থী ছাত্রকে

www.pathagar.com

গ্রেফতার করে। ৬ই আগস্ট কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও জামাত-ই-ইসলামীর ছাত্রকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর পুলিশ ৫৪ নম্বর ধারার অধীনে জামাত-ই-ইসলামীর ৩০ জন সমর্থককে আটক করে। এ ছাড়াও হরতালের আগে ও হরতাল চলাকালে পুলিশ সাধারণত কোনোপ্রকার বৈধ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকেই বিরোধীদলীয় কর্মীদের আটক করে এবং হরতাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটকে রাখে। কখনো কখনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, অর্থ আদায় কিংবা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণেও পুলিশ লোকজন আটক করে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট "রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষতি করতে পারে" এমন কোনো কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যক্তিকে ৩০ দিন পর্যন্ত আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারে। আরো যে সকল অপরাধ 'এসপিএ'-র অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হচ্ছে চোরাচালান, কালোবাজারি এবং মজুতদারি। সরকারকে (অথবা ম্যাজিস্ট্রেটকে) অবশ্যই ১৫ দিনের মধ্যে আটক ব্যক্তিকে তার আটকাদেশের কারণ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং সরকারকে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে আটকের কারণ অনুমোদন করতে হবে অথবা আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে। বাস্তবে যা ঘটে তা হলো সরকারের কোনোরকম কারণ উল্লেখ ছাড়াই বা আনুষ্ঠানিকভাবে তা অনুমোদন ছাড়াই কোনো কোনো ব্যক্তিকে অধিককালের জন্য আটক রাখা হয়। আটক ব্যক্তিরা তাদের আটকাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে এবং সরকার তাদের আশু মুক্তির বিষয়টি অনুমোদনও করতে পারে।

হাইকোর্টের বিচারক অথবা বিচারক হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন এমন দু'জন এবং একজন সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা বোর্ড আটকাদেশের মামলাগুলো চার মাস পর পর পরীক্ষা করে দেখেন। সরকার যদি যথেষ্টভাবে তার আটকাদেশের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে তাহলে আটক ব্যক্তির আটকাদেশ বহাল থাকে, অন্যথায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সরকার যদি তার আটকাদেশের যথার্থতা প্রমাণ না করতে পারে তাহলে আপিল আদালত মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেয়। 'এসপিএ' মামলার আসামি যদি ঢাকায় হাইকোর্টে তার মামলা উপস্থাপন করতে পারে, তাহলে হাইকোর্ট সাধারণত আসামির পক্ষে রায় দিয়ে থাকে। তবে অনেক আসামিই হয় চরম দরিদ্র অথবা কড়া আটকাদেশের কারণে আইনের পরামর্শ লাভে ব্যর্থ হয়। তাই তারা ম্যাজিস্ট্রেটের ওপরের স্তরে মামলা দিতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেটরা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন এবং তাদের দ্বারা মামলা খারিজ হবার সম্ভাবনা কম (অনুচ্ছেদ ১.৬ দ্রষ্টব্য)। আটক ব্যক্তিদের আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করার অনুমতি দেয়া হয় তবে সাধারণত তা অভিযোগ দায়ের করার আগে নয়। উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে নিজেদেরকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আইনজীবী নিয়োগের অধিকার দেওয়া

www.pathagar.com

হয়নি তাদের। আটক ব্যক্তিদের কাছে দর্শনার্থী আসতে পারে। অতীতে সরকার কিছু বিশিষ্ট বন্দীর সাথে কাউকে দেখা সাক্ষাৎ করতে না দিলেও বিগত বছরটিতে এরকম কোনো আটকের কথা জানা যায়নি।

সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখে এক সংসদীয় উপকমিটির সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন বলবৎ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারগুলো ৬৯,০১০ জনকে আটক করেছে এবং পরবর্তীতে হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক ৬৮,১৯৫ জনকে মুক্তি দিয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় জোর দিয়ে বলা হয় যে, বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে আনীত মামলাগুলো সাধারণত এতোটাই দুর্বল ও অস্বচ্ছ যে আদালতের পক্ষে জামিন মঞ্জুর না করে গত্যন্তর থাকে না। সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক ব্যক্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবার বিষয়টিকে এই আইনের প্রয়োগ কমিয়ে আনার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। কোনো কোনো পর্যবেক্ষক জোর দিয়ে বলেন যে, সম্প্রতি বলবৎকৃত জননিরাপত্তা আইন (পিএসএ) প্রয়োগের ফলেই বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকাধীন ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সরকারি হিসাব অনুসারে বৎসরান্তে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৮০১ ব্যক্তি আটক ছিল। এদের মধ্যে ৪১৬ জনকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, ৩০১ জনকে চোরাচালান এবং ৮৪ জনকে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে আটক করা হয়। পহেলা জানুয়ারিতে আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৯৮১ জন হওয়ায়, এই সংখ্যা ছিল ১৮০ জন কম। অপরদিকে, ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ২,০০০; অর্থাৎ ঐ সংখ্যার তুলানায় বর্তমান আটক ব্যক্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সরকার জানিয়েছে, বিগত বছরে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১,৩৩১ ব্যক্তিকে আটক করলেও ১,৫১১ জনকে মুক্তি দেয়।

অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে জানুয়ারি মাসে সংসদে নিবর্তনমূলক নতুন জননিরাপত্তা আইন পাস করা হয়। এই আইন কার্যকর হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এর অধীনে দায়েরকৃত মামলার শুনানির জন্যে গঠন করা হয় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং এসব মামলার এক্তিয়ারভুক্ত অপরাধসমূহের জামিনের ব্যবস্থা রহিত করা হয়। এ বিষয়ে বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ শংকা ব্যক্ত করে বলেন যে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক বিরোধীদের গ্রেফতার করার জন্যে এই আইন ব্যবহার করা হবে। কেননা, বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো এই আইনেও বলপূর্বক গ্রেফতার প্রতিরোধের ব্যবস্থা এড়ানোর সুযোগ পুলিশকে দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু এই আইনে আটক ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা নেই, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৎসামান্য কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকে যে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব। সরকারি মতে বিগত বছরে জননিরাপত্তা আইনে ১,৩৫০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়; ৪৪৫ জনকে টেন্ডার বরাদ্দের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ এবং ৯০৫ জনকে যানবাহন ভাঙচুর অথবা যান চলাচলে বিঘ্ন

www.pathagar.com

ঘটানোর দায়ে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ৪৫০ জনকে মুক্তি দেয়া হয়। আটক হবার এক মাসের মধ্যেই ১৪০ জন, তিন মাসের মধ্যে ৩০১ জন এবং ৬ মাসের মধ্যে ৯ জন মুক্তি লাভ করে। একটি মানবাধিকার সংগঠন জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আগস্টের ১০ তারিখ পর্যন্ত জননিরাপত্তা আইনে ৩,৭৬৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এসব অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ১,২৮৫ জনকে পরবর্তীতে গ্রেফতার করা হয়। অপর একটি মানবাধিকার সংগঠন জানায়, পয়লা জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,১৬৬ জনকে জননিরাপত্তা আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯০ জন বিএনপি, ২৯ জন আওয়ামী লীগ এবং ৩২ জন জামাত-ই-ইসলামীর কর্মী।

বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে সরকার তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্যে নতুন জননিরাপত্তা আইন ব্যবহার করেছে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের প্রদত্ত বিশ্বাসযোগ্য তথ্যে জানা গেছে, রাজনৈতিক বিরোধী ও অন্যদের হয়রানি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন ও নতুন জননিরাপত্তা আইন, উভয় আইনই প্রয়োগ করেছে। নভেম্বর মাসে পুলিশ একটি বিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদক বাহাউদ্দীনের বাসভবনে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশির উদ্দেশ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীকে বিদ্রূপ করে জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডি প্রকাশের দায়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা। বাহাউদ্দীনকে বাসভবনে না পেয়ে পুলিশ, তার পরিবর্তে, বিশেষ ক্ষমতা আইনে তার ভ্রাতা মঈনুদ্দীনকে গ্রেফতার করে। মঈনুদ্দীনকে ১৬ দিন কারাগারে আটক রাখার পর আদালতের আদেশে মুক্তি দেয়া হয়।

২৬শে ডিসেম্বর বিএনপি-র সংসদ সদস্য মোরশেদ খান কয়েকজন যুবকের পরিচয় জানার জন্যে একটি দোকানে যান। ওই যুবকেরা একটি সামান্য যান চলাচল ঘটনায় তার পুত্রের ওপর হামলা চালিয়েছিল। মোরশেদ খান জানান, এ সময় বেশ কিছু সংখ্যক যুবক অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে তাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে দোকানটির চারপাশে জমায়েত হয়। তিনি দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করেন। উক্ত ঘটনার পর মোরশেদ খান ও তার পুত্রের বিরুদ্ধে ওই দোকান থেকে নগদ অর্থ চুরির দায়ে জননিরাপত্তা আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। অপর দিকে, ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলা-সংক্রান্ত বিভক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদস্যরা যখন সংঘর্ষে ইন্ধন যোগায় তখন তাদের কারো বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়নি। ছাত্রলীগের কর্মীরা ওই রায়ের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে, শত শত যানবাহনে আগুন লাগায় ও ভাঙচুর করে এবং একজন অটোরিক্সা চালককে গুলি করে হত্যা করে। উক্ত ঘটনার সময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রলীগ নেতা হেমায়েতউদ্দীনের ছবি অনেকগুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে, এমনকি ঐ সহিংসতায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে সনাক্ত অন্যদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

www.pathagar.com

ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুরের বিধান রয়েছে। সাধারণত সহিংস এবং অহিংস উভয় ধরনের অপরাধের জন্যই জামিন মঞ্জুর করা হয়। তবে আইনের কোনো কোনো ধারায় জামিন না মঞ্জুর করার বিধানও আছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংস আচরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এই আইনে আটক ব্যক্তিদের ৯০ দিন পর্যন্ত প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনাকালে জামিন দেয়ার বিধান নেই। কিছু মানবাধিকার গ্রুপ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, এই আইনের অধীনে দায়ের করা বহু সংখ্যক অভিযোগই ভুয়া ও ভিত্তিহীন কেননা অ-জামিনযোগ্য আটক-মেয়াদের ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলে। সরকারের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, এ বছর ৭,৫৬৫ জনকে এই আইনের অধীনে আটক করা হয়। বৎসরান্তে ২,১৩৯ ব্যক্তি এই আইনে আটক ছিল। সারা বছরে মোট ২০১ জনকে এই আইনের অধীনে সাজা প্রদান করা হয়। জানুয়ারি মাসে সংসদে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন নামক পূর্বতন আইনটির সংশোধন করে একই নামে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। নতুন আইনটিতে কঠিনতর শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং কর্তব্যে অবহেলা কিংবা স্বেচ্ছামূলক ব্যর্থতার দায়ে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে। ২৬শে জুলাই এক বেতার সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী আদালতসমূহকে "নিরাপদ আশ্রয়স্থল" হিসেবে আখ্যায়িত করে চিহ্নিত অপরাধীদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত উদারভাবে জামিন মঞ্জুর করার জন্যে আদালতের সমালোচনা করেন। আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তার বিরুদ্ধে তিনটি আদালত অবমাননা বিষয়ক পিটিশন দাখিল করে। জামিন না-মঞ্জুরের ক্ষেত্রে এই আইনে বিচার-পূর্ব আটকের মেয়াদ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

ধর্ষণ বা ঘরবাড়িতে সহিংসতার ভুক্তভোগী মহিলাদের নিরাপত্তা হেফাজতে রাখার উদ্দেশ্য কারাগারকে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির (বিএনডাব্লিউএলএ) পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক মহিলাদের প্রায় অর্ধেক অপরাধী নয়, তারা অপরাধের শিকার হয়ে নিরাপত্তা হেফাজতে আটক আছেন। মহিলারা প্রথমে এই নিরাপত্তা হেফাজতে থাকার বিষয়টি অনুমোদন করে থাকলেও পরে তাদের পক্ষে মুক্তি লাভ কিংবা পরিবার বা আইনজীবীর শরণাপন্ন হওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। অবশ্য পূর্বের বছরগুলোতে নিরাপত্তা হেফাজতে থাকাকালে পুলিশ কর্তৃক নারী ধর্ষণের খবর থাকলেও এই বছরটিতে এ ধরনের কোনো ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

আদালত ব্যবস্থার একটি প্রধান সমস্যা হলো বিপুল সংখ্যায় মামলা ঝুলে থাকা। এর ফলে কোনো মামলা আদালতে ওঠার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়। ১৯শে মে তারিখে আইন মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সমাবেশে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান

www.pathagar.com

বিচারপতি তার ভাষণে বলেন, ফৌজদারি, দেওয়ানী ও আপিল আদালতসমূহে প্রায় ১০ লাখ মামলা বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে। ৪৭ হাজারেরও বেশি লোক, অন্যথায় দেশের কারাগারসমূহে আটক ব্যক্তিদের ৭৫ শতাংশেরও বেশি লোক হয় বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে, নতুবা বিচারাধীন। একটি মানবাধিকার সংগঠনের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, অধিকাংশ কারাবন্দীরই হয় এখনো সাজা হয়নি, কিংবা তারা বিচারের অপেক্ষায় আছে। সরকার এই পরিস্থিতির একটি সাফাই দিয়ে বলেছে, ইতিমধ্যেই সাজাপ্রাপ্ত যে সব ব্যক্তি তাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে তাদের অনেককেই ভুলবশত "বিচারপূর্ব কয়েদী" হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, আটক ও বিচার শুরু হবার মধ্যবর্তী সময় গড়পড়তা ছয় মাস। তবে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন মানবাধিকার গ্রুপের প্রদত্ত প্রামাণ্য তথ্য অনসারে বিচারপূর্ব আটকাবস্থার মেয়াদ কয়েক বছর। একটি মানবাধিকার সংগঠন জোর দিয়ে বলেছে, সাজাপ্রাপ্তি কিংবা খালাসের মধ্যবর্তী আটকাবস্থার মেয়াদ গড়ে ৪ থেকে ৭ বছর। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সাজাপ্রাপ্ত হলে যে সর্বোচ্চ মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করতে হতো, তার চেয়েও অধিককাল যাবৎ কোনো কোনোব্যক্তি বিচারের অপেক্ষায় কারাবন্দী রয়েছে। একটি বিশেষ মামলার উল্লেখ করে এক মানবাধিকার সংগঠন গ্রুপ জানিয়েছে, ১৯৮৫ সালে চট্টগ্রামে সাময়িকভাবে বরখাস্ত জনৈক ব্যাংক কর্মকর্তাকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৪৫টি মামলার মধ্যে ৪১টিতে জামিন মঞ্জুর করা হয়। অবশিষ্ট চারটি মামলায় জামিনের আবেদনের শুনানি এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগসমূহের কোনোটিরও বিচার এ যাবৎকাল শুরু হয়নি। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সাজাপ্রাপ্ত হলে তার সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের মেয়াদ হতো ১০ বছর। অথচ বিচারপূর্ব আটকাবস্থায় সে ইতিমধ্যেই ১৫ বছর অতিবাহিত করেছে। অপর এক ঘটনায় বিএনপি সরকার ১৯৯৩ সালে আওয়ামী লীগের একটি বিক্ষোভ সমাবেশের জের হিসেবে ১০ বছর বয়স্ক এক বালককে গ্রেফতার করে। এ বছর পর্যন্ত কোনো রকম শুনানি ছাড়াই বালকটি কারাবন্দী থাকে। অতঃপর ঢাকার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী মামলা হাতে নিলে ছেলেটি জামিনে বেরিয়ে আসে। মামলার শুনানি প্রায়শই দীর্ঘকালের জন্য মুলতবি রাখা হয়। এর ফলে জামিন না পাওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাজাপ্রাপ্তিতে অধিকতর বিলম্ব ঘটে।

রাজনৈতিক বিরোধী না হলেও সাধারণ নাগরিকদের কখনো কখনো বলপূর্বক আটক রাখা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর এবং মানবাধিকার কর্মীদের প্রদত্ত তথ্যে এ ধরনের বহু ঘটনার নজির তুলে ধরে বলা হয়, কখনো কখনো আটক ব্যক্তির মুক্তির জন্য তার পরিবারের সদস্যদের অর্থ প্রদানে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেও কোনো কোনো লোককে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৯৯ সালে প্রদত্ত এক রায়ে আটক রাখার ক্ষমতা অপব্যবহারের জন্য পুলিশের সমালোচনা করে হাইকোর্টের মন্তব্যে বলা হয়, পুলিশ একটি আইন ভঙ্গকারী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক অধিকাংশ ব্যক্তিই বিচারের জন্য আনীত কার্যকর অভিযোগ না থাকায় শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়ে যায়।

www.pathagar.com

সরকার কখনো কখনো রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আটকাদেশ জারি করে। অক্টোবরের ৩ তারিখে জামাত-ই-ইসলামীর একজন সাবেক সংসদ সদস্য জামিনে মুক্তিলাভ করার পরপরই বিশেষ ক্ষমতা আইনে পুনরায় গ্রেফতার হন। কুষ্টিয়ায় একটি স্থানীয় সরকার ইউনিটের নির্বাচিত নেতা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্য মাহমুদ হাসান সাচ্চুকে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এপ্রিল মাসে হাইকোর্ট তার আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করলে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাচ্চুকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে পুনরায় অন্তরীণ করে।

দুর্নীতি থেকে শুরু করে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য ও কর্মীদের বিরুদ্ধে আদালতে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেন যে, পূর্ববর্তী প্রশাসনের সময়ে কথিত দুর্নীতির অভিযোগে বর্তমান সংসদের ৭০ জনের বেশি বিএনপি সংসদ সদস্যের বিষয়ে তদন্ত চালানো হচ্ছে। এসব দুর্নীতি মামলার অধিকাংশই তদন্তাধীন ছিল এবং বছরান্তে কয়েকটি মাত্র মামলার তদন্ত কাজ সম্পন্ন হয়। বিএনপির সংসদ সদস্য ওবায়দুর রহমান কারাবন্দী থাকেন। ১৯৭৫ সালে চারজন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতার "জেল হত্যাকাণ্ড"-এর সঙ্গে কথিত সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে ওবায়দুর রহমান এবং অপর দুই রাজনৈতিক নেতা গ্রেফতার হন। এসব হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সরকার আট ব্যক্তির আটকাবস্থা অব্যাহত রাখে। অক্টোবরের ১২ তারিখে আদালত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। ২০০১ সালের ২৪শে জানুয়ারি জেল হত্যাকাণ্ড মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করার দিন ধার্য করা হয়।

কয়েকজন বিরোধীদলীয় কর্মীকে সন্দেহজনক মামলায় আটক অথবা অভিযুক্ত করা হয়েছে। ২১শে জুলাই জামাত-ই-ইসলামীর একজন নেতাকে চট্টগ্রামে গ্রেফতার করে তাকে পাঁচটি মামলার আসামি করা হয়; পরে তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তার আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে তাকে মুক্তির আদেশ দেয়। দৃশ্যত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এক মামলায় বিরোধী ইসলামী ঐক্যজোটের জনৈক প্রবীণ নেতাকে সন্দেহজনক "রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে" জড়িত থাকার অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত আটক রাখা হয়। রাজনৈতিক কারণে কতজনকে আটক করা হয়েছে তার মোট সংখ্যার হিসাব করা দুরূহ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মীদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ফৌজদারি অভিযোগে প্রযোজ্য হতে পারে এবং অনেক অপরাধী নিজেদেরকে রাজনৈতিক দলের কর্মী বলে দাবি করতে পারে। মামলা স্তূপীকৃত হয়ে থাকায় এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে অনিচ্ছুক থাকায় বিচার ব্যবস্থা ফৌজদারি মামলাগুলো, যেগুলো মূলত রাজনৈতিক, সেগুলো কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করতে পারে না। আটকাদেশগুলো পর্যবেক্ষণ করা বা রাজনৈতিক হয়রানির উদ্দেশ্যে আটক প্রতিহত করা, চিহ্নিত করা

www.pathagar.com

এবং প্রচার করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো স্বতন্ত্র সংস্থা নেই। অধিকাংশ আটকাদেশ হয় স্বল্প সময়ের জন্য যেমন কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্য। বিবাদীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জামিন পায়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা অভিযোগ খারিজ হতে বা অভিযোগ থেকে খালাস পেতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

সরকার কাউকে জোর করে নির্বাসনে পাঠায় না।

ঙ. সুষ্ঠু প্রকাশ্য বিচারে অস্বীকৃতি

সংবিধানে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, সংবিধানের একটি দীর্ঘমেয়াদি "অস্থায়ী"ব্যবস্থা অনুযায়ী কিছু নিম্ন আদালত কার্যনির্বাহী শাখার অংশ হিসেবে রয়ে গিয়েছে এবং তার প্রভাবাধীন। বিচার বিভাগের উর্ধতন স্তরে লক্ষণীয় মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করে এবং প্রায়শই ফৌজদারি, দায়রা এবং এমনকি বিতর্কিত রাজনৈতিক মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়। অপরদিকে নিম্ন আদালত নির্বাহী শাখার চাপের মুখে সহজেই প্রভাবিত হয়। আইনী প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ে দুর্নীতি রয়েছে।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় ২৪শে আগস্ট হাইকোর্টের প্যানেল এরশাদকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড প্রদান এবং সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা (প্রায় এক মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করে। জাতীয় পার্টির কর্ণধার এরশাদ নভেম্বরের ২০ তারিখে আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। অপরদিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল প্যানেল তার সাজাকে সংক্ষেপিত করে কেবলমাত্র জরিমানা প্রদান অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ডে সীমায়িত করে। তবে এরশাদ পাঁচ বছরের জন্য সংসদে নিষিদ্ধ হতে পারেন। ১৯৯৫ সালে অপর একটি মামলায় সরকার ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার কথিত নির্দেশ দানের জন্য এরশাদকে অভিযুক্ত করে।

সমগ্র বছর ধরে সরকারের কার্যনির্বাহী শাখা এবং বিচার বিভাগের মধ্যে টানাপড়েন চলতে থাকে। ১৯৯৯ সালে সরকার অভিযোগ করে যে, অপরাধ দমনের তৎপরতাকে নস্যাৎ করে হাইকোর্ট নির্বিচারে জামিন দিয়ে চলেছে। জানুয়ারি মাসে সংসদে তড়িঘড়ি করে জননিরাপত্তা আইন পাস করার সময় এর অন্যতম কারণ ও প্রয়োজন হিসেবে ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে অনায়াসে জামিন লাভের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। অক্টোবরে আদালত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি আদালত অবমাননার মামলা খারিজ করে দিলেও তাকে অমূলক বিবৃতি প্রদানের বিষয়ে সতর্ক করে দেয়।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে আদালত দেশের স্থপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের ২১ জন সদস্যের হত্যা মামলা সম্পর্কে একটি বিভক্ত রায়

www.pathagar.com

প্রদান করে। এই মামলার প্রবীণ বিচারক পূর্বে সাজাপ্রাপ্ত ১৫ ব্যক্তির মধ্যে ১০ ব্যক্তির সাজা ও মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন; অপরদিকে জুনিয়র বিচারক সাজাপ্রাপ্ত ১৫ ব্যক্তির সকলেরই সাজা ও মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। উভয় বিচারকই সাজাপ্রাপ্ত ১৫ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল না রাখায় প্রধানমন্ত্রী গভীর হতাশা ব্যক্ত করেন এবং ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিভক্ত রায়ের প্রতিবাদে তারা শত শত যানবাহন ভাঙচুর ও সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে।

আদালত ব্যবস্থার দু'টি স্তর রয়েছে: নিম্ন আদালত এবং সুপ্রিম কোর্ট। দু' জায়গাতেই দায়রা এবং ফৌজদারি মামলার শুনানি হয়। নিম্ব আদালত ম্যাজিস্ট্রেট, যারা সরকারের প্রশাসনিক শাখার অংশ এবং সেশন ও জেলা জজ, যারা বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তাদের সমন্বয়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্ট দু'টি শাখায় বিভক্ত: হাইকোর্ট এবং আপিল আদালত। হাইকোর্টে মূল মামলার শুনানি হয় এবং নিম্ন আদালত থেকে আসা মামলার পর্যালোচনা করা হয়। হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল শোনার এখতিয়ার রয়েছে আপিল আদালতের। অন্য সমস্ত আদালত আপিল আদালতের রুলিং মানতে বাধ্য।

আদালতের বিচারকার্য সম্পন্ন হয় প্রকাশ্যে। অভিযুক্তকে তার প্রতিনিধি হিসেবে কৌঁসুলি নিয়োগের, অভিযোগের দলিলপত্র পর্যবেক্ষণের, সাক্ষী ডাকার এবং রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার দিয়েছে আইন। রাষ্ট্রের অর্থে বিবাদীকে উকিল দেওয়া হয় কদাচিৎ এবং আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার মতো খুব কমই আইনগত সহায়তা কর্মসূচি আছে। গ্রামীণ এলাকায় লোকেরা বেশির ভাগ সময়েই মামলায় তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো কাউকে পায় না। আর শহুরে এলাকায় কারো যদি সামর্থ্য থাকে তবেই তার পক্ষে আইনি পরামর্শ পাওয়া সম্ভব হয়। তবে কখনো আটক ব্যক্তি ও পুলিশ রিমান্ডে থাকা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আইনগত পরামর্শ নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন, জননিরাপত্তা আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের অধীনে পরিচালিত মামলার অবস্থাও সাধারণ মামলার মতোই। তবে অন্যান্য মামলার মতো এগুলো দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে না।

জননিরাপত্তা আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের বিধান অনুসারে বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইব্যুনালে শুনানির পর রায় প্রদান করা হয়। এসব আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত কাজ ও বিচার অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের কাজ সমাপ্ত না হলে কি হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ব্যবস্থা নেই।

ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও তার বিচার হতে পারে, যদিও এটা খুব কমই হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের ২১ জন

www.pathagar.com

সদস্যকে হত্যা করার দায়ে ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে ১৯ জন বিবাদীর মধ্যে ১৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ৪ জন সাজা পায়। আইনের বিধান অনুসারে এপ্রিল মাসে যখন হাইকোর্টে এসব মৃত্যুদণ্ডাদেশ পর্যালোচনার জন্য উত্থাপিত হয়, তখন এই মামলায় নিযুক্ত প্রথম দুই জন বিচারক অপারগতা প্রকাশ করে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তারা বলেন, নিরপেক্ষভাবে এই মামলার শুনানি অনুষ্ঠান তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে। দ্বিতীয় দফা এই ধরনের অপারগতা প্রকাশের ঘটনায় সরকারের সমর্থকবৃন্দ লাঠিসোঁটায় সজ্জিত হয়ে হাইকোর্ট ভবনে মিছিল করে যায় এবং বিচারকালে প্রদত্ত দণ্ড কার্যকর করার দাবি জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য একটি সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন, যেখান থেকে এই মামলা গ্রহণে অপারগতার জন্য বিচারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়া হয়। বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ওইসব ব্যক্তিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। অনেক পর্যবেক্ষকের ধারণা, এই মামলায় সরকারের স্বার্থ জড়িত থাকায় এবং চাপ প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকায় তা বিচার কার্যের নিরপেক্ষ পর্যালোচনার অনুকূল নয়। এ কারণই উক্ত বিচারকরা তাদের নিযুক্তি প্রত্যাহার করে নেন। অবশ্য বিচারকরা তাদের সিদ্ধান্তের কোনো ব্যাখ্যা দেননি, এবং এসব অভিযোগ প্রমাণের মতো কোনো জোরালো সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। হাইকোর্টকে একই সঙ্গে দেশে অবস্থানরত চারজন বিবাদীর দাখিলকৃত আপিলের ওপর রুলিং প্রদান করতে হবে। অনুপস্থিতিতে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি পরবর্তীতে প্রত্যাবর্তন করলেও আপনা-আপনি মামলার পুনর্বিচার পাবার কোনো অধিকার তার নেই। অনুপস্থিত বিবাদীরা রাষ্ট্র নিযুক্ত কৌসুলীর সহায়তা পেতে পারে (শেখ মুজিব বিষয়ক মামলায় যা হয়েছিলো), তবে তারা নিজেরা তাদের কৌসুলী বেছে নিতে পারে না। সাজাপ্রাপ্তির পর দেশে প্রত্যাবর্তন না করে তারা রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিলও করতে পারে না।

আদালত ব্যবস্থার একটি প্রধান সমস্যা হলো বিপুল সংখ্যায় জমে থাকে মামলা এবং দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা শুনানি যখন অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি কারারুদ্ধ থাকেন। এই অবস্থায় এবং আদালত ব্যবস্থায় যে দুর্নীতি রয়েছে তাতে অনেক লোক ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক স্বাধীনভাবে গৃহীত একটি নমুনা জরিপে দেখা গেছে যে, আদালতে বিভিন্ন মামলায় জড়িতদের ৬০ শতাংশেরও বেশি লোক আদালত কর্মকর্তাদের উৎকোচ প্রদান করেছে। আদালতে যাওয়ার জটিলতার কারণে এবং মামলা কালক্ষেপণকারী ব্যাপার বলে গ্রামীণ সমাজে সনাতনী গ্রাম্য মাতব্বরদের দ্বারা বিরোধ মীমাংসা জনপ্রিয়। অবশ্য এই ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও দুর্নীতি দেখা দিতে পারে।

সরকার জানিয়েছে তাদের কোনো রাজনৈতিক বন্দী নেই, কিন্তু বিএনপি এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলো দাবি করেছে যে বহু বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার হয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ফৌজদারি মামলার অজুহাতে সাজা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে মোট কতোজন রাজনৈতিক বন্দী রয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়।

www.pathagar.com

চ. গোপনীয়তা, পরিবার, ঘর বা চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যাপারে একতরফা হস্তক্ষেপ

আইনে বিধান রয়েছে যে কর্তৃপক্ষকে কোনো বাড়িতে প্রবেশের আগে বিচার বিভাগীয় ওয়ারেন্ট গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে পুলিশ কদাচিৎ ওয়ারেন্ট গ্রহণ করে এবং এই বিধান লঙ্ঘনকারী অফিসারদের শাস্তি দেয়া হয় না। তাছাড়া, বিশেষ ক্ষমতা আইনে (এসপিএ) বিনা ওয়ারেন্টে তল্লাশি চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সরকার কখনো কখনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র পুনর্বাসন করে। ১৯৯৯ সালে পুলিশ নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় থেকে ২৬৭ জন যৌনকর্মীকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করে। কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে মহিলারা পুনর্বাসিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে বলা হয়েছে মহিলারা পুনর্বাসনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিল। ২৬৭ জন মহিলাকে একটি ভবঘুরে কেন্দ্রে আটকে রাখা হয়। সেখানে তাদের কারো কারো ওপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ডিসেম্বর মাস নাগাদ এক ডজনেরও কম মহিলা ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান করে।

১৯৯৯ সালে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য ঢাকার ছয়টি বস্তি এলাকা থেকে ৫০ হাজারের বেশি লোককে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে। আলোচ্য বছরে সরকার তার বস্তি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখে। ১৫ই এপ্রিল তারিখে সরকার সেগুনবাগিচা বস্তি এলাকার ৭০০ বাড়িঘর ভেঙে দেয়। ৩০শে এপ্রিল তারিখে পুলিশ কর্মকর্তারা পরিবাগ বস্তি উচ্ছেদ করে যার ফলে ১,১০০ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। একদিনের নোটিশে পুলিশ যখন কাওরান বাজারে অবস্থিত রেলওয়ে বস্তি উচ্ছেদ করার ঘোষণা দেয়, তখন বস্তিবাসীরা এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদকারীদের দমন করতে গিয়ে পুলিশ রাবার বুলেট ব্যবহার এবং লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় ৩০ ব্যক্তি আহত হয়। পুলিশ ও ভাড়া করা শ্রমিকেরা ২০টি কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, তবে তারা বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করতে ব্যর্থ হয়।

অন্যদের কৃত অপরাধের জন্য তাদের পরিবারের সদস্যদের সরকার কখনো কখনো শাস্তি দিয়ে থাকে। একটি মানবাধিকার সংগঠনের ভাষ্য এবং ঘটনার শিকার হয়েছেন এমন এক ব্যক্তির প্রকাশিত বক্তব্য অনুযায়ী, ১৭ই জুন সন্ধ্যায় পুলিশ খিলগাঁও এলাকার একটি বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ তাদের আকাঙ্খিত ব্যক্তিকে খুঁজে না পেয়ে সেই ব্যক্তির মাতাপিতাকে গ্রেফতার করে এবং তার বোনদেরকে মারধর করে। নভেম্বর মাসে পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে একটি বিরোধী দলীয় পত্রিকার সম্পাদক জনাব বাহাউদ্দিনকে গ্রেফতার করতে গিয়ে তাকে না পেয়ে তার ভাই মঈনুদ্দিনকে গ্রেফতার

www.pathagar.com

করে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগের সাথে মঈনুদ্দিনের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। পুলিশ তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় গ্রেফতার করে।

পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স এবং ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই) সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলে অনুমিত নাগরিকদের ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে চর নিয়োগ করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার কর্মী, বিদেশী বেসরকারি সংস্থা এবং সাংবাদিকরা এই সব নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক মাঝে মধ্যে হয়রানির কথা জানান। একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ জানিয়েছেন যে পুলিশ কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে তাদের কর্মীদের হয়রানি করেছে।

অনুচ্ছেদ ২

নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ক. বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবিধানে নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে অথবা চরিত্র হনন বা কোনো অপরাধ সংঘটনে উৎসাহ দান প্রতিরোধে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে" বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকার এই সব অধিকারকে যে সীমিত করছে তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিছু সংখ্যক সরকারি নেতা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অবলম্বনের জন্য ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের উৎসাহিত করেছে।

শত শত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশের বাহন। অধিকাংশ সংবাদপত্র সরকারের সার্বিক নীতিসমূহ সমর্থন করলেও অনেক সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের সমালোচনা করে সংবাদ প্রকাশ করে। সরকারি মালিকানাধীন একটি সংবাদ সংস্থা ছাড়াও বেসরকারি মালিকানাধীন একটি সংবাদ সংস্থা রয়েছে যেটা একটি বড় আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট।

সংবাদপত্রের মালিকানা ও বিষয়বস্তু সরাসরি সরকারের বিধিনিষেধের আওতাধীন নয়। তবে সরকার চাইলে আর্থিক পন্থা ব্যবহার করে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করতে পারে। সরকারি বিজ্ঞাপন ও অনুকূল শুল্ক হারে আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দ অনেক সংবাদপত্রের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকার প্রদত্ত বিজ্ঞাপন অনেক সংবাদপত্রেরই আয়ের বৃহত্তম উৎস। সরকার বলছে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দফতরের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রগুলোর প্রচার সংখ্যা, ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন, বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন, উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি সংবাদপত্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি" বিবেচনা করে থাকে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে অনির্দিষ্ট সরকারি বা আমলাতান্ত্রিক

www.pathagar.com

পাল্টা ব্যবস্থার ভয়ে সরকারের সমালোচনাকারী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে অনিচ্ছুক দেখা যায়।

সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক কর্মী বা অন্যদের কর্তৃক সাংবাদিকদের ওপর হামলা বা তাদের মাঝে মধ্যে ভয়ভীতি প্রায় দেখানো হয়ে থাকে। রাজপথে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় রাজনৈতিক কর্মী কর্তৃক এ ধরনের হামলা একটি সাধারণ ব্যাপার এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে পুলিশী ব্যবস্থায় কয়েকজন সাংবাদিকও আহত হয়েছেন।

৪ঠা জানুয়ারি দু'জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার ভবনে বোমা নিক্ষেপ করে। এতে অবশ্য তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি; অবশ্য কয়েক মিনিট পরে নিক্ষিপ্ত আরেকটি বোমায় সংশ্লিষ্ট পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৫ই জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জে বিএনপি সমর্থিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একজন স্থানীয় নেতা "আজকের কাগজ" পত্রিকার শ্রীনগর সংবাদদাতা জাকির হোসেন সুমনের ওপর এই বলে হামলা চালায় যে সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতা ছাত্রদলের সমালোচনা করে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছিল। সুমন যখন আক্রান্ত হয়, তখন সফিউদ্দিন আহমেদ নামে আরেকজন সাংবাদিক তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তবে তিনিও ছাত্রদলের ঐ গ্রুপের হামলার শিকার হন। এই দুটো ঘটনার কোনোটাতেই কাউকে দায়ী করা হয়নি।

১৫ই জানুয়ারি তারিখে তিনজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ঝিনাইদহের সাংবাদিক মীর ইলিয়াস হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে। নিহত সাংবাদিক একটি বামপন্থী দলের নেতা ছিলেন। নিহত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি মৃত্যুর হুমকি পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে এবং পুলিশের কাছে তিনি এ বিষয়ে নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেছিলেন। এই হত্যায় জড়িত থাকার সন্দেহে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বছরের শেষ নাগাদ এই হত্যার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ দাখিল করা হয়নি। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নারায়ণগঞ্জের একটি আদালত ক্ষমতাসীন দলীয় একজন সংসদ সদস্যের অভিযোগের ভিত্তিতে বিরোধীদলীয় সংবাদপত্র "দৈনিক দিনকাল" পত্রিকার সম্পাদক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করেন। সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য অভিযোগ করেন যে ঐ পত্রিকা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক এবং ত্রুটিপূর্ণ সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ৮ই মার্চ পুলিশ ঐ পত্রিকার অফিসে হামলা করে সাংবাদিকদের হুমকি প্রদান করে এবং আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন করে। এক ঘণ্টা পর পুলিশ ঐ পত্রিকা অফিস ত্যাগ করে। ২০শে মে তারিখে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র শাখা ছাত্রলীগের কর্মীরা দু'জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতাকে মারধর করে এবং তাদের একজনকে হত্যার হুমকি প্রদান করে।

www.pathagar.com

১৬ই জুলাই দুই ব্যক্তি "জনকণ্ঠ" পত্রিকার যশোর অফিসে প্রবেশ করে রিপোর্টার শামসুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করে। নিহত সাংবাদিক শামসুর রহমান দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অপরাধচক্রের কর্মকাণ্ড এবং জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতার ওপর প্রতিবেদন লিখেছিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ১২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বছরের শেষ নাগাদও কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

"কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট"-এর ভাষ্য অনুযায়ী ২০শে অক্টোবর তারিখে ক্ষমতাসীন দলের যুব শাখা যুবলীগের একদল কর্মী আঞ্চলিক "লোকসমাজ" পত্রিকার রিপোর্টার সোহরাব হোসেনকে হুমকি প্রদান করে। বন্যাকবলিত সাতক্ষীরা জেলায় সরকারি ত্রাণ তৎপরতার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সোহরাব হোসেনকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর তাকে এই হুমকি প্রদান করা হয়। ২৫শে অক্টোবর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোজাম্মেল হোসেন (সাতক্ষীরা জেলায় বন্যাত্রাণ কর্মসূচি তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত) ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদেরকে সাংবাদিকদেরকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করার জন্য কার্যকরভাবে উৎসাহিত করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি তার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যেখানেই আপনারা সাংবাদিকদের দেখবেন, তাদের হাড় ভেঙে দেবেন।" ২৬শে অক্টোবর তারিখে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একদল কর্মী স্থানীয় "সাতক্ষীরার চিত্র" সংবাদপত্রের অফিস ভাঙচুর ও তছনছ করে এবং ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদক আনিসুর রহমানকে চাকু ও রিভলবার দিয়ে মারধর করে। সম্পাদক আনিসুর রহমানকে ঘটনার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দূর্যোগ পীড়িতদের জন্য ত্রাণ তহবিলের অর্থ তসরুপ সম্পর্কে ঐ সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পরই সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদকের ওপর হামলা চালানো হয়। প্রতিমন্ত্রীর মন্তব্যের পর সম্পাদকের ওপর হামলার সাথে জড়িত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলেও বছরের শেষ নাগাদ কোনো অভিযোগ দাখিল করা হয়নি।

ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এক্সচেঞ্জ-এর ভাষ্য অনুযায়ী ২৭শে অক্টোবর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ঢাকায় কর্মরত রিপোর্টারদের সংগঠন) সাধারণ সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলামকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। অল্পের জন্য তিনি অপহরণ হওয়া থেকে রক্ষা পান। তার সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের জন্যই তাকে অপহরণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এ ব্যাপারে কোনো তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। মনোয়ারুল ইসলাম দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের সকল সাংবাদিক কিছু মাত্রায় স্বআরোপিত সেন্সরশিপ প্রয়োগ করে থাকে এবং সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের

www.pathagar.com

সমালোচনা করতে অনীহা প্রকাশ করে। তবে কিছু কিছু সাংবাদিক এ ধরনের সমালোচনা করে থাকেন। অনেক সাংবাদিক স্পর্শকাতর সংবাদ এড়িয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে সম্ভাব্য হয়রানি, প্রতিশোধ বা শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির ভয়ের কথা উল্লেখ করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, মার্চ মাসে একটি নেতৃস্থানীয় বাংলা দৈনিকের লক্ষ্মীপুর সংবাদদাতাকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। কারণ তিনি এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক গণটোকাটুকির কাজে পুলিশের জড়িত থাকার বিষয় উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। নভেম্বর মাসে ঐ সাংবাদিকদের মুক্তি দেয়া হয় কারণ জননিরাপত্তা আদালতে সরকার পক্ষ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন। ২৮শে মে দৈনিক "আজকের কাগজ" পত্রিকার রিপোর্টার আমিনুর রহমান তাজকে গ্রেফতারী পরওয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে চরিত্র হননের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এর পূর্বে তার সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে বলা হয় যে, একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর পত্নী ও একজন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। আমিনুর রহমান তাজকে গ্রেফতারের পর তার সহকর্মীরা এর প্রবল বিরোধিতা করেন এবং পুলিশ সেই সব সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলার হুমকি প্রদান করে। বিক্ষোভকারী সাংবাদিকরা নিরাপত্তার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে কোনো অভিযোগ দাখিল করা হয়নি।

জুন মাসে একটি নেতৃস্থানীয় ইংরেজি দৈনিক সংসদ সদস্যদের তিন জন পুত্র সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে এবং যাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে দেয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি বিদেশী সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হলে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একজন কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবেদনের রচয়িতাকে চাকুরীচ্যুত করার জন্য সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। কয়েকদিন পর উক্ত সাংবাদিক চাপের মুখে পদত্যাগ করেন। ৬ই আগস্ট চট্টগ্রামের একটি সংবাদপত্র আগের দিন প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন প্রত্যাহার করে নেয়। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, ক্ষমতাসীন দলের একটি অংশ গত ৮ই জুলাই একটি মাইক্রোবাসে আট ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। যে প্রতিবেদক মূল প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী আওয়ামী লীগের স্থানীয় শাখার একজন সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মীপুরে একটি জনসভায় ৪ঠা অক্টোবর বলেন যে, তিনি সেই সব সাংবাদিকদের "হাত ও পা কেটে ফেলবেন" যারা তার সম্পর্কে লেখালেখি অব্যাহত রাখবে। তিনি বিরোধীদলীয় কর্মীদের "নদীতে ছুড়ে ফেলার" হুমকি প্রদান করেন যদি তারা তার বিরুদ্ধাচারণ করে। তিনি বলেন, যে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে আসবে, তার বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্য ও সরকারের মন্ত্রী এই সভায় "প্রধান অতিথি" হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দুইদিন পর সশস্ত্র ব্যক্তিরা লক্ষ্মীপুরে একজন সাংবাদিকের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে আহত করে।

www.pathagar.com

কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ফৌজদারি আইনের আওতায় মানহানির মামলা দায়ের করলে সাংবাদিক ও অন্যদের আটক করা যেতে পারে। ক্ষমতাসীন দলীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কয়েকটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনের আওতায় মানহানির পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করেছেন। ঐ সব রাজনীতিবিদ প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোকে মিথ্যা ও মানহানিকর হিসেবে বিবেচনা করেন। এই সব মামলার প্রত্যেকটিতেই সাংবাদিকরা অগ্রিম জামিন লাভ করেন এবং এ সব মামলার কোনোটিরই বিচার শুরু হয়নি। ১৯৯৮ সালে একটি বাংলা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দেশদ্রোহিতার মামলাটিও মুলতবি রয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ জামিনে রয়েছেন। নভেম্বর মাসে একই সম্পাদক বাহাউদ্দিনের বিরুদ্ধে তার পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রীকে বিদ্রূপ করে জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডি প্রকাশ করার জন্য দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। বাহাউদ্দীনকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ যখন তার বাসভবনে যায়, তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। সুতরাং পুলিশ তার ভাই মঈনুদ্দীনকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে যে আইনে জামিনের কোনো বিধান নেই। মঈনুদ্দীনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি; ১৬ দিন পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়। বাহাউদ্দিনের বিরুদ্ধে দুটো দেশদ্রোহিতার মামলাই মুলতবি রয়েছে।

নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন, যার লেখা ও বিবৃতির কারণে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে কয়েকটি ইসলামী গ্রুপ তাকে হত্যার হুমকি দেয়। তিনি ১৯৯৪ সালে দেশত্যাগ করে ইউরোপে যান। নাসরিন ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং আবার ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে দেশ ত্যাগ করেন। নাসরিন বিদেশে স্বেচ্ছা নির্বাসনে রয়েছেন এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অবমাননার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলা মুলতবি রয়েছে। ১৯৯৪ সালে একজন নাগরিক তার বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ দায়ের করেন এবং ১৯৯৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর একজন বিচারক সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করেন। এই ওয়ারেন্ট কখনই তামিল করা হয়নি এবং নাসরিন পরে হাইকোর্টে আবেদন করে আগাম জামিন লাভ করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রোধ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এই সম্ভাবনার আলোকে ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে সরকার তসলিমা নাসরিনের সর্বশেষ গ্রন্থটির আমদানি, বিক্রয় এবং বিতরণ নিষিদ্ধ করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন প্রাক্তন সহকারী মতিয়ুর রহমান রেন্টুর লেখা একটি বই ২৯শে জুন তারিখে সরকার নিষিদ্ধ করেন। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বইটিতে এমন সব বক্তব্য রয়েছে যেগুলো সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিতে পারে। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এর লেখককে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা ঢাকায় গুলি করে আহত করে।

www.pathagar.com

সরকার বেতার ও টেলিভিশনের মালিক এবং নিয়ন্ত্রক। টেলিভিশন ও বেতারের প্রধান সংবাদ বুলেটিনের অধিকাংশ সময়জুড়েই থাকে প্রধানমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের খবর এবং এর পরে থাকে মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের খবর। খবরে বিরোধী দল সামান্যই স্থান পায়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের আহ্বান জানায়। পরবর্তীতে একটি সরকারি কমিটি বেসরকারি খাতে রেডিও এবং টেলিভিশন সম্প্রচার চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে। তবে সরকার এখনও সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করেনি। অবশ্যি ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী স্বায়ত্তশাসন অনুমোদন সম্পর্কিত তার ইতিপূর্বেকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এই স্বায়ত্তশাসনের আওতায় অর্থায়নের দায়িত্ব সরকারেরই থাকবে তবে সংশ্লিষ্ট টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্রগুলো সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় একটি বেসরকারি বেতার ও একটি বেসরকারি টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেছে। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে "একুশে টেলিভিশন" (ইটিভি) নামে ঐ বেসরকারি টেলিভিশন কেন্দ্র চালু হয়েছে। ১৪ই এপ্রিল থেকে ইটিভি বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রচার শুরু করেছে। বর্তমানে ইটিভি ভূমি ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে দেশের সত্তর শতাংশ এলাকায় এবং উপগ্রহের মাধ্যমে পুরো দেশে তার অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে। ৬ই নভেম্বর তারিখ থেকে ইটিভি-র অনুষ্ঠানমালা দৈনিক দশঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টা করা হয়। ইটিভি দুটো বাংলা সংবাদ বুলেটিন সম্প্রচার করে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং রাষ্ট্র পরিচালিত টেলিভিশনের ইংরেজি সংবাদ বুলেটিন সম্প্রচার করে। ইটিভি তার সংবাদ বুলেটিনগুলোতে বিরোধী দলের সংবাদ সরকারের আপাত কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্প্রচার করে থাকে। এ ছাড়া ইটিভি একটি ফিচার অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে যেটাতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয় এবং সেগুলো সমাধানের জন্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। ইটিভির মালিক বেসরকারি বেতার কেন্দ্রটিরও স্বত্বাধিকারী। সম্প্রচারের শর্ত হিসেবে দুটি কেন্দ্রকেই সরকারের সংবাদ অনুষ্ঠান এবং প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিনামূল্যে সম্প্রচার করতে হয়।

বিদেশী প্রকাশনা পর্যালোচনা ও সেন্সরশিপের আওতাধীন। অশালীন আলোকচিত্র, ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অবমাননাকর কোনো কিছু লেখা থাকলে অথবা জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কোনো আপত্তিকর মন্তব্য থাকলে সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক ইংরেজি সাময়িকী "নিউজউইকের" ১৮ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ পত্রিকাটির ঐ সংখ্যায় একজন মানুষের পায়ের তলায় পবিত্র কোরানের একটি সুরার আলোকচিত্র ছাপানো হয়েছিল।

সরকারের ফিল্ম সেন্সর বোর্ড স্থানীয় ও বিদেশী ছায়াছবি পর্যালোচনা করে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি, অশালীনতা, বৈদেশিক সম্পর্ক,

www.pathagar.com

চরিত্র হনন বা নকলের অভিযোগে যে কোনো ছায়াছবি সেন্সর বা নিষিদ্ধ করতে পারে। আলোচ্য বছর ফিল্ম সেন্সর বোর্ড অশালীনতার কারণে ১৪টি ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ১৩টি বাংলা চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করে। অবশ্য দু'মাস পর বাংলা চলচ্চিত্রগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। সরকার প্রায় ১০টি সিনেমা হলে ইংরেজি চলচ্চিত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে কারণ ঐ সিনেমা হলগুলো নিয়মিতভাবে সেন্সর বোর্ডের নিয়মাবলী মেনে চলে না। ক্যাবল অপারেটরবৃন্দ সাধারণত সরকারের কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। তবে বিগত ১৫ই আগস্ট তারিখে (জাতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নিহত হবার দিন) সরকার ক্যাবল অপারেটরদেরকে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। ক্যাবল অপারেটরবৃন্দ সরকারের এই অনুরোধ মেনে চলে। ভিডিও লাইব্রেরিগুলো বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম তাদের সদস্যদের ভাড়া দিয়ে থাকে আর এদের ক্ষেত্রে সরকারি সেন্সর আরোপের চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে তবে তা ফলপ্রসূ হয় না। সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করে না।

সরকার শিক্ষাঙ্গনের স্বাধীনতার প্রতি সাধারণভাবে শ্রদ্ধাশীল। সকল স্তরে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ অবাধে তাদের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। তবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি গোলযোগপূর্ণ। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রগ্রুপগুলোর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে চট্টগ্রাম, সিলেট এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজসমূহ অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর নববর্ষের আগমনী উদযাপনের পূর্ব মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একজন মহিলাকে আংশিকভাবে বিবস্ত্র করা হয়। সংবাদপত্রগুলোতে এক সপ্তাহব্যাপী তীব্র সমালোচনার পর ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের তিনজন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় তবে তাদেরকে পরে জামিন দেয়া হয়। মুসলিম সামাজিক মূল্যবোধ লঙ্ঘন করে নববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে রাস্তায় বের হওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলের একজন সংসদ সদস্য সংসদে সেই মহিলার শাস্তি দাবি করেন। ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সহিংস সংঘাতের সাথে তাদের আদর্শগত পার্থক্যের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। বরং এসব সংঘর্ষের মূলে রয়েছে চাঁদাবাজি যেটা পরিচালনা করে অছাত্র রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ। এদের সাথে রয়েছে তারা যারা ছাত্রবাসগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্যাম্পাসে ব্যাপক সহিংসতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার ফলে চার বছরের একটি ডিগ্রি লাভ করে ছাত্রদের গড়ে ছয় বছর সময় লেগে যায়। অবশ্যি, ১৯৯০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের রাজনৈতিক সহিংসতা থেকে মুক্ত।

www.pathagar.com

খ. শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশ করা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

সংবিধানে জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা রয়েছে। অবশ্যি, সরকার প্রায়ই এই অধিকার সীমিত করে। ফৌজদারি আইনের ১৪৪ ধারার আওতায় সরকার চার জনের অধিক ব্যক্তির একত্রে সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে। একটি মানবাধিকার সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরের প্রথম নয় মাসে সরকার ৩৩ বার ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। সরকার কখনো কখনো নিরাপত্তার কারণে ১৪৪ ধারা জারি করে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু অনেক স্বাধীন পর্যবেক্ষক এইসব ব্যাখ্যাকে অজুহাত বলে মনে করেন। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা প্রায়ই একই স্থানে এবং একই সময়ে তাদের সভার আয়োজন করে থকে যেখানে বিরোধী দলের সভার সময় আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। এর ফলে সরকার নিরাপত্তার কারণে ১৪৪ ধারা জারির একটা সুযোগ পেয়ে যায়। বিশিষ্ট ভূতপূর্ব আওয়ামী নেতা বর্তমানে বিরোধী কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নেতা কাদের সিদ্দিকীকে ১৪ই মে তারিখে করিমগঞ্জে একটি পূর্বনির্ধারিত সমাবেশ বাতিল করতে হয় কারণ ক্ষমতাসীন দলীয় কর্মীরা একই স্থানে এবং একই সময়ে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। ফলে স্থানীয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। বিএনপির যুব ফ্রন্ট গত ২৯শে জুন বরিশালের মুলাদীতে তাদের পরিকল্পিত সমাবেশ করতে পারেনি কারণ ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা একই দিনে একই সময়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে।

বিরোধী দলের সভা সমাবেশে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিরোধী দলগুলো আহূত দেশব্যাপী হরতালের সময় ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা নিয়মিতভাবে বিরোধীদলীয় সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে থাকে এবং হরতাল উপেক্ষা করার জন্য দোকান মালিক ও যানবাহন চালকদের ওপর জবরদস্তি করে থাকে।

ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকবৃন্দ প্রায় পুলিশের যোগসাজশে এবং সমর্থনে সহিংস পন্থায় বিরোধী দলের র‍্যালি এবং শোভাযাত্রা সহিংস পন্থায় ছত্রভঙ্গ করে। ৬ই আগস্ট তারিখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী ও জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের (আইসিএস) কর্মীদের মধ্যে এক বন্দুকযুদ্ধে কমপক্ষে ২২ ব্যক্তি আহত হয়। ক্যাম্পাসের সূত্র উদ্ধৃত করে একটি মানবাধিকার সংগঠন বলেছে যে, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা আইসিএস-এর একটি মিছিলের ওপর গুলি চালালে উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। ৬ই আগস্ট তারিখে পুলিশ কর্মকর্তারা ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণু বহনকারী মশা নির্মূল করতে

www.pathagar.com

সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় একটি যৌথ মিছিলের ওপর হামলা করে। টিয়ারগ্যাস, রাবার বুলেট ও লাঠি ব্যবহার করে পুলিশ ঐ সমাবেশ এবং মিছিল ভেঙে দেয়। এই ঘটনায় ১০০ জনেরও বেশী মানুষ আহত হয়।

বিরোধী দলের আহ্বানে জাতীয় অথবা স্থানীয় পর্যায়ে ১৩ দিন পূর্ণ দিবস অথবা আংশিক হরতাল পালিত হয়েছে। এ ছাড়াও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এবং জননিরাপত্তা আইন কার্যকর করার প্রতিবাদে, বিরোধী দলীয় মিছিল ও সমাবেশের ওপর হামলার প্রতিবাদে, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বিএনপিপন্থী একজন আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে স্থানীয় পর্যায়ে আরও হরতাল পালিত হয়। দেশের কিছু কিছু এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রায়ই হরতাল পালিত হয়।

হরতালগুলো চলাকালে সংঘটিত সহিংসতার ফলে চার ব্যক্তি নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। এদের মধ্যে আছে বিরোধীদলীয় কর্মী, পুলিশ এবং অনেক সাধারণ নাগরিক।

ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মীরাও মাঝে মাঝে স্থানীয়ভাবে হরতাল আহ্বান করে থাকে। এইসব হরতালের যারা বিরোধিতা করে, দলীয় কর্মীরা সহিংসতার হুমকি অথবা প্রকৃত সহিংসতার মাধ্যমে এইসব হরতাল কার্যকর করে থাকে। যারা হরতালের বিরোধিতা করে অথবা হরতাল সম্পর্কে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করে, তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে হরতালে যানবাহন চলাচালে ও ব্যবসা চালু রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা মানতে বাধ্য করা হয়। হরতালের দিনগুলোতে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের কর্মীরা মিছিল বের করে। এসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের মিছিলে পুলিশ কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করে। বিরোধীদলীয় শোভাযাত্রায় বাধা সৃষ্টি এবং তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে পুলিশ এবং ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা একত্রে কাজ করে।

সংবিধানে নৈতিকতা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে" প্রতিটি নাগরিকের সমিতি গঠনের অধিকার দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে সরকার এই অধিকার মান্য করে। ব্যক্তি বিশেষ যে কোনো বেসরকারি গ্রুপে যোগ দিতে পারে।

গ. ধর্মীয় স্বাধীনতা

সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। সরকার কার্যত এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও সরকার ধর্মনিরপেক্ষ তবুও রাজনীতিতে ধর্মের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনার প্রতি সংবেদনশীল। জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ মুসলমান। হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কিছু সংখ্যক মনে করেন এবং প্রত্যক্ষ করেন যে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের থেকে তাদের বৈষম্য করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে সরকারের কাছে নাম রেজিস্ট্রি করতে হয় না। সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশ থেকে অর্থ গ্রহণ করলে সকল এনজিও এবং ধর্মীয় সংগঠনকে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। কোনো এনজিও-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল অথবা তার বিরুদ্ধে অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার আইনগত ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এই ক্ষমতা কদাচিৎ ব্যবহার করা হয় এবং ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন এনজিওগুলো সরকারের এই ক্ষমতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

স্কুলগুলোতে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা লাভের অধিকার শিশুদের রয়েছে। আইনের আওতায় নাগরিকদের ধর্মান্তরকরণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলাম থেকে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে জোর সামাজিক বিরোধিতা থাকায় অধিকাংশ খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতার লক্ষ্য কয়েক প্রজন্ম ধরে যারা খ্রিস্ট ধর্ম পালন করছে তাদের মাঝে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখা। সরকার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে তাদের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা, তাদের যাজকদের প্রশিক্ষণ দান, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, এবং বিদেশে সহধর্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দেয়। বিদেশী মিশনারিরা দেশে কাজ করতে পারেন, তবে তাদের ধর্মান্তরকরণের অধিকার সংবিধানে সংরক্ষিত নয়। কিছু মিশনারী ভিসা পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

খ. দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের, বিদেশ ভ্রমণের এবং অভিবাসনের ও প্রত্যাবাসনের অধিকার

নাগরিকরা দেশের অভ্যন্তরে অবাধে চলাচল করতে পারে, বিদেশে যেতে পারে বা অভিবাসন করতে পারে এবং প্রত্যাবাসিত হতে পারে। তবে কিছু কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে সরকার এইসব অধিকার সীমিত করেছে। ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা সফরের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে বিমানবন্দরে জাতীয় পার্টির মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জুরের পাসপোর্ট আটক করে। হাইকোর্ট এই পাসপোর্ট মঞ্জুরকে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। সরকার সুপ্রিম কোর্টে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে সুপ্রিম কোর্ট তা প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্যি বছরের শেষ নাগাদও এই পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জামাতে ইসলামী দলের তদানীন্তন নেতা গোলাম আজম অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে নবায়নের জন্য তার পাসপোর্ট দাখিল করেন, তবে সেই পাসপোর্ট নবায়ন করা হয়নি। ১৩ই মার্চ গোলাম আজম সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দাখিল করেন। ৮ই জুন তারিখে আদালত ১৫ দিনের মধ্যে গোলাম আজমের পাসপোর্ট নবায়ন করে সেটা তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবকে নির্দেশ প্রদান করেন। সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিলম্বে একটি আপিল দাখিল করেন। বছর শেষ হয়ে গেলেও এই

www.pathagar.com

মামলাটি মুলতবি রয়েছে। ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এবং ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পাসপোর্ট আটক করে এবং পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে তা ফিরিয়ে দেয়। অবশ্য ৫ই জুন সরকার চিকিৎসার জন্য এরশাদকে লন্ডন যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করে এবং ঢাকা বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তার পাসপোর্ট পুনরায় আটক করে। এরশাদ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। হাইকোর্ট তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পাসপোর্ট এরশাদকে ফেরত দেয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করে। সরকার এখনও এই আদেশ মান্য করেনি। এরশাদ বছরের শেষ নাগাদ আদালতের আদেশের সার্টিফায়েড কপি পাননি। ইসরায়েলে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশী পাসপোর্ট বৈধ নয়।

শরণার্থীদের মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ সনদ এবং ১৯৬৭ সালের প্রটোকলের আলোকে শরণার্থী বা আশ্রিতের মর্যাদা দেয়ার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত নয়। সরকার শরণার্থীদের সহায়তার ব্যাপারে জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশন (ইউএনএইচসিআর) ও অন্যান্য মানবিক সংগঠনের সাথে সাধারণভাবে সহযোগিতা করে থাকে। আইনে প্রথমে আশ্রয় প্রার্থনা অথবা আশ্রয়প্রার্থীদের বসবাসের সুযোগ নেই। "ইউএনএইচসিআর" সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে যাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার সাময়িক আশ্রয়ের ব্যাপারে অনুমোদন দিয়ে থাকে। "ইউএনএইচসিআর"-এর অনুরোধে সরকার প্রায় ১২৫ জন শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীকে অন্য কোন দেশে বসবাসের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বা তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অথবা স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদশে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা নয় বর্মার এমন নাগরিক, সোমালিয়ার নাগরিক, ইরানী নাগরিক এবং শ্রীলঙ্কার নাগরিক।

আনুমানিক ৩,০০,০০০ বিহারী মুসলিম সারাদেশের বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছে। পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের আশায় তারা ১৯৭১ সাল থেকে এ দেশে রয়েছে। এরা সবাই অবাঙালি মুসলমান, যারা ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তির পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসী হয়ে আসে। এদের অধিকাংশ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। তারা পরে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের দাবি জানায়। পাকিস্তান সরকার ঐতিহাসিকভাবে বিহারীদের গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

আনুমানিক ২,৫১,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী (বর্মার উত্তরাঞ্চলীয় আরাকান প্রদেশের মুসলমান) নিপীড়নের ভয়ে ১৯৯১ সালের শেষের দিকে ও ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে। ১৯৯২ সালের পরে আনুমানিক ২,৩২,০০০ রোহিঙ্গা স্বেচ্ছায় বার্মায় ফিরে গেছে। অবশিষ্ট ২২,৭০০ শরণার্থী শিবির ত্যাগ করেছে এবং স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করছে। এই শরণার্থীদের ৩২,২০০ শিশু

www.pathagar.com

জন্ম নিয়েছে যাদের মধ্যে ৭,৭০০ জন মারা গেছে। "ইউএনএইচসিআর"-এর সহযোগিতায় সরকার পরিচালিত দু'টি শিবিরে ২০,৮০০-এর অধিক শরণার্থী বসবাস করছে। ১৯৯৭ সালের আগস্টে প্রত্যাবাসনে বাধা দেয়ার পর বার্মা ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে আবার প্রত্যাবাসন শুরু করার অনুমতি দেয়। তবে এর গতি এত ধীর যে শরণার্থী শিবিরগুলোতে জন্ম নেয়া শিশুর সংখ্যা প্রত্যাবাসনের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে পড়ে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে "ইউএনএইচসিআর" সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ করে যে, যে সব শরণার্থী ফিরে যেতে পারছে না তাদেরকে দেশে কাজ করতে দেয়া হোক, স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির সুবিধা তারা পাক এবং তাদের সন্তানদেরকে স্থানীয় স্কুলে যেতে দেয়া হোক। সরকার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এবং জোর দিয়ে বলে যে, বর্মায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সকল শরণার্থীকে শিবিরের মধ্যেই থাকতে হবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর ভাষ্য অনুযায়ী রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের কর্মকর্তারা শিবিরে বসবাসকারীদের ওপর সহিংসতা চালিয়েছে। তবে উচ্চ পর্যায়ে সরকার আলাপ আলোচনা করেও প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্মী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের নিশ্চয়তা আদায় করতে পারেনি।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী আলোচ্য বছরে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তবে তারা শিবিরগুলোকে এড়িয়ে যায় এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে ১৯৯১ সাল থেকে ১,০০,০০০-এর অধিক রোহিঙ্গা যারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, তারা দেশের মধ্যে শিবিরের বাইরে অত্যন্ত করুণ অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে এবং তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক দলিলপত্র নেই। নতুন যারা এসেছিল সরকার তাদেরকে প্রথম আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদেরকে অবৈধ অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। সরকার যথাসম্ভব তাদেরকে সীমান্তে ফিরিয়ে দেয়। "ইউএনএইচসিআর"-এর মতে তারা যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, তাদের কিছু সংখ্যক বর্মা সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের ভয়ে পালিয়ে এসেছে বলে জানায়।

অনুচ্ছেদ ৩

রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ : সরকার পরিবর্তনের নাগরিক অধিকার

বাংলাদেশে বহুদলীয় ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংসদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন। এ ছাড়া মহিলাদের জন্যে রয়েছে ৩০টি আসন। এই সব মহিলা সংসদ সদস্যদের কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ১৯৯৬ সালের একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর আওতায় সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের সর্বসাম্প্রতিক সময়ে অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রধান বিচারপতি এই সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনটিকে দেশী ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকবৃন্দ সাধারণভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতির হার ছিল অত্যন্ত উঁচু, ৭৫ শতাংশ যা বাংলাদেশের জন্যে একটি রেকর্ড।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত বিরোধিতার কারণে নির্বাচন কমিশন উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সূচি ঘোষণা করতে পারেনি। জুলাই মাসে জাতীয় সংসদে জেলা পরিষদ আইন পাস করে। এই আইনের আওতায় নিম্ন পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় ঐসব অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সরকার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ করতে পারবেন। সরকার অবশ্যি এই সব চেয়ারম্যান নিয়োগ করেননি। ৩রা জানুয়ারি তারিখে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্যি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচন বয়কট করে এবং ঐ সময়ে আসীন আওয়ামী লীগ দলীয় মেয়র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হন। জাতীয় পর্যায়ে বিরোধী দলগুলো সরকারের আশু পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায় নির্বাচনের দাবি অব্যাহত রাখে।

বাংলাদেশের নির্বাচনে সহিংসতা, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ভোট কারচুপির ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। সরকার ও বড় বড় রাজনৈতিক দলের কর্মীরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রায়ই সহিংস আচরণ ও হয়রানিমূলক কার্যকলাপ করে থাকে যেগুলো নির্বাচনের পূর্বে আরও বৃদ্ধি পায়। ৩১শে জুলাই তারিখে খাদ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু একটি উপনির্বাচনে জয়লাভ করেন। বিরোধী দলসমূহ এই নির্বাচন বয়কট করে। আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় পর্যবেক্ষক ও সংবাদ মাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী এই উপনির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর পক্ষে ভোটারদের ব্যাপকভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের এখনও নিষ্পত্তি হয়নি এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে পারেননি।

স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মীরা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ-আদায়ে লিপ্ত থাকার খবর পাওয়া যায়।

১৯৯১ সালে গৃহীত শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীসমূহের আওতায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এই সব পরিবর্তনের

www.pathagar.com

আওতায় একজন সংসদ সদস্য যদি তার দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে তার দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে তিনি সরাসরি তার সংসদীয় আসন হারাবেন। বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য মেজর (অব) আখতারুজ্জামন সংসদ বর্জন করা সম্পর্কিত তার দলের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার কারণে তার সদস্যপদ হারিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিধান সংসদের ওপর সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণকে সুসংহত করে। ১৯৯১ সাল থেকে যে সব রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছে সেই সব দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছে। বাস্তবিকপক্ষে সংসদের সামান্য অথবা কোনোরকম সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী নিজেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। দেশের সংকীর্ণ ও দলীয় রাজনীতির কারণে পরামর্শ সভা হিসেবে সংসদের কার্যকারিতা আরো বেশী ক্ষুণ্ন হয়েছে। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাস থেকে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদের অধিবেশন বর্জন করে আসছে। অবশ্য ১৯৯৮ সালে গঠিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিগুলোর সভায় বিরোধীদলীয় সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে আসছেন। ১৯৯৮ সালে গঠিত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিগুলোর প্রধান এখন মন্ত্রীবর্গ নন, বরং সাধারণ সদস্যবৃন্দই এগুলোর সভাপতি। এর ফলে সরকারি কাজকর্ম তদারকির কাজে কমিটিগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকার ও রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে স্বল্প। সংসদে ত্রিশটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তারা মনোনীত হয়ে থাকেন; তবে সমালোচকদের অভিযোগ হচ্ছে, এসব আসন ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যতখানি পুষ্ট করে মহিলাদের ক্ষমতায়নে ততখানি অবদান রাখে না। সংসদে মহিলাদের জন্য ত্রিশটি আসন সংরক্ষিত রাখার যে বিধান রয়েছে, ২০০১ সালের এপ্রিলে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে যদি না ঐ তারিখের পূর্বে একটি নতুন সংসদ বসে। ঐ বিধানের মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারের উত্থাপিত একটি বিল পাস করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ বিরোধী দল সংসদের অধিবেশন বর্জন করছে এবং তাদের সমর্থন ব্যতীত এই বিল পাস করা সম্ভব নয়। সংরক্ষিত আসনগুলো ছাড়াও মহিলারা সংসদের যে কোনো আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে সাত জন মহিলা তাদের নিজেদের অধিকার বলে সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত নেই। তিনশত নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মধ্যে তিনজন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বৌদ্ধ এবং পাঁচ জন হিন্দু। অবশিষ্ট সদস্যরা বাঙালি মুসলমান। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর সংসদে দেশের বৃহত্তম ইসলামী রাজনৈতিক দল জামাত-ই-ইসলামীর ১৮টি আসন থাকলেও ১৯৯৬ সলের নির্বাচনের পর তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র তিনটিতে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ৪

মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথিত অভিযোগ তদন্তের কাজে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

সরকার সাধারণভাবে মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করে থাকে। সুনির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সংগঠন তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে, সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে এবং সরকারের কাছে আবেদন করে থাকে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো ক্ষমতাসীন দল নির্বিশেষে প্রায়ই সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও সংগঠনগুলো নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে নাজুক মামলা ও বিষয়সমূহে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ মেনে চলে। বিগত বছরগুলোতে সরকার কোনো কোনো আইনের খসড়া সম্পর্কে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সাথে মতামত বিনিময় করে এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর মতামত বিবেচনা করে। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার এবং কয়েকটি নারী অধিকার গ্রুপ ও এনজিও-র মধ্যে আলোচনার সংসদ 'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন' পাস করে। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখাকে রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দিতে অব্যাহতভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে আসছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯০ সাল থেকে সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-এর আওতায় কয়েকবার রেজিস্ট্রেশনের জন্যে আবেদন করেছে। এই রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য পেতে পারে না।

মানবাধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মতামত সম্পর্কে সরকার স্পর্শকাতর। তবে সরকার নারী ও শিশু পাচারের মতো বিষয় সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিদেশী কূটনৈতিক মিশনগুলোর সাথে সংলাপের ব্যাপারে খোলামনের পরিচয় দিয়েছে। একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত খসড়া আইন অনুমোদন আরো এক বছরের জন্য মুলতবি অবস্থায় রয়েছে। এর আগে সরকার এই খসড়া আইন পর্যালোচনার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদীয় উপ-কমিটি গঠন করে।

সরকার অতীতে মানবাধিকার প্রবক্তা ব্যক্তি বিশেষের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছে। এর মধ্যে মিথ্যা মামলা দায়েরের মতো ঘটনাও রয়েছে। এসব চাপের মধ্যে আরো আছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের জন্য 'রিএন্ট্রি' ভিসা প্রদানে দীর্ঘ বিলম্ব। যেসব মিশনারি মানবাধিকারের সপক্ষে কাজ করেন, তারাও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছে যে, অতীতে তারা সাধারণত গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে হয়রানি ও ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের তরফ থেকে হুমকির আকারে সরকারি চাপের শিকার হয়েছে।

এ বছর জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে সরকার সম্মতি প্রদান করেছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ৫

জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, শারীরিক অক্ষমতা, ভাষা অথবা সামাজিক মর্যাদার কারণে বৈষম্য

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, "আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং সকল নাগরিক আইনের সমান সুরক্ষা পাবার অধিকার।" বাস্তবিকপক্ষে, বৈষম্য নির্মূলের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সরকার দৃঢ়ভাবে বলবৎ করে না। এই কারণে নারী, শিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধীরা প্রায়ই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

নারী

অনির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের কারণে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ, কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন রিপোর্টসমূহ ইঙ্গিত দেয় যে গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতা ব্যাপকভাবে রয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, দেশের ৪৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা তাদের পুরুষ সঙ্গীর কাছে শারীরিকভাবে প্রহৃত হয়েছে বলে জানিয়েছে। সরকার, সংবাদমাধ্যম এবং নারী অধিকার সংগঠনগুলোর তৎপরতা নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা ক্রমশ জোরদার করছে।

মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনাসমূহের অধিকাংশই যৌতুক-সংক্রান্ত বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটি মানবাধিকার গ্রুপের মতে, এই বছরটিতে যৌতুক-সংশ্লিষ্ট ৮১টি হত্যাকাণ্ড ঘটে। মানবাধিকার সংগঠন এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এই আভাস পাওয়া যায় যে, বিশেষ করে পল্লী এলাকায় মাঝে মধ্যে বিচার বিভাগ বহির্ভূত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে মহিলাদের শাস্তি দেয়ার ঘটনা একটি সাধারণ ব্যাপার। কোনো কোনো সময় এসব সালিশে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এ সব ঘটনার মধ্যে রয়েছে নৈতিক অপরাধের অভিযোগে মহিলাদের অবমাননাকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান, যেমন বেত্রাঘাত করা। হামলাকারীদের এসিড নিক্ষেপের কারণে বহু মহিলার মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে গিয়েছে। একটি মানবাধিকার সংগঠন জানিয়েছে যে, ১শ' ৮১ জন মহিলা এ বছরে এসিড হামলার শিকার হয়েছে। এসিড নিক্ষেপের প্রধান কারণ সাধারণত প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মহিলার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ। জমিজমা নিয়ে বিরোধ এসিড হামলার আরেকটি প্রধান কারণ। এসিড হামলাকারীদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক ব্যক্তিরই বিচার হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হামলাকারী রাতের বেলা খোলা জানালা দিয়ে এসিড ছুড়ে থাকে, ফলে প্রকৃত হামলাকারীকে সনাক্ত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ বছর এই ধরনের হামলার সাথে জড়িত কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং একজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

আইন অনুযায়ী ধর্ষণ ও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর দৈহিক নির্যাতন নিষিদ্ধ। তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ধর্ষণ অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। ২০০০ সালে মোট ৩,৫১৬টি ধর্ষণের ঘটনা এবং ৩,৫২৩টি স্ত্রী নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্ত্রী নির্যাতনের অভিযোগগুলোর মধ্যে ২,৮১৪টিই ছিল যৌতুক সংক্রান্ত। অভিযুক্ত ২,৩১০ জন ধর্ষণকারীর মধ্যে ৬৩ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা হয়। সরকার জানিয়েছে যে অন্যান্য ধর্ষণের মামলাগুলো বিচারাধীন রয়েছে। এ বছর সরকার জাতিসংঘ প্রণীত নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত ঐচ্ছিক সনদে (CEDAW) সম্মতি প্রদান করে। এ ছাড়া মহিলাদের বিরুদ্ধে কয়েক ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে সরকার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট আইনও প্রণয়ন করেছে। এই সব আইনের মধ্যে রয়েছে, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮০, নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতাবিরোধী আইন ১৯৮৩, এবং নারী ও শিশু নির্যাতন নিরোধ আইন, ১৯৯৫। শেষোক্ত আইনটিই স্থলাভিষিক্ত হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, ২০০০। তবে এসব আইনের প্রয়োগ অত্যন্ত দুর্বল, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এবং সরকার কালেভদ্রে দায়ের করা মামলাগুলোর বিচার করে থাকে। একটি মানবাধিকার সংগঠনের মতে, সহিংস ঘটনার ভুক্তভোগী মহিলাদের জন্য সরকার-পরিচালিত সাতটি এবং বেসরকারিভাবে পরিচালিত তেরটি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। নির্যাতনের শিকার মহিলাদের জন্য কিছু ক্ষুদ্র আশ্রয়কেন্দ্রও রয়েছে। তবে এগুলো প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এর ফলে, যে সব মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে, সরকার তাদেরকে প্রায়শই "নিরাপত্তামূলক হেফাজতের" নামে কারাগারে আটক করে রাখে। নিরাপত্তা হেফাজতে অবস্থানকারী মহিলাদের আরো সহিংস ঘটনার শিকার হতে দেখা যায়। এ কারণে অন্য মহিলারা অনুরূপ অভিযোগ দায়ের করতে নিরুৎসাহিত বোধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিকভাবে নির্যাতিতা মহিলাদের দীর্ঘকাল যাবৎ নিরাপত্তা হেফাজতে রেখে দেয়া হয় এবং এ থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্যে দুরূহ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশে জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকহারে নারী পাচার হচ্ছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে মহিলাদের স্থান গৌণ। সরকার তাদের মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তেমন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার আনুমানিক ২৬ শতাংশ, তুলনায় পুরুষদের মধ্যে তা শতকরা ৪৯ ভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটামুটিভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়াদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মেয়ে। নিরক্ষরতার উচ্চ হার, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য, সামাজিকভাবে কলংকিত হবার ভীতি এবং আদালতের আশ্রয় নিয়ে আইনগত সহায়তা লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে মহিলারা প্রায়শই আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে।

www.pathagar.com

মহিলাদেরকে তাদের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং এই অধিকার প্রয়োগে তাদের উৎসাহ প্রদান ও সাহায্য করার লক্ষ্যে বহুসংখ্যক বেসরকারি সংগঠন কাজ করে চলেছে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্সের আওতায় পুরুষের তুলনায় মহিলারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ভাগ কম পেয়ে থাকে। তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার সীমিত। পুরুষরা একসাথে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, যদিও তারা এই অধিকার খুব কমই প্রয়োগ করে থাকে। বিবাহিতা মহিলাকে একতরফা তালাক প্রদান এবং প্রথম স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে স্বামী কর্তৃক পুনরায় বিবাহের বিরুদ্ধে আইনে মহিলাদের কিছু সুরক্ষা করেছে। তবে এই সব সুরক্ষার ব্যবস্থা শুধুমাত্র নিবন্ধীকৃত (রেজিস্টার্ড) বিবাহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে পল্লী এলাকায় অধিকাংশ বিয়েরই কোনো নিবন্ধন হয় না। আইনে মুসলিম স্বামীকে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তিন মাসের খোরপোষ প্রদান করতে হয়। তবে এই ব্যবস্থা কদাচিৎ কার্যকর হয়।

বিগত দশকে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের চাকুরীর অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর কারণ হচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের বিকাশ। পোশাক শিল্পে কর্মরত ১৪ লাখ কর্মীর ৮০ শতাংশই মহিলা। পল্লী অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি সম্প্রসারণ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। অবশ্য উপার্জনকারী অন্যান্য চাকরীতে মহিলাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। অক্টোবর মাসে জনপ্রশাসন সংস্থার কমিশন প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী মাত্র বারো শতাংশ সরকারি চাকুরীতে মহিলারা কর্মরত। ঊর্ধ্বতন পদে মহিলাদের সংখ্যা ২ শতাংশ মাত্র। সরকারি চাকুরীতে অধিক সংখ্যক মহিলা কর্মী নিয়োগ-সংক্রান্ত সরকারি নীতির ফলাফল সীমিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ।

পোশাক ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের কাজের সুযোগ সর্বোচ্চ। তেতাল্লিশ শতাংশ মহিলা কৃষি, মৎস্যচাষ ও গবাদিপশু পালন খাতে নিয়োজিত থাকলেও ৭০ শতাংশ মহিলা পারিবারিক ক্ষেত্রে বিনা পারিশ্রমিকে কর্মরত। বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পেও অনেক মহিলা কায়িক শ্রমিক হিসেবে কর্মরত রয়েছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী নির্মাণ কাজেও শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ মহিলা। ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কোমল পানীয় এবং হস্তশিল্প কারখানাতেও মহিলাদের কর্মরত দেখা যায়।

শিশু

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সরকারি উদ্যোগের সমর্থনে অনেক স্থানীয় ও বিদেশী এনজিও সম্পূরক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু করা যদিও বাকি রয়েছে তবু এই সমস্ত যৌথ উদ্যোগের

www.pathagar.com

ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়নে এই দেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তবে, অর্ধেকেরও কিছু বেশি শিশু দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এদেশের সবচাইতে বড় এনজিও ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) ১২ লক্ষেরও অধিক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর এবং কিছু সহযোগী এনজিও'র সহায়তায় ইউনিসেফ দেশের বিভিন্ন শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে বসবাসরত সাড়ে তিন লক্ষ (৩৫০,০০০) শিশুকে শিক্ষা প্রদানের একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই শিশুরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পঞ্চাশ হাজারেরও (৫০,০০০) বেশি শিশুর জন্য শিক্ষা/সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ১৯৯১ সালে সরকার ছয় থেকে দশ বছরের শিশুদের জন্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। তবে সরকার জানিয়েছে যে, এই আইন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্যে সরকারের সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে আনুমানিক ৮১ শতাংশ স্কুলে নাম লিখিয়েছে। এদের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হওয়ার বয়সী মেয়ে শিশুর মধ্যে এই হার ৮৩ শতাংশ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্কুলে হাজিরার হার নিয়মিতভাবে হ্রাস পেতে থাকে; এবং সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী মোট শিশুদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে। সীমিত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিশুকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে অধিকাংশ স্কুলেই দুই শিফটে ক্লাশ হয়ে থাকে। এর ফলে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অধিকাংশ শিশুই দিনে মাত্র আড়াই ঘণ্টা শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে; আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিশুরা শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে চার ঘণ্টা। পল্লী অঞ্চলের ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী মেয়েদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্কুলগামী মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত এই সব ব্যবস্থাদি ফলপ্রসূ হয়েছে।

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুই অত্যন্ত কম বয়সে কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়। এর ফলে প্রায়ই শিশুর ওপর নির্যাতন হয়। বাসাবাড়ির কাজে নিয়োজিত শিশুদের সাথে তাদের চাকুরীদাতারা দুর্ব্যবহার করে (বাসাবাড়িতে যারা কাজ করে তাদের কাজের শর্তাদি দাসত্বের সাথে তুলনীয়)। অনেক সময় শিশু কাজের মেয়েদেরকে পতিতার মতোও ব্যবহার করা হয়। শ্রম সম্পর্কিত এই শিশু নির্যাতন সাধারণভাবে সমাজের সকল স্তরে এবং সারাদেশে ঘটে থাকে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিশুদের ত্যাগ করা, অপহরণ এবং পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে শিশু পাচার একটি ব্যাপক ও গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। শিশু ও নারী ব্যাপকভাবে পাচার হচ্ছে মূলত ভারতে, পাকিস্তানে ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এবং দেশের অভ্যন্তরেও। এই সব পাচারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি। ইউনিসেফের হিসাব মতে বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ শিশু পতিতা রয়েছে। অন্যান্য হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যা ২৯,০০০। সরকারি সার্টিফিকেটসহ ১৮ বছরের অধিক

www.pathagar.com

বয়সী মেয়েদের জন্যে পতিতাবৃত্তি বৈধ। তবে কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন বয়সের এই বিধানকে বয়স সম্পর্কিত মিথ্যা সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সাধারণত উপেক্ষা করে থাকে। যারা নাবালিকাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়ে আসে তাদের বিরুদ্ধে কদাচিৎ মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে এবং সরকার অনুমোদিত পতিতালয়গুলোতে বিপুল সংখ্যক শিশু পতিতা কাজ করে থাকে। এ ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য খবর রয়েছে যে নারী ও শিশু পাচারের সাথে পুলিশের সংশ্লিষ্টতা ছিল বা এ কাজে পুলিশ সহযোগিতা করেছে (অনুচ্ছেদ ১. গ, ৬. গ এবং ৬. চ দ্রষ্টব্য)। কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুকে বলপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করেছে প্রমাণিত হলে আইনের বিধান অনুযায়ী সেই ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

বিগত বছরে 'শিশু বিক্রয়, শিশু পতিতাবৃত্তি এবং অশ্লীল ছবিতে শিশুদের ব্যবহার সম্বন্ধীয় শিশু অধিকার সনদ' এবং 'সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের সংশ্লিষ্টতা সম্বন্ধীয় শিশু অধিকার সনদ' বিষয়ে জাতিসংঘের যে ঐচ্ছিক চুক্তি রয়েছে সরকার তাতে সম্মতি প্রদান করেছে।

প্রতিবন্ধী নাগরিকবৃন্দ

বাংলাদেশের আইনে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমান আচরণ ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষার বিধান রয়েছে। তবে বাস্তবে প্রতিবন্ধীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। সরকার এই সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করেনি অথবা প্রতিবন্ধীদের জন্যে সুযোগসুবিধা বাধ্যতামূলক করেনি। মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্যে যে সুবধাদি রয়েছে সেগুলো অপর্যাপ্ত। কোনো পরিবারের ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা লাভের মতো অর্থ না থাকলে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার তেমন কোনো ব্যবস্থা এ দেশে নেই।

আদিবাসী নাগরিকবৃন্দ

উপজাতীয় জনগণের নিজেদের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার খুব সামান্যই ক্ষমতা আছে। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) শান্তি চুক্তি তিন বছর যাবৎ বলবৎ রয়েছে। এই শান্তিচুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৫ বছরের বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে, যদিও সেখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা অব্যাহত আছে। শান্তিচুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কি না এ ব্যাপারে জনসমক্ষে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন বিদ্রোহী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা এবং চুক্তির সকল শর্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় পার্বত্য এলাকার সংস্থাগুলোর ওপর অর্পিত একই ধরনের দায়িত্ব নিয়ে এখনো বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। ভূমি কমিশনের দায়িত্ব ছিল উপজাতি ও বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ভূমি সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করা। তবে এই কমিশন এই ভূমি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে এখনো

www.pathagar.com

তেমন ফলপ্রসূভাবে কাজ করেনি। বিদ্রোহের সময় যে সব উপজাতীয় নাগরিক সংশ্লিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় উপজাতীয় নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সরকার নিয়মিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের জমি বরাদ্দ করেন। এই সব জমির মধ্যে সেই জমিও অন্তর্ভুক্ত যেগুলো ভূমি মালিকানার সনাতন ধারা অনুযায়ী আদিবাসীরা দাবি করে থাকে। সরকার কর্তৃক জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ফলে চাকমা ও মারমাসহ বহু উপজাতী গোষ্ঠী ভূমিচ্যুত হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালি বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা ১৯৪৭ সালে এলাকার মোট জনসংখ্যার তিন শতাংশ ছিল। ১৯৯৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এলাকার মোট জনসংখ্যার (১০ লক্ষ) প্রায় ৫০ শতাংশ। একটি উপজাতীয় গ্রুপ শান্তি বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে একটি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তবে এই সংঘর্ষের মাত্রা তীব্র ছিল না। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়া পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। সংঘর্ষ চলাকালীন সকলেই- আদিবাসী, বসতি স্থাপনকারী এবং নিরাপত্তা বাহিনী-একে অপরের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করে। ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তিতে মূলত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে যে স্থানীয় সরকারের প্রধানও হবেন একজন উপজাতীয় নাগরিক। চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি হ্রাস এবং গৃহচ্যুত উপজাতীয় পরিবারবর্গের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান।

গত ১৮ই আগস্ট সংঘটিত এক হামলায় দেশের উত্তরাঞ্চলীয় অংশে বসবাসরত সাঁওতাল উপজাতির একজন নেতা আলফ্রেড সরেন নিহত হয় এবং আরো বহু লোক আহত হয়। একটি মানবাধিকার সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী, এই হামলা চালিয়েছিল বাঙালিরা। একটি জমি নিয়ে বিরোধে বাঙালিরা উপজাতীয়দের উপর ক্রুদ্ধ ছিল বলে তারা জানায়। হামলাতে জড়িত থাকার জন্য নব্বই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু বছরের শেষ নাগাদ মাত্র চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে আদালতের কার্যক্রম আবার শুরু হবার কথা।

অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় মানুষও সন্দেহজনক আইন প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য পন্থার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের কাছে তাদের জমি হারানোর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। দেশের উত্তর মধ্য অংশের মধুপুর বন অঞ্চলে বসবাসকারী গারো জনগোষ্ঠীও আশপাশের বাঙালি জনগোষ্ঠী কর্তৃক বন উজাড় করা এবং জমি দখলের কারণে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। গারো সম্প্রদায়ের ওপর এই চাপের ফলে তারা ব্যাপক হারে শহরাঞ্চলে এবং প্রতিবেশী ভারতের মেঘালয় রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের ছোট্ট সম্প্রদায় হুমকির সম্মুখীন

www.pathagar.com

হচ্ছে যার সংখ্যা হচ্ছে মাত্র আনুমানিক ১৬,০০০। ১৯৯৫ সালে সরকার এই আভাস দেয় যে, ময়মনসিংহ জেলায় সরকার ৪০০ একর জমির ওপর একটি জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা করবে। এই জমির অংশ বিশেষ নেয়া হবে গারো উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন এখনও মুলতবি রয়েছে। গারো উপজাতীয়দেরকে তাদের ভূমি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার সম্ভাবনা সরকার এখনও বাতিল করে দেয়নি।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ হচ্ছে হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী

স্থানীয় গুণ্ডা বদমাশ এবং এ ধরনের দলের নেতারা মাঝে মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে দুর্বল ও অরক্ষিত মনে করে তাদের ওপর হামলা চালায়। এই সব হামলাকারীদের সমালোচনা, হামলার তদন্ত এবং হামলাকারীদের বিচার করতে সরকার অনেক সময় ব্যর্থ হয়েছে। আহ্‌মেদিয়া সম্প্রদায়, প্রধান ধারার মুসলিমরা যাদের ধর্মদ্রোহী বলে মনে করে, এ বছরেও বেশ কয়েকটি হামলা এবং হয়রানির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মার্চ মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ক্রোরা এবং নাসিরাবাদে আশপাশের এলাকার মুসলিমরা আহ্‌মোদিয়াবাদের ৪০টি বাড়িঘরে হামলা চালায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারা আহ্‌মেদিয়া সম্প্রদায়ের একটি মসজিদও দখল করে। এক মাসব্যাপী আলোচনা ও সমাঝোতার পর মসজিদটি আহ্‌মেদিয়াদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালেও কুষ্টিয়ায় প্রধান ধারার মুসলিমরা আহ্‌মেদিয়া সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ দখল করেছিল। মসজিদটি এখনো স্থানীয় পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে বলে জানা যায় এবং আহ্‌মেদিয়াদেরকে সেখানে নামাজ পড়তে বাধা দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশে সুন্নী মুসলিমরা আহ্‌মেদিয়াদের একটি মসজিদ ভাঙচুর করে। ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে খুলনাতে একটি আহ্‌মেদিয়া মসজিদে জুম্মা'র নামাজ চলাকালে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ছয় ব্যক্তি নিহত হয় এবং আরো ৪০ জন আহত হয়। বছরের শেষ নাগাদ এই মামলাটি অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বাস্তবিকপক্ষে সরকারি চাকুরী প্রাপ্তি ও রাজনৈতিক পদ লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের জন্যে গঠিত সিলেকশন বোর্ডগুলোতে প্রায়ই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকে না।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্পিত সম্পত্তি আইনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে অনেক হিন্দুই তাদের হারিয়ে যাওয়া জমির মালিকানা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। হিন্দুদের জমির মালিকানার বিষয়টি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে একটি বিরোধপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিরাজ করছে। সে সময় অনেক হিন্দু এদেশ ছেড়ে

www.pathagar.com

পালিয়ে গিয়েছিল। আবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর অনেক হিন্দুই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্যের কারণে জমি হারায়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পূর্বে আওয়ামী লীগ অর্পিত সম্পত্তি আইন বিলোপ করার অঙ্গীকার করেছিল। এই আইনটি হিন্দুদের তাদের জমি থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখে মন্ত্রিসভা অর্পিত সম্পত্তি নীতিগতভাবে এগুলোর প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই লক্ষ্যে একটি আইনের খসড়া করার জন্য একটি উপকমিটি গঠন করে। বছরের শেষ নাগাদ এই খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। বিগত বছরগুলোতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপর হামলা হয়েছিল যার ফলেও তারা তাদের সম্পত্তি হারায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সর্বশেষ বড় হামলা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময়েও এ ধরনের কিছু ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছিল। এই ধরনের আন্তঃ সম্প্রদায় সহিংসতার কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য দেশ ত্যাগ করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে দেশত্যাগ করেন। স্ব-আরোপিত নির্বাসনে তিনি বিদেশে বসবাস করছেন (অনুচ্ছেদ ২. ক দ্রষ্টব্য)। দেশের ইসলামী গোষ্ঠীকে অসন্তুষ্ট করার আশঙ্কায় সরকার ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তার সর্বশেষ বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

অনুচ্ছেদ ৬

শ্রমিকদের অধিকার

ক. সমিতি করার অধিকার

ইউনিয়নে যোগ দেয়ার অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইউনিয়ন গঠনের অধিকারও শাসনতন্ত্রে অনুমোদন করা হয়েছে। দেশের প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৫০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ১৮ লাখ কোনো না কোনো ইউনিয়নের সাথে যুক্ত, যেগুলোর বেশির ভাগই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অধিভুক্ত। (মোট শ্রম শক্তির সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ)। এ ছাড়া রয়েছে একটি বিশাল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত যে সম্পর্কে কোনোরকম বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান নেই।

কোনো কর্মস্থলের শ্রমিকদের ৩০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোনো ইউনিয়ন গঠন ও তার রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। এ ছাড়া রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে কোনো ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা নিষিদ্ধ এবং এই সময়ের মধ্যে চাকুরীদাতার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা থেকে তারা আইনগতভাবে সংরক্ষিত নয়। শ্রমিক সংগঠনের কর্মীরা এই বিধানের বিরোধিতা করে বলেছে যে, এটা শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকারকে

www.pathagar.com

গুরুতরভাবে সীমিত করেছে এবং এই একই কারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সরকারের কাছে ৩০ শতাংশের এই বিধান সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছে। বিভিন্ন মালিকের মালিকানাধীন বিভিন্ন কর্মস্থলের শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত একটি ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞামূলক আইন রয়েছে সেটা সংশোধন করার জন্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও) সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে। মোট প্রায় ৫,৪৫০টি শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ সরকারিভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ২৫টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (এনটিইউ) সেন্টারের অধিভুক্ত। এ ছাড়া আরও কয়েকটি অরেজিস্ট্রিকৃত 'এনটিইউ' রয়েছে।

রেলওয়ে, ডাক বিভাগ, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগের কর্মীরা বাদে সরকারি কর্মচারী, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ কোনো ইউনিয়নে যোগদান করতে পারে না। এই সমস্ত ইউনিয়নের রাজনৈতিক চরিত্রের কারণেই এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে শিক্ষক ও নার্সদের মতো সরকারি কর্মচারীরা যাদের ইউনিয়নে যোগদানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তারা সমিতি গঠন করেছে যেগুলো ট্রেড ইউনিয়নের মতোই কাজকর্ম করে থাকে। অর্থাৎ এই সব সমিতি সদস্যদের কল্যাণ, আইনগত সহায়তা প্রদান ও তাদের অভিযোগ তুলে ধরে। অবশ্যি, এ সব সমিতি কর্তৃক যৌথ দরকষাকষি নিষিদ্ধ। কিছু সংখ্যক কর্মী অরেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়ন গঠন করেছে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী এবং নির্মাণ ও পরিবহন শিল্পের কর্মীবৃন্দ (সরকারি ও বেসরকারি খাত)। ১৯৯৮ সালের শুরুতে সরকার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাংলাদেশ ব্যাঙ্কে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। দেশের ক্ষমতাসীন দলের শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত কিছু সংখ্যক সদস্য ব্যাঙ্কের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মারধর করার পর সরকার বাংলাদেশ ব্যাঙ্কে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে। এই ঘটনার পর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেপ্টেম্বর মাসে বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের অনেকগুলো সংগঠন ধর্মঘটে যায়। সরকার এই বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০ শতাংশ প্রদান করে থাকে। সরকারের কাছে তাদের দাবি ছিল সরকারকে তাদের মূল বেতনের শতকরা ১০০ ভাগই দিতে হবে। অবশেষে সরকার তার অংশের বেতনের ভাগ শতকরা ৯০ ভাগে উন্নীত করতে সম্মত হলে কয়েক সপ্তাহ পর এই ধর্মঘটের অবসান ঘটে। ১৯৯৯ সালে আইএলও বিশেষজ্ঞ কমিটি জানিয়েছিল যে বস্ত্র, ধাতু শিল্প ও পোশাক শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধীকরণের কয়েকটি আবেদন সরকার অযৌক্তিক কারণে প্রত্যাখ্যান করে। শ্রম মন্ত্রণালয় বলেছিল যে এই সমস্ত আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছিল না।

ধর্মঘট করার অধিকার সুনির্দিষ্টভাবে আইনে স্বীকৃত নয় তবে ধর্মঘট প্রতিবাদের একটি সাধারণ পন্থা। এ ছাড়াও, সাধারণ ধর্মঘট বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর একটি হাতিয়ার। রাজনৈতিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্যে সাধারণ ধর্মঘট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের সবচাইতে বড় বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরে একটি

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত বেসরকারি বন্দর স্থাপনের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে শ্রমিকরা কয়েকবার কর্মবিরতি পালন করেছিল। পেশাজীবী সংগঠনের আওতায় সংগঠিত কিছু কর্মী অথবা রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত কিছু ইউনিয়নও এ বছর ধর্মঘটে গিয়েছিল। অঘোষিত ও আকস্মিক ধর্মঘট আহ্বান অবৈধ হলেও এগুলো প্রায়ই ঘটে থাকে। সরকার বিভিন্নভাবে এগুলোর মোকাবিলা করে থাকে। এ ধরনের ধর্মঘট বিশেষ করে পরিবহন খাতে একটি সাধারণ ঘটনা।

"এসেনশিয়াল সার্ভিসেস অর্ডিন্যান্সের" আওতায় সরকার জরুরি খাত হিসেবে ঘোষিত কোনো খাতে তিন মাসের জন্যে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে পারেন। এ বছর, সরকার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে। এই নিষেধাজ্ঞা অতীতে জাতীয় বিমান সংস্থার বৈমানিক, পানি সরবরাহ কর্মী, শিপিং কর্মী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্মীদের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছিল। এই নিষেধাজ্ঞা তিন মাস পর পর নবায়ন করতে হতে পারে। সরকার যে কোনো ধর্মঘট অথবা লকআউট শুরুর পূর্বে বা শুরু হলে সেগুলো নিষিদ্ধ করতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট বিরোধকে লেবার কোর্টে পাঠাতে পারে। ১৯৬৯ সালের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অর্ডিন্যান্সের আওতায় মীমাংসা, সালিশ এবং লেবার কোর্টের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা ব্যর্থ হলে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার রয়েছে। যদি কোনো ধর্মঘট ৩০ দিন অথবা তার চেয়ে বেশী সময় ধরে চলে, সে ক্ষেত্রে সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে পারে এবং বিরোধ সুরাহার জন্যে সেটা লেবার কোর্টে পাঠাতে পারে। ১৯৯৩ সাল থেকে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। 'আইএলও' ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অর্ডিন্যান্সের শর্তাবলীর সমালোচনা করেছে যেখানে একটি শ্রমিক সংগঠনের তিন-চতুর্থাংশের মতামত পেলেই ধর্মঘট আহ্বান করা যেতে পারে তা বলা আছে। আবার এর মাধ্যমে সরকারকে যে কোনো সময়ে একটি ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে যদি সরকার মনে করে যে এই ধর্মঘট জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বা প্রতিষ্ঠানটি জনসেবামূলক।

শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই যদিও ইউনিয়ন কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ ধর্মঘট (হরতাল) আহ্বান অথবা ইউনিয়ন কর্তৃক পরিবহন চলাচলে অবরোধ সৃষ্টির ব্যাপারটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ নয় বরং একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত এবং সেই কারণে এটা নিষিদ্ধ।

ইউনিয়নগুলো সরকারি কাঠামোর অংশ না হলেও সেগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলোতে এবং সরকার পরিচালিত চট্টগ্রাম বন্দরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে এগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে, সকল 'এনটিইউ' ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসহ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। কিছু কিছু ইউনিয়ন হচ্ছে জঙ্গী এবং সেগুলো ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ধ্বংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ বছর ধর্মঘটী শ্রমিক কর্তৃক পরিবহন

www.pathagar.com

রুটগুলোতে অবরোধের ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে নিয়মিতভাবে মারমুখি হয়ে থাকে। অবৈধ চাঁদার বখরা অথবা অবৈধ উপার্জনের উৎস নিয়েই অধিকাংশ সংঘর্ষ ঘটে থাকে। আর এই সব সংঘর্ষে ছোরা, বন্দুক এবং দেশী বোমা ব্যবহার হয়ে থাকে।

শ্রমিকরা তাদের ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হতে পারে। ইউনিয়নের মোট সদস্য সংখ্যার অনুপাতে আইন অনুযায়ী এই কার্যনির্বাহী পরিষদের আকার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস লেবার কোর্টের অনুমোদনক্রমে যে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারে। তবে গেল বছরে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানা যায়নি।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অর্ডিন্যান্সের আওতায় রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন অথবা ইউনিয়ন কর্মকর্তাদেরকে দেওয়ানি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান রয়েছে। এসব বিধান প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অসমতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অতীতের অবৈধ কার্যকলাপের জন্যে পরিবহন ব্যবস্থায় অবরোধ সৃষ্টির অভিযোগে পুলিশ ইউনিয়ন সদস্যদেরকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে অথবা নিয়মিত ফৌজদারি আইনে গ্রেফতার করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনগুলোর সাথে অধিভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলো এ ধরনের অনেক সংযোগ রক্ষা করে থাকে। "আইএলও"-র সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনের জন্যে শ্রমিক ইউনিয়ন সদস্যদেরকে সরকারের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। তবে ১৯৯৯ সালে এ ধরনের ছাড়পত্র না দেয়ার কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়াও, ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিমানবন্দরের অভিবাসন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ফেডারেশন (বিআইজিইউএফ)-এর ১১ জন কর্মকর্তাকে দেশত্যাগের সময় বাধা দেন। এই কর্মকর্তারা এএফএল-সিআইও সরকারি ক্লিয়ারেন্স দাবি করেন। অক্টোবর মাসে শ্রম মন্ত্রণালয় তাদের জন্য ক্লিয়ারেন্স ইস্যু করে। কিন্তু স্টাডি ট্যুরে অংশগ্রহণের জন্য বিআইজিইউএফ কর্মকর্তাদের অনেক দিন দেরি হয়ে গিয়েছিল।

খ. সংগঠিত হবার এবং যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকার

শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার রয়েছে তবে এই শর্তে যে তাদের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস-এর দফতরে বৈধ যৌথ দরকষাকষির এজেন্ট হিসেবে নিবন্ধীকৃত। লেবার ইউনিয়নগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করে থাকে। আর তাই, প্রতিটি শিল্প কারখানারই একাধিক লেবার ইউনিয়ন রয়েছে (প্রতিটি রাজনৈতিক দলের এক বা একাধিক অঙ্গ সংগঠন)। যৌথ দরকষাকষিতে জড়িত প্রতিটি ইউনিয়নকে অবশ্যই একটি যৌথ দরকষাকষি কর্তৃপক্ষ কমিটি (সিবিএ)-তে প্রতিনিধি মনোনীত করতে হবে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনার পর সেই

www.pathagar.com

কমিটিকে অবশ্যই রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ঔষধ শিল্প, পাট শিল্প অথবা টেক্সটাইল শিল্পের মতো বড় বড় শিল্পে মাঝে মাঝে যৌথ দরকষাকষি হয়ে থাকে। তবে তীব্র বেকার সমস্যার কারণে শ্রমিকরা তাদের চাকুরীর নিরাপত্তার স্বার্থে যৌথ দরকষাকষি এড়িয়ে যেতে পারে। বেসরকারি খাতের ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণত যৌথ দরকষাকষির ঘটনা ঘটে না। ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ ফ্রি ট্রেড দরকষাকষি (আইসিএফটিইউ) তাদের দৃষ্টিতে আইনগত প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে এ ধরনের দরকষাকষিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এ বাংলাদেশের সমালোচনা করেছে।

সরকারি খাতের কর্মীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি জাতীয় বেতন ও মজুরি কমিশন নির্ধারণ করে থাকে। এই কমিশনের সুপারিশসমূহ বাধ্যতামূলক এবং শুধুমাত্র বাস্তবায়নের প্রশ্ন ছাড়া এ নিয়ে আর কোনো বিতর্ক করা চলে না।

ইউনিয়নগুলোর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপক ক্ষমতা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস-এর রয়েছে। ইউনিয়ন কার্যালয়ে প্রবেশ এবং নথিপত্র তদন্ত করে দেখবার ক্ষমতা তার আছে। তবে ১৯৯৯ সালে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস তার এই ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন কিনা সে রকম কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অর্ডিন্যান্সের আওতায় চাকুরীদাতারা ইউনিয়ন সদস্য ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করার অনেক সুযোগ পেয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অর্ডিন্যান্সের আওতায় ইউনিয়ন সদস্যদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে জড়িত সন্দেহে একতরফাভাবে বদলি করা যেতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক চাকুরীচ্যুতির সুবিধাসহ (দুই সপ্তাহের বেতন) চাকুরীচ্যুত করা যেতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে বেসরকারি খাতের চাকুরীদাতারা সাধারণত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করে থাকে। এ ব্যাপারে তারা অনেক সময় স্থানীয় পুলিশের সহায়তা নিয়ে থাকে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস বৈষম্য বিষয়ক অভিযোগ সম্পর্কে রায় দিয়ে থাকেন। কয়েকটি মামলায় লেবার কোর্ট ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদেরকে পুনর্বহালের আদেশ প্রদান করেছে। তবে লেবার কোর্টে বিপুল সংখ্যক মামলা জমে থাকায় এর কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আর এই অভিযোগও পাওয়া গেছে যে, চাকুরীদাতারা অসাধু পন্থায় সংশ্লিষ্ট কোর্টের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে।

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের (বিজেএসডি) মহাসচিব জাফরুল হাসান ৭৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য এক অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগে বলা হয় যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই ব্যক্তিদেরকে অন্যান্য স্থানে বদলি ও বিভিন্নভাবে হয়রানি করেছে। কারণ এরা সকলেই ছিল সক্রিয় ইউনিয়ন নেতা। বিগত বছরের শেষ পর্যন্ত এই মামলার কোনো সুরাহা হয়নি।

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালের জুন মাসে আইএলও বাংলাদেশ কৃষি খামার শ্রমিক ফেডারেশন থেকে একটি অভিযোগ পায়। এই অভিযোগে বলা হয় যে, সরকার এমন কোনো আইন চালু করেনি যার মাধ্যমে আরো ব্যাপক সংখ্যক কৃষি শ্রমিকদেরকে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অর্ডিন্যান্স'-এর আওতায় সুরক্ষা দেয়া যেত। কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য জুলাই মাসে আইএলও আয়োজিত এক সেমিনারে এই ইস্যুটি উত্থাপন করা হয়। শ্রম মন্ত্রণালয়সহ আরো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এতে যোগ দেন। মৎস্য চাষ (চিংড়ির হ্যাচারি, চিংড়ি চাষ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ) খাতে কর্মরত খামার কর্মীরা শ্রম আইনের আওতাভুক্ত এবং তারা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারে। তবে বেশির ভাগ কৃষি শ্রমিকই অভিবাসী শ্রমিক হওয়ায় তারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গ্রুপের অধীনে কর্মরত নয়। এই সব অভিবাসী শ্রমিকদের শ্রম আইনসমূহের ছত্রচ্ছায়ায় আনার জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

দেশের দু'টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলকে (ইপিজেড) ১৯৬৫ সালের শ্রম নিযুক্তি (স্ট্যান্ডিং অর্ডার) আইন, ১৯৬৯ সালের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই আইনগুলো অন্যান্য বিষয় ছাড়াও সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং মজুরি, কর্মঘণ্টা, পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের মানদন্ড নির্ধারণ করে। যদিও এই সমস্ত আইনের শর্তাবলীর কিছু বিকল্প ইপিজেড নীতিমালার মাধ্যমে বাস্তাবায়ন করা হয়েছে এবং এগুলোর বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে বাংলাদেশ ইপিজেড কর্তৃপক্ষ, তবু পেশাদার ও শিল্প-ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন এখানে নিষিদ্ধ। এই ইপিজেডগুলোতে কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিষেধাজ্ঞা পাশ কাটিয়ে সমিতি গঠন করেছে। ১৯৯২ সালে সরকার একটি অঙ্গীকার করেন যে, ১৯৯৭ সালের মধ্যে সমাবেশ করার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে এবং ২০০০ সালের মধ্যে ইপিজেডগুলোতে শ্রম আইনের সব ধারা প্রয়োগ করা হবে। এই অঙ্গীকার এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ইপিজেডগুলোতে যৌথ দরকষাকষিরও কোনো বিধান নেই। তবে ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে সরকার ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে পূর্ণ সংগঠন করার স্বাধীনতা অনুমোদন করতে সম্মত হয়েছে। প্রায় ৯৩,০০০ কর্মী এই ইপিজেডগুলোতে কর্মরত। তারা মূলত টেক্সটাইল ও পোশাক, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ এবং চামড়া শিল্পে কর্মরত। সারা বছরে ইপিজেডগুলোতে বেশ কয়েকবার ধর্মঘট সংঘটিত হয়, যার মধ্যে কয়েকটি সহিংসতায় রূপ নেয়। এমন এক ঘটনায় পুলিশ একটি কারখানায় জোর করে প্রবেশ করলে চারজন ইপিজেড শ্রমিক নিহত হয়। অসন্তুষ্ট শ্রমিকরা কারখানাটি দখল করে রেখেছিল। এই ঘটনায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালালে দুই ব্যক্তি নিহত হয়; একই সময়ে ছুরিকাহত হয়ে পরবর্তীতে আরো দু'জন প্রাণ হারায়। শ্রমিকদেরকে যে পীস রেট-এ বেতন দেয়া হতো তার ১৫ শতাংশ হ্রাস করায় এবং পরবর্তীতে আরো ৩৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করায় তারা বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হয়েছিল।

www.pathagar.com

গ. বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা

সংবিধানে শিশুশ্রমসহ জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে বলবৎ করে না। ১৯৬৫ সালে গৃহীত কারখানা অ্যাক্ট এবং বিপনী ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ক অ্যাক্টে জোরপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে আইন বলবৎ করার উদ্দেশ্যে পরিদর্শনের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এই আইনগুলো কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়না অংশত এই কারণে যে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ স্বল্প। ব্যাপক হারে শ্রমদাসত্ব বা জোরপূর্বক শ্রমের ঘটনা নেই। অবশ্য ঘরবাড়িতে শিশুসহ যারা কাজ করে, তাদের কারো কারো অবস্থা দাসের মতো এবং তাদের অনেকেই শারীরিক নির্যাতন ভোগ করে, এর ফলে এমনকি কখনো কখনো মৃত্যুও হতে পারে। ঘরবাড়িতে কাজ করে এমন ছেলেমেয়েদের ওপর নির্যাতন চালানোর কারণে অতীতে সরকার কয়েকটি ক্ষেত্রে গৃহকর্তা/কর্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছে। প্রধানত পতিতাবৃত্তির জন্য ব্যাপকহারে নারী ও শিশু পাচার হয়ে থাকে। কখনো কখনো এই পাচার হয়ে থাকে দেশের বাইরে দাস শ্রমিক হিসেবে কাজ করানোর উদ্দেশ্যে।

ঘ. শিশু শ্রমের অবস্থা এবং চাকুরীর সর্বনিম্ন বয়স

অভিন্নভাবে শিশুদের কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে এমন কোনো আইন দেশে নেই। শিশু শ্রম একটি গুরুতর সমস্যা। কোনো কোনো আইনে কিছু খাতে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে ১৪ বছরের কম বয়সের শিশুদের কারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে আরো বলা হয়েছে যে শিশু ও কিশোরদের কেবল দৈনিক সর্বোচ্চ ৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে দেয়া যেতে পারে এবং তাও সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে। ১৯৬৫ সালের বিপণী ও প্রতিষ্ঠান আইনে কোনো বাণিজ্যিক কর্মস্থলে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৩৮ সালের শিশুদের কর্মনিয়োগ বিষয়ক আইনে রেলওয়েতে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ এবং বন্দরে মাল ওঠানামার কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই সব আইনের এক্তিয়ার ও প্রয়োগ যথেষ্ট নয়। ব্যাপক দারিদ্রের কারণে অনেক ছেলেমেয়ে অত্যন্ত কম বয়সে কাজ করতে শুরু করে। ১৯৯৬ সালে শ্রমশক্তির ওপর সরকারের গৃহীত একটি জরিপ থেকে দেখা যায় যে দেশের কর্মজীবী ৬৩ লাখ শিশুর বয়স ৫ থেকে ১৪ বছর। এরা টাকার বিনিময়ে কাজ করে এবং স্কুলে ভর্তি হয়নি। ছেলেমেয়েরা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি খামারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সংগেও কাজ করে। অতীতের ইউনিসেফ ও আইএলও'র গৃহীত জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৬ থেকে ১৭ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের মধ্যে ২১ শতাংশ বালক ও ৪ শতাংশ বালিকা অর্থের বিনিময়ে কাজ করে। সাধারণত তারা অনেক ঘণ্টা কাজ করে এবং কম মজুরি পায়, এ

www.pathagar.com

ছাড়াও কাজের পরিস্থিতিও অনেক সময় থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। এরা রিকশা চালায়, নির্মাণ স্থলে ইট ভাঙে, বাজারে ক্রেতাদের ফল, সবজি ও শুকনো খাদ্যের বোঝা বহন করে, চায়ের দোকানে কাজ করে এবং চিংড়ির রেনু পোনা ধরার কাজ করে। বহু শিশু বিড়ি কারখানায় কাজ করে এবং ১৮ বছর বয়সের কম শিশুরা চামড়া শিল্প কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। শিশুরা ঘরবাড়িতে নিয়মিত কাজ করে। ছেলেমেয়েরা যে সব ঘরবাড়িতে কাজ করে সেখানে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো এবং কখনো কখনো গৃহস্বামী কর্তৃক হত্যার ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যে সব গৃহকর্তা/কর্ত্রী গৃহকার্যে নিয়োজিত শিশুদের ওপর নির্যাতন চালায় অতীতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। কিছু ছেলেমেয়েকে দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে পাচার করা হয় প্রায়শ পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে এবং শিশু পতিতাবৃত্তি একটি গুরুতর সমস্যা। আইনে প্রতিটি শিশুর পঞ্চম শ্রেণী বা ১০ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু সরকার বলে আসছে যে এটা কার্যকরভাবে বলবৎ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ তার এখনো নেই।

দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পোশাক নির্মাতা ও রপ্তানিকারক সংস্থা (বিজিএমইএ), ইউনিসেফ এবং আইএলও'র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এই স্মারক অনুযায়ী গার্মেন্ট খাতকে ১৯৯৬ সালের অক্টোবরের মধ্যে শিশুশ্রম থেকে মুক্ত হবার কথা বলা হয়। বলা হয়, সাবেক শিশু শ্রমিকরা ইউনিসেফ পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আইএলও পরিচালিত পরিদর্শক দল কারখানাগুলো পরিদর্শন করে দেখবে। স্মারক অনুযায়ী কাজ হারানোর ফলে শিশু শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা স্বল্প পরিমাণ মাসিক বৃত্তি পেতো। এ বছরের জুন মাসের ১৬ তারিখে সমঝোতা স্মারকটি পুনরায় নবায়ন করা হয়। বছর এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যেসব কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, সমঝোতা স্মারকে বর্ণিত শর্তাদির লঙ্ঘন আগের তুলানায় ৫ শতাংশ থেকে কমে ৪.৭ শতাংশে নেমেছে। আইএলও পরিদর্শক দল অনুযায়ী যে সব কারখানায় এই লঙ্ঘন দেখা গেছে সেগুলোর শতকরা ৯০ ভাগ কারখানায় এক থেকে তিন শিশু শ্রমিক কাজ করছে। এ ছাড়া বাকি দশ শতাংশ কারখানায় আরো বেশি শিশু শ্রমিক কাজ করছে। অবশ্য লঙ্ঘনকারী কারখানাগুলোর ওপর জরিমানা ধার্য করার দায়িত্বে নিয়োজিত বিজিএমইএ-এর একটি সালিশী কমিটি মন্থর গতিতে কাজ করছে। রপ্তানি বহির্ভূত ও কারখানা বহির্ভূত পোশাক উৎপাদনে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা জানা যায়নি।

২০০০ সালের মধ্যে বিপদজনক শিশু শ্রম নির্মূলের এবং ২০১০ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশু শ্রম নির্মূলের উদ্দেশ্যে তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সার্কের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সরকার শ্রম মন্ত্রণালয়কে অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ প্রদান করেনি। অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে বর্তমানে কর্মরত স্বল্প সংখ্যক লেবার ইন্সপেক্টর সকল ধরনের শ্রমিক সমস্যা মোকাবিলায় অকার্যকর প্রতীয়মান হয়েছে।

www.pathagar.com

সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর এবং কিছু সহযোগী এনজিও'র সহায়তায় ইউনিসেফ দেশের বিভিন্ন শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে বসবাসরত সাড়ে তিন লক্ষ (৩,৫০,০০০) শিশুকে শিক্ষা প্রদানের একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, সরকার, বিভিন্ন এনজিও এবং কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের সাথে আইএলও/আইপিইসি-র ২০টি কর্মসূচি রয়েছে। শিশুদেরকে কাজ থেকে অপসারিত না করে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কর্মরত প্রায় ৬,০০০ শিশু যাতে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পঞ্চাশ হাজারেরও (৫০,০০০) বেশি শিশুর জন্য শিক্ষা/সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

সংবিধানে বাধ্যতামূলক শ্রম অথবা বলপ্রয়োগে কাজ করানো নিষিদ্ধ; এর মধ্যে শিশুদের কাজও অন্তর্ভুক্ত। সরকার কার্যকরভাবে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করে না। কিছু কিছু শিশু এমন পরিবেশে গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করে যেটাকে শ্রম দাসত্বের সাথেই তুলনা করা যায়। বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্টের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে নারী ও শিশু পাচারের সাথে পুলিশের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল অথবা এ কাজে পুলিশ সহযোগিতা করেছে।

ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য শর্তাবলী

জাতীয় পর্যায়ে কোনো ন্যূনতম মজুরি নেই। পক্ষান্তরে কয়েক বছর পর পর আহূত মজুরি কমিশন শিল্প ভেদে মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের নিয়োগকারীরা এই মজুরি কাঠামো উপেক্ষা করে থাকে। গার্মেন্ট শিল্পে আইনসম্মত ন্যূনতম মজুরি অনেক কারখানাই প্রদান করে না। ছোট ছোট কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে বিলম্ব করা একটি সাধারণ ঘটনা। আর তিন মাস কাজ করার পরও এই সব কারখানার শ্রমিকদেরকে শিক্ষানবীশের বেতন প্রদান করা হয়। একজন দক্ষ কারখানা শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ইপিজেড-এ কর্মরত শ্রমিকের জন্য আনুমানিক ৬৩ ডলার (৩,৪০০ টাকা) এবং ইপিজেড-এর বাইরের শ্রমিকের জন্য আনুমানিক ৪৯ ডলার (২,৬২০ টাকা)। এই মাসিক বেতনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জন করতে পারে তবে এই অর্থে একজন শ্রমিক ও তার পরিবারের পক্ষে একটি সুন্দর জীবন যাপন সম্ভব নয়।

আইন অনুযায়ী এক কর্ম সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে এবং সপ্তাহে একদিন ছুটি বাধ্যতামূলক। সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টার ওভারটাইমসহ ষাট ঘণ্টার কর্ম সপ্তাহ অনুমোদিত। এই আইন হোসিয়ারী ও তৈরী পোশাক শিল্পে অত্যন্ত শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হয়।

১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরীজ আইন অনুযায়ী পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানদণ্ড নামমাত্র নির্ধারিত হয়েছে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আইন তবে নিয়োগকারীরা এই আইনটিকে ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করে থাকে। গার্মেন্ট শিল্পে অগ্নি নিরাপত্তার শর্তাবলীর ব্যাপক লঙ্ঘন দেখা যায়। অনেক কারখানা এমন সব ভবনে স্থাপন করা হয়েছে যেগুলো শিল্প স্থাপনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়নি। বিপদকালে এই সব ভবন থেকে শ্রমিকরা সহজে বের হতে পারে না। এ বছরের ২৭শে আগস্ট তারিখে একটি গার্মেন্টস

www.pathagar.com

ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগলে ১২ জন শ্রমিক প্রাণ হারায়। দরোজা তালাবদ্ধ থাকার কারণে ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার পর তারা সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয়নি। বেসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের এক রিপোর্টে অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চরম বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া, অনেক কারখানার টয়লেট ও বাথরুম সুবিধাদি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত (৩শ' কর্মীর জন্য একটি টয়লেট)। আইনের শর্তাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমিকরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে তবে খুব কম সংখ্যক মামলাই দায়ের করা হয়ে থাকে। শ্রম মন্ত্রণালয়ে ইন্সপেকটর কর্তৃক পরিদর্শন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। এর কারণ ইনসপেক্টরদের স্বল্পতা, তাদের ব্যাপক দুর্নীতি এবং অদক্ষতা। ৩,০০,০০০ প্রতিষ্ঠানের জন্য মাত্র ১০০ ইনসপেকটর রয়েছে। বেকার সমস্যার উচ্চ হারের জন্য এবং আইনের প্রয়োগ না হওয়ার জন্য শ্রমিকরা বিপদজনক কর্ম পরিবেশের প্রতিবিধান দাবি করলে অথবা এই পরিবেশে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের চাকুরী হারানোর জুঁকি রয়েছে।

চ. মানুষ পাচার

আইনে মানুষ পাচার নিষিদ্ধ হলেও মানুষ পাচার একটি গুরুতর সমস্যা। মূলত ভারত, পাকিস্তান ও দেশের মধ্যে প্রধানত জোর করে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু ব্যাপকভাবে পাচার করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোর করে কাজ করানোর উদ্দেশ্যে পাচারের ঘটনাও লক্ষ্য করা গেছে। উটের সহিস হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু শিশুকে মধ্যপ্রাচ্যেও পাচার করা হয়।

পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী পাচারের জন্য ১০ থেকে ২০ বছরের কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান রয়েছে। অনৈতিক বা বেআইনী কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শিশু পাচারের সাজা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যাহোক এই ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কমই সাজা দেয়া হয়। মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারীরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে খবর দিয়েছেন যে পুলিশ ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তারা পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচারকে প্রায়ই উপেক্ষা করে থাকে এবং এসব ঘটনায় চোখ বুজে থাকতে তাদের সহজেই ঘুষ দেয়া যায়। একটি পাচারবিরোধী সংগঠন জানায় যে আলোচ্য বছরে মানুষ পাচারের চারটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়। ইতিপূর্বে দায়ের করা দুটি মামলার নিষ্পত্তি হয়। একটি মামলায় একজন পাচারকারীকে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং অপর একটি মামলায় দুজন পাচারকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। পাচারের দায়ে সঠিক কত সংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হয় তা নির্ণয় করা দুরূহ কেননা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সাধারণত যথাযথ কাগজপত্র ছাড়া সীমান্ত অতিক্রমের মতো মামুলী অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জোর করে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ঠিক কতজন নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়েছে, তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। যাহোক মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা হিসাব করেছেন যে এই উদ্দেশ্যে বছরে ২০ হাজারের বেশি নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়। ভালো কাজ

www.pathagar.com

পাইয়ে দেয়ার ও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অধিকাংশকে পাচার করা হয়। এদের কাউকে কাউকে দেশের বাইরে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ না পেয়ে অনেক পিতামাতা প্রায়ই স্বেচ্ছায় ছেলেমেয়েদের দূরে পাঠিয়ে দেয়। অবিবাহিতা মাতা, এতিম এবং যারা স্বাভাবিক পরিবারের আশ্রয়ের বাইরে রয়েছে, তাদের পাচার হয়ে যাবার ঝুঁকি রয়েছে। বিদেশে অবস্থানকারী পাচারকারীরা প্রায় গ্রামে এসে কোনো মেয়েকে "বিয়ে" করে দেশের বাইরে কোনো ঠিকানায় নিয়ে যায় বিক্রি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে মহিলাদের নতুন "বন্ধু" বা "স্বামীরা" তাদের দাসত্বমূলক শ্রম, কায়িক পরিশ্রমের কাজ বা পতিতাবৃত্তির জন্য বিক্রি করে দেয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত, বিশেষ করে যশোর ও বেনাপোলের আশপাশে সীমান্ত শিথিলভাবে নিয়ন্ত্রিত বলে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম সহজ।

শিশু পতিতার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। সরকারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী যাদের বয়স ১৮ বছরের অধিক তাদের জন্য পতিতাবৃত্তি আইনানুগ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই ন্যূনতম বয়সের বাধ্যবাধকতাকে প্রায়ই উপেক্ষা করে। বয়স সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দানের মাধ্যমে এই বাধ্যবাধকতাকে সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায়। অপ্রাপ্ত বয়স্কা পতিতা সংগ্রহকারীদের কদাচিৎ শাস্তি দেয়া হয়। শিশু পতিতাদের একটি বিরাট সংখ্যক পতিতালয়ে কাজ করে।

শিশুদের, সাধারণত তরুণদের মধ্যপ্রাচ্যে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে উটের সহিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য পাচার করা হয়। হিসাব করা হয়েছে যে একমাত্র সংযুক্ত আরব আমীরাতে বর্তমানে ১০০ থেকে এক হাজারের বেশি অপ্রাপ্ত বয়স্ক দক্ষিণ এশীয় উটের সহিস হিসেবে কাজ করছে। এদের অধিকাংশ পাকিস্তান ও ভারত থেকে গেলেও বাংলাদেশ থেকে যাওয়া সহিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব শিশুর বেশির ভাগ তাদের পিতামাতাদের জ্ঞাতসারে কাজ করে। এর জন্য পিতামাতারা তাদের শিশুর কাজের জন্য ২০০ ডলারের মতো (১০ হাজার টাকা) পেয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে অপহরণ করা হয়। যেসব চক্র এই শিশু সহিসদের নিয়ে আসে তারা শিশুপ্রতি মাসে ১৫০ ডলার (সাড়ে সাত হাজার ডলার) পেয়ে থাকে। এই সব শিশুকে মধ্যপাচ্যে নিয়ে আসার একটি সাধারণ কৌশল হলো মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের ভিসা আছে এমন ভারতীয় বা বাংলাদেশী মহিলার পাসপোর্টের সংগে শিশুটির নাম জুড়ে দেয়া। মহিলাটি ঐ শিশুটিকে নিজের সন্তান হিসেবে দাবি করে। আলোচ্য বছর পুলিশ শিশুদের মধ্যপ্রাচ্যে পাচারের কয়েকটি ঘটনায় কয়েক জনকে গ্রেফতার করে।

সরকার পাচার মোকাবিলায় কয়েকটি নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সমস্যায় দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থাকে (সার্ক) সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টায় সরকার জড়িত রয়েছে। সরকার প্রায়ই পাচার সমস্যা বিষয়ক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশিবিরে তার প্রতিনিধি পাঠায়। তাছাড়া সরকার এই সমস্যা মোকাবিলায় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করেছে। যা হোক এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের ক্ষমতা সীমিত।

www.pathagar.com

জুনে সরকার পাচার সমস্যা মোকাবিলায় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নরওয়েজীয় সরকারের সাহায্য সংস্থা "নোরাড"-এর সংগে ২০ লাখ ডলারের (১০ কোটি ৮০ লাখ টাকা) তিন বছর মেয়াদি একটি কার্যক্রম স্বাক্ষর করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এই কার্যক্রম দোষী ব্যক্তিদের বিচার, নারী ও শিশুদের আশ্রয় দান এবং পাচার প্রতিরোধের ওপর জোর দেবে। এই প্রকল্পের একটি লক্ষ্য হলো পাচারকারীদের গ্রেফতার ও বিচার করার উদ্দেশ্যে সরকারকে আরো বেশি করে সংশ্লিষ্ট করা । যাহোক সরকার গ্রাম পর্যায়ে জন্ম ও বিয়ের কোনো রেকর্ড রাখে না বলে বিয়ে বা পারিবারিক বন্ধন সম্পর্কে মিথ্যা দাবি নির্ণয় করা দুরূহ।

সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং পাচারের বিরুদ্ধে বেসরকারি সংস্থা, দাতা দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সংগে কাজ করছে। এই ধরনের কিছু প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির অভিযান, গবেষণা, লবিং এবং উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। পাচারকৃতদের ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় সরকার সহায়তা দিলেও সরকার পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রগুলো অপর্যাপ্ত ও এগুলোর ব্যবস্থাপনা দুর্বল। "নোরাড"-এর সহায়তায় এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমগুলোকে জোরদার করা।

দেশজুড়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা পাচার প্রতিরোধ, উপাত্ত সংগ্রহ, তথ্য নথিবদ্ধকরণ, প্রচার, সচেতনতা সৃষ্টি, নেটওয়ার্ক তৈরি, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা, আইন প্রয়োগ, উদ্ধার, পুনর্বাসন, সমাজে পাচারকৃতদের পুনরায় সম্পৃক্তকরণ, উপার্জন সংস্থান ও স্বল্প সুদের ঋণদান কর্মসূচি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং আইন সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়াসের মাধ্যমে পাচার সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করছে। এই সমস্যা সমাধানের কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে "দি অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট" পাচার সমস্যার ওপর একটি সমীক্ষা এবং কয়েকটি কর্ম শিবির পরিচালনা করেছে। যাদের পাচার হয়ে যাবার ঝুঁকি রয়েছে এমন তাদের জন্য এই সংগঠনটির একটি সহায়তা কার্যক্রমও রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডাব্লিউএলএ) প্রচারপত্র, স্টিকার ও পোস্টার বিলির মাধ্যমে পাচারের বিপদ সম্পর্কে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিএনডাব্লিউএলএ পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য বিএনডাব্লিউএলএ একটি আশ্রয় কেন্দ্রও পরিচালনা করে। এই কেন্দ্রটি চিকিৎসা পরিচর্যা, পরামর্শদান ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সারা দেশে পাচারের ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে "মহিলা ও শিশু কেন্দ্র" (সিডাব্লিউসিএস)-এর নেটওয়ার্ক রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠনটি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কে পুলিশদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে এর একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প রয়েছে। পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংবাদপত্রে এই সমস্যাটি প্রায়ই স্থান পাচ্ছে। পাচারবিরোধী কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর দু'টি সমন্বয়কারী সংগঠন রয়েছে এবং তারা এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে অধিকতর সমন্বয় এবং পরিকল্পনার জন্য কাজ করছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com